সোনালি ডানার চিল

সুরঞ্জন প্রামাণিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সোনালি ডানার চিল

সুরঞ্জন প্রামাণিক

২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্
কোলকাতা-৭০০ ০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনালি ডানার চিল

সুরঞ্জন প্রামাণিক

SONÂLI DÂNÂR CHIL
[a kite with golden wings]
(a biography-novel on Jibanananda Dash, the poet)
Suranjan Pramanik

© লেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ডিসেম্বর ২০১৫

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৯

প্রচ্ছদ : শমীক প্রামাণিক

অক্ষরবিন্যাস
মুদ্রাকর, ১৮এ রাধানাথ মল্লিক লেন্, কোলকাতা-৭০০ ০১২

উবুদশ-এর পক্ষে ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্ কোলকাতা-৭০০ ৫১২ থেকে
সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত এবং
ইউডি প্রিণ্টার্স-এর পক্ষে ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্ কোলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত

দাম ৪০০.০০

ISBN — 81-87487-87-9

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণীয়াসু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সমাজ নেই তবু রয়ে গেছে, যেখানে কায়েমী
মরুকে নদীর মতো মনে ভেবে অনুপম সাঁকো
আজীবন গড়ে তবু আমাদের প্রাণে
প্রীতি নেই— প্রেম আসে নাকো।

সে কোন্ শ্রুতি-কথকতার যুগ থেকে মানুষ শুনতে ভালোবাসে পবিত্র পুরাণকথা, মহাত্মা নরপতি ঋষিদের উপাখ্যান; ভালোবেসেছে রূপকথা, নীতিগল্প— আদিরসের গাঢ় ভিয়েনে রচিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক-কথায় এসময় ম'জে আছে খুব... তবু, এসবের বাইরে আপাত ব্যর্থ, জীবনে অসফল দু'-একজন মানুষ আমাদের জানিয়ে দিয়ে যান জীবনের অন্য মানে— জীবন হ'তে পারে প্রার্থনাসঙ্গীতের মতো, কিংবা শান্ত বিপ্লবী... তাঁদের জীবনকথাও মানুষের আগ্রহের জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। এই আখ্যানের কেন্দ্রে আছেন তেমনই একজন— কবি জীবনানন্দ দাশ।

তাঁর জন্মের একশ বছর পর— এই রচনা-প্রয়াস। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে— কেন জীবনানন্দ? এ আখ্যানের সত্যতা কতখানি?

তখন (বিশ শতকের শেষ দশক) প্রতিদিন মনে হতো আমি একা হয়ে যাচ্ছি, কোথাও নেই আমি। তখন এক-একটা মধ্যরাত গড়িয়ে যাওয়া টের পেতাম। গাঢ় অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা। তখন দু'জন অন্যরকম মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হতো। একজনের সঙ্গে প্রায়ই আমার ঘরে (তাঁকে আমি অনুভব করতাম); অন্যজনের সঙ্গে মাঝেমধ্যে কফিহাউসে। প্রথমজন 'মহাপৃথিবী'র স্বপ্ন দেখতেন, দ্বিতীয়জনের স্বপ্ন ছিল 'বিপ্লব'। দু'জনই আপাত অসফল। এঁদের যে-কোনো একজনের জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়া ছাড়া আমার যেন আর পরিত্রাণের পথ ছিল না। আমার এক বন্ধুর পরামর্শে জীবনানন্দের জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়ি। এটা অবশ্যই ব্যক্তিগত কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

এ আখ্যানের 'সময়' ইতিহাসনিষ্ঠ; চরিত্রদের মানসপট নির্মাণের অন্যতম উপাদান জীবনানন্দের শিল্পকৃতি, তাঁর শিল্পভাবনা এবং তাঁর স্ত্রী ও ভাই-বোন সহ অন্যদের স্মৃতিকথা। সংলাপ কল্পিত হ'লেও বস্তুনিষ্ঠ, চিন্তাপ্রবাহ জীবনানন্দীয় (তাঁর চিঠিপত্র, ডায়েরি)।

প্রচলিত 'আধুনিক' উপন্যাস-কাঠামোর পরিসরে এ আখ্যান গ'ড়ে ওঠেনি। এর অন্যতম কারণ হ'তে পারে: জীবনানন্দ দাশ— এই মানুষটি তথাকথিত 'আধুনিক' হয়ে উঠতে পারেননি। গ্রামপতনের আর্তনাদ তিনি শুনেছেন, জেনেছেন নগরপত্তনের উল্লাস আর বেদনার্ত হয়ে অনুভব করেছেন: পশ্চিমে প্রেতের মতো ইউরোপ/পুবদিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;/আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতো ঘনঘটাচ্ছন্নতা/ইয়াঙ্কির লেন-দেন ডলারে প্রত্যয়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ তো চূড়ান্ত 'আধুনিক'-বিরোধী অবস্থান! তাঁর এই অবস্থানই এই রচনা-প্রয়াসের অন্যতম কারণ। এই 'অবস্থান'কে উপন্যাসের 'আধুনিক' কাঠামো ধারণ করতে অক্ষম। অন্য বাচনে বলা যায়: শিল্পের বিষয়বস্তু (আধেয়) তার কাঠামোগত রূপের স্রষ্টা (Content creates its form and frame.)— এই তত্ত্বানুসারে ঘটনাটি ঘটেছে।

এই আখ্যানের মধ্যে এমন একটি মেয়ের দেখা পাঠক পাবেন— হয়তো তাকে অন্য কোথাও আমরা দেখেছি; কিংবা সে আছে আমাদের আকাঙ্ক্ষায় —'সুন্দরী' না-হয়ে সে মানুষী হয়ে উঠবে।— উৎসর্গপত্রটি সেই মেয়ের জন্য!

যাঁদের অবদানে **সোনালি ডানার চিল,**— তাঁদের কথা গ্রন্থশেষে উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠক! আপনাকে স্বাগত।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশকের কথা

জীবনীমূলক উপন্যাসের সংখ্যা শুধু বাংলাসাহিত্য নয়, বিশ্বসাহিত্যেই বস্তুত হাতে গোনা। সেই তালিকায় সুরঞ্জন প্রামাণিকের 'সোনালি ডানার চিল' আর-একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আমরা যুগপৎ আনন্দিত ও গর্বিত।

উপন্যাসের মূল চরিত্র কবি জীবনানন্দ দাশ। আমরা দেখেছি, কবির চরিত্র-বিশ্লেষণে— দেশ-কাল-সমাজভাবনারহিত অচরিতার্থ প্রেমের কবি, নারীবিদ্বেষী, রাজনীতিবিমুখ, জীবনবিমুখ, অন্ধকারবিলাসী— এমন কত-না নেতিবাচক বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে তিনি বণিকসভ্যতাবিরোধী একজন প্রেমিক— মানবপ্রেমিক।

উপন্যাসের কাহিনী বস্তুনিষ্ঠ— ইতিহাসনিষ্ঠ— তথ্যনিষ্ঠ। পরতে-পরতে উঠে এসেছে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, স্বাধীনতা আন্দোলন, দাঙ্গা, বাংলার প্রকৃতি আর তাঁর অনুপম মুখাবয়ব। ইতিহাসসচেতন এই কবি বস্তুত তিমিরবিলাসী নন,— তিমিরবিনাশী এক শান্তবিপ্লবী।

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ... আলোর সন্ধানে যারা আছি, এ উপন্যাস হয়তো তাদের সেই পথে আলো ফেলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকের অন্যান্য বই

নীলরতন (গল্প সঙ্কলন)

জ্যোৎস্নায় হাঁটা ও আরো কিছু গল্প (গল্প সঙ্কলন)

উত্তর হাওয়ার গান (উপন্যাস)

কাফেস (গল্প সঙ্কলন)

মুদ্রারাক্ষস (গল্প সঙ্কলন)

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আবহমান (উপন্যাস)

রাষ্ট্রের দৃষ্টি কবির দর্শন (প্রবন্ধ)

অদৃশ্য সম্পর্কগুলি (গল্প সঙ্কলন)

২০০০-এর নির্বাচিত গল্প (যৌথভাবে সম্পাদিত গল্প সঙ্কলন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

With a devotion deeper than the Saints'
I feel the throbs of morn & eve

যেতে হবে। না-যাওয়ার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। কেবল মন খারাপ। মন খারাপ কোনো যুক্তি হ'তে পারে না। তাছাড়া কেন মন খারাপ, কীজন্য— এসবও ঠিক-ঠিক বলা যাবে না। তব, কারণ যা-ই হোক— সবাই যেন জানে, এরকমই হয়— যেতে হয়। আনন্দকেও যেতে হবে। মায়ের কাছেও তার মন খারাপের কোনো দাম নেই! নইলে মা কীভাবে বললেন, 'বড় হচ্ছিস, বাইরে তো যেতেই হবে বাবা!' মায়ের হাত তখন তার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল, 'এই দেখ্ না, আমাকেও তো যেতে হয়েছিল।'

হ্যাঁ, আনন্দ জানে তার মা কোলকাতায় সমাজবান্ধবদের বাড়িতে থেকে, বোর্ডিঙে থেকে পড়াশুনো করতেন। অতএব তাকেও যেতে হবে। যেতে হবে, কেননা, 'তুমি তো জানো মিল, মানুষের জীবন মাইগ্রেটরি বার্ডের মতো—' বলেছেন বাবা, 'হাজার-হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে পাখিরা আমাদের দেশে আসে— বাসা বাঁধে, জন্ম-মহোৎসবে মেতে ওঠে— ডিমে ওম্ দেয়, তারপর বাচ্চারা উড়তে শিখলে ফের ফিরে যায় তাদের দেশে— ততদিনে সেখানকার অবস্থা জীবনের অনুকূলে বদলে গেছে।' আনন্দ মাথা নিচু ক'রে শুনছিল। তার মনে হলো উপমাটা ঠিক হলো না। পরিযায়ী পাখিরা কেউ এখানে থেকে যায় না। কিন্তু মানুষ— তাকে যেতে হয় একা— কোথাও গেলে ফিরে না-ও আসতে পারে। এসব কথা সে বাবাকে বলতে গেল না। তিনি ভাবলেন, ছাত্রসুলভ এই আনুগত্য যতদিন থাকে ততই ভালো। বললেন, 'তুলনাটা সবদিক থেকে ঠিক নয়।' আনন্দ একপলক বাবাকে দেখলো। তাঁর দৃষ্টিতে তখন দূরমনস্কতা 'তোমার ঠাকুর্দা— বিক্রমপুর থেকে এখানে এসেছিলেন, খুব অল্পবয়সে— ওই পড়াশুনোর জন্যহ; এন্ট্রান্স পাশের পর এখানেই চাকরি নিলেন, সিভিল কোর্টে— এসব কি কখনও বলেছি তোমাকে?'

—'এভাবে বলোনি, তবে শুনেছি।'

—'তোমার জ্যাঠামশাহ, আমি— দু'জনেই কোলকাতায় গেছি ওই পড়াশুনোর জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য—' কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁকে বিষণ্ণ দেখলো আনন্দ। যেন রোদ-ঝলমল দিনে একখণ্ড মেঘের ছায়াপাত। ছায়াটা স'রে যেতেই তিনি বললেন, 'মৃত্যুর কথা কিছুই বলা যায় না, তবু মনে হয়, আমার মৃত্যুর ঢের দেরি এখনও— বাবার মৃত্যুতে যেমন আমাদের আর পড়াশুনো হয়নি, আশা করি তোমার ক্ষেত্রে তা ঘটবে না। মন খারাপ কোরো না! প্রস্তুত হও!' অনুচ্চারিত শুভকামনা আর সরব নির্দেশের পরও তিনি বললেন, 'ঢাকায় যেতে

পারতে, কিন্তু কোলকাতায় সুযোগ-সুবিধে বেশি— বিশেষ ক'রে সমাজবান্ধবদের সহযোগিতা পাবে। মনে রেখো, কোলকাতায় তুমি যাচ্ছো যোগ্য হ'তে।'

আচম্‌কা বাবাকে বাস্তব-ঘেঁষা সাধারণ মানুষের মতো মনে হলো। অথচ মুখভর্তি কাঁচাপাকা দাঁড়িতে যে ঋষিভাব মূর্ত হয়ে ওঠে তা অমলিন। বাবা তো মানুষ হওয়ার কথা বলেন! তবে যোগ্য হওয়ার কথা বললেন কেন? তবে কি ডারউইনিজ্‌ম?

অতএব, আনন্দ— যেতে হবে। না-যাওয়ার পেছনের কারণগুলো খুবই মামুলি। কিংবা নির্ভেজাল গভীর এলোমেলো আবেগের বিষয়। কেবল মন খারাপ করায়। মিলু, বি প্র্যাকটিক্যাল!

ঘরে ব'সে ভাবছিল আনন্দ। তার মনে হলো, এই ঘরটার জন্যই তার মন খারাপ। পড়াশুনোর জন্য একান্ত নিরিবিলি মায়ের হাতে সাজানো-গোছানো ঘর থেকে তাকে উচ্ছেদ হ'তে হবে। অথচ, সমস্ত কোলাহল থেকে, অপ্রিয় পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে মনের মতো একটা পৃথিবী গ'ড়ে তোলা যায় এখানে— তখন পাখির ডাক, মৌগুঞ্জন এমন-কী ফুল ফোটার শব্দ সে শুনতে পায়। ফুল ফোটার শব্দ কি শিশির জমার শব্দ যে শোনা যায়— কেউ বিশ্বাস করে না। অবশ্য আনন্দ তেমন কাউকে বলেনি। একবার সে হরিজীবনকে বলেছিল। হরিজীবন— 'তোর কান খুব সেন্সিটিভ' ব'লে আর কিছু বলেনি। আনন্দর বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, 'ব্যাপারটা কানের নয়— ও-শব্দ চোখ দিয়ে শুনতে হয়।' আর একদিন,— কী কথায়-কথায় মনিয়াকে চুপ করতে ইশারা করেছিল সে। তখন হেমন্ত। বিকেল। ধানপাতার ডগায় শিশিরবিন্দু। সমস্ত ধানক্ষেত ভ'রে আছে বিন্দু বিন্দু শিশিরে। এত শিশির-সম্পাত অথচ শব্দ শোনা যায়নি— আনন্দ সেই শব্দ ধরতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল।

মনিয়া ভয়ে-ভয়ে আনন্দকে আলতো ছুঁয়ে বললো 'ও মিলুদা! কী হলো!'

আনন্দ একটু চমকে, অদ্ভুত হেসে বললো, 'ও কিছু না। চল্‌।'

—'না। বলো না! তোমাকে কীরকম যেন দেখাচ্ছিল! বলো!'

—'কীরকম দেখাচ্ছিল?'

—'কীরকম— কীরকম, তা কি বলা যায়— তুমি যেন কিছু ধরতে চাইছিলে।'

আনন্দ ব'লে উঠলো, 'এক্সাক্টলি।'

—'কী?'

—'শব্দ।'

—'শব্দ! কীসের?'

—'শিশিরের।'

মনিয়া ধন্ধে পড়লো। আনন্দকে বোঝার চেষ্টা করলো, মিথ্যে বলছে কি না। জানতে চাইলো, 'শিশিরের শব্দ কি সত্যি শোনা যায়?'

—'আমি তো শুনতে পাই।'

মনিয়া গম্ভীর। তারপর বায়না ধরার ভঙ্গিতে ব'লে উঠলো, 'আমি শুনবো।'

তখন নিজেকে খুব অসহায় আর বিপন্ন মনে হয়েছিল আনন্দর। আহা! যদি শোনানো যেতো! যদি পারতাম! আনন্দ বলেছিল, 'শোনা দেখা— এসব ব্যাপার তো যার-যার...'

—'তাই কি! তুমি যা দেখতে পাও, আমি কি তা দেখিনি?' ব'লে হাসলো। রহস্য ছড়ালো সে হাসিতে।

আনন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক জোড়া শালিকের আদর, উজ্জ্বল হলুদ ঠোঁট। সে সায় দিলে মনিয়া বললো, 'তাহলে তুমি যা শুনতে পাও, আমিও তা পাবো— আমরা একসঙ্গে শুনবো।'

—'আচ্ছা, ঠিক আছে। আগে তুই একা একা শোন্— তারপর একসঙ্গে।'

—'বেশ। তাহলে মিলুদা—' ব'লে মনিয়া তাকিয়ে থাকলো আনন্দর মুখের দিকে। কী যেন বলার কথা। আনন্দও তাকে পড়তে চাইছিল।

মনিয়ার চোখে চোখ। চোখের নীল দেখতে দেখতে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সমুদ্র। জাহাজ। ওই জাহাজে আসছে পণ্য, এসেছে ধর্ম— সর্বনাশ, মনিয়াদের— ওই-যে নীলাভ চোখের কোণে যে রক্তাভাস, ওই রক্তে রয়েছে পর্তুগীজ রক্তের মিশ্রণ—

—'এই মিলুদা!'

আনন্দ চমকে উঠলো। —'না, কিচ্ছু না' এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।

—'তুমি কিছু ভাবছিলে!'

—'হ্যাঁ। কতদূর থেকে মানুষ আসে।'

মুহূর্তের মধ্যে মনিয়ার যেন তার বাবার কথা মনে প'ড়ে গেল, সেই অনুষঙ্গে সে বললো, 'সাত সমুদ্দুর পার থেকে।' কী এক খেয়ালে গলার চেন্‌টা সে নাড়াচাড়া করলো। ওই চেনে ঝোলানো ক্রুশ উঠে এলো সামনে বললো, 'তুমি যে কখন কী ভাবো! বেশ, মজার। আমিও ভাবি। সে যাকগে, শোনো, তুমি অন্তত শিখিয়ে দাও, কীভাবে শুনতে হয়।'

—'ঠিক আছে। চল্!'

—'কী ঠিক আছে?'

—'চল্ না!'

তারপর আনন্দদের উঠোনে এসে আনন্দ বললো, 'বল্ তো, এটা কী গাছ?'

—'কী আবার! গন্ধরাজ।'

—'ফুল ফোটার সময় এলে, একা, যখন কেউ থাকবে না, কোনো কোলাহল, তখন ফুটছে যে কুঁড়ি— তার দিকে তাকিয়ে থাকবি, একমনে—'

—'তাহলেই শুনতে পাবো!'

—'আমি তো পাই।'

—'কিন্তু মিলুদা, গন্ধরাজ তো রাতের বেলায় ফোটে!'

—'হ্যাঁ।'

কেমন যেন নিভে গেছিল মনিয়ার মুখ। আনন্দ বলেছিল, 'ফুল ফোটার সময় আসতে দে— তুই তখন নিশ্চয়ই এখানে থাকবি—'

কিন্তু আনন্দ থাকবে না। কোলকাতায় গেলে ফুলেদের ফুটে ওঠা, শিশিরের শব্দ, পাখপাখালির ডাক-কূজন— এসব শুনতে না-পাওয়ার সম্ভাবনায় মন খারাপের রঙ আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। মুখ থেকে কিছুতেই তার আভাস লুকানো যায় না। আড়াল খুঁজতে হয় এই ঘরে— বইপত্তরের মধ্যে। কিংবা খাতায় আঁকিবুকি— আজ একটা চোখ এঁকেছে। কার চোখ? হয়তো মনিয়ার। কিংবা বিশেষ কারও নয়। যদি রঙের ব্যবহার জানতাম— এমন একটা চোখ আঁকতাম, যাতে ফুটে উঠতো মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা এক আশ্চর্য অনুরক্তি, আমার জন্য— আমাদের জন্য, দু'-একখানা ছবি দেখলে যেমন মনে হয়, যেন আমার দিকেও চেয়ে আছে ছবির চোখ— তেমন।

কত কিছুই না-পারা থেকে যাবে জীবনে। আবার যা পারি তা-ও হয়তো শেষপর্যন্ত আর হয়ে উঠবে না। যেমন মা। মা'র কবিতা লেখা সেভাবে স্ফূরিত হয়নি। আমার দাদুর স্বভাব মা'তে বর্তেছিল। আমিও বোধহয় একটু-আধটু পেয়েছি। কী জানি, যদি পেয়েই থাকি— সংসার যেমন খেয়ে ফেললো মাকে— বাবা আশ্চর্য এক কথা বলেছেন এই ক'দিন আগে— যোগ্য হ'তে আমাকে যেতে হবে কোলকাতায়—। মেসজীবন কেমন? সবাই বলছে মজা আছে। কোথাকার-কোথাকার সব মানুষ একসঙ্গে থাকা। একসঙ্গে থাকা মজার ঠিকই, কিন্তু একটু ভাবনার জন্য— একটা নতুন কিছু খোঁজার জন্য— কিংবা দেখার জন্য একা হওয়াটা খুব জরুরি। যদি একা হওয়া না-যায়, একঘেয়ে সব দৃশ্যে, ভাবনায় সময় কাটানো তো খুব মুশকিল— এসব ভাবনায় আনন্দর মন ভালো হওয়ার কোনো পথ পাচ্ছে না। অসহায় দৃষ্টি চার বেড়ার মধ্যে অস্থির। একসময় স্থির হলো রামমোহনের ছবিতে। ফাউণ্ডার— ব্রাহ্মধর্ম। সমাজ। —যে-সমাজে আমার বাবা একজন নেতা। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হবার আগে আমার বাবার নাম ছিল দুর্গামোহন, ব্রাহ্ম হবার পর তিনি সত্যানন্দ। আমিও বাই বার্থ ব্রাহ্ম— আমার ভাইও, ভাইয়ের নাম শুধু অশোক হ'তে পারতো কিন্তু সে অশোকানন্দ, কিন্তু খুকির নাম সুচরিতা— আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে মেয়েদের বোধহয় প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ ঘটে না— মা ব্রহ্মসঙ্গীত গান, তাঁর পিতৃদত্ত নাম কুসুমকুমারী, কুসুমকুমারীই থেকে গেছে— রামমোহনের ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে-ভাবতে আনন্দর ভ্রূ-দু'টি 'কী-হে' ভঙ্গিতে নেচে উঠলো। না রাজা, তোমাকে খুব বেশি মহান ভাবতে পারছি না। যদিও সতীদাহের বিরুদ্ধে আইন তৈরিতে তোমার ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর আর তোমাদের কাজকর্মে মেয়েদের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি— তা একই, যেমন সত্যানন্দ ঋষিতুল্য, গরিবগুর্বো মানুষের কাছে সাক্ষাৎ ভগবান, অন্তত মনিয়ার মা— যিশু আর সত্যানন্দে কোনো ফারাক দেখে না— মা'র প্রতি

তাঁর ব্যবহারটা লক্ষ করেছো— একই অবস্থা— সে হিঁদুর ঘরে হোক কি খ্রিস্টান, মুসলমান ব্রেম্ম তেও কোনো ফারাক নেই— বিবেকানন্দের ছবিতে তাঁর দৃষ্টি ঘুরে গেল... পরপরই ডাক এলো রাতের খাবারের জন্য।

রাতদুপুরে শুতে যাওয়া আর আটটা নাগাদ ওঠা আনন্দর স্বভাব। সত্যানন্দের জীবনচর্যায় এটা ঠিক না। কিন্তু তিনি আনন্দকে ভোরে উঠবার অভ্যাসে নিয়ে যেতে পারেননি। অবশ্য তার এই অভ্যাসের পেছনে কুসুমকুমারীর প্রশ্রয় আছে। ভোরবেলা-যে আনন্দর ঘুম ভাঙে না, এমন নয়। এক-একদিন ভেঙে যায়। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করে না। উঠলে হয়তো বাবা খুশি হতেন। আজ সমস্ত শরীরে গতির শিহরণ নিয়ে জেগে উঠলো আনন্দ। ভারী অদ্ভুত! —আনন্দ ছুটছিল, ছুটতে-ছুটতে সে হাওয়ায় ভাসতে থাকলো, ঠিক পাখির মতো, চিল যেমন ভেসে থাকে, হাওয়া কেটে উড়ে যায় উঁচুতে, তেমন— আনন্দ হাওয়া কেটে ছুটছিল— বাইরে জানলাপথে এক টুকরো ভোরের আকাশ। আলো। বাবা কতবার বলেছেন, 'আলোর স্পর্শে গাছেদের— নিশাচর বাদে এ-পৃথিবীর সব জীবজন্তুর ঘুম ভাঙে। তুমি যদি শিশুগাছের দিকে তাকাও, স্পষ্ট বুঝতে পারবে— সূর্য ডোবার সময় যে-পাতারা ফুলের ওপর বসা প্রজাপতির ডানার মতো মুড়ে গিয়েছিল, মথের পাখা মেলে বসার মতো সে-পাতা ভোরের আলোয় খুলে গেছে।' শুনতে-শুনতে আনন্দর মাথার মধ্যে জেগে উঠেছে বাঁশঝাড়ে পাখিদের কিচিরমিচির, তখন সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে— শান্ত হয়ে আসছে চারধার, সন্ধ্যাতারা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে— শান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে মোরগের ডাক, ফের নিস্তব্ধতা— সেই নিস্তব্ধতায় দু'-একটা ফোঁড় তুলে পাখিদের উড়াল— 'তুমি ছাড়া তোমার চারপাশে আর যারা— সবাই তোমার শিক্ষক— প্রকৃতির পাঠশালায়, এক-একটা প্রহর জেনো, এক-একটা ক্লাস—' তবু আনন্দ ভোরবেলা একদিনও ওঠেনি।

আজ উঠলে হয়। আর কয়েকদিন পর তাকে কোলকাতায় চ'লে যেতে হবে। যাবার আগে অন্তত একদিন বাবাকে সে খুশি করতে পারে। কিন্তু আজও উঠতে ইচ্ছে করছে না। আকাশে ভাসার অনুভূতিটা এখনও শরীরময়, উঠলেই নষ্ট হয়ে যাবে। অনুভবের আয়ু কতকাল? ও তো মরবেই। এমন না যে, তুমি সারাজীবন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু যদি তুমি ওঠো, আর বাবা যদি দেখেন তুমি ভোরের আলো মেখে নিচ্ছো সারা শরীরে— তাঁর যে বিস্ময়, যে খুশি— তার মূল্য তো কম নয়!

আনন্দ উঠতে যাচ্ছিল। তখন সুর-ছন্দে মাখামাখি সূর্যমন্ত্র সত্যানন্দের স্বরতন্ত্রী বেয়ে উঠে এসে, ভোরের আলো মেখে হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে ঢুকে পড়লো এ ঘরে। আর আনন্দর বন্ধ দু'চোখের সামনে ভেসে উঠলো পদ্মাসনে উপবিষ্ট সত্যানন্দের নিমীলিত আঁখিপল্লব, শশ্রু-গুম্ফ; দু'হাতের আঙুলগুলো পরস্পর বিজড়িত— ঋষিপ্রতিম অবয়বের মধ্য থেকে উঠে আসছে আর্তি, আর অনূদিত হয়ে যাচ্ছে আনন্দর চৈতন্যে— হে সূর্য! সুবর্ণময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত। তুমি তা অপসারিত ক'রে সত্যধর্ম দেখাও!

আনন্দ উঠতে পারলো না। সুরের মায়াজাল ছিন্ন ক'রে, শব্দনিঃসৃত বোধি-তরঙ্গকে উপেক্ষা ক'রে তার আর ওঠা হলো না। এতদিন বাবার ইচ্ছে মতো ভোরবেলা উঠতে না-পারার অন্তর্লীন কারণটা যেন আজ আনন্দ আবিষ্কার ক'রে ফেললো। যে মানুষ তাকে সূর্যোদয় দেখতে উৎসাহ দিয়েছেন তিনিই তা নিজের অজান্তে করেছেন নিরস্ত। আর আনন্দ অবাক। এটা হয়েছিল ব'লেই এক অপরূপ সৌরচেতনার প্রত্যুষ সে প্রত্যক্ষ করেছে, নইলে সত্যানন্দকে সে এই প্রশ্নটা করতো না, 'বাবা! সত্যধর্ম কী?' সেদিন সত্যানন্দের গাম্ভীর্য তাঁর চুপ থাকার ওপর নতুন মাত্রা আরোপ করায় আনন্দর মনে হয়েছিল, প্রশ্নটা বোধহয় ঠিক হয়নি। কেমন একটা সংকোচে সে দাঁড়িয়েছিল। সত্যানন্দ বলেছিলেন, 'ধর্ম বলতে সবসময় রিলিজিয়ন বুঝো না— পরে কথা হবে।' সত্যানন্দের শ্লোক আওড়ানো শেষ। আনন্দ আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

উঠলো সাতটা নাগাদ। রোদ্দুরের উজ্জ্বলতা কম। হয়তো হালকা মেঘ জমেছে। চোখ দুটো দু'হাতের তালু দিয়ে একটু রগড়ে নিলো। পৃথিবীজুড়ে কর্মকোলাহল। অন্তর্লীন কী এক ছন্দে বাঁধা। কিন্তু উঠোনে পা দিতেই মন খারাপ টের পেলো। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো আনন্দ। ভাবনার গভীরে, নাকি ওই মাধবীলতায়— অজস্র ফুল ফুটেছে আজ, এত ফুল আগে কি কখনও দেখেছি! নাকি বিভ্রম! জিয়লকচা আর বেড়াচিতার বেড়া দিয়ে ঘেরা 'সর্বানন্দ ভবন'-এর সীমানা। প্রবেশপথে ওই মাধবীলতার পরিপাটি সংসার। আসা-যাওয়ার পথে ফুলপাতা মাথা ছোঁয়। সত্যানন্দের ভাষায় তা ব্রহ্মস্পর্শ। আশীর্বাদ।

কুসুমকুমারী লক্ষ করছিলেন। দিন দিন কী হচ্ছে যে ছেলেটা! মতিগতি বোঝা ভার। এত ভাবুক! এত একা থাকতে ভালোবাসে যে মাঝেমধ্যে আশঙ্কাও হয়। কী ভাবছে ওখানে দাঁড়িয়ে! ডাকলেও বিপদ। কেমন চমকে ওঠে। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে। এসব যে কীসের লক্ষণ! কথাও কেমন আধখেচড়া। কথা বলতে যেন ওর ভালোই লাগে না। কথায় বড় না-হয়ে কাজে বড় হবে— এ কি সেই ছেলে! মুখে হাসি কোথায়? কেমন এক চাপা বিষণ্ণতা! আর তেজ? এই তো সেদিন যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছি। রোগটা এখনও মাঝেমধ্যে ভোগাচ্ছে। কোলকাতায় গেলে কী যে হবে! এটা খাবো না, ওটা খাবো না— কুসুমকুমারীর মনটাও কেমন ভার হয়ে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে নিজের অজান্তে।

আনন্দর দৃষ্টি রাস্তার ওপর। এক থোকা ফুল ছুঁয়ে আছে তার মাথা। সুরকি বিছানো এ-পথ পুবে গিয়ে শেষ হয়েছে স্টিমারঘাটে। পৃথিবীর সব বড় পথেরা কি স্টিমারঘাটে গিয়েই মেশে? স্টিমারগুলো ভেড়ে কোনো-না-কোনো বড়.গঞ্জের ঘাটে— সেসব গঞ্জের দু'-একটায় মাত্র রেলস্টেশন আছে। সব রেললাইন চ'লে গেছে কোলকাতার দিকে— কু-উ-ঝিক-ঝিক, আনন্দর শরীরে দোলানি, যেন রেলগাড়ির দুলুনিতে, দুলছে সে; তার স্মৃতিতে ভেসে উঠছে প্রথম রেলে চড়া, তখন অবশ্য তার খুব অসুখ— চেঞ্জে যাচ্ছিল... নাকি বাবার অসুস্থতার সময় গিরিডি মধুপুর...

We are built with clay— but there is a lamp
Which burns bright and steady though fed with no oil

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রায় নির্জন সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল আনন্দ। এরকমই সে দাঁড়িয়ে থাকে। একা। বিশেষ ক'রে ছুটির পর। কলেজে এখনও কারও সঙ্গে তেমন বন্ধুত্ব গ'ড়ে ওঠেনি। উঠবে ব'লে মনেও হয় না। একে গেঁয়ো, তায় মুখচোরা। গোবেচারা ভাবভঙ্গি। কেউ তার সঙ্গে এগিয়ে এসে আলাপ করবে সে-সম্ভাবনা নেই। উপযাচক হয়ে আলাপ করা তারও স্বভাববিরুদ্ধ। তবু, একটি ছেলের সঙ্গে তার দু'-একটা কথা হয়। সেও গ্রাম থেকে এসেছে। তবে আনন্দর মতো নয়। বেশ স্মার্ট। তার বাবা সরকারি চাকুরে। পয়সার অভাব নেই তাদের মতো। আনন্দর বাবা বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক। সরকারি চাকুরের থেকে মাইনে কম পেলেও মানমূল্যে তিনি-যে ছেলেটির বাবার চেয়ে অনেকটা এগিয়ে— এ-বিষয়ে আনন্দর কোনো সংশয় নেই। বরং প্রচ্ছন্ন একটা গর্ব আছে। কিন্তু সেখানে আজ ছেলেটি যেন একটা প্রশ্ন তুলে গেছে। সে আজ জিগ্যেস করেছে, 'তুমি কি খ্রিস্টান?' আচমকা এই প্রশ্নে আনন্দ একটু বিস্মিত। মুহূর্তে ওই প্রশ্ন উত্থাপনের প্রেক্ষাপট খুঁজে না-পেয়ে বললো, 'না।' এবং একই সঙ্গে তার কুঁচকে থাকা চোখ-দুটো ছেলেটির চোখে রাখলো।

—'তাহলে তুমি মিশন হস্টেলে চান্স পেলে কীভাবে?'

ব্যাপারটা মনে হলো অস্বস্তিকর। ঠিকই তো, অক্সফোর্ড মিশন হস্টেল ফর খ্রিস্টান স্টুডেন্ট। সেখানে অখ্রিস্টান ছাত্র ঠাঁই পায় কী ক'রে? কোথাও একটা দুর্নীতি আছে। এরকম আভাস ছেলেটির বোধে হয়তো পৌঁছে গেছে। কিংবা হ'তে পারে নিতান্তই নির্দোষ কৌতূহল। হয়তো সে ভালো হস্টেল পাচ্ছে না। মেসে থেকে পড়াশুনো চালাতে হচ্ছে। যদি কোনো উপায় বের করা যায়। এরকম ভাবনায় সে জানতে চেয়েছে। আনন্দ বললো, 'আমি ব্রাহ্ম।'

—'মানে?'

—'মানে খ্রিস্টানরা তো একেশ্বরবাদী, আমরাও— ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম।' আনন্দর মুখে মিচ্‌কি হাসি। ছেলেটি যেন কিছু বুঝতে পারছে না— এরকমভাবে সে চেয়ে ছিল আনন্দর দিকে। আনন্দ আকাশের দিকে তাকালো। দেবদারু গাছের মাথা ছুঁয়ে তার দৃষ্টি আকাশ স্পর্শ করলো। আর আশ্চর্য! কয়েক বছর আগে লেখা একটা কবিতার লাইন মনে প'ড়ে গেল— হি স্পান মুনবিম; প্রথম লাইন টেনে আনলো দ্বিতীয় লাইনকে— হি সেণ্ট সান। আনন্দ ছেলেটিকে শোনালো,— হি হ্যাজ ফিল্‌ড্ আস/উইথ্ ফিস্ট অ্যাণ্ড ফান/অ্যাণ্ড ফায়ার অব হার্থ/ইন হিজ রেল্‌ম/দেয়ার ইজ নো ড্যার্‌থ্— আনন্দ তার দু'হাত ধর্মযাজকদের মুদ্রায় ঊর্ধ্বে তুলে ধরলো।

ছেলেটি বিস্মিত। যেন-বা বিমূঢ়। কয়েক মুহূর্ত পর আনন্দ বললো, 'শোনো, তোমাকে খুলেই বলি— আমার বাবা ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রাণপুরুষ; তাঁর সঙ্গে বরিশাল মিশনের কর্তাদের সম্পর্ক খুবই ভালো— মিশনের রেকমেণ্ডেশনে আমি অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলে চান্স পেয়েছি।'

ছেলেটির দীর্ঘশ্বাস আনন্দকে ছুঁয়ে গেছে।

তারপর থেকেই মনটা কেমন যেন হয়ে গেছে। বাবার জন্যে গর্বের যে-ব্যাপারটা ছিল... আনন্দ বার বার 'ঠিক নয়, ঠিক নয়' ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছিল। মন খারাপ— ঠিক যে কীসের জন্য? একটা সত্যের স্বরূপ জানার জন্য, নাকি ছেলেটার সুপারিশ করার কেউ নেই জেনে? কিংবা হ'তে পারে ব্রাহ্ম-খ্রিস্টানের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য থেকে উঠে এসেছে তার ব্যাপারটা— এটা প্রকাশ পাওয়ার জন্য। তাই কি? ঠিক বুঝলো না। তবে মনিয়ার কথা মনে প'ড়ে গেছে ইতিমধ্যে। হয়তো সে-কারণে। মনিয়ার জন্মদাতা একজন পাদ্রি— এরকমই শুনেছে আনন্দ। বড়দের কথায় ঠিকমতো কান দিতে পারেনি ব'লে প্রকৃত ইতিহাস এখনও অজানা। তবে সেই পাদ্রি নাকি নিরুদ্দেশ। মনিয়া, মনিয়ার মা আর্ত-অসহায়— 'পরব্রহ্মের প্রিয়কার্য তিনটি— ন্যায়াচরণ, সত্যব্যবহার, পরোপকার।' সত্যানন্দের কণ্ঠস্বর যেন স্পষ্ট শুনতে পেলো আনন্দ— সমাজের হয়ে তৃতীয় কার্যটি করেছেন সত্যানন্দ, মা-মেয়ে আশ্রয় পেয়েছে। কেন খ্রিস্টানপাড়ায় মনিয়াদের জায়গা হয়নি? কেন জ্ঞাতি-গোষ্ঠির মানুষেরা মনিয়ার মাকে আশ্রয় দেয়নি? এরকম প্রশ্ন তুললেই মা-বাবা খুব রেগে যান। আজ সে-ই রেগে গেল নিজের ওপর— মগজ খুঁড়ে এসব ঝামেলা পাকানোর দরকারটা কী! ঈশ্বরের এ-পৃথিবীতে কেউ তো নিরাশ্রয় থাকতে পারে না। ঈশ্বরের অভিপ্রায় সেরকম নয়। কোথাও-না-কোথাও আশ্রয় জুটে যায়— যেমন ভুবনমামা, বিয়ে-থা করেননি। আর করবেন ব'লেও মনে হয় না। মায়ের দূরসম্পর্কের ভাই; কিন্তু আমাদের খুব আপন মামা— ঠিক-যে আমাদের আশ্রয়ে আছেন, তাও না। তবে আমার মনে হয়, তিনি কুসুমকুমারীর আশ্রয়ে আছেন। অন্তত নিরিবিলিতে তাঁদের ব'সে থাকতে দেখে আমার অমনই মনে হয়েছে— এ এক আশ্চর্য প্রীতিবৃত্তি! যার মধ্য থেকে ফিসফিস গল্প ছড়িয়ে পড়ে— মনিয়ার বাবা ভিলেন হয়ে যান। আমার অনুমান, মনিয়ার বাবাকে সরিয়ে দিয়েছে মিশন। পাদ্রি হয়ে অমন গৃহীমানবসুলভ কাজ করা ঠিক হয়নি। এতে চার্চের বদনাম। ধর্মের বদনাম। সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে অতএব, মনিয়াকে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে। মনিয়ার মাকে স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় রেখে করুণার প্রার্থী ক'রে তোলা যায়— পরম কল্যাণময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় ত্রাতার ভূমিকা নিয়েছেন সত্যানন্দ, মনিয়ার গলায় রুপোর সরু চেনের সঙ্গে পবিত্র ক্রুশ— যন্ত্রণার প্রতীক, ঝোলে—। যন্ত্রণাদগ্ধ এ-জীবন, তবু কী-যে আশ্বাস জেগে থাকে মৃত্যুর কোল ঘেঁষে— এরকম ভাবতে-ভাবতে কখন সে এই সিঁড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সিঁড়ির ধাপগুলোর দিকে এক মনে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আনন্দর মনে পড়লো, 'তুমি এমন এক প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করবার সুযোগ পাচ্ছো যেখানকার ছাত্র ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, ব্রাহ্মসাহিত্যের একজন পথিকৃৎ— তাঁর রচিত 'হোয়াট ইজ ব্রাহ্মইজম' পাঠ ক'রে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।' বাবার কথাগুলো এত স্পষ্ট যে তাঁর কথা বলার ভঙ্গিও ফুটে উঠলো, যাতে প্রকাশ পাচ্ছে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা; এবং

একটু যেন অহঙ্কার— আমি বাই বার্থ ব্রাহ্ম, বাই ফেথ-ই-বা না কেন— এই তো একটু আগে, আমি আমার দু'হাত প্রসারিত ক'রে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলাম তাঁরই উদ্দেশে তো!

আনন্দ প্রথম ধাপে পা রাখলো— বঙ্কিমচন্দ্র পেরিয়েছেন; হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু— রাধানাথ শিকদার— খুব নিবিষ্ট মনে ধাপগুলো দেখতে-দেখতে উঠছে আনন্দ, সিঁড়িতে জেগে উঠছে পায়ের শব্দ...

আনন্দ থমকে দাঁড়িয়েছে। মাথার মধ্যে জেগে উঠছে ইতিহাসের কোলাহল, সকলে তার পাশ দিয়ে উঠে যাচ্ছে কিংবা নামছে। কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না। আমি যোগ্য হ'তে এসেছি— কথাটা সে চিৎকার ক'রে বলতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। স্বপ্নে যেমন পারা যায় না— মনে হলো সেই স্বপ্নের মধ্যেই রয়েছে আনন্দ।

মাঝেমধ্যে উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে আনন্দর ভালো লাগে। এটা অবশ্য তার পুরনো ব্যাপার। হাঁটতে-হাঁটতে পুরনো ধ্বংসস্তূপ, বনজঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার একটা আলাদা আনন্দ আছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সে পুরনো দিনকে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। কিংবা সেই অনুষঙ্গে তার মন কোথায়-কোথায় চ'লে যায়— মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস... কিন্তু এখানে সে-সুযোগ নেই। পথঘাটও খুব একটা চেনে না। একটা পথ ধ'রে হাঁটতে-হাঁটতে কোথাও তো পৌঁছানো যায়। টুকরো টুকরো দৃশ্য— কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়, কুষ্ঠরোগী, ভিখারি, ফুটপাথ-গেরস্থালি— গঙ্গার বগলানো ঘোলা জলে দেহাতি মানুষজনের স্নান; অদ্ভুত মনে হয় সব— এরা কি সবাই যোগ্য হ'তে এসেছে কোলকাতায়? কিংবা এসেছিল? ওই-যে সাদা চামড়ার মানুষগুলো, ওরা কি কোলকাতায় যোগ্য হ'তে এসেছে কিংবা আমাদের চেয়েও যেসব কালোচামড়ার মানুষ দেখি, তারা?— নানান ভাবনা আনন্দর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। মাঝেমধ্যে কেমন বিশ্রী লাগে। দমবন্ধ একটা অবস্থা তৈরি হয়।

আজ কলেজ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রামলাইনের দিকে একদৃষ্টিতে সে কী-যেন দেখছিল। কখনও ঘাড়টা বাঁ-দিকে একটু কাত্ ক'রে— লাইন-বরাবর দৃষ্টি ছুটে যাচ্ছিল মেডিকেল কলেজের দিকে। একটা ট্রাম আসছে— এরকমই আসছিল সেদিন, শিয়ালদহ স্টেশনের সামনে। মা বললেন, 'ওই দ্যাখ্ মিলু— ট্রাম!'

ট্রাম দেখতে-দেখতে কেন যে সেদিন মা'র কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, মা-ও যেন তাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। ট্রামটা একটু দাঁড়িয়ে চ'লে যাচ্ছে। ওভারহেড তারের সঙ্গে সংযুক্ত বাঁকা দণ্ডের প্রান্তে হুইল্‌টার দিকে তাকিয়ে আছে আনন্দ— মাঝেমধ্যে স্পার্ক হচ্ছে। রাতের বেলা ওই স্পার্ক দারুণ একখানা দৃশ্য হয়ে ওঠে— আনন্দ যেন সেই দৃশ্যই দেখছে।

আচমকা তার খেয়াল হলো, অনেকক্ষণ সে এভাবে দাঁড়িয়ে— যেন কোথাও যাওয়ার নেই আমার। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন? আনন্দ হাঁটতে শুরু করলো হ্যারিসন রোডের দিকে। কীসের একটা আওয়াজ— তাকে মনোযোগী ক'রে তুললো। সম্ভবত মিছিলের আওয়াজ।

শিয়ালদহের দিক থেকে আসছে। মিছিল দেখতে আনন্দর বেশ মজাই লাগে। একসঙ্গে অনেক মানুষ। একই কথা। সমবেত উচ্চারণ। 'কথা আর কাজ যদি মানুষের এক হতো!' বাবার মুখে একথাটা আনন্দ প্রায়ই শোনে। ব্রাহ্ম রা অবশ্য তার একটা প্রচেষ্টা আজও চালিয়ে যাচ্ছে। বড় আশার কিছু দেখতে পায় না আনন্দ। যতটুক ছিল, তাও সেদিন ধ্বংসে গেছে— ব্রাহ্ম সমাজ আর মিশনের অদৃশ্য বোঝাপড়া— এই বোঝাপড়া যদি না-থাকতো, তুমি... আনন্দ নিজের উপর বিরক্ত হলো। মিছিলের আওয়াজ স্পষ্ট কথা হয়ে উঠলো— বিশে আগস্টের ঘোষণা বাতিলের দাবির সঙ্গে দাবি উঠছে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের জন্য।

আনন্দ দেখছিল। অবাক।

কণ্ঠস্বরে দাবি প্রতিষ্ঠা বা আদায়ের যে দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছে তাতে আনন্দর মনে হলো অশান্তির বীজ আছে— ক্রমে মিছিল বাঁ-দিকে বাঁক নিলো। অশান্তির উৎস কোথায়— আনন্দ জানে না। বিশে আগস্টে কী ঘোষণা হয়েছিল— একটু জানার ইচ্ছে হলো। হয়তো তাতে অশান্তির উৎস সম্পর্কে আভাস পাওয়া যেতে পারে। একবার তার বাবা ধর্ম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কেশবচন্দ্রকে উল্লেখ করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের মনে হয়েছিল ধর্মের প্রতি মানুষের অননুরাগই যত দুঃখের কারণ— এবং এটাই-যে কারণ তা অধিকাংশ মানুষ জানে না—

মানুষকে জানানোর জন্য কেশবচন্দ্র পোস্টার লিখে রাতের অন্ধকারে সকলের অগোচরে পথের পাশে আঠা দিয়ে সেঁটে দিতেন— 'হে পথিকগণ! এ পৃথিবীতে শান্তি নাহ, তোমরা কি চিন্তা করিতেছ?'

তাহলে কি দুঃখই অশান্তির মূল?

আনন্দর মনে হলো— এ-পথের কোথাও-না-কোথাও সেই পোস্টার ছিল। কোনো-কোনো পথিক নিশ্চয় তা দেখে থাকবে। তারপর?

এ-পথেই উল্লাসকর হেঁটেছিলেন— প্রেসিডেন্সির ছাত্ররা তো এ-পথেই হাঁটে...

এ-পথেই ওই মিছিল...

আমিও এ-পথে হাঁটছি...

ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্তে কেশবচন্দ্র আজ ইতিহাস। উল্লাসকর দ্বীপান্তরে। আনন্দ ভাবলো, মুরারীপুকুরে যে-বাড়িটায় উল্লাসকর বোমা তৈরির দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিলেন— একবার সেই বাড়িটা দেখতে যেতে হবে—

মিছিল ক্রমশ দূরে স'রে যাচ্ছে, দাবিগুলো আর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। আওয়াজ কেবল। আওয়াজের মধ্যে শব্দগুলো অবশ্য এখনও বসিয়ে দেওয়া যায়— বিশে আগস্টের ঘোষণা/মানছি না, মানবো না।

ওই ঘোষণা বিষয়ে একটা কৌতূহল টের পাচ্ছে। নিশ্চয়ই গত বছরের। কার কাছে জানা যাবে? হস্টেলে রাজনীতি আলোচনা নিষিদ্ধ। তাছাড়া, তেমন কেউ নেই হস্টেলে, যাকে জিগ্যেস করা যায়।

The buffet of the ever-wheeling strife
That life hurls on us— so that we may fain
A deeper wisdom— a profounder strain

নগররাত্রির নিজস্ব রূপ আছে, শব্দ আছে— এটা খানিকটা আবিষ্কারতুল্য আনন্দর কাছে, উপভোগের জিনিস। এক-একদিন সমস্ত হস্টেল যখন নিস্তব্ধ, আনন্দ ঘর থেকে নিঃশব্দে ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়ায়। সোজাসুজি তাকালে সারি সারি বন্ধ দরজা। উত্তরেও তাই। একটু উপরদিকে মুখ তুললে তিনতলা— মাথাটা পিছনদিকে আর-একটু হেলিয়ে দিলে একচিলতে আকাশ, রূপালি নক্ষত্রের আকাশ— তবু খানিকটা চেনা মনে হয়, কিংবা— দেশের আকাশকে মনে করিয়ে দেয়। দক্ষিণে রাস্তা— বিবেকানন্দ রোড, রাস্তার ওপারের বাড়িঘরে দৃষ্টি রুদ্ধ হয়। তখন আনন্দ পশ্চিমদিকে একটুকরো বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়েছে রাধাচূড়ার গাঢ় সবুজ পাতারা। আনন্দ তাদেরকে স্পর্শ করে, যেন সেই পাতারাও তাকে ছোঁয়— এখানটায় দাঁড়ালে পশ্চিমদিকে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট আর বিবেকানন্দর কাটাকুটি ছাড়িয়ে আরও কিছুদূর দৃষ্টিটাকে মেলে ধরা যায়। জনশূন্য রাস্তায় কখনও একা এক মাতাল, অস্পষ্ট প্রলাপকথা, কখনও-বা টানা রিক্‌শার টং-টাং, টমটমের টগবগ— এক-একটা দৃশ্য হয়ে আনন্দর মাথার চারপাশে ঘুরতে থাকে। আর এসবের মধ্য থেকেই যেন উঠে আসে তার দেশের আকাশ-মাটি। সে হেলেঞ্চার ঝোপে জোনাকির ওড়াউড়ি দেখতে পায়, দেখতে পায় পুকুরের জলে চাঁদের মুখ দেখা, বাঁশের ডগা ঝুঁকে প'ড়ে জল ছুঁয়েছে— যেন চাঁদ ধরতে চায়, লক্ষ্মীপেঁচার প্রহর ঘোষণা— লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, কেমন অনুগত ব'সে থাকে লক্ষ্মীর পায়ের কাছে— লক্ষ্মীর সঙ্গে পেঁচার কি গল্প হয়? কী গল্প হয়?— এভাবেই আনন্দর মাথার মধ্যে জেগে ওঠে তার দেশের জল-হাওয়া কথা-উপকথা আর দীর্ঘশ্বাস। সে যেন ওসবের হাত থেকে রেহাই পেতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

আজ আকাশে চাঁদ ছিল। প্রতিপদের চাঁদ— আশ্চর্য মায়াবী জোছনায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। চাঁদটাকে তার নীলাভ মনে হচ্ছিল। সত্যিই কি নীলাভ? পুব-দক্ষিণ-পশ্চিমে যতটা দৃষ্টি যায়, সে দেখছিল, নীলাভ আলোছায়ায় মুড়ে আছে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, এমন-কী পাদ্রিদের হস্টেলের সামনের কৃষ্ণচূড়া আর এই রাধাচূড়া— সত্যিই কি যাদুজ্যোৎস্না? আবারও সে চাঁদের দিকে তাকালো। নীলাভই— মনে পড়লো। মনিয়ার চোখ, আর তখনই গির্জা থেকে ভেসে এলো ঘণ্টাধ্বনি।

ঘুম ভাঙার পরও আনন্দর মনে হলো— এটা দেশের বাড়ির ঘর। এবং এইমাত্র তার বাবার মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হলো, তার রেশ এখনও এ-ঘরের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রয়ে গেছে। আবার একইসঙ্গে ট্রামের ঘণ্টির আওয়াজ— বিরক্ত হলো আনন্দ— একটা ভালো স্বপ্ন দেখারও উপায় নেই। প্রতিটি স্বপ্নেরই কিছু-না-কিছু মানে থাকে— এরকমই মনে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দর— কিন্তু এ স্বপ্নের? একে কি স্বপ্ন বলা যায়? কোনো দৃশ্য তো ছিল না। দৃশ্য ব্যাতীত স্বপ্ন— হ'তে পারে, কেবল শব্দ ছিল। শব্দ মানেই তার উৎস থাকবে— উৎস অদৃশ্য কিন্তু কল্পনা করা যায়। চোখ বন্ধ করলো আনন্দ— স্মৃতি; সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে— ওই সত্যানন্দ ব'সে আছেন, তাঁর স্বরতন্ত্রী বেয়ে উঠে আসছে:

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

এবং আনন্দর চেতনায় তা অনূদিত হয়ে যাচ্ছে... স্বপ্ন-স্মৃতি-কল্পনা— একটা আবর্ত তৈরি হলো, ক্রমে বৃত্ত— বৃত্ত থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো। আশ্চর্য! এও কি স্বপ্ন?

কিংবা, এই যে তাদের বাড়িতে বসানো আলোচনা সভা— সত্যানন্দকে ঘিরে ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশনের কতকগুলো ছাত্র। ক্লাসরুমে ছাত্রদের নাম ডাকার মতো ক'রে সত্যানন্দ নাম ডাকছেন।

—হরিজীবন!

হরিজীবন উঠে দাঁড়ালো।

—মান্দু!

প্রমথ উঠে দাঁড়ালো।

তারপর তিনি আনন্দকে বললেন, এক ভদ্রলোক হরিজীবনকে খুঁজছেন। কিন্তু তিনি তাকে চেনেন না। কেবল নামটাই জানেন। ধরো, তুমি তখন কোথাও যাচ্ছিলে, ধরো ফেরিঘাটে— তোমাকে সামনে পেয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন হরিজীবনকে তুমি চেনো কিনা। তুমি তো তাকে চেনোই— বললে, হ্যাঁ। কিন্তু তোমার তো সময় নেই। লঞ্চ ধরবে। সেটা তুমি জানালে। তখন ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, হরিজীবন দেখতে কেমন। তখন তুমি কী বলবে মিলু?

মিলু একবার হরিজীবনের মুখের দিকে তাকালো। তারপর তার চেহারার বর্ণনা দিলো, এমন-কী তার কপালে গভীর কাটা দাগটার কথাও সে বললো।

সত্যানন্দ বললেন, বেশ। আচ্ছা যদি ভদ্রলোক জিগ্যেস করতেন হরিজীবন মানুষটা কেমন?

মিলু চুপ থাকলো। তার মাথা নিচু।

—অশোক তুমি পারবে?

অশোক মাথা নাড়লো।

—আর কেউ?

সবাইকে চুপ থাকতে দেখে তিনি নিজেই বললেন, না। না-পারাটাই স্বাভাবিক। এমন-কী আমিও পারবো না। সবাই কেমন অবাক তাকালো তাদের মাস্টারমাশাইয়ের মুখের দিকে। তিনি হাতের ইশারায় সকলকে বসতে বললেন। তারপর গোঁফে তা দিয়ে বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-পৃথিবীর সবকিছুকে আমরা নাম আর রূপ দিয়ে চিনি— নাম-রূপের আবরণে আবৃত বস্তুকেই আমরা জানি। আর এই জানাকেই আমরা সর্বোচ্চ ব'লে মানি। কিন্তু বুঝতেই পারছো, তা নয়— হরিজীবনকে নামে চিনেছো, রূপে জেনেছো, কিন্তু যেই বলা হলো— মানুষটা কেমন? অমনি আমরা সবাই চুপ— নাম-রূপের অন্তরালে নিহিত রয়েছে আর এক সত্য, ইংরাজিতে যাকে বলে এসেন্স— সার, সত্তা; ওই আবরণ অপসারিত না-হ'লে সত্তার স্বরূপ আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

বলতে-বলতে তিনি মিলুর দিকে তাকাচ্ছেন বার বার। যেন আন্দাজ করতে চাইছেন কিছু।

—তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো?

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

—মোহন তুমি?

মাথা নিচু ক'রে মোহন মাথা নাড়লো।

—মিলু।

আনন্দ ব'লে উঠলো— একটু যেন আভাস পাচ্ছি।

সত্যানন্দ কী যেন ভাবছেন। তারপর বললেন, আসল ব্যাপার কী জানো, বাইরের দেখাটাই সব নয়; পার্ট, অংশ; বাইরেরটা যেমন সত্য, তেমনই আর এক সত্য আছে ভিতরে— এই দুই সত্য মিলে সম্পূর্ণ—

মন্ত্রের প্রথম ছত্র আবৃত্তি ক'রে সত্যানন্দ বললেন, বাইরের ওই আবরণ সোনার পাত্রের মতো, দৃষ্টিনন্দন, মনোমুগ্ধকর। যেমন বইয়ের মলাট, জিনিসপত্রের মোড়ক—

মিলু ব'লে উঠলো, হ্যাঁ বাবা, বুঝেছি।

সত্যানন্দ সন্তানের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, কী?

মিলু বললো, সত্যধর্ম।

কিন্তু আজ, ওই স্মৃতির অংশ হয়েও সে গম্ভীর। আচমকা তার মনে হলো, 'হে সূর্য' ব'লে যে-সূর্যকে আবাহন করা হয়— তা কি ওই আকাশের সূর্য? কে যেন উত্তর দিলো, না।

—তবে?

—চিদাকাশ, হৃদাকাশ— এসব শব্দ কি শোনোনি?

—তার মানে ওই আকাশেও সূর্য আছে!

—আকাশ থাকলে তো সূর্য থাকবেই।

স্বপ্ন কিংবা স্মৃতিঘোর যা-ই হোক না কেন আনন্দ স্পষ্ট সেই উজ্জ্বল আলোময় বৃত্ত, সূর্যপ্রতিম কিংবা অনুসূর্যের উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে। তাহলে, আনন্দ অনুমান করলো, বাবার যতসব প্রার্থনা আর্তি— সবই ওই নিজের মধ্যকার সূর্যের নিকটে।

জেগে ওঠা নাগরিক কোলাহলের মধ্যেই তার দেশের বাড়ির দোয়েল যেন ডেকে উঠলো এই হস্টেলবাড়ির কোনো গাছ থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুবন ভরা মুক্ত মায়া
মুগ্ধ— হৃদয় চেয়ে।

ব্রাহ্ম মতে পরোপকারের সুখ ত্রিবিধ— উপকার মননে সুখ, করণে সুখ, আর কৃত-উপকার স্মরণে সুখ। মনিয়াদের প্রতি কৃত-উপকারে ওই সুখ নিত্য অনুভব করছেন সত্যানন্দ, কুসুমকুমারী— মনিয়ার মা-ও এ-বাড়ির নানান কাজকর্মে হাত লাগান। মনিয়ারও অবাধ গতি। কিন্তু কেমন যেন মন্থর। লজ্জা কিংবা সঙ্কোচে। এবার বাড়িতে এসে ব্যাপারটা লক্ষ করেছে আনন্দ। নিজের মধ্যকার স্বতঃস্ফূর্তি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে— এটাও টের পাচ্ছে সে। আসলে একটা আশঙ্কা— মনিয়ার প্রতি তার আচরণের ভঙ্গি যদি মা-বাবার ওই সুখানুভবকে নষ্ট ক'রে দেয়! বসন্ত শেষ হ'তে চললো। গন্ধরাজ ফুটেছে খুব। ফুটছে। ফুল ফোটার শব্দ শুনতে শেখার কথা ছিল মনিয়ার। শিখছে কি না— এটা জানার জন্য যতবার আনন্দ দৃশ্য রচনা করেছে ততবারই মনে হয়েছে, ওই দৃশ্য যদি কেউ দ্যাখে, সে ভাবতেই পারে— গল্পে যেমন হয়, প্রেম হয়েছে মনিয়া-আনন্দতে। কেউ না-জানলেও খানিকটা সত্য বটে, কেবলমাত্র আনন্দই জানে। মনিয়া এত কাছে এসেছে স্বপ্নে— কী অদ্ভুত আনাড়ি সব কাণ্ড, ইংরাজি উপন্যাসের পাতা থেকে যেন উঠে এসেছে সেসব দৃশ্য— কেবল পাত্র-পাত্রী আলাদা, আনন্দ আর মনিয়া— যেন আদম-ইভ, ইভের একটা স্কেচ করেছে আনন্দ; কিংবা মনিয়ার— স্তনের শেপে ফুটি-ফুটি চালতাকুঁড়ির আভাস। স্বপ্নের পৃথিবী আর ছবির পৃথিবীর সঙ্গে কিছুতেই মিলছে না এই বাস্তব— মনিয়াও কি অমন স্বপ্ন দেখেছে! নইলে ঠিক আগের মতো দুদ্দাড় ঢুকে পড়তে পারতো আমার এ-ঘরে।

—'মিলু।'

আনন্দ চমকে উঠলো। মায়ের কণ্ঠস্বর কেমন যেন। বললো, 'বলো।'

—'তোর সঙ্গে একটু কথা আছে।'

হৃৎপিণ্ডের চমকানি এখন দ্রুত লয়ে— ঢিপ ঢিপ। তবে কি মা কিছু আন্দাজ করেছেন? দেখে ফেলেছেন স্কেচ? আনন্দ বললো, 'কী কথা?'

মা রহস্যময়ী। বললেন, 'গোপন কথা।'

মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করলো আনন্দ। দরজার ফাঁক দিয়ে দূর থেকে মনিয়া তার দৃষ্টি টানলো। মনিয়া আরও দূরে স'রে যাচ্ছে।

—'বলো।'

—'হ্যাঁ রে, তোর মুখটা অমন দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ করেনি তো?'

আনন্দ মাথা নাড়লো, 'তুমি বলো, কী কথা।'

—'সমস্যায় পড়েছি।'

—'তোমার আবার সমস্যা!'

—'তাই তো মনে হচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কী শুনি!'

—'ব্রহ্মবাদী-তে বৈশাখ সংখ্যায় কবিতা লিখতে বলেছেন তোর মোহন পিসে—'

—'সে তো ভালো কথা— তোমার সমস্যাটা কী?'

—'লেখাটাই সমস্যা।'

আনন্দর দু'ভ্রূতে ভাঁজ, 'বুঝলাম না।'

—'বৈশাখ সংখ্যা মানে বুঝতে পারছিস— নতুন বছরকে আবাহন করতে হবে কবিতায়।'

—'তা করবে।'

—'মাথায় কিছু আসছে না রে— পর-পর তিন বছর লিখেছি।'

মাকে কেমন অসহায় দেখছে আনন্দ। অথচ এই মাকে রাঁধতে-রাঁধতে লিখতে দেখেছে সে। বললো, 'ঠিক পারবে তুমি।'

হতাশ ভঙ্গিতে মা বললেন, 'পারবো না। একই বিষয় তো— মনে হচ্ছে নতুনভাবে আর বলার নেই কিছু।'

—'তাহলে তুমি ব'লে দাও— পারছো না।'

—'বলেছি। শুনলে তো।'

মোহন পিসে— মনোমোহন চক্রবর্তী। 'ব্রহ্মবাদী'র সম্পাদক। সম্পাদনার অভিজ্ঞতায় কুসুমকুমারীকে তাঁর অপরিহার্য মনে হ'তেই পারে— এসব বড়দের ব্যাপার; আনন্দ যে কী বলবে ঠিক ভেবে পেলো না। আর এ-ব্যাপারে তার সঙ্গেই-বা কথা কেন— মাথায় ঢুকছে না। আনন্দ চুপ। তার মা-ও। একসময়, কী যেন ভেবে, তিনি বললেন, 'তুই লেখ্ তো!'

—'আমি!'

—'হ্যাঁ, তুই।'

—'তোমার মাথা খারাপ— সম্পাদক চাইছেন তোমার কবিতা।'

—'তা চাক্। আমি বলছি, তুই লেখ্।'

আশ্চর্য স্বরে মা কথা বললেন। যেন নির্দেশ। আবার চাওয়াও।

আনন্দ বললো, 'আমি কি পারবো?'

—'না-পারার কী আছে! লিখছিস তো।'

—'কতদিন লিখিনি।'

—'এবার লেখ্।'

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো আনন্দ। মা বললেন, 'সর্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশের দরকার আছে।'

আনন্দ লিখতো। বলা ভালো, লেখে আপন খেয়ালে। অনেকদিন তেমন খেয়াল হয়নি। তাই লেখাও হয়নি। কিন্তু স্কেচ হয়েছে। হচ্ছে। একই বিষয় কখনও শব্দে কখনও রেখায়— শব্দ ছবি খুলে দেয়— ছবির মধ্য থেকে উঠে আসে ধ্বনি। সবই নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য। নিজেকেই মেলে ধরা। সর্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশ— মানে এই দ্যাখো, আমি আছি! আমি ছিলাম— অন্তরালে, এই প্রকাশিলাম। আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পেলো ব্রহ্মবাদীর কবিতার পাতায় ছাপার অক্ষরে তার নাম—

কল্পনাকে সাকার করার একটা তীব্র ইচ্ছা টের পেলো আনন্দ। মায়ের লেখা গত তিন বছরের কবিতাগুলো একবার দেখে নিলো। কিন্তু কোনো ভাবনা আসছে না। গালে হাত দিয়ে নিজের ঘরে ব'সে ছিল আনন্দ। তারপর আঁকিবুকি কাটলো খাতায়। তারপর সে বাইরে এলো। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে হেঁটে বেড়ালো কিছু সময়। আচমকা সে মনিয়াকে দেখতে পেলো। পরনে তার ফুলছাপ ফ্রক। ফ্রকটা তার চেনা। গত ইংরাজি নববর্ষে বাবা তাকে উপহার দিয়েছিলেন। ইংরাজি নববর্ষ আবাহনে, উৎসবের মেজাজে আনন্দ কতবার যোগ দিয়েছে। রাত জেগেছে— অধীর আগ্রহে কতক্ষণে একত্রিশ ডিসেম্বর রাতে চার্চের ঘড়ির কাঁটা-দুটো এক হয়ে যাবে, অপেক্ষায় থেকেছে— ঢং-ঢং-ঢং— বাংলার নববর্ষ সূর্যোদয়ের সঙ্গে শুরু হয়—

আচমকা আনন্দর মনে হলো, সূর্যোদয়ের কোনো স্মৃতি তার নেই। তব, তার মনে হলো বর্ষকে আবাহনকালে ফিরে দেখার নিয়ম আছে। যে যায় সে আর ফিরে আসে না। ফিরে-ফিরে আসে কেবল তার স্মৃতি। দিনের শুরুতে যে উদয়রাগ, যে সম্ভাবনা-সংঘটন, দিনশেষের অনিবার্যতায় তা ফিকে, ম্লান— গাঢ় অন্ধকারে সেই উজ্জ্বলতার স্মৃতি, সে-স্মৃতি আর-এক সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যায় আমাদের সত্তাকে...

আনন্দ যেন নিজের জন্মসম্ভাবনায় শিহরিত হ'তে থাকে...

পরের দিন ভোরে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। জানালাপথে আশ্চর্য এক আলো এসে পড়লো আনন্দর ঘুমন্ত মুখের ওপর। তার চোখের পাতা সেই আলো-স্পর্শে খুলে গেল। সে উঠে বসলো। একটা অমোঘ টান। বেরিয়ে এলো। উঠোন পেরিয়ে। মাধবীতোরণ, সেখান থেকে নদীর দিকে— ঊর্ধ্বে আকাশে জেগে উঠেছে নরম নীল, দীপ্তিময়; দিগন্তের আকাশ ক্ষণে-ক্ষণে রঙ বদলাচ্ছে, যেন রঙের খেলা,... মুগ্ধ আনন্দ দেখছে সূর্যোদয়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি— রায়গুণাকর
আসিবে না— দেশবন্ধু আসিয়াছে ক্ষুরধার পদ্মায় এবার
কালীদহে ক্লান্ত গাঙশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়

মা-বাবা দু'জনকেই দেখে আনন্দর মনে হলো— তাঁরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কুসুমকুমারী তার চিবুকে স্নেহচুম্বন রাখতে-রাখতে বললেন, 'হ্যাঁ রে মিল, মুখটা এত শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে কেন? শরীর ভালো আছে তো?' আনন্দ মাথা নাড়লো। সত্যানন্দ বললেন, 'এতটা জার্নি!'

কুসুমকুমারী বললেন, 'যা! চোখে-মুখে জল দে।'

কোলকাতা থেকে ফিরলে সবাই কেমন অবাক দ্যাখে তাকে। কত-কী প্রশ্ন করে। কোনোটারই উত্তর আনন্দ ঠিকমতো দিতে পারে না। ভেবলুর কাছে কোলকাতা যেন রূপকথার দেশ— 'এই দাদা। তুই গড়ের মাঠে গিয়েছিস?' আনন্দ দুই ভ্রূ নাচিয়ে উত্তর দেয়। মুহূর্তে ভেবলু কোথায় যেন হারিয়ে যায়। আনন্দ বলে, 'তোর বয়সে আমি কি গেছি— বড় হ' তুইও যাবি।'

সত্যি— দাদাটা কত বড়! কী সুন্দর গোঁফ! নিজের অজান্তেই ভেবলু তার চোয়ালে ঘন হয়ে ওঠা লোমগুলোয় হাত বুলালো।

কিন্তু বাবা যখন জিগ্যেস করবেন, 'কোলকাতার খবর কী?'

তখন? প্রায়ই সে চুপ থাকে। সত্যিই কোলকাতার কোনো খবর সে জানে না। নিশ্চয় তার চারপাশে নিত্যদিন কোনো-না-কোনো খবর তৈরি হচ্ছে— যে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট ধ'রে তার নিত্য যাওয়া-আসা, হয়তো তার যাওয়া-আসার সময়েই কিছু ঘটছে কোথাও—

এবার সত্যানন্দ খবর জানতে চাইলেন না। কেবল বললেন, 'খুব চিন্তায় ছিলাম।'

—'কেন?'

—'কোলকাতার আবহাওয়া— খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। হরতাল তো বেশ সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে।'

আনন্দর মনে পড়লো— এ-মাসের গোড়ার দিকে একদিন স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল— দোকানপাট খোলেনি। রাস্তা ছিল জনমানবশূন্য। কিন্তু পুলিশ ছিল। ঘোড়সওয়ার পুলিশও টহল দিচ্ছিল। কে যেন বলছিল, ময়দানে চিত্তরঞ্জনের জনসভায় বিশাল লোক হয়েছে।

খবর না-জানতে চাইলেও আনন্দর মনে হলো, এটা একটা খবরের মতো খবর হ'তে পারে। বললো, 'হ্যাঁ, তাছাড়া কোলকাতার মানুষজনের উৎসাহও বেড়েছে খুব— চিত্তরঞ্জন দাশের জনসভায় নাকি দশ হাজারের বেশি সমাবেশ হয়েছে।'

—'হ্যাঁ। কাগজ সেরকমই লিখেছে। ভাবা যায়!' এতক্ষণ দুশ্চিন্তার যে মিহি আবরণ ছিল তাঁর চোখে-মুখে— কখন তা স'রে গিয়ে তাঁকে বেশ খুশি আর গর্বিত দেখালো। এতদিন বাবাকে অধ্যাত্মজগতের মানুষ ছাড়া অন্যকিছু ভাবতেই পারেনি। আজ মনে হচ্ছে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতির খবরাখবর বেশ ভালোই রাখেন। কিন্তু ওই বিষয়ে কখনও এমন কিছু আলোচনা করেননি যাতে উৎসাহিত হ'তে পারে আনন্দ; যেমন করেছেন ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কে, প্রকৃতি সম্পর্কে— ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন থাকতে বলেছেন। রাজনীতি কি ইতিহাস-বহির্ভূত?

সত্যানন্দ কিছু ভাবছিলেন। তাঁকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। বললেন, 'রাজধানী দিল্লিতে চ'লে যাবার পর থেকে বাংলার রাজনীতিতে কেমন একটা ঝিমুনি ভাব এসেছিল, চলছিল— হতাশা, পরাধীনতার গ্লানিবোধে এতটাই নির্জীব— দশ হাজার মানুষের জমায়েত আশার কথা। অনেকদিন পর, বলা যায় রবীন্দ্রনাথের পর, একজন নেতার মতো নেতা উঠে আসছেন।' সত্যানন্দ গোঁফে হাত বুলালেন।

রবীন্দ্রনাথ কবি। গীতিকার। সুরকার। নাট্যকার।— এককথায় শিল্পী অভিনেতা। তিনি নেতা হলেন কবে? আনন্দ জিগ্যেস করলো, 'তিনি কীসে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?'

সত্যানন্দ কয়েক মুহূর্ত নীরব। মিলুর সঙ্গে এ-বিষয়ে তেমন কিছু আলোচনার সুযোগ হয়নি। তাছাড়া খুব অল্প বয়সে রাজনৈতিক আবেগ তৈরির বিপক্ষে তিনি— ক্ষুদিরামের পরিণতি তাঁকে আরও দৃঢ় করেছে, রবিবাবুর একটা উক্তি ঘুরেফিরে তাঁর শ্রুতিগোচর হয়েছে, কথাটা বেশ সুন্দর— 'উত্তেজনার আগুন পোহানো'— তাছাড়া রবিবাবুর কয়েকটা লেখাও তাঁর ওই মনোভাবকে পুষ্ট করেছিল— মিলু বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছে, নিতান্ত কাঁচা আবেগের বয়স নয়, আত্মসচেতনার কথা যখন বলি তখন তো তাকে রাজনৈতিক সচেতনার কথাও বলতে হবে— এই বরিশালের মাটিতেই তো সেবার উল্লাসকর... আনন্দ বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে— সত্যানন্দের দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছে সম্মুখে, মাধবীতোরণ পেরিয়ে সেই দৃষ্টি দক্ষিণের পোড়োজমি ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে কোন্-সে দূরে উধাও... দৃষ্টি গুটিয়ে এনে বললেন, 'তোর জন্মের আগে এই দেশটাকে দু'টুকরো করার অপচেষ্টা হয়েছে বেশ কয়েকবার। শেষপর্যন্ত করা যায়নি। কিন্তু সেবার— তখন তুই পাঁচ বছরের— আমাদের ঢাকা আর মৈমনসিংহকে আসামের সঙ্গে জুড়ে— ওদিকে চট্টগ্রাম—' দক্ষিণ-পুবে বাঁ-হাত প্রসারিত, 'উত্তর-পশ্চিমের রংপুর পর্যন্ত— একটা ভাগ—' বাঁ-হাত দাড়িতে বুলালেন বার-কয়েক, 'অর্থাৎ নতুন একটা প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হলো—' আনন্দ শুনছিল। কোনো কৌতূহল জন্মাচ্ছিল না। কেবল একটা আগ্রহ জেগে রয়েছে।— রবীন্দ্রনাথ। তবু মনোযোগী শ্রোতার মতো আনন্দ অপেক্ষা করছে।

সত্যানন্দ বললেন, 'পত্র-পত্রিকায় সমালোচনার ঝড় উঠলো। তখনকার গভর্ণর এণ্ড্রু ফ্রেজার— প্রতিবাদের চেহারাটা যে ঠিক কী আকার নেবে বুঝতে পারেননি— কিন্তু দেশভাগের জন্য মরীয়া কার্জনও— জনমত গঠনের জন্য তিনি এ-বঙ্গে এলেন।' —ব'লে একটু নীরব থাকলেন। তারপর বললেন, 'বুঝলি মিল, একটা পুরনো ব্যাধি আমাদের সমাজে ছিল— ছিলহ, ক্ষত— নানান শুশ্রূষায় সেটা ভরাট হয়ে এসেছিল— সেটাকে খুঁচিয়ে দিয়েছিলেন ওই কার্জন।'

যে-অশ্রদ্ধা আর ঘৃণার বিকিরণ ছিল ওই কথায় আর তাঁর দেহভাষায়— তা মুহূর্তে অপসারিত হয়ে ফের ফিরে এলো সেই উজ্জ্বলতা, তিনি বললেন, 'সেই ক্ষতে শুশ্রূষা বেঁধেছেন রবীন্দ্রনাথ।' আনন্দ চমৎকৃত। তার মাথার মধ্যে গেঁথে গেছে 'শুশ্রূষা বাঁধা'। এবং কৌতূহল জেগে উঠছে। কার্জনের প্রতিপক্ষ রবীন্দ্রনাথ! আনন্দ জানতে চাইলো, 'ক্ষতটা কী বাবা?'

—'হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সন্দেহ-অবিশ্বাস— পরস্পর বৈরিভাব।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এর রুট অনেক গভীরে—'

—'বাবা, আমার জানতে ইচ্ছে করছে— লর্ড কার্জন কীভাবে ক্ষতকে খোঁচালেন আর রবীন্দ্রনাথই-বা কীভাবে শুশ্রূষা বাঁধলেন।'

—'শোনো! এর আগে আমি বলেছি— কোনো ঘটনা একটা কারণে ঘটে না।'

আনন্দ মাথা নাড়লো।

—'এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। মূল কারণ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা— তখন সরকারের কাছে নানান রকম দাবিদাওয়া উত্থাপিত হচ্ছিল— অধিকাংশই ছিল সংস্কার-বিষয়ক এবং সরকার তা মানতে বাধ্য হচ্ছিল, আর সেখানেই ছিল বৃটিশের সংকট— আন্দোলনে অধিকাংশ নেতাই ছিলেন বাংলার এবং হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত— বিষয়টা খুব জটিল আবার সরলও। বাংলার অধিকাংশ মুসলমান হতদরিদ্র— এই দারিদ্রের কারণ হিন্দু-জমিদাররা— এরকম একটা প্রচার ছিল। কার্জন তাঁর সফরে বিভিন্ন জনসভায় বললেন, মুসলমানের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত তার এই নতুন প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা— সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান যে-প্রদেশে, সে তো মুসলমানদেরই দেশ আর সে-দেশের রাজধানী হবে ঢাকা— এটাও ঘোষণা করলেন কার্জন। অতএব, পুববাংলার অধিকাংশ মানুষ বঙ্গভঙ্গের পক্ষ নিলো, এমন-কী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ও— মানসিকভাবে বাংলা ভাষাভাষি গরিব মানুষেরা দু'টুকরো হয়ে গেল। এই প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। আমি তাকে নেতা বলি।' একটু দম নিলেন। দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'দিনটা মনে আছে। ষোলোই অক্টোবর— আমাদের এই বরিশালেও কত বাড়িতে উনুন জ্বলেনি। ষোলোই অক্টোবর ছিল বঙ্গভঙ্গ আইন বলবৎ-এর দিন। প্রতিবাদ হিসেবে হরতাল ধর্মঘট অরন্ধন আর রাখিবন্ধন— কর্মসূচি আগের থেকেই ঘোষণা করা হয়েছিল। রাখিবন্ধনের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের— তিনি গানও বেঁধেছিলেন।'

—'কোন্ গান?'

—'বাংলার মাটি বাংলার জল—'

কবিতা হিসেবে আনন্দর স্মৃতি থেকে উঠে এলো, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল/পুণ্য হউক, পুণ্য হউক/পুণ্য হউক, হে ভগবান...

সত্যানন্দ বললেন, 'কোলকাতায় সারাদিন মিছিলে-মিছিলে ওই গান— বন্দে মাতরম্ ধ্বনি— এই বরিশালেও— কোলকাতায় জোড়াসাঁকো এলাকায় মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন

রবীন্দ্রনাথ— রাখিবন্ধন ছিল সৌভ্রাত্রের প্রতীক— হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের নিদর্শন— তারপর থেকে স্বদেশিদের জন্য কত লিখেছেন তিনি— আমার সোনার বাংলা,/আমি তোমায় ভালোবাসি—' আনন্দ রূপকথা শোনার ভঙ্গিতে ব'লে উঠলো, 'তারপর?'

সত্যানন্দ একটু ধন্ধে পড়লেন। সেটা কাটিয়ে উঠে বললেন, 'আইন বলবৎ হলো ঠিকই কিন্তু আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে লাগলো— বিদেশি দ্রব্যের ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যেও কমতে শুরু করলো, বাণিজ্যে ক্ষতি— বঙ্গভঙ্গ আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলো সরকার— এরকম একটা প্রচার আছে— কিন্তু...' সত্যানন্দ আনন্দর মুখের দিকে তাকালেন। হঠাৎ যেন তাঁর মনে হলো, এসব বলছি কেন? যেন তিনি খেই ধরতে চাইলেন। আনন্দ বললো, 'কিন্তু—!'

ডান হাতের তর্জনী আর বৃদ্ধ দিয়ে সত্যানন্দ গোঁফে তা দিলেন একটু চিন্তিতভাবে। বললেন, 'কিন্তু আমার মনে হয় অন্য একটা ক্যালকুলেশন ছিল— কিন্তু ঠিক যে কী, আমি বলতে পারবো না। এগারোতে বঙ্গভঙ্গ আইন প্রত্যাহার করা হলো আর তার পরের বছরেই রাজধানী চ'লে গেল দিল্লিতে— মুসলমানদের মধ্যে হতাশা বাড়লো'— সত্যানন্দকে একটু গম্ভীর দেখলো আনন্দ। কয়েক মুহূর্ত পর তিনি বললেন, 'এসব সাম্প্রতিক অতীত— ইতিহাস হবে একদিন।' এর পরও কিছু কথা আছে— এমন প্রত্যাশায় কিছুসময় থাকার পর আনন্দ বুঝতে পারলো, বাবার কথা শেষ। বললো, 'আসছি।' সত্যানন্দ পিছু ডাকলেন, 'শোনো! ওই সময়টা যদি তুমি ভালো ক'রে জানতে চাও, পুরনো পত্র-পত্রিকা ঘাঁটতে পারো, রবিবাবুর কিছু লেখা পাবে বঙ্গদর্শন প্রবাসীতে—'

—'আচ্ছা।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝড়ের বাতাস চাই।
—চারি দিক ঘিরে শীতের কুহেলি, শ্মশানপথের ছাহ,
ছড়ায়ে রয়েছে পাহাড়প্রমাণ মৃতের অস্থি খুলি,
কে সাজাবে ঘর-দেউলের পর কঙ্কাল তুলি তুলি?

রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই সংবাদ আনন্দকে দারুণ উদ্বেলিত করলো। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড খুবই মর্মান্তিক— খবর পড়তে-পড়তে আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল চারদিকে প্রাচীরঘেরা একটা বাগান, গাছের ছায়ায় হাজার-হাজার মানুষের সমাবেশ। একটিমাত্র প্রবেশপথ ইংরেজ সৈন্যের উপস্থিতিতে রুদ্ধ... যেন একটা স্থির দৃশ্য, সচল হ'তেই সে দেখতে পেলো বর্বরযুগের ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠছে... অথচ এরা সভ্য— সভ্যতার বড়াই করে! আমরা তা বিশ্বাসও করি— ইংরেজদের অনুগ্রহে আমরা সভ্য হচ্ছি! —দশ মিনিট ধ'রে গুলি চলেছে! নিরীহ গ্রাম্য মানুষ সব— রাজনীতির সঙ্গে সত্যিই কি তাদের সম্পর্ক ছিল, মেলায় আসা মানুষেরাও কি রাজনীতি করে? রাজনীতি মানে— কিছুই বোঝে না আনন্দ। তবে সে বোঝে তার দেশ পরাধীন, সে স্বাধীন নয়— মা'র মুখে শুনেছে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,/কে বাঁচিতে চায়?/দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,/কে পরিবে পায়?' সে আজ মাকেই জিগ্যেস করলো, 'মা— রাজনীতি ব্যাপারটা কী?'

কুসুমকুমারী বললেন, 'সেই যে রঙ্গলালের কবিতাটা মনে আছে?' আনন্দ আবৃত্তির ঢঙে কবিতাটা বললো। কুসুমকুমারী বললেন, 'ওই স্বাধীনতা-হীনতায় না-বাঁচতে চাওয়াটাই রাজনীতি, দাসত্ব-শৃঙ্খল না-পরতে চাওয়াটাই রাজনীতি— পরাতে চাওয়াটা ব্রিটিশের রাজনীতি—'

আনন্দ একটু অন্যমনস্ক!

কুসুমকুমারী বললেন, 'কী ব্যাপার বল্ তো!'

—'কী ব্যাপার আবার? কতগুলো মানুষ মারা গেল!'

—'মারা গেল না— বল্ মেরে ফেলা হলো।'

অথচ আমাদের জীবন অভাব-অনটনে কী ছায়াস্নিগ্ধ! ঘুঘু ডাকছে। শিমুলতুলো ফেটে আছে, হাওয়ার অপেক্ষায়— ঝড় উঠলে... আঃ! সে একখানা দৃশ্য— কালো মেঘের প্রেক্ষাপটে সাদা তুলোর ওড়াউড়ি— দেখেছে আনন্দ, সেই দৃশ্য ফের সে দেখতে পেলো। আচ্ছা সেই বাগানে কি এমন শিমুলগাছ আছে— এমনই কি তুলো ফেটে আছে এখন? রক্তমাখা ঘাসগুলো? যখন গুলি চলে, ঠিক তার আগে যে ঘুঘু ডাকছিল, সে কি ডাক ভুলে গেছে? এখন এমনই শান্ত হয়ে আছে হয়তো সে বাগান; হ'তে পারে ঘুঘুটা ভয় পেয়ে চ'লে গেছে কোথাও— দু'-একটা কাক হয়তো রক্তের গন্ধে এখনও মাটিতে নেমে আসে। ঠোক্কর মারে মাটিতে।

—'কী হলো?'

—'ভাবছি।'

—'কী?'

—'এরকম শান্ত-স্নিগ্ধ ছায়ানিবিড় কোনো বাড়িতে— একটা মানুষ আর নেই— সে মানুষটা স্বাধীনতা চেয়েছিল, তাই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

আনন্দর দৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত গাছে-গাছে, লতায়পাতায় ঘুরে ফিরে এলো, 'কেউ প্রতিশোধ নেবার কথা ভাববে নিশ্চয়—' আনন্দর চোখ দেখে কুসুমকুমারীর বুকের ভেতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠলো। তবে কি মিলু— যে পথে মিলু নিত্যদিন যাতায়াত করে ওই পথে একসময় অনুশীলন সমিতির দপ্তর ছিল, প্রেসিডেন্সি কলেজ— তবে কি মিলু এক্সট্রিমিস্টদের দলে ভিড়েছে?

কুসুমকুমারী বললেন, 'প্রতিহননের পথে মহৎ কিছু হয় না।' আনন্দ কেমন প্রাজ্ঞের মতো বললো, 'জানি।' মুহূর্ত-কয়েক নীরব থেকে বললো, 'কিন্তু মা, হনন যার টিকে থাকার প্রধান উপায়, তার হৃদয় তুমি বদলাবে কীরূপে?' যে আশঙ্কায় কুসুকুমারীর বুক কেঁপে উঠেছিল সেই আশঙ্কা আরও গাঢ়। এবং তিনি অসহায়— ওই প্রশ্নের কোনো উত্তর তাঁর জানা নেই। এবার তিনি সরাসরি জিগ্যেস করলেন, 'তুই কি রাজনীতি করার কথা ভাবছিস?'

—'তুমি কি চাও আমি স্বাধীনতা-হীনতায় বাঁচি?'

কুসুমকুমারী চট্ ক'রে কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। আনন্দ বললো, 'আর দাসত্ব-শৃঙ্খল পরতেও আমার ভালো লাগবে না। এটা আমি বুঝেছি।' মায়ের মুখের দিকে তাকালো। এতক্ষণ মাকে সেভাবে লক্ষ করেনি। বললো, 'তুমি কি ভয় পাচ্ছো? বাঙলার ছেলেমেয়েকে, মনে আছে তোমার, তুমি জেগে উঠতে বলেছিলে— জয় সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত ছিলে?' আনন্দর এই মুখর রূপ এর আগে দেখেননি কুসুমকুমারী। তাঁর কবিতা 'আদর্শ ছেলে'র একটা রূপ তিনি মিলুর মধ্যে দেখেছেন, কম কথা বলা মিলু একদিন নিশ্চয় কাজে বড় হবে— এ আশা তিনি পোষণ করেন; ওই আশার সঙ্গে মিলুর 'জেগে ওঠা'র কোনো বিরোধ নেই— এরকমই মনে হলো তাঁর। বললেন, 'জয় সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় নেই— স্বরাজের দাবি জোরদার হয়ে উঠছে—'

কিন্তু পরক্ষণেই কুসুমকুমারী গম্ভীর। বললেন, 'দেশের কথা ভাবতে আমি নিষেধ করিনে, সেই সঙ্গে সংসারের কথাটাও মনে রেখো— জিনিসপত্রের দাম যা বাড়ছে! তোমার বাবার একার আয়ে সংসার চালানো খুব মুশকিল হয়ে পড়েছে— পড়াশুনোটা মন দিয়ে করার দরকার আছে।'

এইসব কাটা-কাটা কথায় আনন্দর মনের ওপর একটা চাপ তৈরি হলো। মনে পড়লো সত্যানন্দের বলা সেই কথাটা 'মনে রেখো, কোলকাতায় তুমি যাচ্ছো যোগ্য হ'তে।'

আনন্দর স্মৃতিতে ভেসে উঠলো, মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন; মানুষ হইতে হবে এই যার পণ—

মাকেও কেমন অচেনা মনে হচ্ছে।

চুমিয়া চুমিয়া তব হৃদয়ের মধু
বিষবহ্নি ঢালে নিকো বাসনার বধূ
অন্তরের পানপাত্রে তব

পুব আকাশে শুক্লা একাদশীর চাঁদ। পশ্চিমে দিগন্ত ছুঁই-ছুঁই সূর্য, বর্ণময় মেঘ। স্টিমার ঘাটে ভেড়ার আগে, সূর্যকে একটা টিপের মতো দেখেছে আনন্দ। এখন পুব আকাশে দৃষ্টি পড়তেই চাঁদটাকে দেখলো। হলুদ আভার ময়লা চাঁদ। নদীর বুক থেকে ওঠা আঁধার যত ছড়িয়ে পড়বে আকাশে, তত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ওই চাঁদ, মায়াবী হবে। স্টিমার থেকে নেমে আনন্দ দাঁড়ালো। নদীর কিনারা ঘেঁষা সুরকি বিছানো পথ— ডানদিকে সেই পথ-বরাবর তাকালো আনন্দ। ঝাউবীথি— ঝাউয়ের চিরল পাতায় আঁধার জ'মে কেমন যেন প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে সব গাছগুলো— এ-পথে মনিয়া আর সে হেঁটেছে... একটা দীর্ঘশ্বাস ঝাপটা মারলো বুকে। দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে গিয়ে নজরে পড়লো— একা এক কিশোর। দু'চোখ ভরা বিস্ময়— যা দেখছে তাতেই যেন সে মুগ্ধ। আনন্দ দেখছে— এ পৃথিবীর মোহমায়া কাজলের দাগ এখনও পড়েনি ওই চোখে, কামনা-বাসনা জাগেনি,— জমেনি বিষ অন্তরের পানপাত্রে... অদ্ভুত একটা বিভ্রম জেগে উঠলো, তাদের বাড়ির রাস্তা ধ'রে এদিকে একটা মেয়েকে আসতে দেখেছিল, যেন মনিয়া— মনিয়া এমনই এসেছিল একদিন।

—'মিলুদা!'

—'বল্!'

মনিয়া তার দিকে এক পলক চোখ তুলে তাকালো। মৃদু স্বরে বললো, 'সেই কবে এসেছো তুমি।'

—'হ্যাঁ। আমিও ভাবছিলাম— পাখিটা গেল কোথায়।'

—'আমি গিয়েছিলাম। তুমি তখন ঘাড় গুঁজে কী লিখছো। মাসি দেখে বললো, বিরক্ত করিস না— সামনে এক্সামিন।'

মিলু চুপ থাকলো।

—'মিলুদা!'

মিলু এতক্ষণে খেয়াল করলো মনিয়ার হাত-দুটো পেছনে আড়াল ছিল।

—'এই নাও। এই নোনাফল-দুটো।'

মিলু নিলো।

মনিয়ার গভীর দৃষ্টিপাতে আশ্চর্য এক ইশারা। মিলুর সমস্ত শরীরে শিহরণ— সেই শিহরণ এখনও যেন অনুভব করতে পারলো আনন্দ— মিলু নোনাফল-দুটো অবাক দেখছিল, সেই কবে মনিয়াকে কল্পনা ক'রে আঁকা স্কেচে স্তন ছিল ফুটি-ফুটি চালতাকুঁড়ির মতো, নোনাফলের মতো হ'তে পারতো— ফল-দুটো দু'হাতে একত্রে ধ'রে তার মধ্যে মুখ ডুবিয়েছিল। আলাদা-আলাদাভাবে গালে ঠেকিয়েছিল। দীর্ঘশ্বাস এবার যেন আছড়ে পড়লো

পাঁজরে। বেসামাল— এভাবেই বোধহয় গঙ্গাসাগরের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল মনিয়াদের নৌকোয়, নাকি ভিড়ের ভারে টাল সামলাতে পারেনি মাঝি! কোথায় ভেসে গেল মনিয়া— সাগরের ঢেউয়ে— দুরন্ত এক দুরাশার জেগে ওঠা টের পাচ্ছিল আনন্দ, তাও ভেসে গেল— অথচ এই হাতে জ'মে উঠেছে হাতের তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষার আগুনে পুড়ছি— কিশোরের মুখটা আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠলো, ওই প্রাণে এখনও ওঠেনি জেগে দুরন্ত দুরাশা, আকাঙ্ক্ষার আগুনে পুড়তে হচ্ছে না— দিগ্‌ভ্রান্ত— আচমকা আনন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠলো বৌবাজারের একটা গলি— দরজায়-দরজায় দাঁড়ানো মেয়েরা সভ্যতার বীভৎস ভৈরবী যেন সব, ময়লা হয়ে গেছে মনের অনেক ছবি— তাই কি মনিয়া জল হয়ে মিশে গেল জলে!

ভাবতে-ভাবতে হাঁটছিল আনন্দ— সেই যে চিদাকাশে এক সূর্য, তাকে আর অনুভব করতে পারে না সে। কেমন যেন উথালপাথাল মেঘ— ঘষা কাচের মতো মেঘ— তার আড়ালে কোথায় যে সূর্য— মেঘলা মন, বিষণ্ণ, কোথাও কোনো আলো নেই— যে দ্যাখে সে-ই বলে, মুখটা অমন কালো কেন! আনন্দ বলে, 'খুব আমাশয়ে ভুগছি।'

আনন্দ বুঝে গেছে— সূর্যচেতনার চেয়েও তীব্র যৌনচেতনা, লাস্ট; তবু সূর্যচেতনা মনিয়া থেকে তাকে দূরে রেখেছিল। মনিয়া আজ নীহারিকা, সেই চেতনা একটা হাত কামনা করছে, তার চোখ খুঁজছে এমন দু'টি চোখ, যা থেকে আসবে দূর নক্ষত্রের সংকেত, নক্ষত্রদ্যুতি— যার স্তন থেকে ছড়িয়ে পড়বে চালতা ফুলের সুবাস— মনিয়া নেই— আকাঙ্ক্ষা আছে, মনিয়া নেই— পৃথিবীতে আর কোনো নারী নেই যেন, থাকলে অন্তত একজন, তার দিকে চোখ তুলে তাকাতো, পলকের জন্য— যেমন মনিয়ার চোখ— নোনাফল দেবার দিন।

আনন্দ বাড়ির পথ না-ধ'রে ডানদিকের পথ ধরলো। উঁচু-উঁচু ঝাউগাছে অন্ধকার জমাট বাঁধছে। ঊর্ধ্ব আকাশে এখনও আলোর আভাস— এক ঝাঁক অন্ধকার উড়ে যাচ্ছে, বাদুড়ের ওড়া দেখে তেমনই মনে হলো আনন্দর। পুবদিকে ফিরে তাকালো। স্টিমার জেটি। গাধাবোট। হাটুরে বজরা, পানসি, ডিঙি, জেলেনৌকা— সমস্ত নদীর বুক জুড়ে— ভেসে আছে নোঙর ফেলে, বয়ে যাচ্ছে কোনোটা। নদীর বুকে অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ— চাঁদকে ঘ'ষে-মেজে ঝক্‌ঝকে ক'রে তুলছে অন্ধকার।

—মিলুদা!

—বল্‌!

—আমি ফুলফোটার শব্দ শুনেছি।

—সত্যি!

—হ্যাঁ। একদিন আমরা একসঙ্গে শুনবো কিন্তু!

আনন্দ যেন মনিয়ার কাঁধে হাত রাখতে গেল— হাতটা কোনো অবলম্বন না-পেয়ে ঝুলে পড়লো।

আনন্দ বুঝতে পারছিল না তার অস্থিরতার উৎস ঠিক কোথায়। প্রথম মনে হয়েছিল মনিয়ার মৃত্যু— এবং অসময়ে সে দেশে ফিরে এসেছিল উদ্‌ভ্রান্তের মতো। কখনও চুপচাপ ব'সে থেকেছে ঘরের মধ্যে। সামনে বই বা খাতা খোলা। কখনও পায়চারি করেছে সর্বানন্দ ভবনের চৌহদ্দির মধ্যে— গাছ, পাখি, ফুল, লতাপাতা সবাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে কিন্তু উদাসীনতার আবরণে তা প্রতিহত হয়েছে। সুপারিগাছে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে উর্দ্ধমুখে চেয়ে থেকে কী যে দেখতে চেয়েছি— শাখাপ্রশাখায় ঘন পাতার বুনট গলিয়ে টুকরো-টুকরো আকাশ, শূন্য-শূন্য— নীল শূন্যতা, স্কাই ব্লু। মেরিন ব্লু— মনিয়ার চোখ দেখতে-দেখতে একবার জাহাজ ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। আকাশ দেখতে-দেখতে কিছুই আর ভেসে ওঠেনি। আগানেবাগানে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাসের কথা কমবেশি সবারই জানা। তবু, সুপারিগাছে ডান পা বাঁধিয়ে, পিঠ আর মাথা গাছে সঁপে দিয়ে এক পা'য় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা— দৃশ্যটা অবশ্যই নতুন ছিল। হয়তো সে-কারণে কুসুমকুমারী জিগ্যেস করেছিলেন, 'কী রে মিলু, কীরকম যেন মনমরা-মনমরা দেখাচ্ছে!'

মিলু তখন সশব্দে হেসে উঠেছে সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে। বলেছে, 'মা! আমি কি এখনও ছোট্ট খোকাটি আছি? আমি এখন ধেড়ে খোকাদের পড়াই।'

কুসুমকুমারী তবু অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে মিলুর মুখ দেখছিলেন। হাসির ছলে কত যে গভীর দুঃখ-বেদনাকে লুকিয়ে রাখা যায় তা তিনি ভালোই জানেন। পরক্ষণেই ভাবলেন, ও ছেলের এখন কীসের দুঃখ! গভীর বেদনা অনুভবের বয়েস কি হয়েছে ওর? বললেন, 'সুপারিগাছে হেলান দিয়ে কী ভাবছিলিস?'

—'ভাবছিলাম—' একটা ভাবনা বানাতে গিয়ে দেখলো, সময় দরকার; বললো, 'তেমন কিছু না।' কোনো ভাবনা আসছে না, আবারও বললো, 'ওই আর কী—' সত্যি কথাটা বললেই হয়। কোন্‌টা সত্যি— মনিয়ার মৃত্যু? নাকি মনিয়ার না-থাকা নিয়ে, আমার আকাঙ্ক্ষার আপাত-বিপর্যয় সম্পর্কিত বেদনা? কোন্‌টা বলবো? বললো, 'ভাবছিলাম, কোনো কিছু তৈরি হ'তে-হ'তে হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার কথা।' কুসুমকুমারীর চোখে তখন 'শুনতে চাই' দৃষ্টি।

—'এই যেমন গান্ধিজী— আন্দোলন তুলে নিলেন।'

—'উপায় ছিল না।' ব'লে মা বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আচমকা মনে হলো তার— এটা একটা কারণ হ'তে পারে। সেবার, বাবা এবং মা— দু'জনের কথাতেই এটা স্পষ্ট হয়ে গেছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনে, যুগধর্মানুসারে আনন্দর জড়িয়ে পড়া অনিবার্য কিন্তু তাঁরা সহিংস আন্দোলনের পক্ষপাতি নন। মা তাকে পুরনো একটা পত্রিকা পড়তে দিয়েছিলেন। পত্রিকাটা হাতের কাছেই ছিল। টেনে নিলো।

> বাংলাদেশে কিছুকাল হইতে যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহার সংঘটনে আমাদের কোন্ বাঙালির কতটা অংশ আছে তাহার সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া একথা

নিশ্চয় বলা যায় যে, কায় বা মন বা বাক্যে ইহাকে আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো প্রকারে খাদ্য যোগাইয়াছি। ...ইহার দায় এবং দুঃখ বাঙালি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।

যে কাল পড়িয়াছে এখন ধর্মের দোহাই দেওয়া মিথ্যা... দেশের যে-সকল লোকে গুপ্তপন্থাকেই রাষ্ট্রহিত সাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোনো ফল হইবে না এবং তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে।...

অতএব বর্তমান অবস্থায় যদি উত্তেজিত দেশের লোককে কোনো কথা বলিতে হয় তবে তাহা প্রয়োজনের দিক হইতেই বলিতে হইবে। তাহাদিগকে এই কথা ভালো করিয়া বুঝাইতে হইবে যে, প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়— কোনো সংকীর্ণ রাস্তা ধরিয়া পথও পাইব না, কাজও নষ্ট হইবে।...

মানুষের চিত্ত যখন অপমানে আহত হইয়া নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে সমস্ত কঠিন বাধাকে উন্মত্তের মতো একেবারে অস্বীকার করিয়া অসাধ্য চেষ্টায় আত্মহত্যা করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে তখন তাহার মতো মর্মান্তিক করুণাবহ ব্যাপার জগতে আর কী আছে। এই প্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য ব্যর্থতার মধ্যে লইয়া যাইবে, তথাপি ইহাকে আমরা পরিহাস করিতে পারি না। ইহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির যে পরম দুঃখকর অধ্যবসায় আছে তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বকালেই নানা উপলক্ষে নানা অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্য সাধনে বারংবার দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের ন্যায় নিশ্চিত পরাভবের বহ্নিশিখায় অন্ধভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।... মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যা দ্বারা।

সমস্ত লেখায় মাত্র দু'জায়গায় আণ্ডারলাইন করা আছে— 'প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়'-এর নিচে উডপেন্সিলের দাগ আর 'অন্ধভাবে'-এর নিচে, দাগটা গভীর। গুরুত্বারোপ ওই রেখা কি কুসুমকুমারীকৃত, পত্রিকাটা তাকে দেওয়ার আগে? মনে হয় না। কাগজের রঙের সঙ্গে ওই দাগের উজ্জ্বলতার কোনো বিরোধ নেই। হয়তো সেই প্রথম পাঠকালে ওই রেখা টানা হয়েছিল। ব্রাহ্ম রেখা। ব্রাহ্ম সমাজ চরমপন্থাকে কখনোই প্রশ্রয় দেয়নি। রবীন্দ্রনাথের এই লেখায় চরমপন্থীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। হয়তো ভুল বোঝার অবকাশ আছে ব'লে ওই দুই জায়গায় আণ্ডারলাইন ক'রে বিষয় সম্পর্কে ধ্যান দিতে চেয়েছেন— হ'তে পারে। কিন্তু প্রশস্ত পথের স্বরূপ কী? তখনই গান্ধিজীর বলা কথা আনন্দর মধ্য থেকে কেউ যেন ব'লে উঠেছিল, 'কনকয়ার হেট বাই লভ, আনট্রুথ বাই ট্রুথ, ভায়োলেন্স বাই সাফারিং—' মন্ত্রের মতো মনে হয়েছিল; এবং শেষপর্যন্ত মন্ত্র। সেইপথে যেতে যেতে গান্ধিজী পিছিয়ে গেলেন!

মা বলেছিলেন, 'উপায় ছিল না।'

খবরের কাগজ থেকে আনন্দ যতটুকু জেনেছে তাতে মনে হয়েছে চৌরিচৌরার ঘটনা না-ঘটলে গান্ধিজী পিছিয়ে আসতেন না।

চৌরিচৌরার সঙ্গে জালিয়ানওয়ালাবাগের মিল রয়েছে এক জায়গায়। দু'জায়গাতেই হত্যা সংঘটিত হয়েছে। এক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' ত্যাগ করলেন আর একটি প্রতিবাদে গান্ধিজী আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন! তাও এমন একটা সময়, যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষ মনে করছেন 'গান্ধীরাজ' এসে গেছে— এই তো গেল-বছরের গোড়ার দিকে রাজশাহী জেল ভেঙে প্রায় সাতশ জন কয়েদি ঘোষণা করেছিল 'গান্ধীরাজ' সুসমাচার— হ্যাঁ, খবরটা পড়ার পর আনন্দর মনে হয়েছিল, সু-সমাচারই বটে— গান্ধীরাজ মানে ঘৃণার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার প্রেম, গান্ধীরাজ মানে—

আনন্দ নিজের অজান্তেই যেন হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে থাকলো।

গান্ধিজীর সঙ্গে আবার সি. আর. দাশের বিরোধ। সত্যানন্দ চিত্তরঞ্জনকে নেতা মানছেন।

বাবার নেতা মানে কি সন্তানেরও নেতা?

—'ভেবলু!'

অশোক ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছাড়ছিল। ফিরে তাকালো।

—'চিত্তরঞ্জনকে দেখেছিস?'

—'কে?'

—'চিত্তরঞ্জন।'

—'আমি ওই নামে কাউকে চিনিনে।'

—'আরে, সি. আর. দাশের কথা বলছি—'

—'লিডার? নাম শুনেছি। আমাদের বরিশালেও গিয়েছেন। কেন?'

—'না। এম্‌নি। বাবা বলছিলেন, বাংলাদেশ অনেকদিন পর নেতার মতো নেতাকে পেয়েছে।'

অশোক কোনো কথা বললো না। তার খাটের ওপর ব'সে বললো, 'রাজনীতি করছিস নাকি?'

—'না। স্বাধীনতার কথা ভাবছিলাম।'

—'আচ্ছা দাদা, এই যে কতবছর ইংরেজরা আমাদের পরাধীন রেখেছে— তার আগে মোঘলরা— কী ক'রে পারে বল্ তো, পারছে!'

অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আনন্দ। তারপর উঠে তার সামনে দাঁড়ায়। 'ভেবলু' ব'লে অশোকের মাথাটা দু'হাতের মধ্যে ধ'রে নিজের মাথাটা তার মাথার সঙ্গে চেপে ধরে, 'দে, কিছু অন্তত দে—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর ছেড়ে দিয়ে বললো, 'বুঝলি ভেবলু, এই প্রশ্নটা যদি সবাই করতে পারতো! পারবে কী ক'রে বল্— সবার মাথায় তো আর ম্যাথ ঢোকে না।'

তারপর আচমকা যেন কিছু একটা মনে প'ড়ে গেল যা আনন্দর উচ্ছ্বাসকে ধ্বসিয়ে দিলো। সে বললো, 'কিন্তু ভেবল, সেদিন বাবা বলছিলেন,— উপনিষদে নাকি 'স্বরাজ' কথাটা আছে, তিনি বলছিলেন চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ-ভাবনায় নাকি ঔপনিষদিক তাৎপর্য আছে— স্ব-রাজ, নিজেই নিজেকে শাসন করা— এখানে স্ব— দ্য নেশন—'

—'নাঃ! দাদা, তোর মতিগতি একটুও ভালো মনে হচ্ছে না। তুই! তোর মাথায় রাজনীতির পোকা ঢুকেছে!'

—'আমারও তাই মনে হচ্ছিল, কিন্তু...'

—'কিন্তু কী...'

—'বুঝতে পারছি না।'

—'কী?'

—'ওই যে বললি, মানে ওই প্রশ্নটা—'

—'কবিতা লিখছিস?'

—'অনেকদিন লিখিনি। মাথায় কিছু আসছে না।'

—'কী ক'রে আসবে! স্বরাজ, স্বাধীনতার ভয়ে কবিতা পালিয়েছে।'

আনন্দ কিছু বললো না। কেবল পত্রিকাটা ছুড়ে দিয়ে বললো, 'রবীন্দ্রনাথের লেখাটা পড়িস!'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. পাশ সত্ত্বেও সিটি কলেজে আনন্দর টিউটর পদ জুটে গেছে। এবং সে ব্রাহ্ম ব'লেই তা হয়েছিল। সত্যানন্দ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'শোনো মিল, তুমি কখনোই আমার অবাধ্য হওনি। তবু ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তোমার অনুরক্তি প্রকাশ পেলে আমি খুশি হতাম। যুগের হাওয়ায় তোমাকে দোষ দিইনে। যেটা বলার— তুমি যে কলেজে পড়াতে যাচ্ছো, জানো বোধহয়, কলেজটার পরিচালনভার ব্রাহ্ম এডুকেশন সোসাইটির ওপর। ব্রাহ্মনীতির বিরুদ্ধ কোনো আচরণ তুমি করবে ব'লে আমার মনে হয় না। তব, নিজেকে একটু সতর্ক রেখো।'

অনুগত ছাত্রের মতো একপাশে মাথা কাত্ করেছিল মিলু।

—'আর একটা কথা। পারলে অন্তত তৈত্তিরীয় উপনিষদখানা একবার প'ড়ে নিও।'

—'আচ্ছা।'

সেদিনই আনন্দ ব্রাহ্মনীতিবিরুদ্ধ বিষয়গুলি, যা সে কোনো-না-কোনো সময়ে সমাজগৃহে শুনেছে, মনে করার চেষ্টা করেছিল। এবং মনে পড়তেই তার আরও মনে পড়লো, সমাজের বাইরে বড়দের মুখেও কথাগুলো সে শুনেছে— কু-সঙ্গে না-মেশা, অসৎগ্রন্থ পাঠ না-করা, অনর্থক পরিহাস-পরনিন্দা না-করা—

এবং সেদিন সে আরও আবিষ্কার করেছিল, হয়তো এসব কারণে কারও সঙ্গে সে মিশতে পারে না, প্রথমেই তো জানা যায় না ভালো-মন্দ ব্যাপারটা, হয়তো এ-কারণেই সে একা— মা কতবার বলেছেন, কু-দৃশ্য দেখো না, কু-কথা শুনো না, কু-কথা বোলো না!

কতবার মা'র কাছে ধমক খেয়েছে, 'এই বলতে নেই।'

হয়তো এ-কারণে তার কম কথা বলা অভ্যাস হয়ে গেছে। প্রফেসর-রুমে অতএব, আনন্দ খুব ভালো শ্রোতা। দু'-একটা প্রয়োজনের কথা ছাড়া তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হয় না। কিন্তু আজ তার কিছু কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

সি.আর. দাশের মৃত্যুর খবর শোনামাত্রই আনন্দ শোকবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। খুব কাছের মানুষ, প্রিয়মানুষের মৃত্যুতে যেমন কী-এক বিপন্নতা গ্রাস করে, তেমনই— তার কিছু ভালো লাগছিল না। একটা প্রশস্ত পথ কেটে চলছিলেন চিত্তরঞ্জন— পথটা থেমে গেল— আনন্দ ভেবলুকে বলেছিল, 'পরাধীনতার কারণ, জানিস তো, সি. আর. দাশ ধরতে পেরেছিলেন— হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।' সেই সমস্যা সমাধানের আশ্চর্য বয়ান তার মনে পড়ছিল: হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান সমাসে নয়— সন্ধিতে, সংযোগে নয়— সংসর্গে, ঐক্যে নয়— সাম্যে, মিশ্রণে নয়— যোগে, মিলনে নয়— মিলে, ফিউশনে নয়— ফেডারেশনে— অর্থাৎ বাইণ্ডিং-এ নয়— বণ্ডে—

ওই কথাগুলো তার বলতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু বলার জন্য যে ব্যক্তিত্ব ও কণ্ঠস্বর দরকার— আনন্দর মনে হচ্ছিল তা তার নেই— সে কেবল বলেছিল, 'হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা আমরা বলি, কিন্তু কীভাবে— কোন্ পথে, আমরা জানি না— কিন্তু তিনি জানতেন— রাজনৈতিক ফেডারেশন।'

সেই কথাটাই আজ প্রফেসর-রুমে কণ্ঠস্বরে বেশ খানিকটা জোর দিয়ে আনন্দ ব'লে ফেললো, 'না, তাঁর কথার মধ্যে কিন্তু মুসলমান তোষণ ছিল না। হিন্দু-মুসলমান মিলন বলতে তিনি কিন্তু রাজনৈতিক ফেডারেশন বুঝিয়েছেন।'

—'তাহলে তো নেশনের কন্‌সেপ্‌শনটা ধাক্কা খায়।'

—'নেশন কন্‌সেপ্‌শনটাই আমাদের দেশের ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নয়।'

—'ভাবনাটা কি আপনার?'

—'না। সি.আর. দাশের— আমার মতো ক'রে বললাম।'

—'আপনি বিশ্বাস করেন?'

—'আজ্ঞে।'

—'মিস্টার দাশ, ইফ য়্যু ডোণ্ট মাইণ্ড— নেশন ব্যাপারটা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।'

আনন্দ কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর বললো, 'মিস্টার মিত্র, আমার ঠিক মনে পড়ছে না— এইট্টিন সেঞ্চুরিতে কোন্ কোন্ জাতি আমাদের দেশে এসেছিল?'

—'ইংরেজ, ফরাসি, পর্তুগীজ—'

—'জাতি, আই মীন নেশন হিসেবে সকলেই আলাদা— আমাদের এখানে যেমন বিহারি, ওড়িয়া, গুজরাটি— বাট... একবার চোখ তুলে তাকালো আনন্দ, 'ইউরোপের জাতীয়তাবাদ, একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, স্বার্থ-সর্বস্ব আগ্রাসী— ১৭৪৬ থেকে ১৭৬৩— তিন-তিনবার ইংরাজ আর ফরাসি জাতির মধ্যে যুদ্ধ হয়— এই দেশে, কর্নাটকে— ওই ন্যাশনালিটির ভিত্তি ঘৃণা-বিদ্বেষ, বেনেবুদ্ধি— মুনাফা ভিত্তিক— কিন্তু সি.আর. যে-ন্যাশনালিটির কথা বলেছেন তা ওই নেশন থেকে একটু আলাদা, সি.আর.-এর 'নেশন' ধারণা কখনোই মানবতাকে আঘাত করবে না— 'স্বরাজ'-ধারণা ব্যাখ্যা করলেই তা বোঝা যায়— ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নেশনের একটা পলিটিক্যাল আসপেক্ট্ রয়েছে— ধর্মবিশ্বাস কি সম্প্রদায়গত পরিচয় সেখানে বড় কথা নয়— প্রশ্নটা হলো, রাজনৈতিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকা— বাঁচার সুযোগ তৈরি করা, এককথায় অন্নের অধিকার— অন্ন দ্য ব্রহ্ম।' আনন্দর মুখে অদ্ভুত এক হাসির আভা। বাইরে আষাঢ়ের মেঘলা আকাশ। সেদিকে তাকালো আনন্দ।

—'আপনি এত ভালো বলেন!'

—'অন্ন দ্য ব্রহ্ম — রাজনীতিকে ব্রহ্ম তত্ত্বের পরিসরে নিয়ে এলেন একেবারে!'

—'মাপ করবেন, আমি না— উপনিষদের ঋষি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশে ব'সে থাকা ডি. ডি. বললো, 'তোমাকে এতদিন ভাবতাম মুখচোরা, কম কথা বলা মানুষ— লিডারের মতো লেকচার ঝাড়লে!' আনন্দর ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা।

—'গৌরাঙ্গ, তোমার ভাবনায় যে গলদ— আবারও তা প্রমাণ হয়ে গেল—'

—'কীরকম?'

—'আবার জানতেও চাচ্ছো? আমাদের কাজ কী? বকা— বকতে না-পারলে, মানে কম কথার মানুষ হ'লে এইচ. এম. কি ওঁকে রাখতেন?'

—'মিস্টার দাশ, আপনি ঠিকই বলেছেন— একটা পলিটিক্যাল আসপেক্ট্ থেকেই কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় চিত্তরঞ্জনকে তাদের নেতা মেনেছে— এটা একেবারেই নতুন। প্রশ্ন হলো...' ব'লে থেমে গেলেন।

আনন্দ জিগ্যেস করলো, 'কী?'

—'না।' মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, 'আমি রাজনীতির মানুষ না, কী বুঝি? কতটুকু বুঝি?' কোথাও যেন একটু অভিমানের সুর বাজলো, 'যা-ই হোক, স্বাধীনতা আন্দোলনের খুব ক্ষতি হয়ে গেল।' কেমন আশঙ্কা ফুটে উঠলো কণ্ঠস্বরে।

রাজনীতি আনন্দও বোঝে না। তবু চিত্তরঞ্জনকে তার নেতা মনে হয়েছে। স্বরাজ তারও আকাঙ্ক্ষা। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্যের প্রেক্ষাপট তৈরি স্বরাজ ব্যতীত হ'তে পারে না— আর স্বরাজের জন্য চাই ঐক্য, এই ভাবনা আনন্দর মাথার মধ্যে এমন ঢুকে পড়েছে যে, তারও আশঙ্কা, যেকথা ব্রজবাবু মুখ ফুটে বলতে পারেননি, আনন্দ ব'লে ফেললো, 'হিন্দুর রাজনীতি আর মুসলমানের রাজনীতি যে অভিন্ন— এটা প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে চিত্তরঞ্জন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন— প্রশ্ন হলো এই প্র্যাকটিসটা থাকবে কিনা।'

আচমকা যেন স্তব্ধতা নেমে এলো— কেউ কোনো কথা বলছে না। একজন ঘড়ি দেখলো। একজন ঘড়ি দেখে উঠলো। ক্লাসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই স্তব্ধতার অর্থ কী— কথা ফুরিয়ে যাওয়া? নাকি অন্য কিছু? যেন অশুভ কোনো কিছুর ইঙ্গিত। আনন্দ ঠিক বুঝতে পারছিল না।

—'দেখলি চিত্তরঞ্জনকে?'

—'দূর থেকে।'

—'কী মনে হলো?'

মিলুর চুপ ক'রে থাকায় সত্যানন্দ বলেছিলেন, 'চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতার আগে, লক্ষ করেছিস, সব কেমন যেন ঝিমানো নির্জীব পাব্লিক— একই কথা শুনতে শুনতে সবাই ক্লান্ত; আচমকা যেন ক্লান্তিহর হাওয়া বয়ে গেল— জানিস এরকমই মনে হলো আমার, মনে হয়েছিল, রক্তাক্ত ক্ষতের ওপর শুশ্রূষার মতো এসে পড়ছে তাঁর বাণী।' অথচ তার পর-পরই আনন্দ শুনেছে, ভোটের রাজনীতি করছে দাশ। বাংলাদেশটাকে মুসলমানদের কাছে বিক্রি ক'রে দেবার চক্রান্ত করছে। মুসল্লাদের দালাল। দু'টি পক্ষ খুব স্পষ্ট—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যানন্দ দেখেছেন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে— সেখানে সবাই মানুষ। আর একপক্ষ, হিন্দুদৃষ্টিতে—

আমি কোন্ পক্ষে?

কে যেন উত্তর দিলো, তুমি কীর্তির পক্ষে— কৃতীর পক্ষে!

আনন্দ দু'চোখ বন্ধ করলো। পরাধীনতার গ্লানিতে নির্জীব জনগণের একখানি আলোচিত্র তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ক্রমে তা চলচ্চিত্র। তাদের মাঝখানে চিত্তরঞ্জন। ভাষণমুদ্রায় আন্দোলিত হচ্ছে তাঁর হাত— কখনও ডাইনে, কখনও বামে, কখনও-বা ঊর্ধ্বে। স্থবির জনচেতনায় যেন ছড়িয়ে পড়ছে উজ্জীবনী মন্ত্র। চাঞ্চল্য জাগছে। তাদের হাতগুলোর ওঠানামায় আনন্দর মনে হলো যেন অসংখ্য ডানার ঝাপটানি। যেন আকাশ ডাকছে তাদের।...

অদ্ভুত স্বপ্ন— আবক্ষ মূর্তি। অযত্ন-অবহেলায় যেন নষ্ট ভাস্কর্য। মূর্তিটা দেখছিল আনন্দ। দেখতে-দেখতে চেনা মনে হ'তে থাকলো— ডাঁটি ভাঙা চশমার আড়ালে চোখ দুটো পিটপিট ক'রে উঠলো। ভাঙা নাকের ডাসা ফুলে উঠলো, ধুলোর আস্তরণ ঝ'রে পড়লো— তুমি?(!)

মূর্তির ভাঙা ঠোঁট হেসে উঠলো।

সেই তুমি! যে তুমি—

উপমা খুঁজতে গিয়ে সে দেখলো পুরাণ, মহাকাব্য, লোকগাথার বর্ণময় জগৎ একে-একে মেলে ধরছে নানান মূর্তি... এক-একটা মূর্তি ওই ভাঙাচোরা মূর্তিতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে...

...অনেকদিন পর আনন্দ একটি কবিতা লিখে ফেললো—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুমান আমি চেয়ে থাকি দূর হিঙুল-মেঘের পানে!
মৌন নীলের ইশায়ায় কোন্ কামনা জাগিছে প্রাণে!

ঠাঁইনাড়া জীবন। কোথাও কোনো স্থিতি আছে ব'লে মনে হয় না। তবু মাঝেমধ্যে কেন যে রবীন্দ্রনাথ তাকে দিয়ে কথা বলান, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' আর আনন্দর মুখ আকাশের দিকে উঠে যায়। তার চোখে পড়ে কারখানার চিমনির উগরানো কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার ছড়িয়ে পড়া— কখনও মেঘ, মেঘলা; রাতের আকাশে দেখেছে নক্ষত্রদ্যুতি, চুল্লির আগুনের স্ফুলিঙ্গ— কখনও মনে হয় ধূম্রগর্ভ বিস্তীর্ণ অন্ধকারে— এই নগরী, যেখানে সে এসেছিল যোগ্য হ'তে, মৃতপ্রায়— মৃতপ্রায় মানুষদের বন্দিশালা— তাদের নিভু-নিভু চোখ আকাশ খোঁজে— টুকরো আকাশ— একা পাখি— দেখতে-দেখতে আনন্দ ব'লে ওঠে, 'ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা—' একদিন আনন্দ স্বপ্নে দেখলো আকাশ থেকে পালক ঝ'রে পড়ছে— একটা, দুটো... অজস্র— উথালপাথাল বুক; ঘুম ভাঙার পরও তার রেশ টের পাচ্ছিল সে। পাখিরা কি পালক ঝরিয়ে যায়? কোনো স্মারক বার্তা?

বাবা বলেছিলেন মানুষের জীবন মাইগ্রেটরি বার্ডের মতো— অভিযান, সুদূর সাইবেরিয়া থেকে সুসময়ে— পাখিরা তো পালক রেখে যায়, মানুষ তবে কী রেখে যায় তার চলার পথ জুড়ে?

—'বাণী।' বললেন রবীন্দ্রনাথ, 'কত বাণী দলে দলে অলক্ষিত পথে উড়ে চলে—'

আনন্দ বিড়বিড় করলো 'অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে—' তারপর তার মনে হলো, বন্দি মানুষ কখনও অভিযাত্রী হ'তে পারে না— কেবল অভ্যাস আর ফরমায়েশ— শাসনের অদ্ভুত কঠিন শৃঙ্খল জড়ানো পায়ে—

আনন্দ হাঁটছিল।

ইদানিং— কিছুদিন আগে পাওয়া মায়ের একটা চিঠির আস্ত একটা বাক্য, তাঁর কণ্ঠস্বর সমেত আনন্দ এরকম পথ হাঁটায় মাঝেমধ্যে শুনতে পায়, 'চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে লিখেছো, ভালোই করেছো, কিন্তু রামমোহনের ওপর লিখতে বলেছি তোমাকে, মহর্ষির ওপরেও!'

—মা! রামমোহন কোনো ইম্প্রেশন তৈরি করছেন না আমার ভেতর। আমাকে ক্ষমা কোরো মা, তোমাকে খুশি করতে পারলাম না।

—মিলু তুমি অবাধ্য হচ্ছো!

—না মা, আমি অক্ষম। মা, নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' পড়েছো? বল বীর/বল উন্নত মম শির! কখনও সাইক্লোন হ'তে পারবো না কিন্তু আমি ঝড়ের বাতাস চাই—

—বুঝতে পারছি, চিত্তরঞ্জনের ভূত তোমার ঘাড়ে চেপেছে।

কে জানে! ভূত না কোনো ভবিষ্যৎ— সুদূর যুগান্তরের ইশারা হয়তো-বা, কিংবা— হঠাৎ ক'রে যেন ব্ল্যাকআউট হয়ে যায়— আধো অন্ধকারে আনন্দ দেখতে পায় কিশোর মিলুকে, ফুটফুটে মনিয়া, সাগরের ঢেউয়ে লুটোপুটি খেতে-খেতে সে মেঘের আড়ালে কোথাও হারিয়ে যায়— এসব কথা কি মাকে বলা যায়? বাবাকে? কিংবা এই যে গেল রাতে, রাতদুপুরে বেচু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ্যাটার্জি স্ট্রিটের এই ঘরখানা একেবারেই উড়ে গেল বরিশালে, নাকি, বরিশাল উঠে এলো এখানে— ঝিঁঝির ডাক অদ্ভুত এক শরীর পেলো, ঘুমন্ত পায়রাগুলোকে দেখা গেল সেই শরীরের কাছে, যেন পরম আশ্রয়— কার্নিস উধাও— কিংবা মা, তোমাকে কি বলা যায়— অস্তমিত চাঁদের আভায় এই মহানগর বিলুপ্ত হয়ে যায়, জেগে ওঠে ইতিহাসের পৃথিবী। নির্জন প্রাসাদ অলিন্দে আমি তখন সম্রাট— আমার হাতিয়ার নামিয়ে রাখছি এক কুমারীর পদতলে...

ঘুমন্ত রাজপুরী, রাণী— এক ক্রীতদাসী বালিকার সঙ্গে...

কিংবা মা, তোমার চোখের শাসন, থুড়ি সম্রাজ্ঞীর— উপেক্ষা ক'রে শেষরাতে মনিয়ার ঘরের দরজায়— মনিয়া নয়, কোন্ জন্মের কোনো এক পৃথিবী যেন...

এসব কি বলা যায় তোমাকে? কাউকে?

—আমাকে বলো!

—কে তুমি?

—এখনও চিনলে না!

আনন্দ মাথা নাড়লো।

—'আরে। আনন্দ যে!'

—'হুঁ। হ্যাঁ।'

—'এখানে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছো কেন?'

আনন্দ মানুষটাকে চেনার চেষ্টা করছিল।

—'কোনো সমস্যা?'

—'না। আসলে মনে পড়ছে না। চলি।'

লোকটা কে? হবে কেউ। কিন্তু লোকটা আমার নাম জানে— বরিশালের কেউ? বাবার বন্ধু হ'তে পারে।

বাবার কত বন্ধু! কত প্রভাব! আমার কোনো বন্ধু নেই। কারও বন্ধু হ'তে পারলাম না।

কয়েকদিন আগে আনন্দ একটা পোস্টকার্ড পেয়েছে। অভিনন্দনপত্র। ডাক মারফৎ সে একটা কবিতা পাঠিয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকায়— এই ফাল্গুন সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। চিঠিটা পাঠিয়েছে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত এক কবি— তার কবিতা গল্প আনন্দ আগেও পড়েছে দু'-একটা, এ-সংখ্যাতেও আছে— কোনো কবি যখন অন্য কারও কবিতা বিষয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করেন, তার একটা আলাদা মূল্য আছে— পরিতৃপ্তির বিষয় সেটা— একই সুরে বাঁধার একটা ব্যাপার থাকে— আনন্দ চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার ক'রে তারও মুগ্ধতার কথা জানিয়েছে। জানিয়েছে, রচনার অক্ষুণ্ণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে তাকে সম্ভাষণ ক'রে আসছে।

কী রূপে— তা অবশ্য বলেনি, তবে প্রাপক অনুমান করতে নিশ্চয় পারবে— অচিন, মাই ফ্রেণ্ড!

অচিন, আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই। চিরজীবনের জন্য!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই;
যে প্রাণ গুমরি কাঁদিছে নিরালা শুনি যেন তার ধ্বনি,

দেশ ক্রমশ দাঙ্গাপ্রবণ হয়ে উঠছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ঝিমিয়ে পড়াই নাকি তার কারণ— এরকম শুনেছে আনন্দ। কেউ বলছে, 'দাঙ্গা ব্রিটিশ রাজনীতির অঙ্গ।' কেউ আবার বলছে, 'এর রুট অনেক গভীরে— ভারতবর্ষের সব মুসলমান তো আর আরব থেকে আসেনি— সবাইকে জোর ক'রেও মুসলমান করা হয়নি— মুসলমান হলো কেন? ওই কারণের মধ্যেই রয়েছে দাঙ্গার প্রকৃত কারণ।' তার পক্ষে যুক্তি জোরালো করার জন্য সে বলেছিল, 'লক্ষ ক'রে দেখবেন, মজবুত মুসলিম শাসনে দাঙ্গার কোনো ইতিহাস নেই। দাঙ্গার প্রকোপ বেড়েছে ইংরেজ জমানা দৃঢ়মূল হবার পর— আর স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রবল হবার পর থেকে চলছে—'

শুনতে-শুনতে আনন্দর মনে হয়েছিল তাহলে তো শেষমেশ সেই ব্রিটিশ রাজনীতিই এসে গেল। তার ভাবনা যেন লোকটা প'ড়ে ফেলে বলেছিল, 'এর মানে কিন্তু এই নয় যে, এটা ইংরেজদের রাজনীতি। এটা ভারতীয় রাজনীতির সনাতন বৈশিষ্ট্য—।'

কিন্তু রাজনীতির উচ্চ আদর্শের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই— এ বিশ্বাস আনন্দর দৃঢ়, থাকলে দাঙ্গার সময় সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তো, একপক্ষকে নিকেষ ক'রে অন্যপক্ষ দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকতে পারতো— বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান তো একসঙ্গেই লড়েছিল!

—'হ্যাঁ মিলু, এ হলো আমাদের আশার ইতিহাস— কিন্তু অন্যরকম ইতিহাসও আছে, ছ' সালে জামালপুরে বিলিতি জিনিস বিক্রিকে কেন্দ্র ক'রে দাঙ্গা বাঁধে— সাতে কুমিল্লায়—' সত্যানন্দের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে আনন্দ, 'ইতিহাসেও আলো-অন্ধকার রয়েছে।'

আলোকিত মানুষও অন্ধকারে ডুবে যেতে পারে— নইলে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর একপক্ষ কাটতে-না-কাটতেই এই কোলকাতায় দাঙ্গা হ'তে পারে!

একটা কোকিল ডাকছে কোথাও। আনন্দ যেন কোকিলটাকে দেখার জন্য জানালায় এসে দাঁড়ালো। সামনের নিমগাছে হা-মুখ মা-কাককে দেখলো ডিমে ওম্ দিচ্ছে। শিমুলতুলো ফুটে আছে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো কতদিন আগে দেখা একটা দৃশ্য— কালো মেঘের পটভূমিতে শিমুলতুলোর আকাশময় ছড়িয়ে পড়া— ঝড়ের বাতাস ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোন্ সুদূরে। আকাশে সে মেঘ খুঁজলো। বরিশালে তুলো এরকমই ফেটে আছে ঝড়ের প্রতীক্ষায়— এবার তাদের আমগাছে নাকি দারুণ মুকুল এসেছিল, তার মানে ঝড় হবে খুব— কুশি আম ঝ'রে পড়বে, শিলাবৃষ্টি হ'লে আম-কাঁঠাল সবই নষ্ট হবে— এমন ফলবতী সময়! অথচ মানুষ খুনে মেতেছে! কাল খুন হয়েছে পঁচিশ জন। লুটপাট, আগুন ধরানোর ঘটনাও ঘটেছে— ঘটছে আজও। সারাদিন ঘরবন্দি। রাস্তায় পুলিশের টহল। একটু আগে মসজিদে আজান উঠেছে। একটু পরে শাঁখ বাজবে। মন্দিরে-মন্দিরে সন্ধ্যারতি, গুরুদ্বার-দরগায় জ্বলবে চিরাগবাতি, উপাসনাও হবে।

সকালের দিকে একটা শান্তিমিছিল বেরিয়েছিল। যারা দাঙ্গা করছে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে কে? বা কারা? এতে ক'রে কি পরাধীনতার শিকল আরও মজবুত হচ্ছে না?

রবীন্দ্রনাথ কী বলছেন?

আমি কী বলতে পারি?

আমি হিন্দু নই। আমি মুসলমান নই। আমি ভিনদেশি শাসনে থাকা এক মানুষ— আমি পরাধীন!

কে শুনবে আমার কথা? কেউ কারও কথা শোনে না। যদি শুনতো, 'ঈশ্বর মঙ্গলময়' ব'লে কেউ কাউকে হত্যা করতে পারতো না। তবু, কেউ-কেউ কেবল বলতে পারে। বলাটাই তাদের কাজ। এই যে তুমি কোকিলের ডাক শুনছিলে— কোকিল কিন্তু তোমাকে শোনানোর জন্যে ডাকেনি, তুমি শুনেছো— অনেকেই শোনেনি। যেমন ট্রামের ঘর-ঘর শব্দ তোমার শুনতে ভালো লাগে না— তবু চলন্ত ট্রামে শব্দ হয়েই যায়— কখনও-কখনও তুমি তা শুনতে পাও না, শুনতে চাও না ব'লেই তো।

একটু আগে তুমি আজান শুনেছো— শাঁখ শোনার সময় হয়ে এলো, শুনবে— সবই আলাদা-আলাদা কিন্তু ভাবো তরঙ্গ...

আনন্দ শিহরিত হলো— অন্ধকার ঘরে আলোপথে যেমন অগণিত ধূলিকণার ওড়াউড়ি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, তেমনহ— শব্দকণা ভেসে যাচ্ছে— মহানন্দে ভেসে আসছে— আসা-যাওয়ায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, গলাগলি— এসব দেখতে পেলো আনন্দ...

সকালবেলা আনন্দর মনে হলো এ-পৃথিবীতে কোথাও কোনো অশান্তি নেই। ছিল না কখনও। খবরের কাগজ লিখেছে— মহানগর শান্ত। কোনো হিংসার ঘটনা নেই। কার্ফ্যু তুলে নেওয়া হয়েছে। অতএব জনজীবন স্বাভাবিক। কলেজ থেকে ফেরার পথে একবার জিতেনের মেসে গেল আনন্দ।

এখানেও সেই একই কথা। দাঙ্গা। রাজনীতি। বিদ্বেষ। শিক্ষিত মানুষজনের মধ্যে বিদ্বেষ ফুটে উঠলে আনন্দর বড় অসহায় লাগে। কলেজে সে কিছু বলতে পারেনি। শিক্ষিত মানুষকে বোঝানো যায় না। কিন্তু এখানে সে চুপ থাকতে পারলো না। বিদ্বেষের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ যখন ঘ'টে গেছে, নেমে এসেছে স্তব্ধতা, তখন সে ব'লে উঠলো, 'ঠিক না।'

অনুকূল বললো, 'কী?'

—'হত্যা।'

—'তবু ঘটবে।'

—'কেন?'

জিতেন বললো, 'শরীরটার মতো মাথাটাও তোর মেদভর্তি। এটাই নিয়ম— বেঁচে থাকার। মারো আর বাঁচো। ট্রেডিশন। সেই ঋক্‌বেদের যুগ থেকে—'

আনন্দ জিতেনের মতিগতি বুঝতে পারছে না। অমূল্য বললো, 'তারপরও কিন্তু আমরা উপনিষদের যুগ পেরিয়ে এসেছি।'

—'তাতে হলোটা কী? রামমোহনের ব্রহ্মতেজ একশ বছরের মধ্যেই নেতিয়ে পড়া শুরু করেছে। আমরা অন্ধকার ভালোবাসি।' একটা হতাশা ক্ষোভ— সেই সঙ্গে খানিকটা অভিমান জিতেনের বলার ভঙ্গির মধ্যে স্পষ্ট মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবু ননী বললো, 'তবে আর কী— চলুন আমরাও নেমে পড়ি।'

—'বুকের পাটা থাকা চাই। কব্জির জোর।' ব'লে অনুকূল তার লিকলিকে হাতের গুলি ফুলানোর অভিনয় করলো।

তখন একটা গুবরে পোকা কোথা থেকে উড়ে এসে ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়লো। পাখা চালিয়ে সে উপুড় হ'তে চাইছে— তার পা-গুলো হাওয়ায় খুঁজছে অবলম্বন। আনন্দ পা দিয়ে তাকে উপুড় ক'রে দিতেই সে উড়লো। উড়লো বটে ধাক্কা খেয়ে ফের পড়লো জিতেনের কোলের ওপর। আতঙ্ক-বিতৃষ্ণায় তাকে ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে ফেলে দিলো জিতেন। আবারও চিত্। জিতেন একটা কিছু খুঁজছিল— একটা পুরনো স্কেল দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হ'লে কঁকিয়ে উঠলো আনন্দ। যেন তাকেই মারতে যাচ্ছিল। চমকে হতবাক জিতেন। আনন্দ বললো, 'দাঁড়া, বাইরে ফেলে দিই।' পোকাটাকে তুলে নিয়ে জানালার বাইরে হাত বাড়িয়ে তালু মেলে ধরলো সে। তালুর ওপর একটু হেঁটে পোকাটা আবারও তার পাখা খুললো— তার ওড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো আকাশ ডাকছে তাকে। আকাশের দিকে তাকালো— একটা তারাও দেখতে পেলো না আনন্দ।

যখন জানালার কাছ থেকে ফিরে এলো, যখন মুখে তার আলো পড়লো তখন জিতেন তাকে কেমন বিষণ্ণ দেখলো। আলো আর বিষাদের ছায়া মিলেমিশে আনন্দর মুখখানা আশ্চর্য এক ভাস্কর্যের মতো দেখাচ্ছিল। ননী জিগ্যেস করলো, 'কী ব্যাপার দাশবাব, একেবারে বাক্‌রহিত হয়ে গেলেন যে!'

আনন্দ বললো, 'না। ভাবছিলাম—'

—'কী?'

—'বেঁচে গেল।'

—'কে?'

—'একটা প্রাণ।'

জিতেন বললো, 'গুবরে পোকাটার কথা বলছিস?'

আনন্দর চোখের সামনে তখন অসংখ্য পোকা, পতঙ্গ, পোকার মতো মানুষ, পতঙ্গের মতো মানুষ— পাখি, সাপ-ব্যাঙ, চিল-শকুন, বাঘ-হরিণ— আর সে; বললো, 'হ্যাঁ— এই মুহূর্তে কোথাও কেউ-না-কেউ বেঁচে যাচ্ছে, ভ্রাতৃত্বের অনুরাগে— বেঁচে গেল!

—'তোর এই কবি-কবি কথা ঠিক মাথায় ঢোকে না।'

আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে গুছিয়ে নিলো— এখন তার সামনে জিতেনের মেসের বন্ধুরা আর সব অবলুপ্ত। বললো, 'এই দাঙ্গার মধ্যেও কোনো হিন্দু— মুসলমানের সহযোগিতায় সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে, একইভাবে কোনো মুসলমান... খবরের কাগজে এরকম সংবাদ তো প্রকাশ পাচ্ছে— আশা করা যায় মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে— তাই বলছিলাম।' ব'লে একদম চুপ হয়ে গেল আনন্দ। কাউকে কিছু না-ব'লে যেমন এসেছিল নিঃশব্দে, তেমনই বেরিয়ে এলো। রাস্তায় এসে বুক ভ'রে শ্বাস টানলো। আকাশের দিকে তাকালো— আকাশ ভরা চাঁদ তারা— আবারও সেই বিশ্বভরা প্রাণের দৃশ্যটা ফিরে এলো— পরমব্রহ্ম — ঈশ্বর পরম পিতা আল্লাহ্— এই সমুদয় সৃষ্টি নিখিল; আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পেলো সেই গুবরে পোকাটা নক্ষত্রের দিকে উড়ে যাচ্ছে, আনন্দ হাত তুলে বিদায় জানালো; আর তখনই তার মনে পড়লো, অশোক তাকে ঠিক এভাবেই বিদায় জানিয়েছিল— সে যখন প্রথম কোলকাতায় আসে। আনন্দর মধ্যে আশ্চর্য এক পুলক জেগে উঠলো— ভাই! এই সৃষ্টিসমূহের ভাই আমি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কামনা নিয়ে মধুমাছি ফেরে বুকে মোর সেই তৃষ্ণা!
খুঁজে মরি রূপ, ছায়াধূপ জুড়ি,
রঙের মাঝারে হেরি রঙভুরি!
পরাগের ঠোঁটে পরিমলগুঁড়ি—
হারায়ে ফেলি গো দিশা!

গত আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে এবছরের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত বেশ কিছু কবিতা লিখে ফেলেছে আনন্দ। প্রকাশিত হয়েছে কিছু। আরও কয়েকটা মনোনীত হয়ে আছে। আগামী কয়েক মাস ধ'রে প্রকাশ পাবে। কিন্তু এবার আষাঢ় শেষ হ'তে চললো— একটি লাইনও লিখতে পারেনি সে। কেবল অনুবাদ-কবিতা লিখেছে একটি।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবস ছিল মেঘহীন। গাছের পাতারা আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। ভয়ঙ্কর নীল চুঁইয়ে পড়ছিল তাদের ওপর। বনশ্রীতে ব্যাপ্ত হচ্ছিল কেমন এক কালচে ছায়া। আনন্দ মেঘদূত খুলে বসেছিল। মেঘহীন নীল আকাশের ঈশাণকোণে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল পুঞ্জ-পুঞ্জ ভ্রমরকালো মেঘের উথালপাথাল... আকাশছোঁয়া পর্বতশিখরে পরিব্যাপ্ত হওয়া সেই মেঘ 'আলিঙ্গনরত'— এমন ভাবনাকেও সে শরীরি ক'রে তুলতে পারছিল, এমন-কী বিরহী যক্ষের যৌনকাতরতাও সে অনুভব করতে পারছিল তার শিরা-উপশিরায়। কিন্তু যক্ষের বিরহবেদনার তীব্রতা আনন্দ অনুভব করতে পারছিল না। অথচ মেঘবন্দনায় বক-মিথুনের শুভমিলন অনুষঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল একলা এক বক— যার কখনও প্রিয়া ছিল কিংবা ছিল না কখনও... কখন সেই বক তার নিজেরই অস্তিত্বের উপমা হয়ে উঠেছিল।... তারপর, তার কল্পনায় স্পষ্ট রূপ পাচ্ছিল অলকাপুরীর স্থাপত্য-অলঙ্কার, নারী— আর অনূদিত হয়ে যাচ্ছিল, সেই রূপ... সেথা নারীর হস্তে লীলাউৎপল— চিকুরে কুন্দফুল/কর্ণে তাদের শোভে নিরুপম শিরিষ কুসুম-দুল...

কোলকাতায় ফিরে যেতে আনন্দর মন চাইছিল। কিন্তু সেখানে আবার দাঙ্গা শুরু হয়েছে, এগারো তারিখ থেকে— দাঙ্গার পরিণতি— খুন, ধর্ষণ, লুঠপাট— বাস্তব; এর সঙ্গে ধর্মের যে কী সম্পর্ক! এসব ভাবতে গেলে যুক্তির পরম্পরা কেমন যেন ঘেঁটে যায়। মনে হয় প্রাকৃতিক। অনিবার্য। তখন আকাশের দিকে তাকালে মন শান্ত হয়ে আসে— মেঘের উড়ে যাওয়া দেখতে-দেখতে, কোনো এক বিস্মৃত সময় যেন স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে চায়, ওঠেও— ঘুড়ির আকাশ; একঝলক শৈশবের বিবর্ণ ফোটোগ্রাফ... বৃষ্টি নেহ, ঘষা কাচের মতো আকাশ, তার মনের আকাশটাও ওরকম— ধূমল নীল।

এর মধ্যে দু'-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আষাঢ়ে-বর্ষণ বলতে যা বোঝায় তা হয়নি একদিনও। তবু চারিধারে বনশ্রীতে যে কালচে ছায়া পড়েছিল তা ধুয়ে-মুছে উধাও। উজ্জ্বল সবুজ হয়ে আছে সমস্ত গাছপালা। জারুলে এখনও দু'-একটা ফুল— কী দারুণ উজ্জ্বল! কচুরিপানা, কলমিদাম দামাল হয়ে উঠেছে। কখনও-কখনও এই সবুজ-শ্যামশ্রীকে কে জানে

কেন আনন্দর মনে হয় মরূদ্যান। আর সে স্পষ্ট দেখতে পায় দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। কী এক অবসাদে সে খেজুরগাছে ঠেস্ দিয়ে ব'সে আছে। যেন এক দিওয়ানা। তার প্রিয়াকে সে হারিয়ে ফেলেছে। কিংবা লুঠ ক'রে নিয়ে গেছে কেউ... যেন গল্প থেকে উঠে আসছে কোনো বাস্তব... যক্ষের বিরহ আর এই বিরহ কি একই রকম? কোথাও একটা চিল ডাকছে। কেমন যেন কান্নার মতো। ঘরের মধ্যে ব'সেও আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল চিলটাকে। মেঘের কোল ঘেঁষে, ডানা মেলে নিথর ভেসে আছে কিন্তু তা অন্য কোনো কল্পনায় তাকে নিয়ে গেল না। নিজেকে তার মনে হলো ব্যর্থ।

ইদানিং এধরনের ব্যর্থতাবোধ আনন্দকে খুবই বিমর্ষ ক'রে তুলছে। একটিও কবিতার লাইন না-পাওয়া কিংবা কোনো ভাবনার চিত্রময় শব্দরূপ তৈরি করতে না-পারলে যে মন খারাপ তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে নানান আকাঙ্ক্ষায়— কামনা-বাসনার প্রেক্ষাপটে— সেসবের কেন্দ্রে অস্পষ্ট এক নারীমূর্তি। অলকাপুরীর নারীর মতো নয় সে, খুবই সাধারণ, আটপৌরে— এরকমই মনে হয় তার, তাকে কল্পনায় মূর্ত ক'রে তুলতে চাইলে মনে পড়ে স্টিমার অথবা ট্রেনে দেখা কোনো মেয়ের মুখ, সে-মুখ কখনও হয়ে গেছে মনিয়া।

সেইসব মেয়েদের কেউ-কেউ ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে এসেছে, এমন-কী তার বোনের বন্ধুদের কেউ-কেউ, অথচ বাস্তবে, এতটা বয়েস পর্যন্ত কেউ এলো না তার কাছে কিংবা সে নিজেও যেতে পারলো না কারও কাছে— গল্পের মতো দু'-একটি মুহূর্ত যে গ'ড়ে ওঠেনি, তা তো নয়— গল্প-উপন্যাসে কত সহজে সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। সেখানে একটা গোলাপের কী তাৎপর্য! কিংবা একটি কথার— হয়তো সেই কথাটিই সম্পর্কের নান্দীমুখ— এমন-কী একটি শব্দও হ'তে পারে গভীর ব্যঞ্জনার। নীরব চাহনি, চকিত চাহনি— কত কথা ব'লে যায়! এতটুকু স্পর্শে কত সংলাপ মনে মনে! আনন্দর মনে হয় তার মেয়েলি স্বভাবের কারণেই মেয়েরা তাকে অপছন্দ করে। পুরুষের নরম মন, দুর্বলচিত্ত থাকতে নেই— একটা ডানাভাঙা পাখির জন্য বেদনাবোধ কোনো পুরুষের সাজে না— একটা পাখিকে তীরবিদ্ধ করতে পারলেই তুমি পুরুষ— মেয়েরা পছন্দ করে অশ্বখুরের শব্দ, অশ্বকে যে দাবড়াতে জানে সে-ই পুরুষ, গতিময়— আমি আজও সাইকেল চালানোর পক্ষে কোনো প্রেরণা পাইনি।

এরকমই একদিন, আনন্দর মনে হলো, তার টিমটিমে কবিজীবন দপ্ ক'রে নিভে যাবে। আর সে করুণ বিষণ্ণ তাকালো আকাশের দিকে। উড়ে যাচ্ছে মেঘ। সফেদা মেঘ। মেঘভাঙা রোদ্দুর। আম-জাম-কাঁঠালের পাতায়। যেমন নদীর তিরতির ঢেউ চাঁদ-সূর্যের প্রতিবিম্ব ভেঙে-ভেঙে ঝিক্‌মিক্ মায়া তৈরি করে, তেমনই ওই পাতারা— পাতা তরঙ্গে আলো খেলছে— আমি কী করি? এরকম ভাবনায় আনন্দ চিঠি লিখতে বসলো। চিঠিতে সেই আশঙ্কার কথাও লেখা হলো।

কোলকাতায় ফিরে অচিনের সঙ্গে দেখা হ'তেই অচিন জানতে চাইলো, 'অত ভালো একখানা চিঠির মধ্যে অমন মনখারাপ করা কথা লিখলেন কেন?'

—'কোন্ কথাটা বলুন তো!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ওই যে, কবিজীবন— দপ্ ক'রে নিভে যাওয়া—'

কেন ওই আশঙ্কা— তার যুক্তিসম্মত কোনো কারণ আনন্দ খুঁজে পায়নি। আজও পেলো না। বললো, 'ঠিক জানি না।'

—'এবার ছুটিতে কতগুলো লেখা হলো?'

—'একটিও না।'

—'বুঝেছি।'

—'কী?'

—'জানেন তো, আগ্নেয়গিরি মাঝেমধ্যে এমন ঘুম ঘুমায় যে মনে হয় ম'রে গেছে—'

—'হ্যাঁ। সুপ্ত আগ্নেয়গিরির কথা শুনেছি।'

—'কবিত্ব ওই আগ্নেয়গিরির মতো— দেখবেন, দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে আবার।'

তুলনাটা নিয়ে ভাবছিল আনন্দ।

অচিন জিগ্যেস করলো, 'কতগুলো লেখা হলো এ পর্যন্ত?'

একটু ভেবে আনন্দ বললো, 'পঁচিশ-ত্রিশ হবে।'

—'একটা কালেকশন ক'রে ফেলুন।'

কথাটার মধ্যে যেন একটা দাবি ছিল। নির্দেশ ছিল। আরও কী-যেন একটা ছিল। সব মিলিয়ে একটা প্রচ্ছদচিত্র সবার আগে ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। সে-চিত্র ক্রমে চলচ্চিত্র— হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে একটা পালক দুলতে-দুলতে আকাশ থেকে নেমে আসছে... যদি নিভে যাই— প্রচ্ছদচিত্রের উপর একটা নাম ভেসে উঠলো। নিচে তার নাম। দু' মলাটের মধ্যে ধরা থাকবে জমাট বাঁধা একটা সময় কিংবা আলো— আলোর ফসিল...

ক্রমে একটা স্বপ্ন— ঘুমের মধ্য থেকে জাগরণে...

তার স্বপ্নের শরিক মা, বাবাও— তাদের মিলু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে চলেছে জেনে সত্যানন্দ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, যেন দূরে কোথাও চ'লে গিয়েছিল তাঁর মন, ফিরে এলে তিনি বললেন, 'তোর জন্মের বছর-তিনেক আগে, তোর মায়ের একখানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরেছিলাম, তারপর আর হয়নি, অথচ ইচ্ছে ছিল— হয়ে ওঠেনি।' হয়ে না-ওঠার বেদনা, গ্লানি যেন অনুভব করছিলেন তিনি, তারপর বললেন, 'এ তো আনন্দের কথা! কাজে নেমে পড়ো!'

কাজে তো সে নেমে পড়েইছে— টাকা ছাড়া কোনো কাজ হয় না, অর্থের যোগান বিষয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল সে, কিন্তু নিজের থেকে বিষয়টা তুলতে পারেনি। সত্যানন্দও বোধহয় অর্থের ব্যাপারটা মাথায় আনেননি। অচিন সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে। এবার কোলকাতায় ফিরে ম্যানসক্রিপ্ট প্রেসে ফেলতে হবে— এমনই অচিনের নির্দেশ।

কবিতার খাতা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকছে আনন্দ। কবিতাগুলি এমনভাবে সে সাজাতে চায় যাতে ভাব-ভাবনার একটা পরম্পরা তৈরি হবে, ফুটে উঠবে দেশ-কালের আবছা ছবি...

মানুষের ধর্ম-সম্প্রদায়গত পরিচয় কীভাবে যে তার জীবন-সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার বীভৎস রূপ আনন্দ দাঙ্গার সময়েই যতটা-না দেখেছে, তার চেয়েও বেশি খবরের কাগজের ভাষ্যানুসারে কল্পনা ক'রে নিতে পেরেছিল। কিন্তু নিত্য নাগরিক-জীবনের আড়ালে তার অন্য একটা রূপ আছে, আপাত শান্ত নিরীহ— কিন্তু সেখানেও চোরাস্রোতের পাঁকে পড়েছে আনন্দ।

রক্তের সম্পর্ক না-থাকলেও কেবল একই ধর্মমতাবলম্বী হ'লেই পরস্পরের মধ্যে গভীর এক আত্মীয়তাবোধ গ'ড়ে ওঠে— তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আনন্দ নিজে, ব্রহ্ম-উপাসক পিতার সন্তান ব'লে সে সিটি কলেজে পড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল— ধর্ম শব্দের ধাতুগত অর্থ তার জীবনে দারুণভাবে সত্য হয়ে আছে, অন্তত এখনও পর্যন্ত—

কলেজের সব ছাত্র ব্রাহ্ম পরিবার থেকে আসেনি। কলেজ হস্টেলে যারা আছে তাদের অনেকেই পৌত্তলিক হিন্দু। হিন্দু-ব্রাহ্মে একটা বিরোধ সেই রামমোহনের সময় থেকেই ছিল, এখনও রয়েছে। মাঝেমধ্যে তা প্রকট হয়ে ওঠে নানান অনুষঙ্গে—

এবার সরস্বতী পূজা করতে চাইছে সিটি কলেজের আবাসিক ছাত্ররা— কলেজ-কর্তৃপক্ষ পূজার বিরুদ্ধে— হিন্দু ছাত্ররা চাইছে দেবী-আরাধনা। অতএব কানাঘুষো, কর্তৃপক্ষের নজর-কান এড়িয়ে শিক্ষকেরাও আলোচনা করছেন। এমনই এক আলোচনায় আনন্দ বলেছিল, 'প্রত্যেক মানুষের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকা উচিত— এটা অবশ্যই আমার বিশ্বাস।' সেই কথাটা কীভাবে পল্লবিত হ'তে-হ'তে অধ্যক্ষের কানে পৌঁছে গেছে। আনন্দর এক সহকর্মীর মুখে সে শুনেছে, অধ্যক্ষ মহাশয় নাকি বলেছেন, 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, ব্রাহ্ম পরিবারে যার জন্ম, অমন পিতার সন্তান— কীভাবে মূর্তিপূজাকে সমর্থন করে!' ওইসব কথার মধ্যে নাকি তার কবিতার বইয়ের প্রসঙ্গও এসে পড়েছে, তার সম্পর্কে নীতি-নৈতিকতার প্রশ্ন উঠেছে।

কলেজের মধ্যকার পক্ষ-বিপক্ষ বিবাদ ছড়িয়ে পড়লো বাইরে। হিন্দুসমাজ ভার্সেস ব্রাহ্ম সমাজ। কে হিন্দু? ব্রাহ্ম ই-বা কে? যিনি মূর্তিপূজা করেন তিনি হিন্দু। আর নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক যিনি, তিনিই ব্রাহ্ম! তবে আমি কে? উপাসনা কী?

—'উপাসনা মানে', বাবার মুখে শোনা কথাটা মনে পড়লো, 'অস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ—'

—'ব্রহ্মের প্রিয়কার্য কী, বাবা?'

আনন্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল সত্যানন্দের কণ্ঠস্বর, 'ন্যায়াচরণ, সত্যব্যবহার, পরোপকার—'

—'পর মানে কী?'

—'আত্মন-এর বাইরে যা— আমির বাইরে যা কিছু। আমি-আমরা আত্মপক্ষ।'

—'তাহলে বাবা, পরপক্ষের কল্যাণ হবে— এমন কার্য করাই তো পরোপকার?'

—'ঠিক তাই।'

—'তাহলে যে-ছেলেরা সরস্বতী পূজা করতে চাইছে— তার বিরোধিতা করছি কেন আমরা?'

সত্যি-সত্যিই যদি সে এ-প্রশ্নটা করতে পারতো বাবাকে কিংবা অন্য কাউকে, তাহলে অন্য কোনো সত্যে হয়তো পৌঁছানো যেতো। কিন্তু আনন্দ একেবারে নীরব। কত দ্রুত মানুষ-যে ইতিহাস ভুলে যায়! এই তো বছর-দুই আগে— ব্রজমোহন কলেজেও অশান্তি বেঁধেছিল— সেখানে অবশ্য ব্রাহ্মরা ছিল না, ছিল মুসলমানেরা— সে কী নাটক! সেই নাটকের মহড়া এখানেও চলছে— ইতিমধ্যে সম্পাদক, কবি, গায়ক, বিজ্ঞানী কলেজ-কর্তৃপক্ষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অন্যপক্ষে সতীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র। —আনন্দ নীরব দর্শক, শ্রোতা— কিংবা বলা যায় উদাসীন। তবু, মুসলমানদের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতার প্রশ্নে যেসব রটনা আছে, ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধেও তেমন গল্প ছড়াতে শুরু করেছে— আনন্দ মজা পায়— কবে নাকি অধ্যক্ষ মহাশয় দারোয়ানদের পূজ্য শিবলিঙ্গ লাঠি দিয়ে ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু একটা জিনিস আনন্দর দৃষ্টিতে লক্ষণীয় হয়ে উঠলো— পূজাপন্থীদের কাজকর্ম খুব একটা নজরে পড়ছে না। একটা থমথমে ভাব— গোপনে কোথাও কিছু যেন ঘ'টে চলেছে। গাম্ভীর্য ও অতিসতর্কতার কারণে উপাসনাপন্থীদের নজরে ওসব পড়েনি বোধহয়— ব্যাপারটা যে ঠিক, নজরে পড়লো পূজা হয়ে যাবার পর। আগের দিন রাত্রে প্রতিমা এনে পরদিন ভোরবেলা অনাড়ম্বর পূজাপাঠ— আনন্দর মধ্যে ওই ঘটনার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। যেন সে জানতো এমনটিই ঘটবে। ঘটেছে।

পূজা না-করার জন্য নোটিশ জারি ছিল। সেই নোটিশ অমান্য করার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলো কর্তৃপক্ষ— ক্রমে ছাত্রবিক্ষোভ— দলে-দলে ছাত্ররা কলেজ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে। আর তখনই আনন্দ বুঝতে পারলো, তার পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে। শুধু সে একা নয়, আরও অনেকের মনে হ'তে লাগলো।

—'শুনেছো কিছু— কমিটি কী পলিসি নিচ্ছে?'

—'যদ্দুর জানি, গ্রীষ্মের ছুটির আগেই কলেজ বন্ধ ক'রে দেবে।'

—'আর?'

—'আর কী— হিঁদু-ব্রাহ্মের লড়াহ, প্রেস্টিজ ইস্যু— কিছু হিঁদু ছাটাই হবে, তার সঙ্গে দু'-একজন বেম্মও। তাছাড়া উপায় কী— যেভাবে আয় কমেছে! অনেকেরই মুখ কালো হয়ে গেছে আশঙ্কায়।'

আরও দশজনের সঙ্গে আনন্দরও চাকরি গেল।

হায় ধর্ম!

আনন্দ দেশে ফিরে এলো।

বাবা তাকে সান্ত্বনা দিলেন, বললেন, 'চিন্তা কোরো না। চেষ্টা করো। অন্য কোথাও হয়ে যাবে। তাছাড়া, আর্থিক অবস্থা ফিরলে তোমাকে আবার ফিরিয়ে নিতে পারে— এ আশ্বাস দিয়েছে হেরম্ব—'

আনন্দ বললো, 'বাবা, তোমরা যারা উপাসনা করো— সত্যিই কি যা বলো তা করো?'

এ-প্রশ্নের মধ্যে গূঢ় কোন্ কথা আছে— সত্যানন্দ ধরতে না-পেরে বললেন, 'চেষ্টা তো করি।'

আনন্দ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো, মাথা নাড়লো না-ভঙ্গিতে, বললো, 'তা যদি হতো— আমার এক সহকর্মী, গত বৈশাখে সে বিয়ে করেছে, তাকে যদি তুমি দেখতে— কী বিমর্ষ, বিষণ্ন— আমার আশঙ্কা হচ্ছে সে স্যুইসাইড না-করে— এই মৃত্যুর দিকে কীভাবে তাকে ঠেলে দিতে পারলেন হেরম্ব মৈত্র?' সত্যানন্দ যেন অনুধাবন করছেন। আনন্দ বললো, 'হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার চেয়ে হিন্দু-ব্রাহ্মের এই প্রেস্টিজ ইস্যু কি কোনো অংশে কম?'

সত্যানন্দ নীরব। একবার মাত্র চোখ তুলে আনন্দকে দেখলেন। তাকে এমন বিক্ষুব্ধ হ'তে এর আগে দেখেছেন ব'লে মনে করতে পারলেন না। বাবার ওই দৃষ্টিপাতে কী ছিল কে জানে, একটু যেন সঙ্কুচিত হলো আনন্দ। তবু বললো, 'বাবা, আমি-আমরার বাইরে অধিকাংশ মানুষ বের হ'তে পারে না— পরোপকারের কথা বলা এক ধরনের ভান, আসলে আমরা অনুগ্রহ করতে ভালোবাসি আনুগত্যের বিনিময়ে।'

সত্যানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। সবই তাঁর ইচ্ছাধীন, একথা আমি বলতে পারি— কিন্তু তা বলছি না। তোমার মন ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। শান্ত হও!'

আনন্দর বুকে দীর্ঘশ্বাস জ'মে ছিল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে
প্রেমের প্রাণের শক্তি
বেশি, তাই রাখিয়াছে ঢেকে
পাখির মায়ের মতো প্রেম
এসে আমাদের বুক!
সুস্থ করে দিয়ে গেছে আমাদের রক্তের অসুখ!

গ্রন্থ প্রকাশের আগে-পরের উন্মাদনা এখন আর নেই। কেবল রয়েছে ঋণভার। তার মধ্যে বেকার হ'তে হলো। প্রেস কিছু টাকা পাবে। বাইণ্ডারকে আগের টাকা শোধ না-ক'রে নতুন ক'রে বই বাঁধানোর কথা বলা যাচ্ছে না। খুব যে তাড়া আছে তা-ও নয়। বন্ধুরা দু'-এক কপি পুশ সেল করেছে। বেশিরভাগই বিলোনো হচ্ছে।

দু'-একটি পত্রিকায় বইয়ের যে আলোচনা হয়েছে তাতে আর যা হোক— মন খারাপ হয়নি আনন্দর। তার নির্মিত কবিতার পৃথিবীতে যেমন ওড়াউড়ি করে নজরুলের শব্দতেজ, যতীন্দ্রমোহনের ভাবকল্প, তেমনই রবীন্দ্র আবহ, মোহিতলাল— এসব উল্লেখ তাকে সচেতন করেছে। শব্দচয়নে সে আরও সতর্ক। একজন আলোচক তাকে আশীর্বাদ করেছেন। আর একজন তার মধ্যে আবিষ্কার করেছেন বৈশিষ্ট্য— যা তাকে স্বাতন্ত্র্য দেবে কাব্যজগতে। অবশ্য 'আলোচনা'-কেন্দ্রিক একটা মন খারাপ সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তার সহকর্মী সরোজ— 'প্রবাসী' আর 'মডার্ন রিভিয়্যু'তে নিয়মিত লেখে, সে ঝরাপালকের একটা রিভিয়্যু জমা দিয়েছিল 'প্রবাসী'তে— সেই রিভিয়্যু ছাপা হয়নি।

—'কেন?'

—'ঠিক বুঝলাম না।' সরোজের কণ্ঠস্বরে খেদ ঝরলো, 'এত কষ্ট ক'রে লিখলাম! আমার কী মনে হয় জানো— কোথায় যেন তুমি কারও প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছো।'

—'না না— এ তুমি কী বলছো! সম্পাদক আমার বাবার বন্ধু, আমার মায়ের একমাত্র কাব্যগ্রন্থ তিনিই প্রকাশ করেছিলেন—'

—'তবু...'

এই 'তবু' তার মন খারাপের পরিসর— তাকে নস্যাৎ করতে আনন্দ বলেছিল, 'ব্যাপারটা বোধহয় এই যে, তুমি আমার বন্ধু, যে প্রশস্তি করেছো তুমি, সম্পাদক ভেবেছেন তা আমার প্রাপ্য নয়— প্রকাশ হ'লে 'বন্ধুকৃত্য' ব'লে তুমিও উপহাসের পাত্র হ'তে— আমাদের দু'জনকেই বাঁচিয়েছেন তিনি।'

—'না আনন্দ, আমি বন্ধুকৃত্য করিনি— তাছাড়া, যদ্দুর জেনেছি, রামানন্দবাবু ছাপতে চেয়েছিলেন— আপত্তি ছিল সহ-সম্পাদকদের কারও—'

এই যে ঠেসে দেওয়া, তুলে ধরা— রাজনীতির মতো সাহিত্যজগতেও তার চর্চা,— এই পীড়ন প্রতিহত করার উপায় আনন্দ জানে না। হয়তো এসব কারণে উন্মাদনা নেই।

ভালোলাগা বোধও সেভাবে নেই আর। ইদানিং বইটাকে কেন্দ্র ক'রে আরও একটা মন খারাপ, কেবলই মনে হয়,— তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। সত্যি কি তাই? সবচে' খুশি হয়েছেন মা। আরও খুশি হতেন যদি রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো লেখা থাকতো গ্রন্থে। বিবেকানন্দকে নিয়ে লেখা কবিতাটা বাবার খুব ভালো লেগেছে। সেই ভালোলাগা থেকে তিনি একটা বক্তৃতাও দিয়ে ফেলেছেন— পৌত্তলিক বিবেকানন্দ মননবৃত্তির বিকাশ-হেতু কী স্বাভাবিকভাবে ব্রহ্মবাদী হয়ে উঠেছেন। পিসি তাঁর খুশি প্রকাশ করেছেন এভাবে— 'আমাদের মিলু বাপ-কা ব্যাটা না হইয়া মাকো পোলা হইছে।' আর কে, ভুবনমামা— তার কাছে তো মিলুর সবকিছুই ভালো, ইউনিক। আর কাকে নাড়া দিতে চেয়েছি— বৃহৎ পাঠকসমাজ? কিংবা বিশেষ কাউকে? আনন্দ ঠোঁট ওল্টালো। টেবিলের ওপর থেকে বইটা টেনে নিলো। প্রচ্ছদে এখন আর কোনো রহস্য নেই। রহস্য ছিল না ভূমিকায়। এখনও রহস্যাবৃত উৎসর্গপত্র— কল্যাণীয়াসু। অথচ কোনো নাম নেই।

অচিন জিগ্যেস করেছিল, 'কে?'

আনন্দ বলেছিল, 'কবিতা।' তার ঠোঁটচাপা হাসিতে ছিল রহস্য। সেই রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে অচিন বলেছিল, 'বুঝেছি। ছায়া।'

—'মানে?'

কপট গাম্ভীর্যে অচিন বলেছিল, 'বেদান্তের দেশে জন্মেছি বটে, তবু ছায়ার ভেতরেই আমি কায়াকে ফুটিয়ে তুলতে চাই।'

আনন্দর মুখে তখন আশ্চর্য এক তৃপ্তির আভা— সেই যে সেবার, তার কবিজীবন নিভে যাবার আশঙ্কা জানিয়েছিল যে-চিঠিতে, তাতেই আনন্দ লিখেছিল— ছায়ার মধ্যে কায়াকে ফুটিয়ে তোলার কথা। কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসার আবেগে গাঢ় আনন্দর দৃষ্টি, 'তুমি বিশ্বাস করো, অচিন?'

অচিন তখন আকাশের দিকে তাকিয়েছিল— শরতের নরম নীল আকাশ, কেমন এক দীপ্তি ছড়াচ্ছিল, সেই দীপ্তিমাখা দু'চোখ আনন্দর চোখে রেখে কেবল শরীর-ভাষায় জানিয়েছিল, সে বিশ্বাস করে। কল্যাণীয়াসু— এখন ছায়া শুধু—

কার যেন ছায়া পড়লো দরজায়। এরকমই ছায়া পড়েছিল সেদিন। উৎসর্গপত্র থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনন্দ দেখলো, কেউ না। তবু শূন্য দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলো। আর তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই দিনটা— আনন্দ দেখলো, বুলু— বুলুর পিছনে আরও একজন। চেনা মুখ। পথেঘাটে কোথাও দেখে থাকবে,— কিন্তু অপরিচিত।

—'আসছি।'

দাদার ঘরে ঢুকতে খুড়তুতো এই বোনটি আগে কোনোদিন এমন অনুমতি নিয়েছে কিনা মনে করতে গিয়ে আনন্দ দেখলো, বুলু ঢুকে পড়েছে। তার পিছনে মেয়েটিও। আনন্দ অপ্রস্তুত।

—'আমার বন্ধু। তোর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।'

আনন্দ ফ্যালফ্যাল ক'রে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলো। মেয়েটির চোখ-দু'টি যেন কথা বলছে। আনন্দ সে-ভাষা পড়তে পারছে না। মেয়েটির মুখে ফুটে উঠলো হাসি। নমস্কার জানালো।

আনন্দ আড়ষ্ট। হাত-দুটো কিছুতেই উঠলো না। সে চেয়ার ছেড়ে তক্তপোষের ওপর উঠে বসলো।

মেয়েটিকে চেয়ারে বসতে ব'লে বুলু নিজে তক্তপোষের এককোণে বসলো। বললো, 'ওর নাম বনি।'

বনি বললো, 'আমি আপনার কবিতা পড়েছি।'

আনন্দ মনে-মনে ব'লে উঠলো, কী সৌভাগ্য আমার! তারপর বনিকে বললো, 'কেমন লাগলো?' একটু যেন স্মার্ট হ'তে চাইলো সে।

সমস্ত চোখেমুখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে বনি বললো, 'দারুণ! আকাশ থেকে সত্যিই আমি পালক ঝ'রে পড়া দেখেছি। সত্যিই তো চারিদিক ঘিরে শীতের কুহেলি, শ্মশান পথের ছাই— আমার প্রাণের কথাটিই বলেছেন, ঝড়ের বাতাস চাই!'

আনন্দর চোখ মেয়েটির মুখ থেকে একটু স'রে গেল জানালার দিকে, বনি তবু দৃষ্টিফ্রেমের মধ্যেই থাকলো। কিন্তু ওই ফ্রেমের মধ্যে ঢুকে পড়েছে অন্য দৃশ্য— স্বপ্ন হ'তে পারে, কিছুদিন আগে দেখা এরকমই কোনো মেয়ে তার সঙ্গে কাব্যালোচনা করছে কিংবা হ'তে পারে কল্পনা। কিন্তু এখন, তার মনে হলো, সে স্বপ্নই দেখছে— মেয়েটির চোখের দিকে তাকালো। কী-সব ব'লে যাচ্ছে সে। বুলুও দু'-একটি কথা বলছে। ওরা ভাবছে আনন্দ শুনছে। আসলে আনন্দ দেখছিল, একঝলক মনিয়ার চোখ ভেসে উঠলো, মনিয়ার চোখ দেখতে-দেখতে একদিন যেমন মাস্তুল ভেসে উঠেছিল— আজ ওই চোখ দেখতে-দেখতে তেমনই ভেসে উঠলো সকালে দেখা বুলবুলি পাখির বাসা। আনন্দ মুগ্ধ। স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমানায় দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট একটি মূর্তি দেখতে পেলো— বাস্তবের মেয়েটি সেই মূর্তিতে বিলীন হলো। নাকি মূর্তির মধ্য থেকে উঠে এলো রক্তমাংসের এই মেয়েটি— ঠিক বুঝলো না। কেবল সে টের পেলো তার কী-এক মনখারাপ ছিল— ভালো হয়ে যাচ্ছে— তা কবিতার পৃথিবীতে এক নারীর আবির্ভাব—

বুলু-বনি চ'লে যাওয়ার পর আনন্দ আয়নায় নিজের মুখ দেখেছিল। কালো ড্যাপসা। চ্যাপটা নাক। পুরু ঠোঁট। একটু ট্যারা— প্রিয়জনেরা আদর ক'রে বলে লক্ষ্মীটেরা। আয়নায় আশ্চর্য সুন্দর দেখলো সে নিজেকে। তার মনে পড়লো গ্রীকপুরাণের সেই গল্প— নার্সিসাস, নার্সিসাসের মতো আমিও কি আমার রূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না? বনি কি ইকোর মতো কেউ, আমাকে রূপসচেতন ক'রে গেছে— আমি কি তাকে অস্বীকার করবো, যেমন করেছিল নার্সিসাস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নার্সিসাসের মতোই আনন্দ প্রতিবিম্বিত মুখচ্ছবির দিকে অপলক তাকিয়ে ছিল, তারপর তার মনে পড়লো নার্সিসাসের করুণ পরিণতির কথা— চারিদিকে অজস্র পদ্মফুল তার মাঝে তার প্রেমিক ছায়া— সেই ছায়াকে তাব আশ্লেষে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো... আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল আলোড়িত জলের তরঙ্গাঘাতে পদ্মফুলগুলো দুলছে... একটু একটু ক'রে জল শান্ত নিস্তরঙ্গ... ফুলের ওপর একটা মধুমাছি... একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনন্দ ফের দেখলো তার মুখ। বনির কণ্ঠস্বর, ঝড়ের বাতাস চাই। আমি যদি সত্যিই রূপবান হই— এ রূপ তবে ওই মেয়েটির দান।

বিস্ময় আর মুগ্ধতা মিলেমিশে অপূর্ব অনাস্বাদিত এক আবেশের মধ্যে কথার পিঠে কিছু কথা হয়েছিল— আনন্দর মনে হলো সেইসব কথার মধ্য থেকে, বিশেষ ক'রে বনির কথায় এই রূপ বিকশিত হয়েছে। আনন্দ কথাগুলো আজ আবার সাজালো—

—'আপনি কি লেখেন?'

—'না। পড়তে ভালোবাসি। বিশেষ ক'রে কবিতা।'

আনন্দ যেন কৃতার্থ হয়েছে। এবং কৃতজ্ঞ। এ মেয়েটি যদি লিখতো!

—'যাঁরা কবিতা ভালোবাসেন, তাঁদের অনেককেই আমি লিখতে দেখেছি— আপনার লিখতে ইচ্ছে করে না?'

বনি মাথা নাড়িয়ে বলেছে, 'আপনারা যাঁরা লিখছেন— তাঁদের কবিতার মধ্যেই তো পেয়ে যাই আমার বলার কথাটি— কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাহ/যে প্রাণ গুমরি' কাঁদিছে নিরালা শুনি যেন তার ধ্বনি—' বনির মধুর উচ্চারণ আনন্দর কানে বাজছে, এমন-কী তার মতো ক'রে সাজিয়ে নেওয়া কথাটিও, 'নিখিল মাই ব্রাদার— সবার বুকের বেদনা আমার।'

তাদের কথার মধ্যে বুলু একবার ব'লে উঠেছিল, 'এই দাদা, বনি আমার বন্ধু, ওকে আপনি-আজ্ঞে করছিস কেন?'

—'কাব্যলোকের বাসিন্দা— সম্মানীয় অতিথি!'

—'আমাকে অতিথি বানিয়ে ফেললেন! দোসর হ'তে পারি না, না?' বাক্‌স্ফূর্তিতে অভিমান, আর দৃষ্টিপাতে কী এক আর্তি— আনন্দ অভিভূত। সে একজন কবি— শুধুমাত্র এই পরিচয়ে এতখানি আত্মীয়তা! এর আগে কি কোথাও ঘটেছে? অন্য কারও জীবনে?

আর তখনই সেই আর্ত চাহনি বদলে গেছিল, যেন তার দৃষ্টিপ্রদীপ থেকে একটি শিখা নিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছিল আনন্দর দৃষ্টিদীপ— আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বনির একটি হাতে শিখা, অন্য হাত পক্ষপুটের মতো— আড়াল ক'রে আছে শিখাটিকে— সেই আলো সেই আলোর রঙ তার কুৎসিত মুখখানায় আশ্চর্য লাবণ্য ছড়িয়েছে। আনন্দ আবারও মুখটাকে দেখলো। নার্সিসাসের মতো নিজেকে বিমুগ্ধ দেখতে-দেখতে সে দু'চোখ বন্ধ করলো। এবার সে বনির মুখ দেখতে পাচ্ছে— জোড়া ভ্রূ, দিগন্তরেখার মতো তার বিস্তার কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'ভ্রূতে ফুটে উঠেছে ডানার মুদ্রা। ভ্রূ-সন্ধিতে কাজলের ছোট্ট টিপ, যেন কালো চাঁদ; জাদু জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত সমস্ত মুখ গমরঙা— এমনও ভাবা যেতে পারে, মুখচন্দ্রিমায় ওই টিপ কলঙ্কতুল্য। চোখ-দু'টি বাদলমেঘের ছায়াবিম্বিত সরোবরের মতো। তীক্ষ্ণ সরু নাক, যেন ছাঁচে গড়া। পাতলা ঠোঁট, না— বিম্বফলের মতো নয়, পাপড়ির মতো নয়, কমলার কোয়ার মতোও নয়, কী যে— আনন্দ ঠিক প্রকাশ করতে পারছে না— সব মিলিয়ে আস্ত একটা কবিতা— কবিতার কি কোনো উপমা হয়?

চারদিকে তখন সৃষ্টির আয়োজন। জীবনের উৎসব, প্রাণপ্রাচুর্য— আম-জাম-কাঁঠাল-করমচা, কামরাঙা-জারুল-হিজল-জামরুল— কতরকমের সবুজ; বসুন্ধরার ঋতু-উৎসব, মাঠে-মাঠে ব্যস্ত চাষি; ঝাঁক ঝাঁক বালিহাঁস— কোড়া-পানকৌড়ি, সোনাব্যাঙ-কোলাব্যাঙ... কালিদাসের মেঘদূত হয়ে অলকাপুরীর দিকে, পদাবলীর কবিরও বাকস্ফূর্তি... তবু আনন্দ লিখতে পারেনি। না-লিখতে পারলে কেমন এক বিষণ্নতা— যেভাবে পথিপার্শ্বের পাতাদের ধূলিমলিন ক'রে দেয় চৈত্রের হাওয়া, তেমনই যেন— কারও সঙ্গ ভালো লাগে না, কথা বলতে ইচ্ছে করে না। একা এই ঘরটাতে ব'সে থাকলে নিজেকে ভীষণ অস্বাভাবিক মনে হয়। এবারে ব্যাপারটা আরও ভয়ঙ্কর— বেকার জীবনের গ্লানি অবসাদ একটু-একটু ক'রে তাকে গ্রাস ক'রে ফেলছে। সংসারের অসচ্ছলতা, শ্লীল ঝগড়াঝাঁটি— অশ্লীল হ'লে ভালো হতো— তাতে অন্তত মনের ক্লেদ খানিকটা দূর হ'তে পারতো। এই ঘরের মধ্যে ব'সে থাকলে আনন্দ-অনুভূতির কতকগুলি বিষয়ের ওপর পার্থিব চাহিদা, অনুযোগ-অভিযোগ এমন ছায়া ফেলে যে, দোয়েলের শিসও বিরক্তিকর, প্রজাপতিকেও আর দৃষ্টিনন্দন মনে হয় না, কাব্যলোককে মনে হয় ফালতু। তাহলে উৎফুল্লের জিনিস কী, আদরের পৃথিবী কোন্‌টা— তারও হদিস নেই— বৃষ্টিধোয়া অমল রোদ্দুরের মধ্যে নিজের বিষণ্নতার গাঢ় রঙ আনন্দ অনুভব করতে পারছিল স্পষ্ট, তখন বনির আগমন— যেন বৃষ্টি; ঘন বর্ষায় ধুয়ে গেছে সমস্ত বিষাদ, সেই মুখ দেখছে আনন্দ— একটা শিস শুনতে পাচ্ছে, অচেনা, মধুর...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোর চুমায় এই পৃথিবীর হৃদয়ের জ্বর
কমে যায়, তাই নীল আকাশের স্বাদ— সচ্ছলতা—
পূর্ণ করে দিয়ে যায় পৃথিবীর ক্ষুধিত গহ্বর;

ব্রাহ্ম সমাজের কৃতী মানুষদের সঙ্গে সর্বানন্দ ভবনের সম্পর্ক এখনও নিবিড়। সেইসব মানুষেরা ছড়িয়ে আছেন কোলকাতা, দিল্লি, পাঞ্জাব, আসাম, মেঘালয়— সর্বত্র। সত্যানন্দ তাঁর সম্পর্ক-সূত্র ধ'রে আনন্দর জন্য একটা কাজের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কুসুমকুমারীও। আনন্দ কেমন যেন নির্বিকার। অবশ্য তার মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছে সে যথেষ্ট স্বাবলম্বী নয়, যেন যথেষ্ট পরিণতও হয়ে ওঠেনি— হয়তো এ কারণে তার মধ্যে কোনো উদ্যম নেই। বরং সদ্য যুবকের মতো সে বনির প্রেমে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। যদিও বাইরে তার প্রকাশ কম। প্রেম আর কবিতাকে তার মনে হচ্ছে অভিন্ন— প্রেমের আর এক নাম বৃষ্টি; প্রেমের অন্য নাম আলো— এই উপলব্ধি কেবল আনন্দর নয়, বনিরও; বলা ভালো বনিই তাকে এই উপলব্ধিতে পৌঁছে দিয়েছে। কিংবা আলো সম্পর্কে সচেতন করেছে। সেদিন স্টিমার স্টেশনে— জেটির পাটগুদামের এক কিনারে রেলিঙের পাশে তারা দু'টিতে দাঁড়িয়েছিল, অন্য অনেকের মতো— যেন আত্মীয়স্বজনের প্রতীক্ষায়; স্টিমার ভিড়লে তাদেরও চোখ যাত্রীদের মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছিল। এই ক্যামোফ্লেজ তবু— বনি বলেছিল, 'মিলুদা, এখন যদি কেউ আমাদের নিবিষ্ট মনে দ্যাখে, দেখবে আশ্চর্য এক আলো আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে— এই তোমাকে যেমন দেখছি আমি—' বলতে বলতে বনির চোখ আনন্দর চোখে, ঠোঁটে, 'তুমি কি দেখতে পাচ্ছো আমার মুখের ওপর?'

আনন্দ দেখেছিল। বলেছিল, 'আমার মা-ও বোধহয় ওই আলো দেখে ফেলেছে।'

—'কী ক'রে বুঝলে?'

—'সেদিন, তৃতীয়বার যখন তুমি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলে— তুমি চ'লে আসার পর, কথায়-কথায় মা বললো, মুখ দেখে মনে হলো মেয়েটি ভালো কবিতা বোঝে— না!'

—'তুমি কী বললে?'

—'বললাম, হ্যাঁ— মনিয়ার মতো।'

—'মনিয়া কে?'

—'এক পর্তুগীজ পাদ্রির মেয়ে, মা বাঙালি— পাদ্রি নিখোঁজ হয়ে গেলে মা-মেয়েকে আমার বাবা আশ্রয় দিয়েছিলেন— মনিয়া ম'রে গেছে।'

একটু শোকের বাতাস যেন বয়ে গেল। ভোঁ বাজিয়ে একটা স্টিমার ছেড়ে যাচ্ছে,— আবার স্তব্ধতা নেমে এলে বনি জিগ্যেস করলো, 'আমি মনিয়ার মতো কেন?'

—'তুমি মনিয়ার মতো নও— আসলে সম্পর্কটাকে সহজ বোঝানোর জন্য, মনিয়ার সঙ্গে যেমন সহজ ছিল আমার সম্পর্ক—'

—'কীভাবে মারা গেল মনিয়া?'

—'আমি তখন কোলকাতায়— মা'র চিঠিতে জেনেছিলাম, মা-মেয়ে গঙ্গাসাগরে গিয়েছিল, নৌকা উল্টে—'

বনির মুখখানা কেমন ব্যথাতুর হয়ে উঠলো, যেন মনিয়ার মৃত্যু-মুহূর্তকে সে অনুভব করতে পারছে— একই অনুভবে সেই আলোর মধ্যে দু'জনেই দেখতে পেয়েছিল নীল আভার ছড়িয়ে পড়া।

এই কিছুদিন আগেও জীবনটাকে মনে হতো এক মরুসফর— পদে পদে কেবল মরীচিকা— কখনও শুনতে পেতো আকুল উদাস অলস বাঁশির সুর কিংবা বিভ্রম; তারচে' বরং সরাইখানা অনেক বাস্তব, জীবনের নেশায় মশগুল যাত্রা, ভগবানকে তার মনে হতো শুঁড়ি— সুরার তালাসে আনন্দ যেন তুলে নিয়েছিল বিষের পাত্র আর বিষের প্রভাবে সে চিরবিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল— এই উপলব্ধি আজ তার তাসের আড্ডায় এসে হলো।

আনন্দ কেবল তাস খেলতে জানে ব্রিজ, বিন্তি— সে কখনও ডাংগুলি খেলেনি। লাটিম ঘোরাতে পারেনি। ক্রিকেট, ফুটবলও না— কিন্তু খেলা দেখেছে ঢের। এমন-কী কোলকাতায় বড় ক্লাবের ফুটবল খেলাও। ইদানিং তাস খেলতে ব'সে প্রায়ই অমনোযোগী হয়ে পড়ছিল। মাঝপথে তাস ফেলে উঠে পড়তো। অবাক হতো পার্টনার। তার কবি-স্বভাবের জন্য সবাই তাকে ক্ষমাঘেন্না ক'রে দিয়েছে। দু'দিন পর আড্ডায় এলে তাকে খেলতেও দিয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছুদিন সে খেলতে চায়নি। ব'সে-ব'সে খেলা দেখেছে কেবল। কখনও দু'-একটা মন্তব্য বা ভুল ধরিয়ে দিয়েছে মাত্র।

আজ সে খেলছিল।

চারজনকে ঘিরে সাত-আটজন দর্শক।

আনন্দ 'থ্রি হার্টস্' কল্ দিলে পর তার বিরোধীপক্ষ ডাকলো, 'থ্রি স্পেড'। আনন্দর পার্টনার 'নো' জানালো। 'থ্রি স্পেড'-এর পার্টনারও বললো, 'নেই'। আনন্দ একটু নীরব থেকে বললো, 'ফোর হার্টস্!'

ফোর হার্টসের খেলা শুরু হলো।

আনন্দর পার্টনার তাস ওপেন করলে দর্শকদের একজন ফিসফিস বললো, 'দারুণ টাফ'—

কথাটা আনন্দর কানে গেল— এই টাফ খেলাটাকেই সে দারুণভাবে খেলতে চাইলো। খেলা শেষে একজন বললো, 'কী ব্যাপার মিলুদা— বাহান্ন তাস তুমি মনে রাখতে পারছো!'

আনন্দ মিচ্‌কি হাসলো।

—'কিছুদিন থেকে একটা জিনিস লক্ষ করছি— মিলু দারুণ স্মার্ট খেলছে।'

—'কিন্তু কোথাও জালিয়াতি নেই। ফ্রেশ!'

—'আর একটা ব্যাপার কিন্তু লক্ষণীয়—' তাস বাটতে-বাটতে একজন বললো, 'মিলুদাকেও বেশ ফ্রেশ দেখাচ্ছে— কিছুদিন যাবৎ দেখছি।'

আনন্দ কোনো কথা বলছিল না। তাস গোছাচ্ছিল। কোনোদিকে না-তাকিয়েও সে বুঝতে পারলো যেন সকলেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে— সবারই যেন মনে পড়ছে, কী-এক মনখারাপ বয়ে বেড়ানো মিলুর মুখ; সেই মুখের সঙ্গে এই মুখ মিলিয়ে দেখতে গিয়ে সত্যিই অবাক হচ্ছে সকলে।

—'কী ব্যাপার মিলুদা?'

আনন্দ তাসগুলো চোখের সামনে মেলে ধ'রে বললো, 'কীসের কী ব্যাপার?'

—'এই যে তোমাকে খুব ভিভাসিয়াস দেখছে সবাই।'

—'টু স্পেড!— মনে হচ্ছে, তোমাদের সকলের চোখ ভালো হয়ে গেছে।'

বাড়ি ফিরে আনন্দ আয়নায় ফের নিজেকে দেখলো— স্থবিরতা, কদর্যতা ছাড়া যে-মুখে অন্য কিছুর ছাপ দেখেনি, সেই মুখ— এই চোখ... যে-স্বপ্নের আঁচ অনুভব— আনন্দ একান্তভাবে নিজের মধ্যে টের পেয়েছে, সেই স্বপ্নের আভাস নাকি তার দু'চোখে— এই চোখ— চোখে দেখেছে বনি; একথা জেনে ভারী আশ্চর্য হয়েছিল আনন্দ। কথাটা উঠেছিল, সামান্য একটা কথা থেকে— কথাটা হয়তো সামান্য কিন্তু সত্য; আনন্দ যে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, মাঝপথে কথা থেমে যায়— এই স্বভাবের কথা সে জানাচ্ছিল বনিকে, বনি শুনে বলেছিল, 'সে আমি জেনেছি— বুঝেছি তোমার চোখ দেখে—'

—'কীরকম?'

—'এই যে— কথা বলতে-বলতে তুমি কোথায় যেন হারিয়ে যাও, তোমার একটা স্বপ্নের দেশ আছে, তোমার দু'চোখে তার আভাস— আমি দেখেছি।'

দরজায় কার ছায়া পড়লো। কুসুমকুমারীর। তিনি বললেন, 'তাস-আড্ডায় দিব্যি তো দিন চালিয়ে দিচ্ছো— নিজের কথা, সংসারের কথা ভাবছো কিছু?'

আনন্দ চুপ ক'রে থাকলো।

—'বয়েস কত হলো, খেয়াল আছে?'

—'ভাবছি কোলকাতায় ফিরে যাবো— এখানে থেকে কিছু হবে না।'

—'যাক। বুঝেছো তাহলে!'

—'ফাইনাল এক্সামিন শুরু হবার পর-পরই চ'লে যাবো— তখন টিউশনি পাবার সুবিধে।'

—'টিউশনি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছো না?'

—'আর কী ভাববো— কেরানিগিরি আমার দ্বারা হবে না— এ আমি বুঝেছি।'

—'ব্যবসা?'

মায়ের মুখের দিকে তাকালো আনন্দ। এই মা কবিতা লিখতেন! বললো, 'দেখি কোলকাতায় যাই তো, খোঁজখবর নিই—'

বিকেলবেলা এলোমেলো হাঁটলো আনন্দ। নদীর কিনারা ধ'রে অনেকটা দূরে সে চ'লে

গেল, ক্রমশ নির্জনে— তখন পুব আকাশে অনুজ্জ্বল চাঁদ, ময়লা হলুদ আভা ছড়াচ্ছে। আনন্দ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকলো— নদীর বুক থেকে চাঁদের দিকে অন্ধকারের উঠে যাওয়া স্পষ্ট দেখতে পেলো সে। ওপারের পৃথিবী ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। নদী-নৌকা সব ছবি হয়ে ক্রমশ অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। একসময় আনন্দর মনে হলো, চাঁদ তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আনন্দ বললো, 'কী দেখছো?'

চাঁদ যেন বললো, নাকি বনির কণ্ঠস্বর, 'তোমাকে।'

—'আমি আবার দেখার জিনিস হলাম কবে?'

—'যবে থেকে তুমি আর সেই মেয়ে নিবিড় বয়ে গেছ এই পথে।'

—'কোন্ মেয়েটির কথা বলছো তুমি— তুমি কি মনিয়ার কথা বলছো?'

—'না। তোমার দোসর হ'তে চেয়েছে যে-মেয়ে।'

আনন্দ দু'হাত তুলে যেন চাঁদকে অভিনন্দন জানালো। তারপর বললো, 'মনিয়াও আমার দোসর ছিল।'

একদিন, আনন্দর মনে পড়লো, মনিয়া আর সে এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। এমনই চাঁদ ছিল সেদিন।

—'চাঁদ, তুমি ভুলে গেছ তার কথা!'

—'মৃতকে মনে রেখে কেন বাড়াও মনের অসুখ!'

আনন্দ উর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকালো— দু'-একটা নক্ষত্র। মনের অসুখে কি ঝ'রে গেছে মনিয়া— আমি কি অবহেলা করেছি তাকে? উপেক্ষা?

আনন্দ আবারও চাঁদের দিকে তাকালো— আরও উজ্জ্বল, মনে পড়লো বনির মুখ— কাজলের টিপ, যেন কালো চাঁদ— সেদিন আনন্দ টিপ দেখছিল, বনি দেখছিল আনন্দর মুগ্ধ দু'চোখ, দেখতে-দেখতে সে ব'লে উঠলো, 'মিলুদা, তুমি নিঃসাড় নির্জন পুরীতে অনন্ত ঘুমের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখা কোনো মেয়ের গল্প জানো— গল্প মানে রূপকথা?'

—'শুনেছি— এখন আর তেমন মনে নেই— জিয়নকাঠি, মরণকাঠি— কেন?'

—'কল্পনা করো— পালঙ্কের ওপর শুয়ে আছে সেই মেয়ে, মরণকাঠির ছোঁয়ায় সে নিঃসাড়! দেখতে পাচ্ছো তাকে?'

চোখ বন্ধ ক'রে আনন্দ বললো 'হুঁ।'

—'কী দেখছো?'

—'তোমাকে। ঘুমিয়ে আছো!'

বনির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো,. 'ছিলাম—'

আনন্দ চোখ মেলে দেখলো বনির মুখে আশ্চর্য এক আভা; সে বলছে, 'তুমি জাগিয়েছো।'

আনন্দর মাথার মধ্যে জেগে উঠছে অশ্বখুরের শব্দ, ঘোড়সওয়ার রাজকুমারের মুখটাও যেন দেখতে পাচ্ছে সে, আসলে আনন্দ নিজেকে দেখছে— অবিশ্বাস্য!

—'জানো তো মিলুদা, যেন রক্তের অসুখ ভালো হয়ে গেছে আমার— তোমার স্পর্শে।'

আনন্দ কিছু বলতে পারছিল না। কেবল তার মনে হচ্ছিল, সে কোনো স্বপ্ন দেখছে কিংবা কবে পড়া কোনো গল্প-উপন্যাসের কোনো সিকোয়েন্স মনে পড়ছে— বাঃ! মনের অসুখ। রক্তের অসুখ।

রূপকথা—

চাঁদ চেয়ে আছে। জোনাকিরা জ্বলছে তবু ঝোপেঝাড়ে। আনন্দর মাথার মধ্যে জেগে উঠছে রূপকথার পৃথিবী; নিঃসাড় ঘুমন্ত পুরীর নীল জ্যোৎস্না...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানি নি তা— হয়েছে মলিন
চক্ষু এই— ছিঁড়ে গেছি— ফেঁড়ে গেছি— পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে
কত দিন-রাত্রি গেছে কেটে!

দুটো শালিক। কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। কথার আবেগে ফুলে-ফুলে উঠছে ঘাড়ের রোঁয়া। আনন্দ দেখছিল। আনন্দ দেখলো, ঠোঁটে ঠোঁট ঘষছে তারা। একজোড়া শালিকের আদর, তাদের উজ্জ্বল হলুদ ঠোঁটের মধ্যে যেন সঞ্চিত ছিল মনিয়ার কণ্ঠস্বর, 'তুমি যা দেখতে পাও, আমি কি তা দেখিনি?' এতদিন পরও আনন্দ কল্পনায় কথা-শেষে মনিয়ার রহস্য ছড়ানো হাসিও দেখতে পেলো। একটা নরম বেদনাবোধ জেগে উঠতে-না-উঠতেই আনন্দ দেখলো একটা পাখি কোথাও উড়ে যাচ্ছে— অন্যটি দু'-একটি দানা কি পোকামাকড় খুঁটে খাচ্ছে। তার খুঁটে খাওয়া নিবিষ্ট দেখতে-দেখতে আনন্দর মনে হলো, এর চেয়ে পাখি হ'লে ভালো হতো— এমন খুঁটে খেতে-খেতে কোনো তৃপ্ত সময়ে— আহা! আনন্দ পাখি হয়ে গেল, পাখি হয়ে এলো বনি— তবু তো এলো! মনিয়াও আসতে পারতো— পাখিদের সংসার, খড়কুটোর আয়োজন— সর্বানন্দ ভবনের মতো এত জটিল, নিষ্ঠুর হতো না নিশ্চয়! সে যখন কোলকাতায় থাকতো শহরটাকে মনে হতো কারাগার, আর এখন সর্বানন্দ ভবনকে কেন যেন মনে হয় পাগলাগারদ— অথচ আশ্চর্য এই যে, এ বাড়ির প্রত্যেকের ধারণা আনন্দ একটু কেমন যেন! কারুর সঙ্গে মেলে না। খাপ খায় না। এমন-কী যে মা'র সঙ্গে তার মিলকে পিসিমা গর্বের বিষয় ব'লে মনে করেন, সেই মা'ও কেমন যেন— নইলে কেন বলবেন, 'দ্যাখো মিলু উদাসীনতার একটা সীমা আছে!'

আনন্দ মা'র মুখের দিকে অবাক অপলক তাকিয়ে ছিল। সেই তাকানো দেখে কুসুমকুমারী বললেন, 'ক্যাবলার মতো তাকিয়ে থাকার স্বভাবটা এখনও বদলাতে পারলে না।'

আনন্দ বলেছিল, 'স্বভাব কি বদলানো যায়, মা?'

—'যায়— যদি অন্যের বিরক্তি বুঝতে পারো।'

—'বিস্ময়, বিস্ময়ের ঘোর— এ যদি কারও বিরক্তির কারণ হয়, কিছুই করার থাকে না তখন।'

—'শোন্! অত তত্ত্বকথা শুনতে চাইছি না— পুরুষ মানুষ নিষ্কর্মা ব'সে ব'সে খাচ্ছে— এটা সংসারে ভালো দেখায় না।' আনন্দ মিচ্‌কি হাসছিল। এই মা! একদিন পাখির মা'দের মতো ছিলেন। পক্ষিশাবকের মতো তার কবিজীবনকে তিনি পক্ষপুটের ছায়ায়, উত্তাপে... কুসুমকুমারী, সন্ত সত্যানন্দের সহধর্মিনী, ব্রহ্ম সাধিকা— আমার রক্তে যে কাব্যদোষ তা জন্মসূত্রে পাওয়া— মা! এই ক'দিন আগে, একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্ন তো? কী জানি, কল্পনাও হ'তে পারে— সে কোন্ এক পাখিজন্ম, গ্রীবা টানটান আমার বিশ্বগ্রাসী হা-এর মধ্যে তোমার ঠোঁট আধার ঢুকিয়ে দিচ্ছে; আমার অপুষ্ট ডানায় তখন আন্দোলন— তোমার দৃষ্টি বলছে,— কবে যে তুই উড়তে শিখবি!

কুসুমকুমারীকে কেমন বিষণ্ন দেখালো— তাঁর কাব্যলোকে এখন মরুধূসরতা— দগ্ধপীড়িত আত্মার বেদনা যেন ছায়া ফেলেছে তাঁর মুখে। আনন্দ বললো, 'মা, তুমি চিন্তা কোরো না— বলেছি তো, জানুয়ারি মাসে আমি কোলকাতায় ফের চ'লে যাবো!'

—'সে যখন যাবি, যাবি— এখন— সারাদিন এভাবে ঘরকুনো ব'সে থাকতে তোর ভালো লাগে?'

কুসুমকুমারীর কথার মধ্যে কী-একটা ইঙ্গিত ছিল, ঠিক ধরতে না-পারলেও আনন্দ এটা বুঝেছিল, সারাক্ষণ তার ঘরের মধ্যে ব'সে থাকা চলবে না। তবু এক-একটা ভাবনা তাকে এমনভাবে বসিয়ে রাখে স্থবির, এক-একটা দৃশ্য— কোথা থেকে কোথায় যে নিয়ে যায় তাকে— শিশির কুয়াশার ভিতর, ধূ-ধূ মরু, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র— গভীর গহন বন— মনিয়া, বনি, কিংবা অন্য কোনো নারী— এ-পৃথিবী ছেড়ে যেন তার আত্মা সুদূর অতীতের কোনো জনপদে— বস্তুত সকলেই তাকে ঘরের মধ্যে ব'সে থাকতে দ্যাখে, একটু কেমন যেন— পাগল নয় সেভাবে; আপন ভালো পাগলেও বোঝে, মিলু তা বোঝেনি, বুঝলে সিটি কলেজের চাকরিটা যায় না— এরকমই একটা কথা ভেবলুকে বলতে শুনেছে আনন্দ।

ভাগ্যিস ভেবলু চাকরিটা পেয়েছিল! নইলে কী যে হতো! ভেবলুর এখন অনেক দাম এ-বাড়িতে— মান-মর্যাদায় সে অনেক বড়। সে যা বলবে সেটাই ঠিক।

একটা ভাবনা, জোড়া শালিক— এসব অনেকক্ষণ আটকে রেখেছে তাকে। এবার সে তেড়েফুড়ে উঠলো। ভাবনা আর দৃশ্যটাকে ছিঁড়ে ঘেঁটে বেরিয়ে পড়লো আনন্দ।

যেতে-যেতে বার-কয়েক সে থমকে দাঁড়িয়েছে। প্রথমবার, পুকুরে পুঁতে রাখা বাঁশখণ্ডের জলের ওপর ফুট-দেড়েক কঞ্চিতে ব'সে থাকা এক ছোট্ট মাছরাঙা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল— এমনই তো নিবিষ্ট নিথর বসেছিলাম আমি, ভাবতরঙ্গ ছুঁয়েছিল আমার দৃষ্টি, ঠিক ওর মতো নয় কি?

দ্বিতীয়বার গীর্জার কার্নিসে বকবকম পায়রাগুলি, কী যেন কীসের এক ইশারা ছিল, সেই ইশারায় সে থমকে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দেখছিল।

আর এবার সে থমকে দাঁড়াতে গিয়েও দাঁড়ালো না, তার গতি শ্লথ হলো মাত্র— তরুণ সংঘের সামনে জটলা। এই সংঘটির বহিরাবরণের দিকে দৃষ্টি দিলে এ-অঞ্চলের রাজনীতি বিষয়ে কিছু ধারণা করা যায়। জটলা মানেই সামনে রয়েছে কোনো কর্মসূচি— একসময় আগ্রহ ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণের পর রাজনীতি সম্পর্কে সমস্ত উৎসাহ আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে। আমরা স্বাধীনতা চাই— কেউ বলছে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস চাহ, কেউ বলছে পূর্ণ স্বরাজ; কংগ্রেসের মধ্যে একটা উপদলও তৈরি হয়ে গেছে— ইণ্ডিয়া ইনডিপেণ্ডেন্স; ডিসেম্বরে কোলকাতায় অধিবেশন বসছে— হয়তো তারই প্রস্তুতি চলছে ক্লাব সদস্যদের মধ্যে। হয়তো ভাঙন— সেদিন কে যেন বলছিল, বুলু নাকি কোলকাতায় ছাত্রী-সংঘ গঠনের উদ্যোগে অংশ নিয়েছে।

শুনে আনন্দ কেবল একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছিল, 'ভালো।' ওই 'ভালো'র পরে যেন আর কোনো কথা চলে না।

সর্বানন্দ ভবনের আবহাওয়ায় রাজনীতি কখনও চর্চার বিষয় হয়ে ওঠেনি। স্বদেশি-স্বরাজের প্রশ্নে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক— এটা আনন্দ জানে; সেক্ষেত্রে বুলু ছাত্র-রাজনীতিতে নিজেকে জড়িয়েছে— তার মানে সে ট্রেডিশন ভেঙেছে! মনে মনে বুলুকে অভিবাদন জানালো আনন্দ।

বাজার রোড ধ'রে যেতে যেতে আনন্দ আরও এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালো। মদের দোকানে পিকেটিং চলছে— নানান বয়েসী মেয়েরাই সংখ্যায় বেশি। এই মেয়েদের মধ্যে কি বনি আছে? আনন্দর দৃষ্টি বনির বয়েসী প্রায় প্রতিটি মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছিল। প্রতিটি মুখে উত্তেজনার আগুনে আঁচ। আশ্চর্য রোমান্টিক দেখাচ্ছে— 'ঝড়ের বাতাস চাই'— কথাটার উচ্চারণে সেদিন এমনই এক দীপ্তি, দৃপ্ত ভঙ্গিমা বনির সমস্ত মুখাবয়বে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। সহসা আনন্দর মনে হলো— এইসব দৃঢ়চেতা, সংকল্পবদ্ধ মুখ সে আগেও দেখেছে কোথাও— কোথায়? কোথায়? —আনন্দ হাঁটতে শুরু করলো আবার— আর তার মাথার মধ্যে জেগে উঠতে চাইছিল ধূসর এক জনপদ...

কেউ তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। বাজার রোডটা বাজার রোড হয়ে উঠতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো। সামনে দাঁড়ানো মানুষটাকে সে ঠিক চিনতে পারছে না, মানুষটার মুখ যেন ইতিহাসের ধুলো মাখা।

—'কী রে— চিনতে পারছিসনে!'

কণ্ঠস্বরেই সমস্ত ধুলোর আবরণ ঝ'রে পড়লো। আনন্দ বললো, 'না, ঠিক তা না— তোকে দেখেই অন্য কারও মুখ— যাকগে, বল্।'

—'তোকে কারকম যেন দেখাচ্ছে!'

—'কারকম?'

—'বিষণ্ণ—?'

—'শোন্— জানিস বোধহয়, আমি এখন বে-রোজগেরে মানুষ।'

—'না তো!'

—'একজন বেকারের মুখে— শুধু কি বিষণ্ণতা? আরও কত-কী!' ব'লে হনহন হাঁটতে শুরু করলো আনন্দ।

বাড়ি ফিরে অনেকদিন পর সে আয়নায় নিজেকে দেখলো— গিরগিটির মতো এ-মুখও কি রঙ বদলায়? আনন্দ নিজেও টের পাচ্ছিল, তার অন্তরে প্রজ্জ্বলিত দীপাধারে কালি জমছে— এটা নিছক মনে হওয়া, মনের ধর্ম— নেগেটিভ চিন্তা; এরকম ভাবনায় বিষয়টাকে তেমন আমল দেয়নি। আজ প্রতিবিম্বিত মুখ দেখে তার মন খারাপ হয়ে গেল— বনি কি দূরে স'রে যাচ্ছে?

আনন্দ হিসেব ক'রে দেখলো বনির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল মাস-দেড়েক আগে। বুলুর সঙ্গে এসেছিল। বেশি সময় থাকেনি। তেমন কোনো কথাও হয়নি। দীর্ঘ একটা কবিতা বনিকে সে পড়তে দিয়েছিল। কবিতা পড়তে-পড়তে বনি যেন আবেগশূন্য হয়ে পড়ছিল— কবিতা নিয়ে কোনো কথা হয়নি। তবু বোকার মতো আনন্দ বলেছিল 'এই অনুভব তুমি দিয়েছো—' বনির ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা— ঠিকভাবে ফুটে না-উঠলেও আনন্দ বলেছিল, 'তুমি আছো ব'লে—'। কোনো কি প্রত্যাশা ছিল? আনন্দর মনে পড়লো বনির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ছন্দিত আলো আর অন্ধকার খেলা করছে বনির মুখে— কেমন ম্লান দেখাচ্ছিল বনিকে। বস্তুত সেও ছায়াচ্ছন্ন— সেই ছায়া আরও গাঢ়।

চলার পথে বনির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে— পথে নামলেই এরকম মনে হয় আনন্দর— বনি ব'লে ভুলও করে সে, আলেয়ার মতো যেন— দেখা হয়নি একদিনও, এমন-কী বনিদের বাড়ির পাশ দিয়ে নিতান্ত পথিকের মতো একদিন চ'লে গিয়েছে, আবার সে-পথেই ফিরে এসেছে। বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকলে মনে হয়, এই বুঝি দরজায় বনির ছায়া পড়লো। বস্তুত, এই কর্মহীন জীবনে বনির প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই— বনির সঙ্গে মনে মনে কথা ছাড়া আর কোনো ভাবনা নেই। বনিদের বাড়িতে সে যেতে পারে। দু'বার গেছেও। প্রথমবার বুলু ছিল সঙ্গে। বনির মা-বাবা তার কবি-পরিচয়ে একটুও খুশি হয়নি— বুঝতে পেরেছিল আনন্দ। সিটি কলেজে পড়ায় শুনে বনির বাবা একটু কৌতূহলী হয়েছিল। মাইনে কত পায়— জানতে চাওয়াটা আনন্দর মোটেই ভালো লাগেনি। তবু বলেছিল বিস্বাদে। 'আবার এসো!' —বনির মা'র আহ্বান আন্তরিক মনে হয়েছিল। এবং সে দ্বিতীয়বার গিয়েছিল। আর সেদিন—

তখন বিকেল।

ভাদ্রের নীল আকাশের নিচে, নিবিড় সবুজের মাঝে বনিদের বাড়িটা তপোবনের কুটির যেন; পাখিদের কূজন মাখা পড়ন্তবেলার সোনালি রোদ্দুর, তার ছায়া-আলপনা— আনন্দ মুগ্ধ দেখছিল, বারান্দায় একটা বিড়াল অলসভাবে শুয়েছিল, চড়ুই-শালিকের কিচিরমিচির। কোথাও কোনো মানুষের উপস্থিতি নেহ, নেই তার এতটুকু আভাসও— আচমকা এরকম মনে হওয়ায় দরজার দিকে তাকালো, একটা দরজায় কেবল শিকল তোলা। অন্য দরজাটা মনে হলো, ভেতর থেকে বন্ধ।

আনন্দ ডাকলো, 'মাসিমা!'

বার-কয়েক ডেকে সাড়া না-পেয়ে বনির নাম ধ'রে ডাকলো।

বার-দুই ডাকার পর দরজাটা খুলে গেল।

—'মিলুদা, তুমি!'

আনন্দর সমস্ত মুখটা হেসে উঠলো নীরবে।

—'কতক্ষণ?'

—'এই তো।'

—'এসো।'

ঘরে এসে বসলো। বনির হাতে তালপাতার পাখা। বেশ কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে যাওয়ার পর বনি বললো, 'বলো তো মিলুদা, সবচেয়ে বড় ঔপন্যাসিক কে?'

পড়াশুনোর মধ্য দিয়ে এ-পর্যন্ত যেসব ঔপন্যাসিকের নাম বনির জানা সম্ভব, সেসব নামের মধ্য থেকে আনন্দ একটা নাম তুলে আনলো, 'টমাস মান।'

বনি নিচের ঠোঁট কামড়ে— না-ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।

আনন্দ বললো, 'ধাঁধা মনে হচ্ছে—'

খিলখিল বেজে উঠলো বনি। হাসি থামিয়ে বললো, 'ধাঁধা যখন— একটু ভাবো!'

—'নাঃ পারবো না— তুমি বলো!'

—'ঈশ্বর।'

আনন্দ বুঝতে পারছিল, গূঢ় কোনো তাৎপর্যের ইশারা রয়েছে বনির কথায়, চোখের ভাষায়, ঠোঁটের কাজে— কিন্তু না-বোঝার ভানে সে বললো, 'কীরকম?'

—'এই ধরো, আমি আর তুমি— আমাদের নিয়ে এই মুহূর্তে তিনি যে চ্যাপ্টার লিখছেন, একটা মেজর সিকোয়েন্স— কেউ কোথাও নেই—' ঠোঁটের কোণে, চোখের চাহনিতে রহস্য— হঠাৎ যেন মুহূর্তের জন্য তা বদলে গেল— ব্যথাকে সহ্যসীমায় আটকে রাখতে চোখ-মুখের পেশির যে কাজ তাতে সেই রহস্য উবে গেল— কয়েক মুহূর্ত মাত্র, ফের স্বাভাবিক।

—'কী ভাবছো, মিলুদা!'

—'তোমাকে।'

—'আমাকে?'

—'হুঁ।' আনন্দ অন্যমনস্ক।

—'কী হলো?'

—'ঈশ্বরের ইচ্ছা— আমি তা অনুভব করতে পারছি।'

—'সত্যি!'

—'ইয়েস। তোমার খোঁপা খুলে ফ্যালো।'

—'এমা! কেন?'

—'খোলোই না— ঈশ্বরের ইচ্ছা এরকমই।'

—'তুমি খুলে দাও!— আমিও অনুভব করছি তার নির্দেশ।'

আনন্দর বুকে বনির তপ্ত নিঃশ্বাস। রক্তে তার অদ্ভুত দোলানি— জোয়ারের স্পর্শে ভাঁটির চরে আটকে থাকা নৌকা যেভাবে দুলে ওঠে, তেমনই— এলোচুলে বনি। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে একটু দূরে স'রে গিয়ে আনন্দ দেখছে তাকে— দু'চোখ বন্ধ ক'রে বনির সমস্ত ইমেজটাকে সে যেন আত্মস্থ ক'রে নিচ্ছে— মেঘের ফাঁকে চাঁদ— এরকম পুরনো উপমায় বনিকে ঠিক প্রকাশ করা যাচ্ছে না, তাছাড়া চাঁদ তো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, বনিকে আমি ছুঁতে পারি, যেভাবে ভাস্কর্যের স্তনে আমি হাত রেখেছি—

—'মিলুদা!'

আনন্দ বনির খুব কাছে।

গল্প-উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসছে দৃশ্য— বনির ওষ্ঠ-অধর, অধর-পাপড়ির সমস্ত শিরা-উপশিরা-ভাঁজ দেখতে পাচ্ছে আনন্দ, এক আশ্চর্য ডাক ছড়িয়ে দিচ্ছে অধরোষ্ঠ— তাদের ফাঁকে অপক্ক ডালিমদানার দ্যুতি, জিহ্বার গোলাপি আভার ওপাশে তৃষ্ণার্ত অন্ধকার— বনির মুখমণ্ডল যেন একটা অবলম্বন চাইছে নইলে এখনই ভেঙে পড়বে। আনন্দর দু'হাতের মধ্যে বনির মুখ। বনি দেখছে আনন্দকে— দু'চোখের পাতায় আবেশভার, নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। বনি তার নিজের মধ্যে কী-যেন কীসের একটা ফুটে ওঠা টের পাচ্ছে। আনন্দর মনে হচ্ছে, তার মধ্য থেকে উঠে আসছে হাজার মধুমাছির গুঞ্জন— তার অনুভবে ছড়িয়ে পড়ছে বনির চুলের গন্ধ, যেন সুগন্ধি ধূপ পুড়ছে কোথাও— তাব্র আশ্লেষে বিজড়িত আনন্দ শুনতে পাচ্ছে শঙ্খধ্বনি, কবে একদিন স্তনভাস্কর্যে হাত রাখার অভিজ্ঞতা রক্তমাংসে রূপ পাচ্ছে— বনি যেন সেই কবেকার কর্ষণদণ্ড হাতে বীজের অপেক্ষায় থাকা নারী— মিথুনমূর্তি ব'লে উঠলো, 'শুনতে পাচ্ছো!'

—'হুঁ।'

—'বুঝতে পারছো অনন্ত নক্ষত্রলোকের শিহরণ!'

—'হুঁ।'

...সেদিনকার সেই অনুভব, সেই শিহরণ, স্পষ্ট আজও— এই তো তার জননেন্দ্রিয় জেগে উঠছে, বনির স্পর্শও।

সেই প্রথম, স্বপ্নের বাইরে, স্বপ্নময়, শরীরকে জেনেছিল আনন্দ— কেবল তার স্বাদ অনাস্বাদিত থেকে গেছে।

বনি বলেছিল, 'না।'

—'কেন?'

—'শরীর খারাপ।' মুখে তার অদ্ভুত হাসি কেমন যেন রহস্য ছড়িয়েছিল। তারপর সে বিছানার একপাশে রাখা হটওয়াটার ব্যাগ তুলে নিয়ে দেখিয়েছিল। পর-পরই খাটের ওপর শুয়ে ওয়াটার ব্যাগটা রেখেছিল তলপেটে।

সেইদিনকার সেই বিষণ্নতা ফিরে এলো আবার।

আজ আর কেউ বললো না, 'কী হলো?'

কিন্তু কী যে হলো! চ্যাপ্টার কি ক্লোজড় হয়ে যাচ্ছে? সেই মেজর সিকোয়েন্সের

পরও বার-দুই একান্তে দেখা হয়েছে— শেষ দেখা লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন, বনির হাতখানা তুলে নিয়ে আনন্দ নিজের মুখে বুলিয়েছিল। সেদিন যে নিরাবেগ ছিল তার হাত, সেই মুহূর্তে তেমন মনে হয়নি, কিন্তু কয়েকদিন পরে স্মৃতি রোমন্থনে আনন্দর মনে হয়েছিল বনির হাতে ইচ্ছার কোনো উত্তাপ ছিল না। তারপর পথে একদিন দেখা, না-দেখার ভানে চ'লে যাচ্ছিল বনি, আনন্দ ডেকেছিল।

—'কী ব্যাপার?'

—'কীসের?'

—'এই যে তুমি দেখতে পেলে না!'

—'খেয়াল করিনি।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আনন্দ ভেবেছিল, তার মানে আমার শরীর থেকে আর সেই আলো-তরঙ্গের বিচ্ছুরণ ঘটছে না— অথচ বনির শরীর তা পাঠাচ্ছে, আমি তার যথার্থ গ্রাহকও—

—'কোথায় যাচ্ছো?'

—'এই একটু এদিকে—'

উপেক্ষার ভাষা স্পষ্ট অনুধাবন ক'রেও আনন্দ বলেছিল, 'একদিন এসো, বড় একটা কবিতা লিখছি।'

এসেছিল বনি।

'এই অনুভব তুমি দিয়েছো—' শুনেও বনি কেমন যেন আবেগশূন্য ছিল। যেন কবিতার পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই অথচ বনি আমার কল্যাণীয়াসু—

তবু, যাওয়া যায় না।

AMARBOI.COM

—'মিল, তোমার কি শরীর ভালো নেই?'

—'না মা, ভালোই তো আছি।'

—'ক'দিন থেকে লক্ষ করছি— তোমার মুখ শুকনো-শুকনো।'

—'তা— শরীর খারাপ যদি বলো— ডিসেন্ট্রি, ওটা ফিরে-ফিরে আমাকে একেবারে পেড়ে ফ্যালে।'

—'শরীরের আর দোষ কী! এত টো-টো ক'রে ঘুরছো সারাদিন— ছাতাটা নিয়ে তো বেরুতে পারো!' কুসুমকুমারী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আনন্দর মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, 'তোমার ভুবনমামা বলছিল, মুখ চুন ক'রে কেমন ঘুরে বেড়াও—'

—'আচ্ছা মা, তোমরা কি ভাবো এখনও আমি তোমাদের সেই ছোট্ট মিলু আছি— এত চোখে-চোখে রাখার কী আছে!' বিরক্তির ঝাঁঝটা একটু কমিয়ে, নিজের দিকে তাক ক'রে বললো, 'একটা ত্রিশ বছরের বেকার যুবকের মুখ চুন-চুন ছাড়া, আর কী হ'তে পারে? আচ্ছা ভুবনমামাকে আমিই জিগ্যেস করবো।' ব'লে সে বেরিয়ে পড়লো।

—'কোথায় যাচ্ছিস?'

—'তোমাদের চোখের আড়ালে—'

কোলকাতায় গেলেই ভালো হতো। না-যাওয়ার পিছনে নানা কারণ; তবে অন্যতম কারণ বোধহয় এই— যে-পথে আমি হাঁটি, সে-পথে বনিরও পদচিহ্ন পড়ে— যে-পথে বনি হাঁটে সেইপথে আমিও হেঁটে যেতে পারি, দেখাও হয়ে যায় দু'-একদিন, দেখা হ'তে পারে অন্য কোনো দিন— এমন সম্ভাবনা ছেড়ে, স্বপ্নভূমি ছেড়ে কোথায় যাবো আমি?

কী আশ্চর্য! মা আমার মন খারাপকে শরীর খারাপ ভেবেছে— আর কাল স্বপ্নের মধ্যে বনি, যেন-বা বনি আমার দু'চোখে চোখ রেখে বলেছে, তোমার দু'চোখে এত ব্যথা কেন?

আমি বিহ্বল-নির্বাক।

—কী হয়েছে?

—আমাকে চ'লে যেতে হবে।

—কোথায়?

—কোথাও। কাজের খোঁজে। তোমার খুব কষ্ট হবে।

—তোমারও তো!

আমরা একে অন্যের কষ্ট অনুভব করছিলাম।

বনি ব'লে উঠলো, বেশ তো আমাদের কষ্ট কবিতা হয়ে উঠবে।

আনন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেললো— তার কবিতা বইয়ের যে-ক'টি আলোচনা হয়েছে তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একসময় রবীন্দ্রনাথকে এক কপি বই পাঠাতে ইচ্ছে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত আর পাঠানো হয়নি। কিন্তু এবার তাকে নিয়ে তার সাম্প্রতিক কবিতা বিষয়ে বুবুর আলোচনা তার

ইচ্ছেটাকে আবার উস্‌কে দিয়েছে, আর সেই সঙ্গে সুপ্ত প্রেরণা অবশ্যই বনি— হয়তো সে-কারণেই এক কপি 'ঝরাপালক' রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিল আনন্দ, সঙ্গে ছিল এক টুকরো চিরকুট— আপনার মতামত আমার নিকট স্নেহাশিস তুল্য— আশা করি বঞ্চিত হবো না।

রবীন্দ্রনাথ চিঠি পাঠিয়েছেন।

সেই চিঠি পাওয়ার পর-পরহ, একটা অজুহাত যেন পেয়ে গেছিল আনন্দ, বনিদের বাড়িতে গিয়েছিল সে।

বনিকে তেমন খুশি মনে হয়নি। কিংবা মনে হয়েছিল— উচ্ছ্বাসকে সে রুখে দিতে পেরেছে। বনির বাবা বাড়িতে ছিলেন না। তার মা বলেছিলেন, 'ওসবের দাম আমি আর কী বুঝবো বাবা! তবে নিশ্চয় দামি— নইলে ছুটে আসতে না।' ফেরার পথে, বেশ কিছুটা পথ বনি তার পাশাপাশি হেঁটেছিল কিন্তু যে নিবিড়তা থাকলে মন কথা বলে, তা ছিল না। কেবল বনি তার ফেরার পথ ধরবার আগে বলেছিল, 'চাকরির চেষ্টা করো!'

—'একটা কথা জিগ্যেস করবো?'

—'বলো!'

—'আমি কি কোনো দোষ করেছি?'

—'না তো।'

—'আমি আমার দোসরকে পাচ্ছি না কেন?'

বনি নীরব ছিল।

—'ঈশ্বর কি আমাদের চ্যাপ্টার ক্লোজ ক'রে ফেলছেন?'

বনি অদ্ভুত হেসেছিল ঠোঁটের কোণে— একটু যেন তাচ্ছিল্য, খানিকটা ব্যঙ্গ। বলেনি কিছুই।

আরও সব বলা-কথা বনিকে মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু যদি ব্যথা পায়— এই ভেবে আনন্দ নিজের মনে সেইসব কথা ভেবে-ভেবে বিস্মিত হচ্ছিল। ব্যথা পাচ্ছিল।

—'আমি যাই!'

মাথা মৃদু কাত্‌ ক'রে আনন্দ বিদায় জানিয়েছিল।

ইদানিং পথ হাঁটলেই বনির সঙ্গে মনে-মনে কথা চলে। যেকথা বলতে ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু বলা হয়নি— সেইসব কথা। আবার এমন সব কথা, দেখা হ'লে বনিকে যা বলতে হবে। বস্তুত শেষপর্যন্ত কোনো কথাই তাকে বলা হয় না। এমন-কী, সেসব কথা লিখে রাখবে ব'লে কাগজ-কলম নিয়ে বসলে, কিছুতেই মনে পড়ে না। যদিও-বা মনে পড়ে, তার মধ্যে কোনো বুদ্ধিদীপ্তি নেহ, সাধারণ— অতিসাধারণ, তার এই পথচলা কখনও কখনও নিজেরই মনে হয়, একটা নেশা— বনির সঙ্গে কথা বলার নেশায় সে হাঁটে...

হাঁটতে-হাঁটতে আনন্দ স্টিমারঘাটে এসে দাঁড়ালো— ওই যে পাটের গোডাউন। ওইখানে কী এক আলো মেখে দাঁড়িয়েছিল সে আর বনি... জেটিতে উঠে এলো আনন্দ। রেলিঙের এইখানে বনি হাত রেখেছিল— এইখানে তাদের তর্জনী পরস্পরকে স্পর্শ করেছিল...

তারপর ঝাউবীথি ধ'রে হাঁটলো... তখন আচমকা মনিয়ার কথা মনে পড়লো... তখন পুব আকাশে চাঁদ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কাল বা পরশু পূর্ণিমা। আজও চাঁদ তার মুখের দিকে তাকাবে। আর তার ঝলসে যাওয়া মুখ দেখে সেও বিস্মিত হবে। জানতে চাইবে নানান কথা— চাঁদকে পেছনে রেখে আনন্দ হাঁটতে শুরু করলো আবার।

স্টিমারের ভোঁ। দূরে কোথাও শেয়ালের ডাক। লেবুফুলের গন্ধ। শিশুর কান্না। কুকুরের ঘেউ-ঘেউ। এসব শব্দের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে আনন্দ ভাবলো কেমন নিস্তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে জনপদ— একটু আগে আজান শুনেছে— শঙ্খধ্বনি... শঙ্খধ্বনি শুনতে-শুনতে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিল, সন্ধ্যাপ্রদীপের সলতেয় আগুন ছোঁয়াচ্ছে বনি— শিখা জ্ব'লে উঠলে তার আভায় বনির মুখও আলো হয়ে গেল— আচমকা একটা আর্তচিৎকার, কীসের যেন সোরগোল উঠলো... লোকজন ছুটে যাচ্ছে... রাস্তার পাশে কৌতূহলী নারী-পুরুষ... আনন্দ হাঁটছে— যেমন হাঁটছিল, কোনো কৌতূহল নেহ, উদ্বেগ নেই— যদিও তার কান ছুঁয়ে গেছে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার মতো কিছু শব্দ, বাক্য— খুন... সদর বালিকা বিদ্যালয়ের পেছনের রাস্তায়... দারোগা... বন্দেমাতরম... আনন্দর পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে মানুষজন। খুনিকে ধরার জন্য, ধরা না-পড়ার জন্য...

আনন্দ আশ্চর্য হলো, যে-জনপদকে তার নিস্তরঙ্গ মনে হয়েছিল, তার মধ্যে কী সাংঘাতিক আলোড়ন...

—'আসলে তুমি যাকে শান্ত ভাবছো, তা কিন্তু প্রকৃত শান্ত না-ও হ'তে পারে।' বলেছিল বনি। মনে পড়লো। এবং একই সঙ্গে সে স্পষ্ট দেখতে পেলো বনির চোখ— আনন্দ ওই চোখের প্রশস্তি করতেই সেদিন বনি বলেছিল ওই কথা। তার সমর্থনে সে চোদ্দ বছরের এক কিশোরের কথা বলেছিল— ছেলেটি শান্ত অনুগত কিন্তু সে-ই বিপ্লবী দলের অ্যাক্‌শন স্কোয়াডের সদস্য। —বনি জানলো কী ক'রে? সেও কি— বুলু যেমন ছাত্রীসংঘ করছে?

আরও কিছুসময় এলোমেলো ঘুরে বাড়ি ফিরলো সে— সবাই তাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ভুবনমামা বললো, 'শুনেছিস— জ্যোতিষ দারোগা খুন হয়েছে। ধরপাকড় শুরু হয়েছে— কোথায় যে থাকিস!' এসব কথা সে শুনলো কি শুনলো না— ঠিকভাবে বুঝতে পারলো না কেউ। তোলা জলে হাতমুখ ধুলো আনন্দ। যেন কোথাও কিছু ঘটেনি। এমন একটা উদাসীনতার মধ্যে থাকতে একটুও অসুবিধে হচ্ছিল না তার। কিন্তু যখন সে শুনলো, 'অতটুক একটা ছেলে! দশাসই চেহারার দারোগাকে— ভাবা যায় না!' তখন আনন্দ একটু যেন কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

—'কে ছেলেটা— শুনলে কিছু?' যেন তার হয়ে কথাটা তার মা-ই জিগ্যেস করলেন।

—'বলছিল কেউ, কোন্ এক চ্যাটার্জি বাড়ির ছেলে, নাম— রমেশ।' কোনো এক ছোট্ট রমেশ, বিপ্লবী কিংবা খুনি— যেন তার কবিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে সেই কিশোর। বনি যার গল্প জানে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে— পুণ্য ভারতপুরে
পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নমাজের সুরে-সুরে।

মিলু কেমন যেন
মিলুদা একটু অন্যরকম
মিলু সেরকম মিশুকে নয়
মিলু একা থাকতে ভালোবাসে— কেন যে এমন

এইসব ধারণার বিরুদ্ধে আনন্দর অনুচ্চারিত প্রতিবাদ আছে। কেউ খেয়াল করেনি। সে যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাসের আড্ডায় ব'সে থাকে, খ্যালে অথবা খেলা দ্যাখে— এটা কেউ লক্ষ করে না। সামাজিক কাজকর্মে তার উপস্থিতি কারও নজরে পড়ে না। সে অন্যরকম, কেননা সে কোলকাতা থেকে গোলাপচারা এনে পোঁতে, বড় বড় গোলাপ ফোটায়— কেউ খেয়াল করে না ফসল ফলানো আর ফুল ফোটানোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সে অন্যরকম, কেননা তাকে সেভাবে কেউ কখনও ক্রিকেট ফুটবল খেলতে দ্যাখেনি। কিন্তু খেলার মাঠে দর্শক গ্যালারিতে তার উপস্থিতি একটু নজর করলেই দেখা যেতো— তা সে কোলকাতার মাঠে হোক কিংবা এখানকার কোনো স্কুলমাঠে। মিলু অন্যরকম, কেননা মিলুকে কখনও স্বাধীনতা আন্দোলনের মিটিং-মিছিলে দেখা যায়নি। অথচ রাজনীতি বিষয়ে রমেশের সঙ্গে তার তর্কের কথা কেউ জানে না।

আনন্দ ভাবছিল, কীভাবে— সে-যে সবার মতো, এটা ব্যক্ত করা যায়। কিন্তু ভাবনাটা রমেশ-প্রসঙ্গে অন্যদিকে মোড় নিলো। কয়েকদিন আগে জ্যোতিদারোগাকে যে খুন করেছিল তার নামও রমেশ, এটা জানা ছিল— জানা ছিল সে অল্পবয়েসী— কিন্তু তার বয়েস যে চোদ্দ— এটা খবরের কাগজে জেনেছে সে, আর তার কেন যেন মনে হয়েছে, বনি যে-ছেলেটির কথা বলেছিল, সে-ই রমেশ। রমেশ অ্যারেস্ট হয়েছে, তার দ্বীপান্তর, মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন— যা কিছু হ'তে পারে, তবু রমেশের মা গর্বিত— গর্বিত সেই মা-এর মুখ কল্পনা করতে গিয়ে আনন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠলো কুসুমকুমারীর মুখ— চোদ্দ বছর বয়সে আনন্দ প্রথম কবিতা লিখেছিল, সেই কবিতা প'ড়ে কুসুমকুমারীর মুখে যে-আভা ফুটে উঠেছিল, অবিকল তা-ই দেখছে আনন্দ— আমার নাম যদি রমেশ হতো— ভাবতে-ভাবতে প্রতিবেশি রমেশের বাড়ির উঠোন, 'রমেশ আছো নাকি?'

—'কে, মিলু? আসো-আসো?'

আনন্দ ঘরে ঢুকে বললো, 'ক'দিন দেখিনি তোমাকে!'

—'ছিলাম না। গা ঢাকা দিতে হলো।'

—'কেন?'

—'সে কী! জানো না?'

—'কী?'

—'জ্যোতিষ দারোগা মায়ের ভোগে—'

—'হ্যাঁ। জানি তো— তা তুমি— তোমাকে গা ঢাকা দিতে হলো কেন?'

—'তরুণ সংঘ, শঙ্করমঠ— এদের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক রয়েছে, বেছে-বেছে পুলিশ তো তাদেরই ধরছে।'

আনন্দ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। আনন্দমঠ— অনেকদিন আগে, কী প্রসঙ্গে যেন সত্যানন্দ বলেছিলেন, 'আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ এখনও আনন্দমঠ— মঠকেন্দ্রিক রাজনীতি, আমাদের শঙ্করমঠ তারই পরম্পরা— বিপ্লবী রাজনীতির আখড়া।' রমেশও একদিন তার সঙ্গে তর্ক শেষ করেছিল এই ব'লে, 'আনন্দমঠ পড়েছিস? বঙ্কিমচন্দ্রের। পড়িস!'

—'তুমি বুঝি শঙ্করমঠের সদস্য!'

—'না। তরুণ সংঘের—'

—'আচ্ছা রমেশ— তুমি একবার আমাকে, আনন্দমঠ পড়তে বলেছিলে, পড়েছি; আনন্দমঠ বুঝেছি— শঙ্করমঠ সম্পর্কে কিন্তু আমি কিছুই জানি না—'

—'ইতিহাস— আনন্দমঠের শুরুতে, যেমন দুর্ভিক্ষ, শঙ্করমঠের শুরুতেও তেমন— যাঃ মিলু, তুমি ইয়ার্কি করছো, তুমি ইতিহাস জানো না— হয় নাকি? তোমার কবিতায় এশিরিয়-মিশর—'

—'না রমেশ, একেবারে যে জানিনে, তা নয়— বাবার মুখে শুনেছি, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবার সহকর্মী ছিলেন— তিনি ব্রহ্মচারী হয়ে কাশীতে চ'লে যান, বেদ পড়ার জন্য, তার পর ফিরে এসে, ওই মঠ নির্মাণ করান।'

—'হ্যাঁ। ঠিক শুনেছো। তখন তাঁর নাম স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী।'

—'না, মানে আনন্দমঠের মতো কোনো ইতিহাস—'

—'তুমি জানো— ইংরেজবিরোধী রাজনীতিতে পুরোধা ছিলেন অশ্বিনীকুমার—'

আনন্দ মাথা নাড়লো।

—'ব্রজমোহনে শিক্ষকতার সূত্রে সতীশচন্দ্র অশ্বিনীকুমারের সান্নিধ্যে আসেন— এই সান্নিধ্য মানে রাজনীতির সংস্পর্শ— শুনেছি, বরিশালে সেবার, তখন বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধে ছাত্র আন্দোলন তুঙ্গে, প্রাদেশিক সম্মেলনে বারীন ঘোষ এসেছিলেন— তাঁর সঙ্গে সতীশচন্দ্রের কিছু কথা হয়ে থাকবে, বারীন ঘোষের কাছ থেকে তিনি একটা রিভলবার উপহার পেয়েছিলেন— ওই সময়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; সেই দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় অশ্বিনীকুমারের ডানহাত ছিলেন সতীশচন্দ্র, কিন্তু ক্রমে তিনি বিপ্লবী রাজনীতির মধ্যে ঢুকে পড়েন, বিপ্লবী আদর্শ মানেই সন্ন্যাসীর আদর্শ— অতএব ব্রহ্মচারী হয়ে গেলেন সতীশচন্দ্র— এবার বুঝতে পারছো আনন্দমঠ কেন পড়তে বলেছিলাম— আনন্দমঠে মুসলমান-শাসন ধ্বংস হয়েছে, ইংরেজ-রাজ্য স্থাপনের ভিত্তি রচিত হয়েছে— শঙ্করমঠ সেই ইংরেজ-শাসন ধ্বংস করার মহান ব্রত পালন করছে— তরুণ সংঘের পৃষ্ঠপোষক শঙ্করমঠ—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ আবারও অন্যমনস্ক— সে যেন আনন্দমঠের সত্যানন্দের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে— 'হে মহাত্মন্। যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এসময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্য্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?' মুহূর্ত-কয়েক পর আনন্দ বললো, 'ইংরেজ এদেশে অভিষিক্ত হবে ব'লে সন্তানবিদ্রোহ হয়েছিল, তোমরা কাকে অভিষিক্ত করতে চাও?'

—'হিন্দুকে।'

—'হিন্দু কে?'

—'যে মুসলমান নয়।'

—'মুসলমান কে?'

—'তুমি কিন্তু এঁড়ে তর্ক শুরু করছো!'

—'না রমেশ— তুমি ভাবো, রাজমিস্ত্রি মনিরুদ্দি কি মুসলমান— তাহলে মতিও হিঁদু— মতিলাল কি রাজা হবে?'

রমেশকে চুপ থাকতে দেখে আনন্দ উঠে পড়লো। পিছু ডাকলো রমেশ। আনন্দ বললো, 'পরে কথা হবে— বিষয়টা নিয়ে একটু ভেবো!'

এরকম 'পরে কথা হবে' ব'লে অনেকবারই আনন্দ উঠে এসেছে। কিন্তু পরে কখনোই সেই প্রসঙ্গ আর ফিরে আসেনি। এবারের প্রসঙ্গও ফিরবে না— রমেশদের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলন মানে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, খুব গোপনে রয়েছে মুসলমান-বিদ্বেষ— নইলে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ খুন হলেন কেন? খুন হলেন দিল্লিতে আর কোলকাতায় মির্জাপুর পার্কের নাম বদলে হলো শ্রদ্ধানন্দ পার্ক! আজও ভাবলে আনন্দ অবাক হয়— সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীতে যাঁদের সমর্থনে বেঙ্গল প্যাক্ট গৃহীত হয়েছিল তাঁরাই ওই পার্কের নাম বদলের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেলেন!

চিত্তরঞ্জনের সেই বিষণ্ণ স্ট্যাচু ফের দেখতে পেলো আনন্দ। একজন যদি হিন্দুরাজ্য কায়েম করতে চায়, অপরজন চাইবে মুসলমানরাজ্য— লাভ হবে খ্রিস্টান রাজের; অথচ— একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান— এই উপলব্ধি একজন কবির পক্ষেই সম্ভব! চিত্তরঞ্জনেরও কবিহৃদয় ছিল— আশ্চর্য এক শিহরণ অনুভব করলো আনন্দ— একটি নতুন পৃথিবীলোকের ইশারা কেবল কবিই দেখতে পান, দেখাতে পারেন অন্যকে— এরকম ভাবনায় আনন্দর মনে হলো, সেও একদিন দেখতে পারে সেই ইশারা— একটা কোকিল ডাকছে কোথাও, খুব কাছে; থমকে দাঁড়ালো আনন্দ— কোকিলের ডাক, ব্যাঙের ডাক— এসব শুনলে আনন্দ অদ্ভুত একটা তাড়না অনুভব করে, মনে হয়— সে যেন কোকিল হয়ে যাচ্ছে, আর ডাকছে গলায় রক্ত তুলে; কিংবা ব্যাঙ—

আনন্দ হাঁটছে আবার।...

এখন সে বনিদের বাড়ি যাওয়ার রাস্তায়—

যতদিন বেঁচে আছি আলেয়ার মতো আলো নিয়ে—
তুমি চলে আস প্রেম— তুমি চলে আস কাছে প্রিয়ে!
নক্ষত্রের বেশি তুমি নক্ষত্রের আকাশের মতো।
আমরা ফুরায়ে যাই— প্রেম, তুমি হও না আহত!

সর্বানন্দ ভবনের চৌহদ্দির মধ্যে সেই সকাল থেকে আনন্দ নিজেকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে— তা প্রায় সাড়ে এগারো-বারোটা পর্যন্ত। একটা অস্থিরতা তাকে কোথাও থিতু হ'তে দিচ্ছিল না। পথ তাকে টানছিল। একবার পথে নামলে পথ তাকে টেনে নিয়ে যাবে বনিদের রাস্তায়। অথচ বনিদের বাড়িতে ঢোকার সাহস সে হারিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া কোন্ অজুহাতে যাবে সে? একমাত্র অজুহাত— সেটা অজুহাত নয়ও, একটা তাগিদ রয়েছে তার মধ্যে, সেটাই প্রধান— কিন্তু বনির কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সেদিন কবিতাটা প'ড়ে কাগজটা এমনভাবে ফিরিয়ে দিলো— ভালো-মন্দ একটা কথাও বললো না। পাঠকালীন সময়ে বনির মুখে কোনো বিকারও দেখতে পায়নি আনন্দ। কবিতা কি এতটাই নির্লিপ্তি দিতে পারে? তার মানে কিছুই হয়নি? হয়তো এই 'হয়নি' কথাটা বলতে চায়নি বনি। আবার মিথ্যে 'ভালো' বলাও ঠিক না— এমন বিবেচনায় বনি নীরব ছিল। হ'তে পারে। তাহলে তো হয়ে-ওঠার সম্ভাবনাটুকু সে বলতে পারতো— এমন তো নয়, সে কখনও বলেনি। বলেছিল ব'লেই আনন্দ যেতে চায়। যাওয়ার মধ্যে একটা প্রত্যাশা থাকে। নিজেকে প্রার্থী মনে হয়, একইসঙ্গে দাতাও—

কী আশ্চর্য! এক জোড়া টুনটুনি লেজ উঁচু ক'রে তার সামনে দিয়ে নেচে বেড়ালো প্রাণের আনন্দে— এ-দৃশ্য আনন্দকে মুগ্ধ করেনি। আর সেই পাখিটা— ধবধবে সাদা, কেবল মাথা আর ঝুঁটির রঙ গাঢ় নীল, লেজও সাদা— ঘুড়ির লেজ যেন; এ-পাখিটাকে অনেকদিন পরে দেখা গেল, তবু খুব ভালো ক'রে দেখার জন্য কোনো উদ্যম তৈরি হয়নি। একটা বড়সড় গিরগিটি— তার রঙ বদলানো দেখতে-দেখতে বেশ বিস্মিত হয়েছে আনন্দ। একটা লতার ডগা তার গায়ে জড়ালে একবারও মনে হয়নি লতাটি তাকে আদর করছে, সে কিছু বলতে চায়। আলতোভাবে তাকে সরিয়ে দিয়েছে। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে খল্‌সে-পুঁটির রঙ ছড়ানো দেখেছে— খুব বেশি তন্ময় হ'তে পারেনি। অথচ একদিন, এই সবুজ, ফুলেদের বর্ণগন্ধ, পাখিদের মনোমুগ্ধকর রঙ, ডাক— এইসব ছুঁয়ে ছেনে তার নিজের জীবনের রঙ ফলানোর বাসনা ছিল।

কাল আয়নায় মুখ দেখতে-দেখতে আনন্দর মনে হচ্ছিল, একটা নক্ষত্র নিভে যাচ্ছে কোথাও। আজ তার মনে হলো, প্রকৃতির এত রঙ কেমন যেন ধূসরতায় ছেয়ে যাচ্ছে... আনন্দ দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলো ভুবন আর কুসুমকুমারী। ব'সে আছেন মুখোমুখি। কথা বলছেন।

মা-ভুবনমামা মুখোমুখি ব'সে যখন কথা বলেন— দারুণ একখানা দৃশ্য! দৃশ্যটা আটপৌরে। তবু রঙ বেশ উজ্জ্বল। এই দৃশ্যটাকে তো তেমন ধূসর মনে হলো না! একটু

ওপাশে ছোটপিসি, কী একটা বই পড়ছেন। সদর গার্লস স্কুলের বড় দিদিমণি। চশমাটা নাকের ওপর নেমে এসেছে। কেমন এক আশ্চর্য রঙ খেলা করছে ওই মুখে, যার বিচ্ছুরণে ছোটপিসিকে শান্ত দেখাচ্ছে, স্নেহময়ী; ছোটপিসি এ-তল্লাটে সকলের বড়দিদিমণি— এই তবে দিদিমণির রঙ, ছোটপিসির জীবনের রঙ! ছোটপিসিকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে ইচ্ছে হয়। হয়তো লিখবো কোনোদিন। বিশেষ ক'রে তাঁর বিয়ে-থা না-করার ব্যাপারে যে-গল্পটা প্রচার পেয়েছে— খুব মজার, সেই গল্পটাকে গুছিয়ে লিখতে পারলে দারুণ একটা গল্প হবে।

ভুবনমামার জীবনে কোনো গল্প আছে ব'লে মনে হয় না— তবে দারুণ ক্যারেক্টার, মা'র দূরসম্পর্কের ভাই— কেন-যে বিয়ে-থা করলেন না, সমস্ত জীবনটাই সর্বানন্দ ভবনে কাটিয়ে দেবেন ব'লে যেন পণ করেছেন— ওঁর জীবনে যেন কোথাও কোনো ধূসরতা নেই। মায়ের মুখেও যেন আশ্চর্য এক আলো!

ভুবনমামার মুখেও।

তবে কি মানুষও গিরগিটির মতো রঙ বদলায়? কোথায় থাকে এমন রঙ, আলো?

আনন্দ যেন উত্তর পেলো, হৃদয়ের গভীর কোনো গহ্বরে— পরমযত্নে তাকে তুলে এনে একে-অন্যকে রাঙায়! যেমন রাঙিয়েছিল বনি আমাকে। আমিও কি বনিকে রাঙাইনি?

ছোটপিসি তাঁর হৃদয়ের নিভৃত কুঠরিতে জ্বেলে রাখা সেই দীপ সেই রঙপাত্র— সবই কি নষ্ট ক'রে ফেলেছেন— আর মনোপিসে, তাঁর সেই আলো, রঙ— তার হদিস কি দিয়েছেন আমার মেজপিসিকে? আমার মা কি বাবাকে, বাবারও কি ছিল না অমন আলো আর রঙের গোপন মজুতঘর?

ছোটপিসি বই থেকে চোখ তুললেন। বইটা খোলা অবস্থায় উপুড় ক'রে রেখে বললেন, 'মিলুকে বিয়ে দাও— দায়িত্ব এসে পড়ুক, সব ঠিক হয়ে যাবে।' কথাটায় কোনো রাখঢাক না-থাকায় আনন্দ শুনতে পেলো।

কুসুমকুমারী বললেন, 'বেকার ছেলের হাতে কে মেয়ে দিতে চাইবে বলো তো, ঠাকুরঝি!'

ছোটপিসি চশমার কাচ মুছলেন। তারপর চশমাটা প'রে বললেন, 'সুকুমার তো এলো না এবার পুজোয়—'

—'হ্যাঁ। তোমার দাদা বলছিল, ভুবনকে দিল্লি পাঠাবে।'

—'সেই ভালো।'

আনন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ভাগ্যের পরিহাস আর কাকে বলে! সুকুমার তার সমবয়েসী। সেও ব্রজমোহন স্কুলে পড়েছে। আনন্দ তখন এক ক্লাস ওপরে ছিল। পরে সুকুমার স্কটিশচার্চ আর প্রেসিডেন্সিতে। দারুণ মেধাবি। সেও ইংরাজিতে এম.এ. ফার্স্ট ক্লাস— রেজাল্ট বেরোনোর আগেই সে স্কটিশচার্চ কলেজে ক্লাস নিতে শুরু করেছিল—

তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, বাবু সত্যানন্দ দাস তাঁর সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়া ছেলের জন্য দরবার করতে দূত পাঠাচ্ছেন সেই সুকুমারের কাছে— সুকুমার দত্ত, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তর ভ্রাতুষ্পুত্র— দূত নিশ্চয় অশ্বিনীকুমার দত্তর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিশদ বিবরণ বিবৃত করবেন, তার উপর দাঁড়িয়ে অনুগ্রহ দাবি করবেন। সবকিছুই ঘটবে ব্রহ্মের কৃপায়।

ঘটছে। সুকুমার দত্ত— সফল মানুষ, কৃতী মানুষ। আর আমি— মাথাটাকে ডেভিল্‌স ওয়ার্কশপ বানিয়ে মানুষের হৃদয়ের গভীর গহ্বর আবিষ্কার করতে চাইছি!

একটা কাঁঠালপাতা ঝ'রে পড়তে দেখলো আনন্দ— এই দেখা তাকে অন্য ভাবনায় নিয়ে যেতে চাইলো— কিন্তু তার শীত করছে। হেমন্তের বিকেল দ্রুত ম'রে যাচ্ছে— সেও ম'রে যাচ্ছে, নইলে এত শীত করবে কেন? আনন্দ তুষের চাদরটা টেনে নিলো। বেশ ভালো ক'রে জড়িয়ে বসলো। ভাবনাটা ফিরে এলো আবার। আমি যদি ম'রে যাই, মৃত্যুর খবর শুনে বনি কি আসবে— তার কি ইচ্ছে হবে আমার নিথর বুকের ওপর আছড়ে পড়তে?

কিংবা আমার মুখে যে-ব্যথা তখনও লেগে আছে, তা দেখে হয়তো জীবনের গভীর স্বাদ অনুভব করবে বনি, বলবে, মিলুদাটা কী বোকা! এভাবে কেউ মরে!

তবু তো মরে— যদি মরি, ম'রে যাই— বনি-পর্ব কেউ জানে না, জানবে না কেউ— সবাই ভাববে বেকার, অযোগ্য— তাই; তবু কেউ-না-কেউ বলবে, বেঁচে গেছে!

বনি হয়তো ফেলবে স্বস্তির নিঃশ্বাস।

আনন্দর বুক কেমন যেন দীর্ঘশ্বাস-শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

তবু বেঁচে থেকে ব্যথা পাওয়া ভালো, তা হয়তো-বা অন্য এক চরিতার্থতা দিতে পারে জীবনকে, মনে হয় আনন্দর; যেমন ওই ভুবনমামা সর্বানন্দ ভবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখে চরিতার্থতা বোধ করেন— যেমন ছোটপিসি তাঁর বোন-ভগ্নিপতির সমস্যায় পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন— তবুও তো কোথাও দুঃখ রয়েছে, ব্যথা আছে— ধর্ম, প্রেম, নৈতিকতা যথার্থ অর্থে সর্বানন্দ ভবনকে ঘিরে রেখেছে, এই আবহাওয়ায় কবে একদিন মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় আমার ছোটপিসি স্নেহলতার প্রতি অনুরক্তি অনুভব করেছিলেন এবং সম্ভবত পিসির অনুমতিক্রমে তাঁকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মণে বৈবাহিক সম্পর্ক তো হ'তে পারে না! অতএব...। দৃশ্যটা আনন্দ স্পষ্ট কল্পনা করতে পারে—

স্নেহলতা আপনি অব্রাহ্ম, তাই আমার-আপনার মিলন হ'তে পারে না। এটা আমার কথা নয়। সমাজের কথা।

মনোমোহন: আশ্চর্য! আমি তো সমাজের সঙ্গেই আছি। কাজ করছি। আর তার জন্যেই তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ হয়েছি! আমরা পরস্পরকে ভালোবেসেছি!

স্নেহলতা (নতমুখী, নীরব)

মনোমোহন: সবাই জানে আমি ব্রাহ্ম।

স্নেহলতা কিন্তু যারা আপনাকে স্নান করতে দেখেছে— তারা জানে আপনি ব্রাহ্মণ। পৌত্তলিক।

মনোমোহন: মানে?

স্নেহলতা উপবীত।

তারপর—

স্থান: উপাসনাগৃহ

উপবিষ্ট সকলের মাঝে মনোমোহন চক্রবর্তী উঠে দাঁড়ালেন, 'ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম!' ব'লে তিনি সমবেত সকলকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'আমি আপনাদের সমাজে আছি তবু আমি ব্রাহ্ম নই, কেননা আমার কণ্ঠে উপবীত— লালন শাহের সেই গানটা ক'দিন থেকে মনে পড়ছে খুব, সত্যিই তো উপবীত দেখে আমরা বামুন চিনি— এই চিহ্ন—' উপবীতটাকে টেনে বের করলেন, 'এই আমি চিহ্নমুক্ত হলাম।' হালকা টানে পলকা সুতোগুলো ছিঁড়ে গেল, 'যে-ধর্ম আমাকে দ্বিজত্ব দিয়েছিল, সে-ধর্ম আমি ত্যাগ করলাম।'

তারপর আনুষ্ঠানিক দীক্ষাকর্মের কয়েকদিন পর—

মনোমোহন: এ কী শুনছি স্নেহ?

স্নেহলতা কোন্ বিষয়ে বলছেন?

মনোমোহন: সত্যদা বলছিলেন, তুমি নাকি অমত জানিয়েছো?

স্নেহলতা হ্যাঁ।

মনোমোহন: কিন্তু— তোমার মত জেনেই তো আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম।

স্নেহলতা তখন আপনাকে খুব বড় দরের মানুষ ব'লে মনে হয়েছিল— ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মদের উদ্যোগে দেশহিত, জনহিতকর কাজে নিজেকে যুক্ত করা আপনার বড় হৃদয়ের পরিচয় ব'লে মনে হয়েছিল— নিজের ধর্মকে ত্যাগ না-ক'রেও, সব ধর্মের সঙ্গে নিজেকে যে যুক্ত করা যায়, তার একটা বড় উদাহরণ হয়ে উঠছিলেন আপনি, অন্তত আমার কাছে। এ কী করলেন!

মনোমোহন: (নীরব)

স্নেহলতা (স্বগতোক্তি) সব নষ্ট হয়ে গেল। এটা কিন্তু প্রমাণ ক'রে দিলেন মোহনদা, সমস্ত কন্‌ভার্শনের নেপথ্যে থাকে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা— ভাবতে পারছি না, কেবলমাত্র আমাকে পাওয়ার জন্য, নিজের ধর্মকে ত্যাগ করলেন! এত সহজ! এত সস্তা সব! এই ধর্ম, এই বিবাহ!

ধর্ম-নৈতিকতার কাঁটায় জড়িয়ে মনোমোহন চক্রবর্তীর প্রেম ফেঁসে গিয়েছিল, তাকে কিছুতেই আর রিপু করা যায়নি।

তবু সর্বানন্দ ভবনের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছেন তিনি, আনন্দ অনুমান করতে পারে, একটা ক্ষীণ আশা তাঁর ছিল— হয়তো স্নেহলতার মনের পরিবর্তন হবে। মনের পরিবর্তন মানে হৃদয়ের গভীরে যে দীপ, যে রঙপাত্র— তা থেকে আলো-রঙ ছড়িয়ে পড়া; না— তা আর হয়নি। বরং সেই কুঠরির সমস্ত ফাঁকফোঁক বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন স্নেহলতা— যে-আলোয় আমরা পরস্পর মুখ দেখেছিলাম, সে-আলোয় আমি অন্য কারও মুখ দেখবো না— এমনই কোনো প্রতিজ্ঞা হয়তো লালিত হয়েছে ছোটপিসির মনের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য লাগে, মনোমোহন কীভাবে মেজপিসিকে বিয়ে করলেন!

সেই পর্ব এইভাবে কল্পিত হ'তে পাবে:

—মোহনদা, আপনি বৃথা চেষ্টা করছেন।

—তুমি ভুল বুঝছো স্নেহ, আমি কিছুই চেষ্টা করছি না। না ভুল হলো, চেষ্টা করছি। চেষ্টা করছি তোমার থেকে দূরে থাকার, পারছি না। তুমি ঠিকই বলেছো, বৃথা চেষ্টা।

স্নেহলতার মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠলো।

ওই হাসির মধ্যে খানিকটা প্রশ্রয় খুঁজে পেয়ে মনোমোহন বললেন, ভাবছি এখান থেকে চ'লে যাবো।

—কোথায়?

—কোথাও।

—দাদা কিন্তু আপনার উপর খুব নির্ভর করেন, শুনেছি 'ব্রহ্মবাদী'র সব দায়িত্ব আপনাতে বর্তাবে— তাছাড়া, এখান থেকে চ'লে যাওয়ার কী অর্থ দাঁড়াবে— ভেবে দেখেছেন একবারও?

মনোমোহন একটু বিমূঢ় যেন। মাথা নাড়লেন।

—আমাকে দুষবে সবাই।

মনোমোহন ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারলেন। বললেন, তাহলে আমি কী করবো?

—শুনেছি, ভালোবাসা— হয় কাছে ডাকে, না-হয় দূরে ঠেলে দেয়— আর কি কিছু করণীয় আছে তার?

—আমিও তোমার মতো শুনেছি— আর কিছু আছে কী না, জানি না।

—আচ্ছা, শুনেছি, ভালোবাসলে নাকি অনেক অসাধ্য কাজও অনায়াসে করা যায়?

—তুমি কি আমাকে বিদ্রূপ করছো স্নেহ?

—না। আপনার কাছে আমার একটা চাওয়া আছে— সরাসরি বলতে পারছিলাম না ব'লেই এইসব ভণিতা। শুনুন। কোনো প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির মধ্যে আমি যাচ্ছি না। আমি চাইছি আপনি মেজদিকে বিয়ে ক'রে এই সর্বানন্দ ভবনেই থেকে যান!

এক পলক মাত্র চোখ তুলে চেয়েছিলেন স্নেহলতা। মনোমোহন সেই পলক দৃষ্টিপাতের অন্তর্নিহিত আর্তি কিংবা নিবেদন অনুভব করতে পেরেছিলেন ব'লে আনন্দর অনুমান, নইলে তিনি তার পিসেমশাই হলেন কীভাবে?

এই ভাবনায় আনন্দ অভিভূত— কোথাও একটা অন্তর্লীন প্রেরণা রয়ে গেছে ব'লেই ছিট্‌কে যায়নি কেউ— চাঁদ-সূর্য— এই পৃথিবীর মতো— একই আকাশে, একই আকাশের নিচে, তবু... রক্ত-মাংসের গন্ধ নিয়ে বনি স্বপ্নে আসে, হয়তো আমিও যাই তার স্বপ্নে— একবার বাস্তব যা, তা কি কেবলই স্বপ্নে ফিরে-ফিরে আসে? কিংবা আমিই তাকে আবাহন করি— আমার বুকের মধ্যে এসো/তোমার চুলের মধ্যে আমি তো ডুবিয়ে দিতে চাহ/আমার বিশীর্ণ হাত— আর সে আসে। বোদলেয়রের আত্মা ঢুকে পড়ে আনন্দর চৈতন্যে— পরম চুম্বন আমি এঁকে যাবো তোমার শরীবে/বাঁচার বদলে আজ শুধুই ঘুমোতে চাই আমি/আমার মহান ঘুম স্থায়ী হবে তন্দ্রাময় তীবে/হে বনি, তোমার ঠোঁটে মহান বিস্মৃতি, অন্তর্যামী... আমি নিরুপায়, আমি বাধ্য এক কামনার তাপে—/যেখানে বেদনা বড়, যেখানে পবিত্র কারুকাজ—

আনন্দ চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে ছিল। চোখ মেলে দেখলো, ঘরের ভেতর অন্ধকার জমছে। বাইরে অস্তরোদের মধ্যে মিশে গেছে সন্ধ্যার ছায়া। মশাদের গান শোনা যাচ্ছে। বাইরের সব দৃশ্যই বদলে গেছে কখন।

আনন্দ ঘর থেকে বাইরে এলো। আকাশ বিশাল কত! এমন অস্তরোদের আভায় রাঙানো বনির মুখ মনে পড়লো। তখন তার হৃদয় বিস্তৃত হয়েছিল, আনন্দ বনিকে বললো, আকাশ বিশাল কত! হৃদয় বিস্তৃত হয়ে আছে!/যেই আনমিত হই তোমার নিকটে— কী ঔদার্য/নিয়ে আসো, ও ঈশ্বরী! তোমার রক্তের গন্ধ নাচে/সন্ধ্যাবেলা অস্তরোদ...

আশ্চর্য এক দৃশ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে আনন্দ— যুবতীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে এক যুবক— শরীরে মাধুর্য নিয়ে সেই নারী উষ্ণ এবং উন্মুখ; যুবক বলছে, আমি জানি সেই মন্ত্র— কীভাবে আনতে হয় সুখ। যুবকের তর্জনী যুবতীর গ্রীবা বেয়ে চিবুক, চিবুক থেকে ঠোঁটে... আঙুলের ডগাটা কামড়ে ধরলো... আঃ!

'আঃ!' যেন আনন্দর স্বরতন্ত্রী উগরে দিলো ওই বেদনা— মেয়েটি তবে জেন্ দ্যুভাল...

দৃশ্যে নারী-পুরুষের অবস্থান বদলে দিতেই আনন্দ দেখতে পেলো, বনি তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, বনির কপালে কাজলের ছোট টিপ, বনির কপাল আকাশ হয়ে যাচ্ছে... সমস্ত মুখমণ্ডল— চোখ-দু'টিতে দূর নক্ষত্রের দ্যুতি...

বায়োস্কোপে যেমন একটা দৃশ্যের মধ্য থেকে আর একটা দৃশ্য ফুটে ওঠে তেমনই ফুটে উঠলো বনির ঠোঁট— উষ্ণ-উন্মুখ, দু'চোখের পাতায় কামনার আবেশ— এরকমই রক্ত-মাংসের স্বাদ নিয়ে বনি আসে, স্মৃতি ফুঁড়ে কল্পনায়, স্বপ্নে— বোদলেয়রের ভঙ্গিতে আনন্দ একটা কবিতা লিখে ফেলেছিল রক্ত-মাংস-হাড়ের স্বাদ-গন্ধ ছড়িয়ে— 'একেবারে হাঁউ মাঁউ কাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ!'-এর মতো ঘটনা বটে! আনন্দর মাথাটা হঠাৎ চুলকে উঠলো— একেবারে যথার্থ পাঠ উদ্ধার করেছেন সজনীকান্ত, কিন্তু এই আলোচনাতেও হুইটম্যানকে আনা হয়েছে— আনন্দর মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠলো এবং একইসঙ্গে

একটা দীর্ঘশ্বাস— হোয়াট ইজ বোধ? 'বোধ' নিয়ে বুবুর লেখাটা আমার প্রতি একটা আগ্রহের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ— যতীন্দ্রনাথের গ্রামে সত্যিই কি পরাণপাগল নামে কেউ ছিল? পরাণপাগলের কথাগুলো নাকি সিনসিয়ার, অরিজিনাল রিদমিক— সেসব কথা অন্য কোনো পাগলের মুখে শোনা যায়নি কখনও— সহজ সরল ভাষায় বলা তার কথাগুলো নাকি অনেকের হৃদয়কে সচকিত ক'রে দিতো বিদ্যুৎচমকের মতো—

এসবই তো আধুনিক কবিতার লক্ষণ— তবু পরাণপাগলের কথাগুলো কবিতা নয়, প্রলাপ— প্রলাপ, কেননা, পরাণপাগলের নিজের মনে বলা কথাগুলোর যে অর্থই থাকুক না কেন, যারা শুনতো তারা সুসম্বদ্ধ কোনো অর্থ উদ্ধার করতে পারতো না— বহুবার একা-একা প'ড়েও যতীন্দ্রনাথ বোধ-কে বোধগম্য করাতে পারেননি— এর অর্থ 'বোধ' প্রলাপ— আমি পরাণপাগলের মতো কেউ!

আনন্দ ঘরে ফিরে এলো। পত্র-পত্রিকার স্তূপ থেকে 'উপাসনা' খুঁজে বের করলো। উঠোনে এসে পত্রিকাটা খুললো... যতীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> ...সুরেশবাবু 'বোধ' কথাটিতে আপত্তি তুলতে পারতেন— আমি তুলি না। বরং এই কথাটির দ্বারা আমার চিত্ত কোন গভীর বস্তু উপলব্ধি করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল,— যা কবিচিত্তে স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালোবাসা নয়, সেটি কী, তা জানবার জন্য মন উন্মুখ হইছিল।...

বিদ্যুৎচমকে যেমন পাথুরে অন্ধকার বিদীর্ণ হয়, তেমনই আলোকিত হয়ে উঠলো আনন্দর মুখমণ্ডল, কিন্তু পরক্ষণেই তাকে বিষণ্ণ দেখালো, হতাশ ভঙ্গিতে তার মাথাটা নড়লো মৃদু— এই যে স্বপ্ন-শান্তি-ভালোবাসার বাইরে আরও কিছু আছে— এটা জানানোই কি যথেষ্ট নয়? এটাই তো অন্বেষণের সূচনাবিন্দু— আনন্দ পরের লাইনগুলো পড়তে থাকলো:

> যে 'বোধ' কবির মাথায় ও হৃদয়ে আছে, তা পাঠকের মাথায় ও হৃদয়ে সঞ্চারিত করাই অবশ্য কবির উদ্দেশ্য এবং তাইতেই কবিতাটির সার্থকতা...

যেন যতীন্দ্রনাথ তার সামনে। আনন্দ ব'লে উঠলো, 'না যতীনবাব, তাহলে তো চাপিয়ে দেওয়া হয়!'

কথার পিঠে কোনো কথা উঠে না-আসায়, রচনাটির ওপর চোখ বুলাতে-বুলাতে আনন্দ ভাবলো, সত্যিই কি আমি কী বলতে চেয়েছি, চাই— সম্যক জানি না? তার মানে আমি সিনসিয়ার ছিলাম না!

—'আচ্ছা যতীনবাবু, স্বপ্ন-শান্তি-ভালোবাসা— এসবের ভেতর দিয়েই তো জীবনের রঙ ফ'লে ওঠে?'

যতীন্দ্রনাথের মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আনন্দ, সায় দিলেন তিনি।

—'যদি কারও জীবন থেকে স্বপ্ন-শান্তি-ভালোবাসা একইসঙ্গে ঝ'রে যায়— কী থাকে তারপর জীবনে? জীবনের রঙ তখন কেমন?— এসব প্রশ্নের উত্তর যদি কখনও পান,

কেউ যদি পায়— তখন দেখবেন, সেই রঙ— অনাদরণীয় রঙ থেকে সবাই দূরে স'রে যাচ্ছে, সেই রঙিন মানুষ তখন পরাণপাগলের মতো কেউ হয়ে যেতে পারে, সেই মানুষই ব'লে উঠতে পারে— মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান—'

তার কাঁধে কে যেন হাত রেখেছে। ভুবনমামা। সন্ধ্যার ছায়া মাখা গোধূলির আলোয় ভুবনমামাকে কেমন যেন বিষণ্ণ আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, খেয়াল করেনি আনন্দ। তার কথাগুলো অস্ফুট ছিল না, যদিও অনুচ্চস্বর— তবু কথাগুলো হয়তো শুনে ফেলেছেন ভুবনমামা।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভুবনমামা নিজেকে বদলে ফেললেন, 'কাউকে কিছু বলতে হবে বুঝি— তারই মহড়া দিচ্ছিস?'

আনন্দ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'হ্যাঁ— সেরকমই কিছু— আচ্ছা মামা, জীবনের সব রঙ নিভে গেলে— তবুও তো কিছু আলো থাকে?'

ভুবনমামার মাথা সায়ভঙ্গিতে নড়লো।

—'কী আলো?'

—'করোটি রঙের আলো।'

—'এ কি তোমার অনুমান?'

—'আমি দেখেছি।'

শঙ্খধ্বনি ভেসে আসছে— ভুবনমামার কোনো জন্মের স্মৃতি যেন জেগে উঠতে চাইছে, তেমন মনে হলো আনন্দর, সে ভাবলো সেই স্মৃতির ঝাঁপি খুলে দেবেন ভুবনমামা— তার কাঁধ থেকে স'রে গেছে ভুবনমামার হাত... নিস্তব্ধতার মধ্যে জেগে উঠছে ঝিঁঝি— কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। আনন্দও আর জানতে চাইলো না। জানাবার হ'লে দু'-একটা কথা হয়ে যেতো এতক্ষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও— আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব;
দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;
দেখিব...

কামনার তাপে, বেদনা-অবসাদে, কর্মহীন বেঁচে থাকার গ্লানিতে আনন্দর মুখ কী ভয়ঙ্কর কুৎসিত! আনন্দ টের পাচ্ছিল তার মধ্যে যতটুক সুন্দর ছিল, তা সে সূর্যের ফর্মেই হোক— কী দীপ আকারে, কালো কঠিন আবরণে ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছে— তাকে মুক্ত করতে কে আর আসবে; কবিতা আসছে না— তার মানসিক অবস্থার সাবলীল অনুবাদক আজ বোদলেয়র। কিন্তু গড ইজ ডেড— নীৎশের ঘোষণাটিও চমৎকার, তাতে অন্তত সান্ত্বনা পাওয়া যাচ্ছে— ঈশ্বর মৃত ব'লেই বনি-পর্ব অসমাপ্ত কিংবা ক্লোজ্‌ড চ্যাপ্টার হয়ে গেছে— নেভার বি ওপেণ্ড, মৃত ব'লেই—

বাট, হোয়াট ইজ লাইফ?

স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ।

আমি বর্তমান, বনি স্মৃতি— হোয়াট ইজ ফিউচার?

প্রতি মুহূর্তে ফিউচার বর্তমান হয়ে যাচ্ছে, বর্তমান অতীত— অতীত ফিরে আসছে স্বপ্নে, অনেক সময় যেন জাগরণের মধ্যেই কেমন ইল্যুশন টের পায় আনন্দ— রুক্ষ পাথুরে জমি চারিদিকে, একটিও নদী নেই ধারেকাছে; অথচ সে স্টিমার দেখেছে, শুনেছে জাহাজের ভোঁ— সবুজ তটরেখা। সে আজ পরিযায়ী পাখির মতো এইখানে এসেছে— পাখিদের স্মৃতিতে কি ফেলে আসা দেশের এমন মায়া জেগে ওঠে? স্মৃতির সঙ্গে কি জন্মমহোৎসবে মেতে ওঠা যায়—? এখানে তেমন পাখি নেই। চড়ই-কাক, কিছু পায়রা— বুলবুলি-টুনটুনি, দোয়েল-শ্যামা এমন-কী মাছরাঙা আনন্দর চোখের সামনে নেচে বেড়ায় স্মৃতিতে, স্বপ্নে... এমনই তো হওয়ার কথা অন্তত ওই চড়ই-কাকদের, মানে আনন্দে থাকার কথা— একেই বোধহয় বলে জীবনের পরিহাস— এরা বাস করে আনন্দ পর্বতে, নিরানন্দে... যেমন আমি, আনন্দ— বিষাদের কারবারি, চিরবিষণ্ণ; এমন সিনিক হওয়ার কোনো মানে নেই আনন্দ।

এই নামের মধ্যে কাব্যসুষমা আছে, খেয়াল করেছো— সুপার রিয়ালিজ্‌ম-এর টাচ আছে— একটা টিলা, যার একসময় নাম ছিল কালাপাহাড়। কত আর উঁচু? একটা টিলামাত্র— এটা রিয়েলিটি— সে পর্বত হয়ে গেল; কোন্ মায়ায় হয়ে উঠেছে 'আনন্দ পর্বত'— সুপার রিয়েলিটি?— ভাবো আনন্দ, মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে।

রায় কেদারনাথ ইতিহাস, নাকি রামযশ?

দু'জনই— সমগ্র ইতিহাসের অংশ— কিন্তু স্বতন্ত্র, উজ্জ্বল। সেই সঙ্গে সুকুমারও— ইংরেজি বিভাগের প্রধান, উপাধ্যক্ষ— তাঁর কৃপায় আমি রামযশে ইংরেজি পড়াতে এসেছি! এঁদের জীবনে জেন্ দ্যুভাল কি বনির মতো কেউ আসেনি। আঃ! আনন্দ, আবার বোদলেয়রের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করছো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরং ভাবো, কোথায় বরিশাল আর কোথায় দিল্লির এই আনন্দ পর্বত— রামযশ কলেজ, কীভাবে সংযোগ ঘটলো, নিজের ঠাকুর্দার নামাঙ্কিত কলেজ ব্রজমোহনে শিক্ষকতা না-ক'রে রামযশে এলো কেন সুকুমার দত্ত?

আনন্দর খুব অবাক লাগে— অবাক হয়ে আনন্দ পশ্চিম আকাশের দিকে তাকালো, আনমনে, অস্তরাগের ছটা আঁশ-আঁশ মেঘে— তখনই কেউ পেছন থেকে ডাকলো, 'এই যে কবি!'

একটু চমকে উঠলো আনন্দ। ডাকের মধ্যে হৃদয়ের উত্তাপ আছে ব'লে মনে হলো না, ব্যঙ্গের কাঁটা স্পষ্ট— খোঁচা খেয়েও কয়েক মুহূর্ত একইভাবে থেকে আনন্দ কণ্ঠস্বর চিনতে চাইলো— ফিরে তাকালো; অনুমান ঠিক। প্রভাস। একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরলো, 'বলুন!'

—'না— তেমন কিছু বলার নেই। কেবল দেখার আছে। আপনাকে।'

আনন্দ বিরক্ত। আনন্দ বিস্মিত।

—'আসলে সেদিন, আপনি বোধহয় আমাকে খেয়াল করেননি, দত্ত স্যার আপনাকে পোয়েটসাহেব ব'লে সম্বোধন করলেন, আমি ছিলাম— তারপর আপনার কৃতির কথা জানলাম, আপনি অবশ্য তখন চ'লে এসেছেন। কবিদের সম্পর্কে যা শুনেছি, তার সঙ্গে আপনাকে মেলাতে পারিনি— আজও পারছি না— অথচ আপনি কবি, দেখার জিনিস বটে।'

বিদ্রূপ না প্রশস্তি— ঠিক বুঝতে পারলো না আনন্দ। প্রভাস ঘোষের মুখের দিকে সে তাকিয়ে থাকলো মুহূর্ত-কয়েক। তারপর বললো, 'আপনি তো বরিশালের মানুষ।'

—'ছিলাম।'

—'মানে!'

—'মানে, আর কখনও ফিরবো না।'

আনন্দ ভারী আশ্চর্য হলো। এখানে এসে যতটুক জেনেছে তাতে প্রভাসের স্ত্রী রয়েছে দেশে— একটা কৌতূহল জেগে উঠলেও, তাকে ডুবিয়ে দিয়ে আনন্দ বললো, 'ওঃ। না মানে, আমি বলছিলাম— একসময় তো ছিলেন, যজ্ঞেশ্বর মুদির নাম শুনেছেন?'

প্রভাস স্মৃতি হাতড়ে মাথা নাড়লো।

—'মুকুন্দ দাস?'

—'চারণ কবি?'

—'হুঁ।'

—'তাঁর জন্যে আমরা রীতিমতো গর্বিত।'

—'অথচ দেখুন যজ্ঞেশ্বরকে আপনি চেনেন না।'

—'কী একটা রহস্য আছে মনে হচ্ছে!'

—'না— আপনার দত্ত স্যারের ঠাকুর্দা তাকে ঠিক চিনেছিলেন, যজ্ঞেশ্বর মুদিকে তিনি চারণ কবি ক'রে তুলেছিলেন— আপনার ভাগ্য ভালো, দত্ত স্যার আপনাকে চিনেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন আপনি এমন কেউ হবেন, বরিশালের মানুষ আপনার জন্য গর্ব অনুভব করবে, আপনি বরিশালে ফিরুন আর না-ই ফিরুন— কিছু মনে করবেন না ঘোষবাবু, আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি এসব দেখতে পেলাম।'

প্রভাস ঘোষের বুকটা কি একটু ফুলে উঠলো? প্রভাস বললো, 'জানি না, তবে সত্যি বলতে— ভাগ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলাম, আর ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি, বরিশালে থাকলে কী হতো, কে জানে— সবই দত্ত স্যারের কৃপায়—'

—'আচ্ছা প্রভাসবাবু, আমাদের দত্ত স্যার তো আর ভাগ্যান্বেষণে এখানে আসেননি, তিনি কেন এলেন নিজেদের কলেজ ছেড়ে?'

—'সে এক ইতিহাস—' ব'লে প্রভাস একটা বড় পাথরের চাঁই-এর উপর বসলো, 'বসুন!'

আনন্দও বসলো আর-একটা বোল্ডারের ওপর।

—'আপনি নিশ্চয় জেনেছেন রায় কেদারনাথের পিতার নাম রামযশ।'

আনন্দ মাথা কাত্ ক'রে সায় দিলো।

—'রামযশ কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত কম-বেশি আমরা সবাই জানি।'

আনন্দর মাথা উল্লম্বভাবে মৃদু নড়লো, যদিও সে খুব কম জানে।

—'রায় কেদারনাথের কাজকর্মের অনুপ্রেরণা নাকি গীতা— কর্মযোগ, কর্ম-সন্ন্যাসের মূর্ত প্রতীক তিনি—'

আনন্দ বললো, 'হ্যাঁ— তাঁর এই বিশাল কর্মযজ্ঞ দেখে আর কিছু ভাবনার অবকাশই নেই।'

—'এর কারণ কী জানেন?'

আনন্দ মাথা নাড়লো।

—'আর্যসমাজের সান্নিধ্য।'

কেমন একটা গর্ববোধ প্রকাশ হয়ে পড়লো। আনন্দ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত— এ তথ্য কি প্রভাস ঘোষ জানে? সতর্ক হলো আনন্দ। তার চোখে আগ্রহ।

—'আপনি বোধহয় জানেন, রায় কেদারনাথ বেশ কিছুদিন কোলকাতায় ছিলেন, এম.এ. পড়ার জন্য।'

—'তাই!'

—'হ্যাঁ। তখন আর্যসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে— সনাতন হিন্দুধর্মের অবক্ষয়িত রূপ সম্পর্কে তিনি সচেতন হন এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বুঝতে পারেন— কর্মযোগ একান্তভাবে দরকার— যা-ই হোক, ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা তখনই সম্ভব যখন ভালো শিক্ষক পাওয়া যায়— কোলকাতায় থাকতেই তিনি এটা জেনে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এমন একজনকে খুঁজছিলেন যাঁর টিচিং ক্যাপাসিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নাতীত, একইসঙ্গে প্রশাসনিক দক্ষতা আছে, সকলেই সুকুমার দত্তর নাম বললেন। দত্ত স্যার তখন ঢাকা কলেজে— সেখান থেকে তাঁকে প্রায় জোর ক'রে এখানে নিয়ে আসেন রায় কেদারনাথ।'

আকাশে সন্ধ্যাতারা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সেদিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল আনন্দর। প্রভাস ঘোষেরও বোধহয় আর কিছু বলার ছিল না। কিংবা দম নিতে সেও নীরব। আনন্দ বললো, 'এখানকার অধিকাংশ শিক্ষক আর্যসমাজী, না?'

—'তা বলা যায়।'

—'ভালো— একটা আদর্শ থাকা দরকার।'

প্রভাস কিছু বললো না। কিন্তু তার নীরবতায় সহমত প্রকাশ পেলো— এমনই মনে হলো আনন্দর। প্রভাস বললো, 'আপনার সঙ্গে সন্ধেটা বেশ ভালোই কাটলো। চলি!'

—'আচ্ছা।'

প্রভাস চ'লে যাওয়ার পর কেমন এক হতাশ ভঙ্গিতে আনন্দ মাথা নাড়লো, নিচের ঠোঁট বেরিয়ে পড়লো সেই আলোড়নে। তারপর হঠাৎই তার মনে হলো, জুতোর মধ্যে থাকা আঙুলগুলো, হাতের আঙুল সব কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা কাঁপুনি উঠছে শরীর জুড়ে। আনন্দ দ্রুত তার আস্তানায় ফিরে এলো।

দেখলো আর.ডি. কুলকার্নি কম্বল মুড়ি দিয়ে জড়োসড়ো শুয়ে আছে। কমলেশ কিছু একটা পড়ছে। হ্যারিকেনের কাচে এক টুকরো কাগজের শেড। কমলেশের মুখে হালকা ছায়া। নিশীথের বিছানা খালি। বেরিয়েছে কোথাও। হয়তো দত্তবাড়ি। আনন্দ তক্তপোশে বসলো। তারপর টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে একটা খাতা খুলে কলম হাতে ব'সে থাকলো।

কোথাও কোনো কাব্যবীজ নেই। হায়, কবিতা!

হায়, কত কষ্ট আজ তোমার— কবিতা, দুই চোখে...

বনির চোখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আনন্দ— কারুকাজহীন দুই চোখ, ভাবলেশরহিত, কেমন যেন নিভে যাওয়া— কোটরে রাতের ছায়া, সারামুখে মৌনতা...

এরকমই মুখ সে দিল্লি আসার আগে দেখেছিল।

সেদিন কোনো অভ্যর্থনা ছিল না। কেবল বনির মা বলেছিলেন, 'অনেকদিন পরে এলে!'

—'হ্যাঁ। খুব তাড়াতাড়ি হয়তো আর আসা হবে না।'

—'কেন?'

—'দিল্লি যেতে হচ্ছে— সুকুমারদা ওখানে একটা কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে।'

—'কবে যাচ্ছো?'

—'দু'-একদিনের মধ্যে কোলকাতায় যাবো, তারপর—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঃ! যদি সেই স্বপ্নের মতো, বনি আমার চোখে চোখ রাখতো! যদি বলতো, তোমার দু'চোখে এত ব্যথা কেন? যদি বলতো, আমাদের কষ্ট কবিতা হয়ে উঠবে। হয়তো দু'-একটা কবিতা লেখা হয়ে যেতো এতদিনে। কবিতা না-লিখে, কবে একদিন সারাদিনের টুকরো-টুকরো ঘটনা, চিন্তাসূত্র, স্মৃতি লিখেছে— তাও ইংরেজিতে, অধিকাংশ শব্দসমষ্টি, ক্বচিৎ দু'-একটা বাক্য— ফিরে দেখতে ইচ্ছে হয় না, কেমন যেন ধোঁয়াটে, তব, পাতা উল্টোয়, প্রথম পাতা—

—Summer nights—

—Voice in the night crying—

—Spanish night—

—I flung a flea into the night—

—Love & kiss & everything— but after all she refuses on her health ground, hot waterbag and all that.

দ্রুত বন্ধ ক'রে ফেললো খাতাটা। বুকের মধ্যে একটা কষ্ট পাক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত অনুভবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?

ভোর হ'তেই চড়াই চিড়িক-চিড়িক— কেমন একটা বিরক্তিকর গুঞ্জন, ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। অন্যসময় তার শ্রুতিমাধুর্য অনুভবের বিষয় হ'তে পারে, এ অভিজ্ঞতা আনন্দর আছে। অন্তত দেশের বাড়িতে— দেশের বাড়িতে চড়াই-এর ডাকে তার কখনও ঘুম ভাঙেনি। দেরিতে ওঠা, তার মনে হয়, বিলাসের বিষয়; হয়তো এ কারণে সাতসকালে আনন্দর মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়। তার ওপর আজ নতুন উৎপাত। মাছি। একটা নাছোড় মাছি এসে বসছে নাকে-মুখে। কম্বলটা মাথা অবধি টেনে দিলো। মনটা মাকুর মতো অতীত থেকে ভবিষ্যতে ছুটোছুটি করছে; করছে বটে— বুনন হচ্ছে না, কেটে যাচ্ছে সুতো— স্বপ্নে দেখা নীলবর্ণ মেঘ, মেঘ নয় কুয়াশা মাখা পাহাড়-পর্বত— তার কোল ঘেঁষে কোনো এক বিস্মৃত নগরী— ওই মেঘ তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু ঠিক যে কী রূপ তার, কোথায় তার অবস্থান— মনে করতে পারলো না। মেঘগুলো ভেঙে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত আকাশে। অন্ধকার। ঝড় আর অন্ধকার— আমার যৌবনে শুধু ঝড় আর অন্ধকার— কবিতা প্রাপ্তির আনন্দে ঘুম ভাঙার পরও লাইন মনে আছে দেখে খানিকটা আশ্চর্য হয়েছিল, ফের আওড়াতে গিয়ে বুঝতে পারলো, ওটা ঘুমের মধ্যেই স্মৃতি থেকে উঠে আসা বোদলেয়রের কণ্ঠস্বর, লা এনেমি'র প্রথম ছত্র— কেমন যেন আমরে গেল, কতদিন কবিতা লেখা হয়নি! কেমন একটা দমবন্ধ অবস্থা। কম্বলটা সরিয়ে দিলো। অমনি মাছিটা, যেন তাক করেছিল, এসে বসলো নাকের ডগায়। তাড়ালো। উড়ে গিয়ে ফের এসে বসলো। সেই নাকের ডগায়। আনন্দ উঠে বসলো। দ্য এনিমি— শত্রু নিধনের জন্য সে তার দু'হাত সক্রিয় করলো। কিন্তু অর্জুনের মতো একাগ্রতা তার নেই। সে মাছিও মারতে চায়, ক্লাসের কথাও ভাবতে চাইছে— পড়ানোর বিষয় এবং ক্রমে একটা আতঙ্কের মধ্যে আনন্দ ডুবে যাচ্ছে— তাকে ক্লাসে ঢুকতে দেখে আজও মুখচাপা হাসির আওয়াজ উঠবে, তাকে বিদ্ধ করবে আরও নানা রকমের সুর— ইগ্‌নোর করবো, উপেক্ষা— বনি যেমন, আমার দীর্ঘশ্বাস— দগ্ধ হৃৎপিণ্ডের গন্ধ ছড়ালেও, বনি দমবন্ধ ক'রে থাকে, আমার বিষাদবিধুর চেয়ে থাকাকে তার চোখ সযত্নে এড়িয়ে যেতে পারে— আমিও পারবো— স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করবো। এই চেষ্টাকৃত স্মার্টনেস কি আমাকে আরও হাস্যকর ক'রে তুলবে না?

চেষ্টা করার কী দরকার বাপু? চেষ্টা যদি করো, তার আগে ধুতিপাঞ্জাবি ছাড়ো। ধুতির উপরে কি কেউ কোট পরে? দেখেছো কাউকে?

কিন্তু আমি পরি। পরবো। কার কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ তোমার একগুঁয়েমি। তুমি পড়াও ইংরেজি— ছাত্রদের সামনে তোমার স্টাইল গেট আপটা তো ইংলিশ হওয়া চাই!

কিন্তু আমি বাঙালি— এটা আমার জাতীয় পোষাক।

কোটটা?

হ্যাট-কোট— বোধহয় ইংরেজদের।

তবে ওটা প'রে জোকার সাজো কেন?

শরীরটাকে বেশ গরম রাখে। আমার খুশি।

তোমার খুশি যদি কারও হাস্যরসের উৎস হয় তাতে তো তোমার কষ্ট পাওয়া সাজে না!

মাছিটা এবার কপালে বসেছে— নিজের কপালে চড় কষালো। মাছিটা একটু দূরে গিয়ে বসেছে, বিদ্রূপের হাসি হাসছে। কে একজন জিগ্যেস করলো, 'কী হলো পোয়েট সাহেব?' কমলেশ কিংবা মন্মথ— মন্মথও ইংরেজি পড়ায়, ঢাকার ছেলে, একই দেশের— কোথায় একটু সহযোগিতা করবে, তা না— কথা বলতে ইচ্ছে করে না। আনন্দ সাড়া দিলো না। অথচ আমি বলতে পারতাম, এই দেখুন না— একটা মাছি, খুব জ্বালাচ্ছে।— এই কথার মধ্যে একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়ে যায় এমন একটা কথার, যার মধ্যে সহমর্মিতার স্পর্শ থাকবে— যদি তা না-থাকে, যদি ব'লে বসে, রসে টসটস করছেন বুঝি!

এই আশঙ্কায়— এমনই আশঙ্কায় সহকর্মীদের নানান কথায় সে নীরব থাকে। কখনও কথা ব'লে পরিস্থিতি তার অনুকূলে নিয়ে আসতে চায়, এই সেদিন যেমন, নিশীথ ব্যানার্জি তাকে পোয়েট সাহেব সম্বোধন ক'রে কয়েকটা কথা বলার পর, আনন্দ বলেছিল 'নিশীথদা, আপনি কি আমার কবিতা পড়েছেন— একটাও?'

—'না।'

—'তাহলে আপনি আমাকে এত বড় সম্মান দিচ্ছেন কেন?'

নিশীথ ব্যানার্জি বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে ছিল।

—'তাছাড়া, এখানে আমি তো কবি পরিচয়ে আসিনি— এসেছি শিক্ষক হিসেবে, অন্যদের যেমন ডাকেন, তেমনি ডাকলে খুশি হবো—'

কিন্তু তাতে সমস্যা আরও বেড়েছে। যখন-তখন নিশীথ কবিতা বিষয়ে কথা তোলে— সেদিনকার পর একদিন নিশীথ বললো, 'আপনার কবিতা পড়তে চাই— পড়াবেন!' আনন্দ বলেছিল, 'আচ্ছা।'

দু'দিন পর আবার, 'কই, পড়ালেন না তো?'

—'আমার কাছে কোনো কবিতা নেই এখন।'

—'শুনেছি আপনার বই আছে।'

—'হ্যাঁ। কিন্তু সঙ্গে নেই।'

একটা হতাশ ভঙ্গি ফুটে উঠেছিল নিশীথ ব্যানার্জির চোখেমুখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর একদিন, 'আপনি যখন একা থাকেন— কেমন যেন দার্শনিক মনে হয়। কবিতার সঙ্গে দর্শনের অবশ্য একটা সম্পর্ক আছে— রবীন্দ্রনাথের কবিতা প'ড়ে এটা আমি বুঝেছি।'

আনন্দ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল— প্রভাস ঘোষের দৃষ্টিতে তার চেহারায় কবিসুলভ কোনো দীপ্তি নেই— এই দেখায় কোনো ভুল নেই, এটা মানে আনন্দ-- কিন্তু দার্শনিক দীপ্তি কীরকম? নিশীথ ব্যানার্জি নিজে দর্শনের অধ্যাপক— যিনি দর্শন পড়ান, তাকে কি দার্শনিক হ'তেই হয়? আনন্দ তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল অপলক। তারপর বলেছিল, 'এটাই তো আপনাদের মহত্ব— কত তুচ্ছ জিনিস আপনাদের দৃষ্টির কল্যাণে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে।'

—'সে যা-ই হোক— আমি আপনার কবিতা পড়তে চেয়েছি— পড়াবেন।'

—'নিশ্চয় পড়াবো— দেশে গেলে নিয়ে আসবো, সুকুমারদাকেও দিতে হবে এক কপি।'

—'আচ্ছা, মাঝেমধ্যে খাতা নিয়ে ব'সে থাকতে দেখি— কবিতা লেখেন তো?'

—'চেষ্টা করি।'

—'তাহলে সেই কবিতা পড়ান— একেবারে টাটকা!'

—'যদি লেখা হয় পড়াবো।'

তারপর একদিন কলেজ বিল্ডিঙের প্যাসেজে দেখা হ'তেই নিশীথ ব্যানার্জি ইশারায় তাকে দাঁড় করালো, 'শুনুন, আমি আপনাকে মিস্টার দাশ, কিংবা এ. ডি. ডাকতে পারবো না— সির্ফ কবি ডাকবো।'

সেই থেকে, কখনও কবি, কখনও-বা পোয়েট সাহেব— আর লেখা হলো কিনা, জানতে চাওয়া— বিরক্তিকর, একেবারে মাছির মতো লেগে আছে।

মাছিটা আবারও কপালে এসে বসেছে, যেন নিশীথ— উপেক্ষা ছাড়া কোনো উপায় নেই, কেমন একটা অস্বস্তি— হেঁটে বেড়াচ্ছে মাছিটা, নেমে আসছে নাক-বরাবর— আনন্দর দুটো হাত সমান্তরাল উঠে যাচ্ছে, পরস্পর কাছাকাছি— মাছিটা ব'সে আছে স্থির— সাঁড়াশি আক্রমণ— আহ্! সফলতা! বাঁ করতলে মৃতপ্রায় মাছি— আনন্দ দেখছে... ক'দিন আগে রাতের বেলা এরকম একটা মাছিকে দেখে আনন্দ তার বেদনা অনুভব করতে পারছিল— বেদনায় নীল হয়েছিল মাছিটা, আর এখন ধূসর— মৃত্যুর রঙ— এ রঙ ছড়িয়েছি আমি। নীল থেকে ধূসর— স্বপ্নে দেখা, স্বপ্নে কি রঙ দেখা যায়, হ'তে পারে কল্পনা— কল্পনায় দেখা নীল মেঘ ধূসর হ'তে হ'তে কি কালো হয়ে গেছিল? সেরকমই যেন, মনে হলো আনন্দর। গত পরশু বিকেলটাকে অন্যদিনের তুলনায় বেশ উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল, 'আনন্দ পর্বত' থেকে সূর্যাস্তের বর্ণময় বিভা বেশ উপভোগের জিনিস হবে, তখনও দিগন্তে চাপ-চাপ মেঘ ছিল, তখন অবশ্য পাহাড়-পর্বত মনে হয়নি— গাছপালার সিল্যুট যেন; বরিশালের মাঠের প্রান্তে গাছগাছালির কথা মনে পড়ছিল, স্মৃতি রোমন্থনও

যে কত তৃপ্তিদায়ক— কেমন একটা স্বাদ অনুভব করছিল সে, আর তখনই মন্মথ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল 'আপনি খুব একা থাকতে ভালোবাসেন, না?'

—'না, ঠিক তা নয়—'

—'কিন্তু কার্যকারণে সেরকমই দেখছে সবাই— আপনাকে একটা কথা বলি মিস্টার দাশ!'

—'বলুন!'

—'আপনি নিশ্চয় জানেন রায়সাহেব আর্যসমাজী আদর্শের মানুষ।' মাথা নেড়ে আনন্দ তার জানাটা জানিয়ে দিলে মন্মথ বললো, 'এই শিক্ষাসত্রগুলির আদর্শ গুরুকুল— ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের; অবাধ মেলামেশা, একসঙ্গে কাজ করা— এসব থেকে আপনি দূরে থাকছেন দৃষ্টিকটুভাবে—'

তার বলা-কথার সত্যতা মেনে নিয়ে আনন্দ চুপ ক'রে থাকতে-থাকতে অনুভব করেছিল চারপাশটা কেমন ম্লান হয়ে আসছে, রোদ্দুরের মুখে মেঘ এসে পড়লে যেমন হয়, তেমনই যেন— অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল আনন্দ।

—'শুনেছি আপনি খুব বড় কবি— হুইটম্যানের সঙ্গে আপনাকে তুলনা করা হচ্ছে—'

আনন্দ কুঁকড়ে যাচ্ছিল। কোথাও যেন অশনি সংকেত। সে আরও নীরব।

—'সে আপনি যা-ই হন, এখানে আপনি অধ্যাপক। অ্যাটিচ্যুড, ম্যানার— অধ্যাপকের মতো হওয়া উচিত!'

আনন্দ বিহ্বল।

—'সেদিন সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্ররা যা বললো! কবিতার আলোচনা করতে-করতে আপনি এমন ভাববিহ্বল হয়ে গেলেন— নীরবে জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। বি প্র্যাকটিক্যাল, মিস্টার দাশ!'

আনন্দ একটু হাসলো। অনেকটা নিজের মনে। কিন্তু তার বিভায় মন্মথ কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়লো, 'হাসছেন যে!'

—'নিজের প্রতি এক ধরনের করুণা অনুভব করছি— অবাধ মেলামেশা, একসঙ্গে কাজ করা— এসবই আমি করতে চাই! কিন্তু, কী আশ্চর্য! ভুল ম্যাসেজ পৌঁছে যাচ্ছে সর্বত্র। মিস্টার ঘোষ, কৈফিয়তের মতো শোনাবে হয়তো, কিন্তু কৈফিয়ৎ দিচ্ছি না, আপনাকে জানাতে ইচ্ছে করছে— এই যা। কিছু মনে করবেন না— দু'-তিনটে ক্লাসে একটি কবিতা পড়ানো শেষ করা যেতে পারে, আমিও হয়তো পারতাম, যাকে আপনি বি প্র্যাকটিক্যাল বলছেন, পারিনি— কবিতা পড়ানোর তো একটা উদ্দেশ্য আছে— না কি?'

মন্মথ মাথা নাড়লো।

—'তাহলে, সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতে হ'লে— কবিতা সম্পর্কে ছাত্রদের তো জিজ্ঞাসু ক'রে তুলতে হবে— কবিতা কী,— কী তার কাজ,— কী ক'রে কবিতা গ্রহণ করতে হয়, হবে,— কবিতার ক্লাসে এইসব প্রশ্নের প্রেক্ষাপট আমি তৈরি করতে চাই— কখনও

কোনো বিশেষ কবিতার রচয়িতার সঙ্গে এম্‌প্যাথি অনুভব করতে গিয়ে, লেক্‌চারে দীর্ঘচ্ছেদ পড়ে, নির্বাক চেয়ে থাকি জানালার দিকে— ফ্যাক্ট; ছাত্রদের কাছে আমি হাসির খোরাক হয়ে পড়ি, ইনফ্যাক্ট আমি তাদের কবিতার পৃথিবীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, চাহ,— আমার এই চেষ্টা কি গুরুকুল বিরোধী?'

মন্মথকে একটু অন্যমনস্ক দেখালো, উত্তর না-দেওয়ার একটা ছলনাও হ'তে পারে— এরকম ভেবে আনন্দ বললো, 'সব বিষয়েরই হাতেকলমে শিখবার ব্যবস্থা আছে, কেবল সাহিত্য বিষয়ে নেই— কিন্তু হ'তে পারে— পারে না?'

—'তা পারে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে—'

—'ঠিক। কিন্তু অভিজ্ঞতার আত্মপ্রসাদের ভিতর যে আত্মনাশ ও সকলের সর্বনাশ নিহিত রয়েছে— এটাও কবিতা জানিয়ে দেয়, একমাত্র কবিতাই পারে— মিস্টার ঘোষ, কবিতার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের ব্যবস্থা কি করা যায়?'

—'আচ্ছা মিস্টার দাশ, পি.জি. বলছিলেন— আপনি নাকি বোদলেয়র চর্চা করছেন?'

—'পড়ছি; ঠিক চর্চা বলা যায় না— একটু বুঝতে চাইছি—' একটু আবেগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল আনন্দ, বলেছিল, 'কী আশ্চর্য! যাঁর শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে তাঁর দু'জন বন্ধু ছাড়া আর কেউ তাঁর সম্পর্কে বলার জন্য আসেননি— সেই উপেক্ষিত, অস্বীকৃত মানুষটি সিম্বলিজ্‌ম-এর পুরোহিত হয়ে উঠলেন কীভাবে! ভারী আশ্চর্যের জিনিস— এইখানেই কবিতার শক্তি—' কী এক মুগ্ধতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আনন্দর মুখ, চোখের দীপ্তি।

—'বলছিলেন না— কবির সঙ্গে এম্‌প্যাথিটিক হয়ে ওঠার কথা— তা বোদলেয়রের সঙ্গে কীভাবে এম্‌প্যাথি অনুভব করবেন আপনি?'

—'জানি না— তাৎক্ষণিকভাবে বলা যায় না।'

—'বোদলেয়রের কবিতা কেমন লাগে আপনার?'

—'ভালো। জীবনের স্বর্গ ও আঘাটা— সবেরই ভয়ঙ্কর স্বাভাবিক ও স্বাভাবিক ভীষণতার স্বরূপ আমাদের কাছে তুলে ধরে।'

মন্মথ তাৎক্ষণিকভাবে কোনো কথা বলেনি। কেবল আনন্দর মুখের দিকে বার-কয়েক চোরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। এবং শেষবারে, চোখে চোখ প'ড়ে যেতে সে বলেছিল, 'রামযশ ফাউণ্ডেশনে আর্যসমাজের অনুপ্রেরণা রয়েছে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন— গুরুকুল আদর্শ নৈতিক উৎকর্ষের উপর খুব জোর দেয়— সেখানে বোদলেয়র-চর্চা কিন্তু...' বাকি কথাটা মাথা নেড়ে জানিয়েছিল মন্মথ। আর তখনই দিগন্তের মেঘগুলো কেমন যেন মধ্য আকাশের দিকে উঠে আসছে— মনে হয়েছিল। এতক্ষণে স্বপ্নটার একটা মানে খুঁজে পেলো আনন্দ—

মাছিটার এখনও প্রাণ আছে, ফুঁ দিয়ে মাছিটাকে সে বাঁচানোর চেষ্টা করলো, বাঁচবে না— কিন্তু বেঁচে থাকবে এখনও অনেকক্ষণ— মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে যন্ত্রণার মধ্যে রাখার কোনো মানে হয় না— আনন্দ তাকে মুক্তি দিলো।

ছলাময় আকাশের নীচে
লক্ষ প্রেতবধূদের পিছে
ছুটিয়া চলিছে তব প্রেম-পিপাসার
অগ্নি অভিসার!

কেমন একটা ক্লান্তি, অবসাদ— সেইসঙ্গে উষ্ণতার অভাব, ঘর থেকে বের হ'তে ইচ্ছে করছিল না আনন্দর, চাদর জড়িয়ে জবুথবু ব'সে ছিল। সবাই যে যার কাজে বেরিয়েছে— আড্ডায়, সান্ধ্য ভ্রমণে, তেল মারতে দত্তবাড়ি, টেনিস খেলতে। এসবের কোনোটাতেই আনন্দ সড়গড় হ'তে পারেনি। ইচ্ছেও করে না। তবু সৌজন্যবোধে দত্তবাড়িতে যেতে হয়েছে বার-কয়েক। সুকুমার তাকে 'পোয়েট সাহেব' সম্বোধন করেছে ঠিকই কিন্তু ব্যঙ্গ -বিদ্রূপ মনে হয়নি। সুকুমার নিজেও সাহিত্যসাধক— এরকম একটা আভাস সাবিত্রী বৌদির কথায় আনন্দ পেয়েছে। সুকুমারও তার কবিতা শুনতে চেয়েছে— এক কপি বই যদি সঙ্গে আনতাম— একটা কবিতা লিখতে পারলেও যাওয়া যেতো— সাবিত্রী বৌদির মুখটা এক ঝলক মনে পড়লো। এক-একটা মুখ এমন— ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকা যায়, এক-একটা মানুষ দেখে মনে হয়, এর ওপর ভরসা করা যায়—

—'কী আনন্দ!' সুধীরের কণ্ঠস্বর।

—'এসো, এসো— তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

—'আমার কথা! হঠাৎ?'

—'আসলে তুমি ভাবাচ্ছিলে।'

—'কী?'

আনন্দ হঠাৎ আনমনা। যেন কোথায় চ'লে গেছে সে— সেখান থেকে ফিরে এসে বললো, 'তোমার মনে আছে সুধীর?— রোহিলা স্টেশনে আমি ট্রেন থেকে নেমেছি, কারও আসার কথা ছিল না। তবু আমি কাউকে যেন খুঁজছিলাম— হঠাৎ তোমার চোখে চোখ পড়লো আমার— তুমি এগিয়ে এলে, তুমি জানতে চাইলে, আনন্দ না? আমি বিস্ময়ের ঘোরে অস্ফুট বললাম, হ্যাঁ। তুমি ততক্ষণে আমার হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে নিয়েছো। বললে, আমি সুধীর, সুকুমারদা আমাকে পাঠিয়েছেন। মনে আছে?'

—'তুমি এমন বলছো যেন কতকাল আগের কথা।'

—'সেদিন, জানো তো, তোমাকে দেখেহ, কেমন যেন একটা ভরসা— কীরকম জানো— পাখির নীড়ের আশ্রয় আর নিশ্চয়তা যেমন, দেখেছিলাম—'

—'দ্যাখো আনন্দ, একথাটা যদি তুমি কোনো মেয়েকে শোনাতে, সে কৃতার্থ হয়ে যেতো— আমার কেমন লজ্জা করছে।'

—'আমি একটুও বানিয়ে বলছি না, সুধীর, তুমি—'

সুধীর তাকে নিরস্ত করলো, 'ঢের হয়েছে। এবার ওঠো!'

—'কেন?'

—'চলো বেড়িয়ে আসি!'

—'বড্ড ঠাণ্ডা।'

—'দেখলে?'

—'কী?'

—'প্রমাণ হয়ে গেল— তুমি এতক্ষণ যা বলেছো সব বানানো।'

—'কীভাবে?'

—'এই যে— ঠাণ্ডার ভয়ে তুমি বেরুতে চাইছো না— অথচ জলজ্যান্ত নীড়— নীড়ের উষ্ণতা তোমাকে ডাকছে!'

এর আগে একদিন সুকুমার দত্তর বাড়ি থেকে ফেরার সময় আনন্দ এভাবে সুধীরের সঙ্গে হেঁটেছিল পাশাপাশি। দু'-একটা কথায় সে জেনেছিল, সুধীরকে প্রায়ই দিল্লি আসতে হয়। সে 'বাণীপীঠ'-এর শিক্ষক। তার মনে হয়, শিক্ষকতায় সে ফাঁকি দিচ্ছে। কিন্তু তার স্কুলের প্রধানশিক্ষক, রসরঞ্জন সেরকম মনে করেন না। তিনি কেবল সুধীরের ঊর্ধ্বতনই নন, তার স্ত্রীর পিতৃদেবও। রসরঞ্জন সম্পর্কে আনন্দ জানে। তিনি তার ছোট মেসোমশাই। সত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর খুবই বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আদর্শনিষ্ঠ ব্রাহ্ম। হয়তো এ-কারণে আনন্দর মনে সুধীরের শিক্ষকতা বিষয়ে কোনো কৌতূহল জাগেনি।

আর একদিন এই আনন্দ পর্বতের চূড়ার দিকে উঠেছিল দু'জন। ব্যক্তিগত কয়েকটা কথা হয়েছিল সেদিন।

—'জানো আনন্দ, মাঝেমধ্যে মনে হয়— আদর্শের অজুহাতে কোনো কোনো মানুষ কেবল পালিয়ে বাঁচে।'

—'এরকম মনে হওয়ার কারণ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুধীর বলেছিল, 'এই যেমন আমি— ঘরে রুগ্ন স্ত্রী, তাকে ফেলে— এবার যখন আসি, কী করুণ চোখে, ব্যথাভরা হতাশ দৃষ্টিতে পারুল চেয়েছিল—'

—'কী অসুখ পারুলের?'

—'ঘুসঘুসে জ্বর, খুসখুসে কাশি— খিদে নেই। দিন দিন মাংসমেদ ঝ'রে যাচ্ছে সব— বীভৎস!'

—'ডাক্তার কবিরাজ?'

—'চলছে। কিন্তু মেয়েটার মধ্যে বেঁচে ওঠার যেন কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। কোনো জোর নেই। কিন্তু ওই চোখের চাহনি— কী তীব্র জোরালো! রাগ-বিদ্বেষ নয়, অনুযোগ-অভিযোগ নয়— এসবের বাইরে কিছু একটা—'

আনন্দ সুধীরের মুখের দিকে তাকিয়েছিল— যে-মুখের শ্রীছাদ প্রথম দর্শনে আনন্দর মনে ভরসা জাগিয়েছিল, তাতে তখন একটু বেদনার ছায়া গাঢ় হয়ে দেখা দিয়েছে, 'কোথায় যেন নিজেকে খুন করার আয়োজন।'

নীরবে বেশ খানিকটা পথ হাঁটবার পর সুধীর বললো, 'কী ভাবছো আনন্দ?'

—'তেমন কিছু না। আচ্ছা সুধীর, সেই যে আমাকে স্টেশন থেকে নিয়ে এলে— তারপর তোমাকে বেশ কয়েকদিন দেখিনি— জিগ্যেস করবো ভেবেছি,— এতদিন পর জিগ্যেস করার কোনো মানেও নেই— তব, তুমি বলেছিলে প্রায়ই দিল্লি আসতে হয়, তো তুমি কি সেবার ফিরে গিয়েছিলে?'

—'না। লাহোরে গিয়েছিলাম।'

আনন্দ ভ্রু কুঁচকালো।

—'কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষেই তো সেবার আমার দিল্লিতে আসা—' সুধীর জিভ কাটলো।

—'কী হলো?'

—'ব'লে ফেললাম। মানে তুমি জেনে গেলে আমি রাজনীতির লোক।'

—'পরাধীনতার গ্লানিবোধ যার আছে, সে কি রাজনীতির বাইরে থাকতে পারে ব'লে তুমি মনে করো? কিন্তু আমার একটা সংশয় আছে— আমার এখনও কেন যেন মনে হয় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য না-হ'লে আমরা কখনোই স্বাধীন হ'তে পারবো না— চিত্তরঞ্জনের আদর্শটাকে কেউ গ্রহণ করলো না! কংগ্রেস রাজনীতির মধ্যে হিন্দু-হিন্দু গন্ধ, মুসলিম লিগ তো ঘোষিতভাবে ইসলামিক— ইংরেজদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক নিশ্চয়ই এক হবে না!'

—'তুমি ঠিকই বলছো আনন্দ, তবে লাহোর কংগ্রেস এবার এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে— ডোমিনিয়ান স্টেটাসের দাবি সম্পূর্ণভাবে খারিজ করা হয়েছে, গৃহীত হয়েছে পূর্ণস্বরাজের দাবি।' ব'লে থমকে দাঁড়ালো সুধীর। তাকে উত্তেজিত এবং স্মৃতিতাড়িত মনে হলো আনন্দর। তারও মনে পড়লো কোলকাতায় প্রথম রাজনৈতিক মিছিল দেখার অভিজ্ঞতা, মিছিলের আওয়াজ স্পষ্ট কথা হয়ে উঠছিল, তার মধ্যেই ছিল ডোমিনিয়ান স্টেটাসের দাবি— বছর-দশেক আগের সেই দাবি আজও পূরণ হয়নি, বাতিল হলো! সুধীর বললো, 'জানি না আর কখনও লাহোরে যাবো কি-না; কিন্তু এ জন্মে, সত্যিই এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমিও ছিলাম, এ ভাবনায় আমি রোমাঞ্চিত হবো বার বার— উনত্রিশে ডিসেম্বর, কনকনে ঠাণ্ডা— মধ্যরাত্রি, রাভির তীরে উত্তোলিত হচ্ছে ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা— শীতল নৈশ নিস্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে, সমবেত উচ্চারণে— বন্দেমাতরম।' সুধীর যেন সেই ক্ষণে পৌঁছে গেছে। এক আশ্চর্য বিহ্বলতায় সে এমনভাবে নিশ্চল যেন দূরাগত কোনো শব্দকে সে ধরতে চাইছে। আনন্দর মনে হলো, সেই সমবেত কণ্ঠস্বরের মধ্য

থেকে সুধীর তার নিজের কণ্ঠস্বরকে আলাদা ক'রে চিনতে চাইছে। কতক্ষণ পর সে বললো, 'এই প্রথম, সাম্রাজ্যবাদকেই ভারতীয় জনগণের প্রধান শত্রুরূপে ঘোষণা করা হলো।'

—'তার মানে কমিউনিস্টদের কাছাকাছি এলো কংগ্রেস?'

—'হ্যাঁ। এর প্রস্তুতি অবশ্য শুরু হয়েছিল বছর-দুই আগে— আমাদের সুভাষচন্দ্র আর জহরলাল বিভিন্ন ভাষণে আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু করছিলেন সাম্রাজ্যবাদ-ধনতন্ত্র-সামন্ততন্ত্রকে, আর ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন সমাজতন্ত্রের আদর্শ—'

—'এখন যদি লাজপৎ রাই থাকতেন!'

—'মানে?'

—'তাঁর নেতৃত্বে কিষাণ মুভমেন্টের কথা শুনেছি— লাজপতের চেহারাটা খেয়াল করেছো সুধীর— একেবারে রাশিয়ানদের মতো, রাজনৈতিক অবস্থানেও তিনি খানিকটা বলশেভিক।'

—'তুমি দেখছি অনেক খবরই রাখো!' ব'লে আবার হাঁটতে শুরু করলো।

—'খবরের কাগজ পড়ি যে, স্টেট্সম্যান— তার বেশি কিছু নয়। তবে মাঝেমধ্যে, কোনো-কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে, কীরকম একটা ক্রোধ জন্মায়— যেমন ধরো যতীন দাসের মৃত্যু— তেষট্টি দিন একটা মানুষ না-খেয়ে ম'রে গেল— সুসভ্য জাতি ব'লে নিজেদেরকে দাবি করে বৃটিশরা— এতটা নৃশংস হ'তে পারে রাজশক্তি— আমার তো মনে হয়, লাজপৎ রাইকে ওরা হত্যা করেছে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল আনন্দ। তারপর একসময় বললো, 'আমার আরও অবাক লাগে সুধীর, এদেশের যেসব ছেলেরা পুলিশে, সৈন্যবাহিনীতে— তারা নিজেদেরকে পরাধীন মনে করে না!'

—'দ্যাখো আনন্দ— জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম— এই কথাগুলোর মধ্যে তুমি কিন্তু সব মানুষকে পাবে না, তাহলে দেশ কখনও পরাধীন হতো না!' আবারও থমকে দাঁড়ালো সুধীর। অন্ধকারে ফুটে থাকা বিন্দু-বিন্দু আলোর দিকে তাকিয়ে থেকে সুধীর বললো, 'এই শহরটা দু'হাজার বছরের পুরনো— পুরনোর পাশে গ'ড়ে উঠেছে নতুন— বার বার, দেশি-বিদেশি শাসকদের স্মৃতি কিছু জেগে আছে, কিছু লুপ্তপ্রায়— এটা নতুন দিল্লির মধ্যে, আর ওই যে মিনার, মসজিদ, গম্বুজ— দুর্গ, পরিখা প্রাচীর ঘেরা— পুরনো দিল্লি— শাজাহানের দিল্লি—' একটু চুপ থেকে বললো, 'কী একটা বলতে চেয়েছিলাম, চ'লে এলাম শাজাহানে—' সুধীর আনন্দর কাঁধে হাত রেখে আস্তে-আস্তে হাঁটতে শুরু করলো। একসময় বললো, 'দিল্লি থেকে প্রথম ফেরার পর পারুল একদিন হঠাৎ জিগ্যেস করেছিল, তাজমহল দেখেছো? আমি বলেছিলাম, না। শুনে আমার মুখের দিকে এমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, তাকে এককথায় বিস্ময় বলা যেতো— কিন্তু তা নয়, কিছুটা যেন অবিশ্বাস— এরকম একটা ভাব। তারপর সমস্ত মুখখানা নিভে গেল। তারপর,

অনেকক্ষণ পর, বলেছিল, যদি দেখতে— তাজমহলের গল্পটা অন্তত শুনতে পেতাম! তারপর থেকে, দিল্লি থেকে ফিরলেই পারুল জানতে চায়, তাজমহল দেখেছি কিনা।'

—'তা তুমি দেখোনি কেন?'

—'ইচ্ছে করেনি।'

—'সে কী!'

—'হ্যাঁ আনন্দ।'

—'কেন?'

সুধীর কোনো উত্তর দিলো না।

আনন্দ বললো, 'এবার দেখে যাও!'

—'না। সময় হবে না। ছাব্বিশে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস— ফিরতে হবে দু'-একের মধ্যে।'

—'তব, প্রেমের অপূর্ব কীর্তি— একবিন্দু নয়নের জল/কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল/এ তাজমহল— রবীন্দ্রনাথ এভাবেই তার মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন—'

—'প্রেম! ব্যাপারটা যে কী— নারীদের প্রতি টানকে যদি প্রেম বলো, তাও খানিকটা হয়তো বুঝতে পারি। কিন্তু আমার জীবনে সেটাও অধরা থেকে গেল!' তারপর কী মনে ক'রে বললো, 'চলো, তোমাকে একটা জায়গা দেখাবো।'

অন্যমনস্ক আনন্দ সুধীরকে অনুসরণ করতে থাকলো। বনির কথা মনে পড়লো। সমস্ত শরীর শিহরিত— বনি কেবল স্মৃতিমাত্র, সত্তায় আসার কোনো সম্ভাবনা সে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ স্বপ্নে সে ঢুকে পড়ছে অবাধ। সে-স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সমস্ত শরীরে প্রাণবীজের কোলাহল, তাকে মুক্ত ক'রে দিতে হচ্ছে— মাঝেমধ্যে, তারপর একটা মানসিক অবসাদের মধ্যে ডুবে যেতে হয়— কখনও-কখনও একপিঠ ব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙে। গায়ে ঠুঁসো মেরে সুধীর কী যেন ইশারা করলো। ইশারামতো আনন্দ অনেকগুলো মেয়েকে দেখলো। উগ্র সাজপোষাক। সুধীর বললো, 'এইসব মেয়েদের কেউ-কেউ আমাকে খুব টানে—'

—'এরা কারা?'

কেউ একজন 'নমস্তে' জানানোয়, প্রতি-নমস্কার জানিয়ে সুধীর বললো, 'ন্যাকা, যেন কিছুই জানো না!'

—'না, সত্যি সুধীর, আমি কিছুই জানি না।'

—'ব্রথেল।'

এরকম কোথাও কি বোদলেয়র গিয়েছিল— ভ্যানগখ যেতেন? এরা কোন্ সমাজের— ব্রাহ্ম, আর্য, সনাতন— মুসলিম? এরা কি পরাধীন? এখানেও কি স্বাধীনতার পতাকা উড়বে ছাব্বিশ তারিখে? একটি মেয়ের চোখ আনন্দকে টানলো। অবিকল যেন বনির

চোখ। মেয়েটি হাসলো। হাসির মধ্যে কামনা জাগানোর ছলনা আছে— তবু মনে হলো সুন্দর। আর একটি মেয়েকে দেখে মনে হলো, মেয়েটি যেন স্টেট্‌সম্যানের পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসেছে।

—'কী হলো?'

—'চলো ফেরা যাক।'

বড় রাস্তায় উঠে চারপাশটা একবার ভালো ক'রে দেখে নিলো আনন্দ। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে একসময় বললো, 'মানুষের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যটা যে কী— আমি ঠিক বুঝতে পারি না—'

—'আমি জানি। খুব স্থূলভাবে বললে, রক্ত-মাংসকে সুখী করা— পারুলকে দেখে জেনেছি এটা—'

—'পারুলকে তুমি খুব ভালোবাসো, না?'

—'কী জানি।' ব'লে একেবারে নীরব হয়ে গেল সুধীর। আনন্দ আকাশের দিকে তাকালো একবার, নক্ষত্রভরা আকাশ দেখতে-দেখতে তবু আনন্দর মনে হলো, মানুষের বেঁচে থাকায় কোথাও মহৎ উদ্দেশ্যের ইশারা আছে!

AMARBOI.COM

চাঁদ তার আকাঙ্ক্ষার স্থল খুঁজে দেয়—
আমার নিকট থেকে তোমারে নিয়েছে কেটে যদিও সময়।

শিক্ষক আবাসন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কেবল আনন্দর চোখে ঘুম নেই। এক-একটা দৃশ্য কী অদ্ভুতভাবে আটকে যায় স্মৃতিফ্রেমে— ব্রথেলের মেয়েগুলোর মুখ, কী স্পষ্ট! বনির মুখ বা চোখের সাদৃশ্য নিয়ে কামনা জাগানো হাসিটা বার বার ফিরে আসছে আর জেগে উঠছে বনির রক্ত-মাংসের ঘ্রাণ, তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের স্পর্শ, এমন-কী চুলের গন্ধ— ছড়িয়ে পড়ছে রক্তপ্রবাহে— মুঠিমধ্যে শিশ্নের স্ফীতি, ঝাঁপির অন্ধকারে গোখরোর ফোঁস যেন— স্মৃতি-স্বপ্ন-কল্পনার অদ্ভুত মিশ্রণে ব্রথেলের সেই মেয়ে আর বনি— আশর্চ্য কোলাজ— মায়াবী কোলাজ হয়ে তাঁর শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে— তীব্র আশ্লেষে তাকে বুকে টানতে গিয়ে আনন্দ লক্ষ করলো অদূরে দাঁড়িয়ে আর একটি মেয়ে, ওই মেয়েটির নাম লাবণ্যপ্রভা। লাবণ্যপপ্রভা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কয়েকদিন আগের ডাকে মেয়েটি এসেছে। সেই সুদূর বরিশাল থেকে। ওই মেয়েটি তার বউ হ'তে পারে। আনন্দর পিতামাতার ইচ্ছা তেমনই। কিন্তু এই মুহূর্তে আশ্লেষমুক্ত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়— তীব্র সুখানুভূতিতে আনন্দর আঁখিপল্লব ঢেকে ফেললো তার দৃষ্টি...

অবসাদের মধ্যেও আনন্দর মনে পড়লো মহাকবি ব্যাসদেবের উপাখ্যান— এক অপ্সরাকে দেখে ব্যাসদেব কামার্ত হয়ে পড়েন। এবং অরণিমন্থনে তাঁর কাম নিবৃত্ত হয়। স্খলিত প্রাণবীজ অরণিমধ্যে আলোড়িত হ'তে-হ'তে শরীরধারণ করে... আনন্দর হস্তমধ্যে মথিত প্রাণবীজ যেন এখনই শরীরধারণ ক'রে প্রসব করবে এক আলোকিত শিশু— এমনই এক সম্ভাবনার মধ্যে থেকেও আনন্দ তীব্র অবসাদের মধ্যে ডুবে যেতে থাকলো, কোথাও বনি নেহ, এমন-কী সেই মেয়েটিও। সামনে অন্ধকার— ওইখানে দাঁড়িয়েছিল লাবণ্যপ্রভা।

অবসাদ তাকে এক গ্লানির মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল— যেন তার থেকে মুক্তি পেতে বিছানা ছাড়লো সে। বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। দ্রুত হাত ধুয়ে, ঠাণ্ডা জলের একটা স্পর্শ চোখে মুখে দিয়ে ফিরে এলো বিছানায়। কিন্তু ঘুম আসছে না।

—আনন্দ, তুমি কি রূপমুগ্ধ?

—হ্যাঁ।

—কার রূপে?

—বনি।

—কিংবা ব্রথেলের মেয়েটি?

—হয়তো।

—তার মানে তুমি নারীর বাইরের রূপ— দেখনাইকে ভালোবাসো?

—না, ঠিক তা নয়— এমন একটা চৈতন্যকে ভালোবাসতে চেয়েছি আমি— এই বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি যার মুগ্ধতা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—যেমন মনিয়ার ছিল?

—হ্যাঁ।

—বনির কি তা আছে ব'লে তুমি মনে করো?

—যে কবিতা বোঝে, অনুভব করতে পারে— বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি তার তো মুগ্ধতা থাকার কথা, এ আমি মানি।

—যে-কবিতা নিয়ে বুদ্ধদেবের এত উচ্ছ্বাস— সে-কবিতার পাণ্ডুলিপি প'ড়ে অত নিরাসক্ত, আবেগশূন্য হয়ে পড়েছিল কেন বনি?

—জানি না।

—অথচ সে তোমাকে রূপকথার রাজকুমার ভেবেছিল!

—হ্যাঁ, আমি নাকি তার ঘুম ভাঙিয়েছিলাম! কিন্তু কী এমন ঘটলো!

—কিছু তো একটা ঘটেছেই—

—অথচ আমি জানি না!

—তবু তা তোমার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে দিয়েছে—

—আমার স্বরূপ— বনির কাছে তো অপ্রকাশিত থাকার কথা নয়! আমার স্বরূপ জেনেই তো সে আমার কাছে এসেছিল...

টুকরো-টুকরো দৃশ্য ভেসে উঠছে— যেন বরিশালের নদী, রাস্তাঘাট, মাঠপ্রান্তর— সব উঠে এসেছে আনন্দ পর্বতে— ওই ঝাউবীথি ধ'রে হেঁটে যাচ্ছে বনি-আনন্দ... ওই যে মাঠ, কাশবন— সবুজ ঢেউ, হলুদ শাড়িতে চোরকাঁটা বিঁধেছে খুব, আঁচল উড়ছে... ওই যে মেঠো চাঁদ তাদের মুখ দেখছে... জেটিঘাট...

—তবু, উপেক্ষার বর্ণমালা ফুটে উঠেছে ওই চোখে— তুমি কি পড়োনি?

—তবু, ভুলপাঠ ভেবে তার কাছে গেছি কতবার!

—তার চোখে চোখ রাখতে চেয়েছো, চেয়েছো— বনি আগের মতো চোখ রাখুক তোমার চোখে আর তুমি স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেছ, আশ্চর্য আলোমাখা সেই চোখ— দেখতে-দেখতে স্মৃতি আর বাস্তবের সীমারেখা পেরিয়ে তুমি দেখেছো বনি তির্যক চেয়ে আছে, দৃশ্য শূন্যতায়।

—উপেক্ষা ভেবেছি, তবু অত সুন্দর চোখ যার— ঠাণ্ডা নিরক্ত ভাবতে ইচ্ছে হয়নি।

—আনন্দ, প্রকৃতিকে দেখার চোখ তোমার আছে। তুমি কি দ্যাখোনি, সুন্দরের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা রয়েছে? বনি খুব ভালো মেয়ে— কবিতা বোঝে ব'লেই হয়তো শিল্পের ভাষায় তোমার সঙ্গে কথা বলেছে, নইলে বলতো, আপনাকে আমার পছন্দ নয়, না-আসলেই আমি খুশি হবো।

হঠাৎ আনন্দর মনে পড়লো, একদিন বিরক্তিভরে বনি বলেছিল, 'কথা বলছেন না কেন?' সম্বোধন বদলে যাওয়াটা সে খেয়াল করেনি এমন নয়, তবু তা বুঝতে না-দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ বলেছিল, 'ভাবছি— আসলে বনি, আমি কখনোই ভালো ক'রে কথা চালিয়ে যেতে পারিনি— ভাবছিলাম, তবু তোমার সঙ্গে তো অনেক কথা হয়েছে— এখন কোনো কথা নেই কেন?'

—তখন যদি তুমি সাদা চোখে বনির বডিল্যাঙ্গুয়েজ পড়তে পারতে, দেখতে, বনি বলছে— কথা নেই যখন ব'সে থাকার মানে কী?

তব, বনি স্বপ্ন।

বার বার মন চ'লে যায় বনির কাছে, স্মৃতিতে— বনি স্বপ্নে আসে, কল্পনায় মূর্ত হয়ে ওঠে রক্ত-মাংসের স্বাদ দিয়ে, সাধ নিয়ে। কোথায় যেন একটা আশা আছে। আনন্দর মনে হয়— উপেক্ষা নয়, উচ্ছ্বাসটা কমেছে মাত্র— শান্ত-নিস্তরঙ্গ নদীর মতো, হয়তো খানিকটা হিসেবিও হয়েছে। হয়তো সম্পর্কটাকে বাঁচিয়ে রাখার কৌশল— এই দূরত্ব রচনা, চিঠিপত্র না-লেখা।

প্রভাস ঘোষ খুব চিঠি লেখে তার বউকে— কেমন যেন বায়বীয় প্রেম— পারুল বৌদি গল্প শুনতে চায়— তাজমহলের গল্প— কেবল প্রেমপ্রসঙ্গ এড়াতে চায় ব'লে সুধীর তাজমহল দ্যাখেনি— এবারও দেখবে না, তবু সম্পর্ক বেঁচে আছে— প্রাণচঞ্চল মানুষটা যখন পারুল বৌদির মুখোমুখি বসে কিংবা পাশে— কীরকম দেখায় তাকে? সুধীর— একটা দারুণ ক্যারেকটার! আনন্দ হ্যারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে তার লিটারারি নোট রাখার খাতাটা টেনে নিলো; লিখলো, Sud: a frisky man— তারপর একটা ড্যাস টেনে লিখতে থাকলো— What By might be doing: her letters' mystery of it all— Her coolness or lovelessness: torment incarnated— And still

—কত সহজে ভেঙে গেল!

—গ'ড়ে ওঠাটাও তো সহজ ছিল।

খাতাটার মধ্যে লাবণ্যপ্রভার ছবিটা ছিল। সেটা বের ক'রে দেখতে থাকলো। ছবিটা এমনভাবে তোলা, চোখের সামনে মেলে ধরলেই মনে হয়— মেয়েটি তার চোখে চোখ রেখেছে। ওই বিভ্রমে আনন্দ প্রথমদিন চোখ সরিয়ে নিয়েছিল বার-কয়েক। এই চোখও বনির চোখ মনে করিয়ে দিচ্ছে।

—তবু বনি স্মৃতি।

—এই ছবি সত্তায় আসতে চাইছে।

—তারপর ভবিষ্যৎ—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মতো! তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর!

সত্যানন্দকে একটা চিঠি লেখার কথা ভেবেছিল আনন্দ। চিঠিটা সম্ভবত লেখা হয়েছে। হয়তো পোস্টও করেছে। করেছে কিনা, মনে করতে পারছে না আনন্দ। অথচ চিঠির বয়ান, যতবারই সে মনে করতে চেয়েছে, ততবারই একই; একটি শব্দেরও হেরফের হয়নি—

শ্রীচরণেষু বাবা, অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, নিজের যোগ্যতাবলে আজ পর্যন্ত কোনো কাজ আমি জোগাড় করতে পারিনি। যা করেছি, করছি,— তোমাদের সুপারিশে তা পাওয়া। সিটি কলেজের চাকরিটা আমার দোষেই গেছে। কারণ, আমার আচরণে অব্রাহ্মত্ব প্রকাশ পেয়েছিল। আমি মানুষের ধর্মাচরণের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি— এই মনোভাব হয়তো কোথাও প্রকাশ পেয়ে থাকবে। রামযশের চাকরিটাও বোধহয় খোয়াতে হবে। কিংবা আমিই হয়তো রিজাইন দিয়ে দেবো।...

চিঠিটা কি সত্যিই আমি লিখেছি? যদি লিখে থাকি, বাবা উত্তরে লিখবেন— আমরা এখানে খুবই অসুবিধায় আছি। জিনিসপত্রের দাম বাড়িতেছে। আয় বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা নাই। এমতাবস্থায় তোমার দিক থেকে যদি টাকার যোগান বন্ধ হইয়া যায়— খুব মুশকিল ব্যাপার হইবে। তোমার উপরে সর্বানন্দ ভবনের নির্ভরতা বাড়িয়াছে— বলাই বাহুল্য। পদত্যাগপত্র দাখিল করিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিও না! এটা আমার আদেশ-উপদেশ নয়— অনুরোধ বিবেচনা করিও!

যেন আনন্দ উত্তর পড়ছিল। পড়তে-পড়তে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে রামযশের বাঙালি অধ্যাপকদের মুখ— প্রভাস ঘোষ, দিল্লির জলহাওয়ায় এতটাই সে নিজেকে বদলে নিয়েছে যে, বাংলার মুখ যেন তার আর মনে পড়ে না; নিশীথ ব্যানার্জি, মন্মথ— স্যুট-কোট পরা, বাঙালি ব'লে পরিচয় দিতে বোধহয় ওদের লজ্জা করে। আর ওই যে নিশিকান্ত সেন, ও নাকি ইংরেজদের দালাল, প্রভুভক্তির কারণে নাকি কে জানে, 'খেঁকি কুকুর' বলে কেউ-কেউ— অথচ আর্যসমাজ-আদর্শের মধ্যে দিব্যি আছে! ব্যাপারটা আনন্দর কাছে বিস্ময়ের। আনন্দ বিস্মিত আরও অনেক কারণে— ওই মন্মথ, যে সেদিন তাকে গুরুকুল আদর্শ বোঝাচ্ছিল, কী ক'রে সে কারও নামে কুৎসা প্রচারের জন্য খোশগল্প করতে পারে?— এটাতে কি নৈতিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়? ওই নিশীথ, দর্শনের অধ্যাপক— এত অদার্শনিকসুলভ ব্যবহার কেন? মানুষকে ছোট করার, অপমান করার অপচেষ্টা কেন? এরা কীভাবে রামযশে থাকতে পারে? —আনন্দর বিস্ময় এই ভেবে। কত সহজে এরা বাঙালিয়ানা থেকে দূরে স'রে গেছে। নইলে, এরা তার বাঙালির পোষাক পরা নিয়ে ছাত্রদের দিক থেকে যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ, তার বিরোধিতা করতো। অন্তত তাকে অপদস্থ হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত থেকে বাঁচাতো। এরা কীভাবে 'গুরুকুল' আদর্শকে ফ্লারিশ করবে?— ছাত্রদের অছাত্রসুলভ আচরণকে এরা প্রশ্রয় দিচ্ছে!— এইসব ছাত্ররা কীভাবে মানুষ হবে? না, এখানে কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়— এক-একটা ক্লাস নেওয়া যেন দুঃস্বপ্নের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে— সত্যিই দুঃস্বপ্ন, কয়েকদিন আগে সে স্বপ্নে দেখেছে সেই ছেলেটিকে, চোঁয়াড়ে চেহারা, ফিচেল হাসছে— রোল নং সিক্সটি সিক্স, কল্ করতেই ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছে, তার ভঙ্গি দেখে আনন্দর বাক্রুদ্ধ, অন্য ছাত্ররাও হেসে উঠেছে...

যেখানে শ্রদ্ধা নেহ, স্নেহের পাত্র নেই— সেখানে শুধুমাত্র টাকার জন্য... আনন্দ মাথা নাড়তে থাকে।

এসব কথা বলার মতো কেউ নেই এখানে। সুধীর থাকলে বলা যেতো। হঠাৎ আনন্দর মনে পড়লো মণিকার কথা। সেদিন পথে দেখা। আচমকা দেখা হয়ে গেছিল। এভাবে দেখা কেবল গল্প-উপন্যাসে হ'তে পারে, হয়— আহা, এভাবে যদি বনির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো! মণিকার সঙ্গে এক পাদ্রি ছিলেন, আর দু'জন মহিলা। তেমন কোনো কথা হয়নি। তার থাকবার ঠিকানা জানিয়ে মণিকা আনন্দকে যাওয়ার কথা বলেছিল।

মণিকাকে তার সমস্যার কথা বললো আনন্দ। মণিকা শুনলো। কিন্তু বললো না কিছু। আনন্দর অস্বস্তি হচ্ছিল। এর চেয়ে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতো। অন্তত, কতদিনের কৌতূহল মণিকার খ্রিস্টান হওয়ার ব্যাপারে— প্রকাশ করতে পারতো। নিজেকে এভাবে খুলে দেখানোর জন্য একটা গ্লানিবোধ জেগে উঠতে চাইছে— তাতে কী, আফ্টার অল্ মণিকা, মাই কাজিন— এভাবে ব্যাপারটাকে চাপা দিতে চাইছিল আনন্দ, তখনই মণিকা বললো, 'তুমি কি বোঝো মিলুদা, তুমি একটা গোঁয়ার?'

আনন্দ কেমন যেন হক্চকিয়ে গেল। মৃদু মাথা নাড়লো।

—'তোমাকে তো সেই ছোটবেলা থেকেই দেখছি, তুমি অ্যাডজাস্ট করতে জানো না।'

আনন্দ যেন অনেকক্ষণ শ্বাস নিতে ভুলে গেছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'যেমন—?'

—'যেমন তোমার বাঙালিত্ব— নদী-নালার দেশের মানুষ— এই পাথুরে রুক্ষ ভূখণ্ডে এসেছো— কথায় বলে আপ্রুচি খানা, পররুচি পহেনা— তুমি কি বোঝো এই পোষাকে তোমাকে জোকারের মতো দেখায়? ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তো হাসবেই!'

—'তোমার কি হাসি পাচ্ছে মণিকা?'

—'না।'

—'কেন, জোকার মনে হচ্ছে না?'

—'ওঃ। মিলুদা— এ পোষাক-পরিচ্ছদ তো আমার চেনা— আচ্ছা, পাঞ্জাবিদের পাগড়ি দেখে আমরা হাসাহাসি করি না? বাঁধাকপি নাম দিয়েছি না?— সেরকম, তোমার সহকর্মীরা সকলেই স্যুটেড-বুটেড, তার মধ্যে তুমি— কী না, জাতিপ্রেম দেখাচ্ছো!'

আনন্দ কেমন বেবোধের মতো মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মণিকার পরণে শাড়ি নয়, কোনো ভারতীয় পোষাক সে পরেনি।

—'মিলুদা, তুমি কি আমার কথায় দুঃখ পেলে?'

আনন্দ মাথা নাড়লো।

—'আমি কেবল লজিকটা বললাম— ভেবে দেখো, অ্যাডজাস্ট করাটা খুবই দরকার। তুমি যদি সবার মতো না-হ'তে পারো, সবাই তোমাকে রিফিউজ করবে— এটা স্বাভাবিক।'

আনন্দ উঠে দাঁড়ালো।

হাঁটতে-হাঁটতে আনন্দ ভাবলো, মণিকার কথায় যুক্তি আছে। ওই যুক্তি যে তার অজানা, তা নয়— তবু, আমি কি সত্যিই গোঁয়ার? আচ্ছা আনন্দ, তুমি কি চাও— সবাই তোমার মতো হোক?

—আমি কি এতই মুর্খ?

—তাহলে?

—আমি কেবল আমার মতো থাকতে চেয়েছি।

—মণিকার কাছে গিয়েছিলে কেন?

—একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাইছিলাম—

—তাহলে চাকরিটা ছাড়ছো?

—তাতে বোধহয় খানিকটা মর্যাদা টিকিয়ে রাখা যায়।

—একটা অহংকারের জায়গাও বোধহয় থাকে, না?

খুব ক্লান্ত লাগছে। বোর্ডিঙে ফিরে চোখ বন্ধ ক'রে শুয়ে ছিল আনন্দ। হঠাৎ কী-একটা শব্দে চোখ মেলে তাকালো। প্রভাস তার টেবিলের ওপর থেকে স্টেট্‌সম্যান কাগজগুলো তুলে নিচ্ছে। আরও দু'-একটা বই। আনন্দ কিছু বলতে পারছে না। যেন স্বপ্ন দেখছে। কাগজ-বই বগলে চেপে প্রভাস বেরিয়ে যাচ্ছে।

কী যে হচ্ছে চারদিকে!

নিশিকান্ত আমাকে দেখলে, তার চোখমুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তোলে, যেন আমি একটা অপরাধী, পাপী— কী যে অপরাধ আমার, বোদলেয়র পড়ি ব'লে? হ'তে পারে ডি. এইচ. লরেন্স— সেদিন ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ে আলোচনায় আনন্দ আচমকা লরেন্সের উল্লেখ করেছিল। তখন সকলেই কেমন গম্ভীর হয়ে গেছিল। নিশিকান্ত বলেছিল, 'তুমি কি জানো তার লেটেস্ট উপন্যাসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে?'

আনন্দ মাথা কাত্‌ ক'রে জানিয়েছিল,— সে জানে।

—'কেন?'

—'অবসিনিটির জন্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে লরেন্সকে আলোচ্য করলে তার যৌনতার অনুপুঙ্খ বর্ণনাকে আধুনিকতার চরিত্রলক্ষণ ব'লে স্বীকার করতে হয়।'

—'তাতে অসুবিধে কোথায়— তাহলে তো ফ্রয়েডকে বাতিল করতে হয়!'

আবারও সবাই গম্ভীর— গাম্ভীর্যের মধ্য থেকে অনেকেরই চোখে ফুটে উঠছিল ক্রোধরক্তিম আভা। নিশীথ বলেছিল, 'না, ফ্রয়েডকে আমরা বাতিল করছি না— কিন্তু লরেন্সকে করছি— কারণ, আমাদের সভ্যতায় যৌনতা অন্ধকারের বিষয়; এমন-কী, ভাবুন আনন্দ; মা যখন পূর্ণবয়স্ক সন্তানের স্নেহচুম্বন করেন, সন্তানের চিবুকে ডান হাতের আঙুলগুলো জড়ো ক'রে স্পর্শ ক'রে নিজের ওষ্ঠাধরে ছোঁয়ান— কী দারুণ শিল্প ভাবুন!'

আনন্দর আচমকা তার মায়ের কথা মনে পড়েছিল।

—'ইডিপাস কমপ্লেক্স— ইলেকট্রা— এটা কি সাহিত্যে বর্ণনার বিষয়?'

আনন্দ আর কথা বলেনি।

আমি যেন অচ্ছুত কেউ। অথচ আর্যসমাজ সামাজিক এই উপসর্গের বিরোধিতা করে! আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'হায়! সমাজ! আমি যে কোন্ সমাজের!'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবীর— ফোঁপরার মতো ক'রে এরে লয় শুষে
দেবতা গন্ধর্ব নাগ পশু ও মানুষে!...

সুধীরকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। মাঝেমধ্যে অন্যমনস্ক। অন্যমনস্ক হওয়ার কারণ হ'তে পারে— পারুল। গত পরশু সুধীর এখানে এসেছে। কাল আনন্দর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তখনই তাকে অন্যমনস্ক দেখেছিল। জিগ্যেস করায় সুধীর বলেছিল, 'পারুলের শরীরটা একদম ভালো নেই।'

—'তাহলে তুমি এলে কেন?'

—'আসতে হলো।' তার অন্যমনস্কতার ছায়াটাকে মুছে দিতেই যেন সে বললো, 'তাছাড়া থেকেও-বা করবো কী— যার বাঁচারই ইচ্ছে নেহ, তাকে বাঁচাবে কে?'

—'পারুলের অসুখটা ঠিক কী?'

—'রাজ রোগ।'

তার উচ্চারণের ভঙ্গিতে সংশয় দেখা দিয়েছিল আনন্দর মনে, 'মানে যক্ষ্মা?'

সায়-এর ভঙ্গিতে সুধীর মাথা নাড়িয়েছিল।

আচমকা মনিয়াকে মনে পড়লো। মনিয়া আর পারুল সমবয়সী। আর আশ্চর্য, কিশোরী পারুলের মুখ মনে করতে পারলো আনন্দ— মেয়েটি অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে— কে জানে কোন্ অভিমানে!

—'কী আনন্দ, তুমি কী ভাবছো?'

—'তেমন কিছু না—'

অদ্ভুত হাসলো সুধীর, বললো, 'গেল বার দিল্লি থেকে ফিরলে পারুল তাজমহল দেখেছি কিনা জানতে চায়নি।'

—'তুমি বুঝি আশা করেছিলে— জানতে চাক?'

—'হ্যাঁ। আমি ধ'রেই নিয়েছিলাম, ও জানতে চাইবে আর আমি বলবো, হ্যাঁ পারুল, এবার দেখে এলাম। খুব মনখারাপ হলো জানো— তুমি যদি পাশে থাকতে—' দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুধীর।

আনন্দ বললো, 'কিছুই জানতে চায়নি?'

—'না। কিন্তু জানিয়েছে।'

—'কী?'

—'তৃষ্ণার কথা— জীবনতৃষ্ণা।'

আনন্দের ভ্রূতে ভাঁজ।

—'পারুল ইদানিং নানানরকম স্বপ্ন দেখছে— সে ভালো হয়ে গেছে— আমি আর পারুল নতুন ক'রে মধুচন্দ্রিমা যাপন করছি— সেইসব স্বপ্নের বিবরণ দিতে-দিতে পারুলের ফ্যাকাসে গালে যেন রক্তিম উচ্ছ্বাস, নিরক্ত চোখে এক আশ্চর্য দ্যুতি— রক্তশূন্য ঠোঁটের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোণে কামনা আর লজ্জার অদ্ভুত এক মায়াবী রঙ— কখন সে তার শীর্ণ হাতখানা রেখেছে আমার হাতের ওপর, কী ঠাণ্ডা, আমার সমস্ত উষ্ণতা যেন সে শুষে নিতে চাইছে— কী করুণ কামার্ত চাহনি!'

আবারও অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো সুধীর। আনন্দ শ্রোতার আগ্রহ নিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর সুধীর বললো, 'তারপর— ব্রথেলে মেয়ে দেখে বেড়ানো সেই লোকটা পারুলের ভাঙাচোরা মুখ তার দু'হাতের মধ্যে তুলে নিলো, চোখে চোখ রাখলো— পারুলের চোখে বিস্ময়, একটু যেন আতঙ্ক— আমার মুখ নেমে এলো তার অধরের ওপর— চামড়ায় ঢাকা পারুলের হাতের কঙ্কাল আমাকে আঁকড়ে ধরতে গিয়েও— আমাকে সরিয়ে দিতে চাইলো, চিৎকার ক'রে উঠলো— না!'

—'তারপর?'

—'তারপর, আমি চেয়ে দেখি— দু'হাতে মুখ ঢেকেছে সে।'

আবারও তাকে অন্যমনস্ক দেখলো আনন্দ। কয়েক মুহূর্ত পর সুধীর বললো, 'মানুষ যদি মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত না-হতো তাহলে জীবন বোধহয় অন্যরকম হ'তে পারতো।'

—'যেমন?'

—'যেমন আমি— বাণীপীঠের শিক্ষকতার চাকরিটা পাওয়ার শর্ত ছিল প্রধানশিক্ষকের জামাতা হ'তে হবে, সেক্ষেত্রে পারুলের কোনো মতামত যে থাকতে পারে, ভাবাই হয়নি; রসরঞ্জন দায়মুক্ত হলেন, আমি পায়ের তলায় মাটি পেলাম এবং আহাম্মক হলাম। আমরা কেউ-ই পারুলের কথা ভাবিনি। পারুল মৃত্যুকে ভেবেছে। তার খিদে না-থাকা, অল্পখাওয়া কিংবা উপোস করা— এসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি— স্বদেশি রাজনীতির মহান আদর্শের বাহক আমি। যে নিজের ঘরের মানুষকেই ভালোবাসতে পারলো না— তার রাজনীতিতে দেশপ্রেম! মাঝেমধ্যে নিজের প্রতি ঘেন্না হয়—'

এবার সুধীরকে চিন্তিত দেখাচ্ছে, 'আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না— মাত্র দু'মাস আগে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণস্বরাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অথচ এ মাসের দু'তারিখে গান্ধিজী বড়লাটকে চিঠি লিখে যে এগারো দফা দাবি জানিয়েছেন, তাতে স্বরাজের কোনো উল্লেখ নেই এমন-কী ডোমিনিয়ান স্টেটাসের ব্যাপারেও কোনো কথা নেই।'

এক্ষেত্রে আনন্দ নীরব শ্রোতা মাত্র। খবরের কাগজ মারফৎ যতটুকু সে জেনেছে তাতে বৃটিশ শাসন-যে ভারতের কাছে একটা 'অভিশাপ'— এই বয়ান তার ভালো লেগেছে এবং এতদিন পর— ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যে লুপ্ত হ'তে চলেছে, এটা ভারতের রাজনীতিকরা উপলব্ধি করেছেন— তার মধ্যে কোথায় যেন একটা আশা আছে ব'লে মনে হয়েছে আনন্দর।

—'দেখা যাক। এখনও পর্যন্ত বড়লাট চিঠির উত্তর দেয়নি, গান্ধিজীকে দেখা করতেও ডাকেনি— এগারোই মার্চ লবণ আইন ভেঙে আন্দোলন শুরু হওয়ার কথা— দেখা যাক, কী হয়!'

আনন্দ অপলকে সুধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ভাবছিল একটা ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা। তাকে চমকে দিয়ে সুধীর বললো, 'উঠি। পরে কথা হবে।'

সুধীরের চ'লে যাওয়া পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো আনন্দ। মনে পড়লো, সুধীর আজ এসেই তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন আনন্দ?' তারপর কথায়-কথায় বলেছিল, 'এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে মিলেমিশে থাকাই ভালো— মন ভালো থাকে এমন কিছু পড়ো।' ওই কথার পর-পরই তাকে কেমন চিন্তিত মনে হয়েছিল আনন্দর। তারপর কী কথায় যেন পারুল এসে পড়েছিল। এখন ওই কথার রেশ ধ'রে পি.কে.জি.-র একটা কথা মনে পড়লো। হিন্দি-ইংরেজি মেশানো তার কথার অর্থ ছিল— 'সাধুজন রচিত গ্রন্থ তোমার মনকে সাত্ত্বিক ভাবের দিকে নিয়ে যেতে পারে।' পি.কে. গোঁসাই-এর বাচনভঙ্গিটি সুন্দর। তিনি সনাতনী হিন্দুধর্মের সমর্থক, এমন-কী প্রবক্তাও— এরকম মনে হয়েছে আনন্দর। কখনও-কখনও আর্যসমাজের সমালোচনায় তাঁকে মুখর হ'তে দেখেছে। তাঁর কথাতে মন খারাপের কোনো বিষয় ছিল না। একদিন তিনি বলেছিলেন, 'তোমাকে খুব বিষণ্ণ দেখি। কেন?' আনন্দ কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। তিনিই বললেন, 'মনে হয়, তুমি একা থাকতে পছন্দ করো ব'লেই তুমি বিষণ্ণ।'

তখনই আনন্দ মনে মনে বলেছিল, হ'তে পারে বিষণ্ণতার কারণে আমি একা।

—'এবং ক্রমে তুমি সিনিক হয়ে পড়বে।' তারপর তিনি মাথা নাড়তে-নাড়তে চ'লে গিয়েছিলেন।

তাহলে কি দত্তবাড়িতে আমাকে নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে? হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং সেখানে সুধীর উপস্থিত ছিল। আলোচনাসভাটাকে আনন্দ স্পষ্ট কল্পনা করতে পারলো—

পি.কে.জি: হ্যাঁ সুকুমার, আমি লক্ষ করেছি— কম কথা বলে, ভাবুক প্রকৃতির।

সুকুমার কবি।

নিশীথ আজও পর্যন্ত একটা কবিতা দেখিনি।

মন্মথ তেমন মিশুকে নয়।

সুধীর আমার কিন্তু তেমন মনে হয়নি।

গোঁসাই না। ব্যাপারটা অন্যখানে— রামযশে 'গুরুকুল' প্রথা অনুসরণ করা হচ্ছে, সেখানে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়— এটা বিঘ্নিত হচ্ছে।

মন্মথ তাছাড়া নৈতিকতার প্রশ্ন— এই প্রভাস, বলুন না!

প্রভাস উনি বোদলেয়র চর্চা করছেন! কে না জানে, বোদলেয়র অসচ্চরিত্রতা আর অনৈতিকতার মূর্ত প্রতীক। শুধু তা-ই নয়— খবরের কাগজে ছাপা সুন্দরীদের ছবি তিনি যত্ন ক'রে রাখেন— এসব আমি সুকুমারদাকে দেখিয়েছি।

সুকুমার হ্যাঁ। আমি ভাবতেও পারছি না। অমন ঋষিতুল্য পিতার সন্তান।

নিশিকান্ত অধ্যাপক দাশ আবার লরেন্সের খুব ভক্ত।

গোঁসাই যার নৈতিক ভিত্তিটাই এত নড়বড়ে, শিক্ষক হিসেবে তাকে মেনে নেওয়া যায় না।

অতএব, হুররে!

—কিন্তু আনন্দ, অহংকার বা মর্যাদার কোনো জায়গাই কিন্তু টিকছে না।

—কী আর করা যাবে!

—তুমি কি আবারও ধর্মের বলি হচ্ছো?

—কী জানি! কিন্তু আমার ভালো লাগছে— হয়তো আবার কবিতায় ফিরতে পারবো। কবিতার কাছে।

—মানে বনির কাছে?

আনন্দ নিজের মনে না-ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে। বিড়বিড় করছে, হয়ে-উঠতে-থাকা একটা কবিতার ওপর দোয়াত উল্টে পড়লে, সে-কবিতাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না—

—তবু চেষ্টা ক'রে যেতে হয়—

—স্মৃতি আর স্বপ্ন ছাড়া আর কোনো প্রাপ্তি নেই— স্বপ্নশেষে আত্মরতি, স্টেল মর্নিং— আমি যেন মৃত পচা মানুষ— মাছির উৎপাত দেখে তেমনই মনে হয়, যেন আমার হৃৎপিণ্ডের দগ্‌দগে ক্ষত থেকে চুঁইয়ে পড়া রসরক্তের আস্বাদ নিতে চায় ওরা— কোথাও কোনো শুশ্রূষা নেই!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে
কী এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন!

আনন্দর জীবন থেকে কবিতার আলো-উত্তাপ যেন হারিয়ে যাচ্ছে। যেসব পত্র-পত্রিকায় তার কবিতা প্রকাশ হতো, তাদের সব-ক'টি বন্ধ হয়ে গেছে। যে-পত্রিকায় তার প্রথম কবিতা বেরিয়েছিল, সেটি বন্ধ হয়েছে প্রায় বছর-তিনেক আগে। আর একমাত্র যে-কাগজটি টিমটিম ক'রে জ্বলছিল সেও নিভে গেল, গত আশ্বিনে; তাতে প্রকাশ পেয়েছে তার শেষ কবিতাটি— যথার্থ অর্থে তার ফসলের দিন যেন শেষ হয়ে গেছে।

তার কবিজীবনের প্রথমদিকে আনন্দ যেমন দপ্ ক'রে নিভে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিল— এবার সেই আশঙ্কা যেন সত্য হয়ে উঠছে। এই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থেকেও একটা লাইন লিখতে না-পারা— এ যেন তারই আভাস। কিংবা সত্যিই নিভে গেছে তার কবিসত্তা।

ঘরের জানালা-দরজা সব বন্ধ। চাদরটাকে ভালো ক'রে জড়িয়ে নিয়ে আনন্দ জানালায় এসে দাঁড়ালো। খুলে দিলো জানালার একটা পাল্লা। পৌষের গভীর রাত্রির নিস্তরঙ্গ ঠাণ্ডা, যা জড়ো হয়েছিল জানালার আশেপাশে উত্তাপের আশায়, প্রবলবেগে ঢুকে পড়লো ঘরের ভিতর। তবু আকাশ দেখলো আনন্দ, নক্ষত্রের আকাশ। একটা পুরনো ভাবনা জেগে উঠতে চাইছে— নক্ষত্রের মৃত্যুচেতনা; সে অনুভব করতে পারছে এক আশ্চর্য উত্তাপহীনতা—

—তবু তো অঙ্গীকার ছিল— মৃত্যুর ব্যথা দিয়েছে যে, তাকেই তোমার সব অনুভব উৎসর্গ করার!

—কিন্তু এবার আমি সত্যিই মৃত, কোথাও আর জীবনের স্বাদ নেই! মৃতের কি আর অঙ্গীকার রক্ষার দায় থাকে?

আনন্দ জানালা বন্ধ ক'রে ফিরে এলো তার বিছানায়। ঘরের মধ্যে নানা ঢঙের নাক ডাকার শব্দ। ইঁদুরের চলাফেরাও স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে— এই তো দেখতে পাচ্ছি তাদের রোমে খুদকুড়ো মাখা, ওই যে বেড়াল ওঁৎ পেতে আছে কিংবা পেঁচা— তবু এসব থেকে কোনো ইনট্যুশান পাওয়া যাচ্ছে না; এত দুর্বল কল্পনাপ্রতিভাকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন!

মাত্র ছ'টা বাক্যের সেই চিঠি আনন্দ মনে মনে প'ড়ে ফেললো কল্পনায়— এবারও চিঠিটাকে তার আন্তরিক আর উদ্দীপক মনে হলো। কিন্তু একটা নতুন বিষয়— 'ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি'— এই কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা বিরোধিতা আছে, এটা ঠিক— ভাষাব্যবহারে আর শব্দচয়নে আনন্দ এই সময়ের প্রতিস্পর্ধী, অতএব রবীন্দ্রনাথেরও— এরকম ভাবনায় রবীন্দ্রনাথকে একটা চিঠি লেখার কথা ভাবলো আনন্দ, এর আগেও, প্রাপ্তিস্বীকার ক'রে চিঠি লেখার কথা ভেবেছিল, লেখা হয়নি— এবার লিখতে হবে।

—আপনি ঠিকই বলেছেন, জোর দেখানো জোরের প্রমাণ নয়।

রবীন্দ্রনাথ স্মিত হাসলেন।

—কিন্তু উঁচু জাতের রচনার ভেতর যে কেবল শান্তি থাকবে, মাপ করবেন, মানতে পারলাম না!

রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর হলেন। কিন্তু তাতে শোনার আগ্রহও প্রকাশ পেয়েছে।

—আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য কি পাতালের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানোর জন্য, কবিমন ব্যাকুল হ'তে পারে,— পারে না কি?

রবীন্দ্রনাথ সায় দিলেন, তাঁর মাথাটা মৃদু নড়লো।

—সেখানে কি প্রশান্তি খুব বেশি প্রস্ফুটিত হ'তে পেরেছে? আমার মনে হয়, না।

রবীন্দ্রনাথ যেন তার কথা মেনে নিয়েও মানতে পারলেন না।

—যেমন ডিভাইন কমেডি। শেলীর মধ্যেও সিরেনিটির অভাব রয়েছে। আছে না?

থাকাটা স্বীকার করলেন রবীন্দ্রনাথ। অন্যমনস্কভাবে।

—তবু তো স্থায়িত্ব পেয়েছে এঁদের রচনা!

রবীন্দ্রনাথকে দেখে মনে হলো, অস্বীকার করার উপায় নেই তাঁর।

—আসলে মুড— মুডের প্রভাবেই তো আপনি মৃত্যুকে বঁধু ব'লে সম্বোধন করতে পেরেছেন। আর তার প্রভাবেই তো আমি গেয়ে উঠতে পারি— 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে/এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।'

রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ।

—আমরা বীঠোফেনের কথা ভাবতে পারি— তাঁর কোনো-কোনো সিম্‌ফোনি বা সোনাটাতে রয়েছে অশান্তি— আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। তব, আজও তো টিকে আছে! আসল বিষয় হলো, সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণা আর মর্যাদা। তা যদি না-থাকে, শান্তি বা সিরেনিটির সুরে কবিতা বাঁধলেও তা নিষ্ফল হ'তে বাধ্য।...

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়লো আনন্দ। প্রতিদিন যেমন ঘুম ভাঙে, ঘুম ভাঙলো কাকের ডাকে। বিছানা ছাড়ার আগেই সে ভেবে নিলো, আজ তার প্রথম কাজ চিঠিটা লেখা— প্রভাকেও একটা চিঠি লিখতে হবে আজ; তার আগে কিছু টাকা ধার করার ব্যবস্থা করতে হবে... প্রভা লিখেছে কিছু টাকা পাঠাতে, যেভাবেই হোক। লিখেছে: বুঝলে পেটের মধ্যে এক রাক্ষস ঢুকেছে, আমাকে শুষে খেয়ে ফেললে— সবাই বলছে ছেলে হবে।

আনন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

নিজেকে ভীষণ নিঃস্ব মনে হচ্ছে আনন্দর। এসময়ে প্রভার পাশে থাকতে পারলে প্রভা খুশি হতো; অন্তত তার অভিমান, টুকরো-টুকরো ব্যথা, ক্ষোভ উগরে দিতে পারতো আনন্দর উপরে— এই উপশমটুকুও প্রভা পাচ্ছে না। প্রভার দুঃস্থতা অনুভব ক'রে আনন্দ গাঢ় বেদনায় ডুবে যাচ্ছে।

'এই সেই নারী,
একে তুমি চেয়েছিলে, এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ—'
তবু দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ?

সত্যানন্দকে ইদানিং খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। মিলুর কোনো একটা ব্যবস্থা না-করতে পারলে তাঁর যেন মুক্তি নেই। শিক্ষিত মানুষ-যে এত অবিবেচক হ'তে পারে! এত বড় একটা সংসারে টাকার যোগান ঠিকমতো না হ'লে অশান্তি চারদিক থেকে এসে জীবনকে যে জেরবার ক'রে দেয়— এ অভিজ্ঞতা এখনও কি অর্জন করতে পারেনি মিলু! স্ত্রীর সঙ্গে যে প্রেম-ভালোবাসা গ'ড়ে ওঠার কথা, তা-ও যে হয়ে ওঠেনি, প্রভার ব্যবহারে তা প্রকাশ পাচ্ছে নির্লজ্জভাবে,— অথচ কোনো বিকার নেই ছেলেটার! এসব বিষয়ে কথা বললে চুপ ক'রে শোনে। দশটা কথার পর হয়তো একটা কথা, তাতে দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়— এ বংশে কোনো পাগল জন্মায়নি, মিলুর মাতৃকুলে যতটা জেনেছেন সত্যানন্দ, পাগলের ইতিহাস নেই— তবু, মিলু কবি, মাতৃকুলের ধারা— কবিতা নাকি একধরনের দৈব পাগলামি, ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না তিনি— এই সেদিন কথা বলতে-বলতে, মিলুকে চুপ থাকতে দেখে, বিরক্তি প্রকাশ ক'রে সত্যানন্দ জিগ্যেস করলেন, 'জীবন সম্পর্কে কী ভাবছিস— একটু বলবি আমাকে?'

মিলু তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলো, 'ভাবছি— যদি আমি পুনরায় ব্যাচেলর হ'তে পারতাম!'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে-নাড়তে সত্যানন্দ টের পাচ্ছিলেন তাঁর সন্ত-ইমেজ ভেঙে যাচ্ছে, রক্ষা করতে পারলেন না, সাধারণ গেরস্থ মানুষের মতো তাঁর কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে চিৎকৃত হলো, 'যা হয়েছো তা নিয়ে কী ভাবছো?'

মিলু খানিকটা বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল বাবার মুখের দিকে— একটা অসাধারণ মানুষ সাধারণ স্তরে নেমে এলে তাঁকে যে কী হতাশ, বিপন্ন, বিষাদগ্রস্ত দেখায়— দেখছিল মিল, বললো, 'এটা নিয়ে আমার ভাবতে ইচ্ছে করে না।'

সেদিনই সত্যানন্দ ভেবেছিলেন, মিলুকে নিয়ে তাঁর ভাববার কিছু নেই— তবু তাকে সুস্থিত দেখতে পারলে, বউ-মেয়ে নিয়ে তাকে আনন্দোজ্জ্বল দেখলে, মনের এই মেঘলা ভাবটা হয়তো কেটে যেতো— এসব কথা কুসুমকুমারী জানেন। জানেন ব'লেই সত্যানন্দের মুখ দেখে তাঁর মনে হচ্ছে মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে। জিগ্যেস করার সুযোগ হয়নি।

এখন দ্বিপ্রাহরিক আহারের আয়োজন চলছে। বড্ড মাছির উৎপাত— পাখা হাতে ব'সে আছেন কুসুমকুমারী। সত্যানন্দের দু'পাশে দুই ছেলেমেয়ে। কুসুমকুমারী কথা বললেন, 'নতুন কোনো সমস্যা হয়েছে মনে হচ্ছে।' সত্যানন্দ কথা বলার এই ঢঙের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত, মাথা তুললেন, 'হ্যাঁ। তোমাদের বলা হয়নি— রাঁচি থেকে অপুর চিঠি পেয়েছি কাল।'

সবাই কেমন আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো। অপু— অপূর্বরত্ন, সত্যানন্দের জ্যেঠতুতো ভাই।

সুচরিতা ব'লে উঠলো, 'কাকাদের কোনো খারাপ খবর?'

—'না।'

কুসুমকুমারী বললেন, 'সমস্যাটা কীসের?'

—'অপু রণেশকে এখানে পাঠাতে চাচ্ছে।'

—'কেন?'

—'এখানে থেকে সে পড়াশুনো করবে।'

—'সিটি কলেজে তো পড়তো শুনেছি।'

—'হ্যাঁ। আই.এস.সি. পাশ দিয়েছে।'

—'তা হঠাৎ এখানে পড়াতে চাইছে কেন?'

—'সেসব কিছু লেখেনি। লিখেছে রণেশকে নিয়ে সে খুব মুশকিলে পড়েছে। কোলকাতায় ওর লেখাপড়া চালানোর পক্ষে বিস্তর বাধা। জানতে চেয়েছে— রণেশকে আমি রাখতে পারবো কিনা।'

সমস্যাটা জানানো হলো বটে। কিন্তু সকলেই নীরব। ইতিমধ্যে ভাতের থালা সকলের সামনে ধ'রে দিয়ে গেছে প্রভা। কুসুমকুমারী হাতের পাখা নাড়াচ্ছেন।

আনন্দ বললো, 'ব্যাপারটাকে সমস্যা হিসেবে না-দেখাই ভালো।' কুসুমকুমারী বললেন, 'এটা সমস্যা নয়?'

—'না।'

—'এই আক্রার দিনে বাড়তি একটা পুষ্যি— সমস্যা হবে না?' মুখের গ্রাস গিলে আনন্দ বললো, 'ছ'-সাত বছর আগে এরকমই একটা চিঠি দেওয়া হয়েছিল অপূর্বকাকাকে।' মায়ের মুখ নিভে যাওয়া লক্ষ ক'রেও সে বললো, 'সে-চিঠির কথা আমি হুবহু ব'লে দিতে পারি।'

অতীতকে যারা ভুলে যায় তাদেরকে তা মনে করিয়ে দেওয়ার মধ্যে এক ধরনের নির্দোষ নিষ্ঠুরতা আছে। তব, তা মনে করাতে চায় না আনন্দ, অন্তত বনির ক্ষেত্রে তা পারেনি, কিন্তু এখানে সে পারলো, 'ভাই অপূর্ব দীর্ঘদিন হয় চিঠিপত্রের কোনো লেনদেন হয় নাই। আশা রাখি পরমব্রহ্মের কৃপায় সকলেই কুশলে আছো। অদ্য তোমাকে লিখিবার বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। ভেবল, ব্রাকেটে অশোক, আমার কনিষ্ঠ পুত্র বর্তমানে এম.এস.সি. পাশ দিয়া বসিয়া আছে। চাকরি পায় নাই। এর একটা চাকরির ব্যবস্থা করিতে হইবে।'

সত্যানন্দ ডান হাত তুলে তাকে চুপ করতে বললেন। তারপর খাওয়া বন্ধ ক'রে বললেন, 'ভুলিনি। অপূর্ব তার এ.জি. অফিসে অশোককে চাকরি ক'রে দিয়েছিল। ভুলিনি যে, অশোক তার বাড়িতে প্রায় তিন বছর ছিল।'

কুসুমকুমারী বললেন, 'মিলু ঠিকই বলেছে— ব্যাপারটাকে সমস্যা হিসেবে না-দেখাই ভালো।'

আনন্দ বললো, 'ভাই যে রাঁচিতে অপূর্বকাকাদের কাছে থাকতো— তুমি জানতে না?'

—'জানতাম, কিন্তু ওই চিঠির ব্যাপারটা জানতাম না।'

সত্যানন্দ বললেন, 'সমস্যাটা অন্যখানে— ভেবেছিলাম বলবো না, তোমরা সকলেই আমাকে কৃতঘ্ন ভাবছো—'

—'ঠিক আছে। পরে হবে। খেয়ে নাও!'

—'না। সবারই জানা উচিত। রণেশ অনুশীলন সমিতি করা ছেলে। বাঁকুড়ার কলেজ হোস্টেলে থেকে ও আই.এস.সি. পড়তো— গত বছর দেশজুড়ে যখন আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল— ধর্মঘটে বাঁকুড়ার কলেজে খুব সক্রিয় ভূমিকার জন্য রণেশকে প্রিন্সিপ্যাল কলেজ থেকে বহিষ্কার করেন— সেখান থেকে সিটি কলেজ— সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছিল ব'লেই নানান সূত্র থেকে ব্যাপারটা আমার কানে আসে। সমস্যাটা এখানে— এখানে এলে রণেশ যে শুধু পড়াশুনো করবে তা নয়, তাহলে তাকে কোলকাতা ছাড়তে হতো না।'

সুচরিতা বললো, 'তুমি এমন বলছো যেন স্বাধীনতার জন্য রাজনীতি করাটা অপরাধ!'

—'অপরাধ বলছি না— একটা টেনশন আছে, তোর বৌদির ব্যাপারটা মনে আছে তো— সর্বানন্দ ভবনে পুলিশ, আই.বি.— ভাবা যায়!'

প্রভা শুনছিল দাঁড়িয়ে। সে বললো, 'বাবা, অত ভাবতে হবে না, একটা অব্লিগেশন যখন রয়েছে, আপনি আসতে লিখে দিন।'

প্রভার ভেঙে যাওয়া মুখটার দিকে আনন্দ এক পলক তাকালো। আর তার স্মৃতিতে জেগে উঠলো, সেই তল্লাসির দিনে এক পুলিশের কণ্ঠস্বর: এরা ঢাকার মেয়ে, কতটুকু চেনেন আপনি এদের?

কেউ লক্ষ করলো না আনন্দর চোখেমুখে দারুণ এক মুগ্ধতা আলো ছড়াচ্ছে। পারবে, এই মেয়েটি পারবে সর্বানন্দ ভবনের ব্রহ্মের আখড়া ভেঙে বিপ্লবের আখড়া তৈরি করতে— আর তা যদি হয়— আনন্দ যে কত বড় নিস্তাব পাবে।

আনন্দ ব'লে উঠলো, 'সেই ভালো।'

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত:
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস।

এইমাত্র গল্পটা শেষ করলো আনন্দ। কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে ব'সে থাকার পর খোলা বইটা আবার টেনে নিলো। শেষ অনুচ্ছেদটা আবারও পড়ছে সে—

> ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাহ, সেরেস্তাদারও হই নাহ, গারিবালডিও হই নাহ, আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল— আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।

বইটা বন্ধ ক'রে আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'আমারও—'

—বুঝলেন রবীন্দ্রনাথ, আমার জীবনের অন্তত একটি গল্প এভাবে শেষ হ'তে পারতো— আমার সমস্ত ইহজীবনে ক্ষণকালের জন্য কেবল একটি অপরাহ্নের উদয় হইয়াছিল— আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র অপরাহ্নই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা—

কিন্তু তা হয়নি। ওই সার্থকতাটুক ছিল ব'লেই তার জীবনে বিষণ্ণতার রঙ এত গাঢ়। ভালোবেসে আঘাত পাওয়া— তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু ভালোবাসা পেয়ে তাকে হারিয়ে ফেলার বেদনা একটা মানুষকে যে কীভাবে বামন ক'রে দেয়— তা কেবল আনন্দই জানে।

এরকমই হচ্ছে— ইদানিং প্রেমের গল্প পড়তে পারছে না সে। প্রেমিকের চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন পরিচয়ে একাত্ম করতে পারছে না। কিংবা মনে হচ্ছে, আহা! বনি যদি এমন হতো! পৃথিবীর প্রেমের গল্পগুলির অন্তত একটি যদি ফলতো জীবনে! একটা গল্পের মতো ক'রে কি জীবনকে গ'ড়ে তোলা যায়? যদি যেতো! অন্তত দাম্পত্য প্রেমের সার্থক কোনো গল্প— যদি তার জীবনে ফলতো!

সম্ভাবনা যে একেবারে ছিল না তা তো নয়; তবু কোথায় যে ভুল— আনন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠলো ফুলশয্যার রাত— বনির সমস্ত স্মৃতিকে আড়াল ক'রে ওই দাঁড়িয়ে আছে প্রভা, আর তার সম্মুখে সত্তা। আনন্দর সহসা মনে হলো জীবন আর মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে সে— দৃশ্যত প্রভা বধূবেশে দাঁড়িয়েছিল— অলীক দৃশ্য যেন; আলো আর স্তব্ধতায়, রজনীগন্ধার সুবাস আর নতুন কাপড়ের গন্ধে ঘরটা কেমন যেন প্রেক্ষাগৃহের মতো হয়ে উঠেছে— এক আরম্ভের অপেক্ষায়। আনন্দ বললো, 'শুনেছি তুমি গান জানো!'

প্রভা মুখে কিছু বললো না। কিন্তু তার নীরব থাকা আর শরীরের ভাষা জানালো, ঠিকই শুনেছো।

—'একটা গান শোনাবে?'

—'কোন্ গান?'

—'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে/বন্ধু হে আমার...'

একটু যেন চমকে উঠলো প্রভা। যেন এখনই সে ব'লে উঠবে, এ গান কেন শুনতে চাইছো তুমি?

—'না-জানলে থাক্।'

—'না, জানি—'

কী যেন বলতে যাচ্ছিল প্রভা, তাতে বাধা দিয়ে আনন্দ ব'লে উঠলো, 'তবে শুরু করো!'

দ্বিধা কাটিয়ে গাইছিল প্রভা। দু'চোখ বন্ধ ক'রে আনন্দ— বাণী ও সুরের সম্মিলিত রূপটিকে অনুভব করতে-করতে 'গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে' তার দিকে চেয়ে মনে মনে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সুরের যে ফ্রেম গ'ড়ে উঠেছিল— তার বাইরে যেন চ'লে গেছিল দু'হাত— হ'তে পারে তা তার নিজস্ব আকুলতার কারণে— গান শেষ হবার পর আনন্দ বললো, 'আর একবার গাও তো!'

আবারও একবার গেয়েছিল প্রভা।

জীবনের এই পর্বের শুরুটা কল্পনামাফিক হয়নি— আনন্দ ভেবেছিল প্রভা খাটের ওপর শুয়ে থাকবে, হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে, আর সে তার মুখ দেখতে-দেখতে ঝুঁকে পড়বে তার মুখের ওপর... কিন্তু এইভাবে শুরুটা— আরও গভীর ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যে দারুণ শিল্পিত হয় উঠলো। অকল্পনীয়, কিন্তু এটাই যেন ছিল আকাঙ্ক্ষা— প্রভা যেন মুগ্ধতার জিনিস হয়ে উঠেছিল—

প্রভার দু'চোখের গভীরতার সঙ্গে কারও তুলনা চলে না। কাজল মায়ায় ওই চোখ ছায়াঘন বৈশাখী দিনের দীঘির মতো। ঝর্ণার মতো উচ্ছ্বাসপ্রবণ— এটা টের পেয়েছিল আনন্দ যেদিন তাকে দেখতে গিয়েছিল একা। কেউ জানতো না। কেবল জানতেন অমৃতলাল, প্রভার জ্যাঠামশাই— অবশ্য তিনি তো জানবেনই, কন্যাদায় তো তাঁরই— তাঁকে উদ্ধারের জন্য কুসুমকুমারী সত্যানন্দের উদ্যোগ-অনুপ্রেরণায় আনন্দর সেই ঢাকায় যাওয়া। ব্রাহ্ম সমাজ-বাড়ির দোতলার ঘরে তখন আনন্দ অপেক্ষা করছে, জলখাবারের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে প্রভার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে। দরজায় এসে থমকে গেল। জ্যাঠামশাই বললেন, 'এসো! আলাপ করিয়ে দিই।' লুচির থালাটা তার হাত থেকে নিয়ে, 'ইনি আনন্দ— বাবু সত্যানন্দ দাশের জ্যেষ্ঠপুত্র, দিল্লি থেকে এসেছেন। তুমি বসো।' তখনই আনন্দ লক্ষ করেছিল, প্রভার চোখমুখ হেসে উঠছে, সেই হাসি গোপন করতে সে একটা টুলের ওপর পেছন ফিরে বসেছিল, আর হাসির দমকে তার শরীর ফুলে-ফুলে উঠছিল। জ্যাঠামশাই তখন বলছেন, 'এ লাবণ্যপ্রভা, আমার মৃত যে ভাইয়ের কথা তোমাকে বলছিলাম, তার মেজো মেয়ে।' তারপর প্রভাকে ধমক দিতেই সেই ঝরণার ধারা যেন রুদ্ধ জল...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর কবে যেন চিরতরে— অথচ এই সেদিনও প্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আনন্দ স্পষ্টত তার কিশোরী সময়কে দেখতে পেতো, যেমন বলেছিল প্রভা— উশ্রী নদীর জলে পা ডুবিয়ে ব'সে আছে, তিরতির বয়ে যাচ্ছে নদী কিংবা এক পাথরখণ্ড থেকে আর এক পাথরখণ্ডে লাফিয়ে-লাফিয়ে যাচ্ছে, যেন-বা প্রজাপতি; প্রজাপতি ভাব এই সেদিনও সে স্পষ্ট অনুভব করেছে— এখন যেন ডানা ছিঁড়ে গেছে। কবে ছিঁড়েছিল, অন্তত আহত হয়েছিল? আনন্দর অনুমান, সেদিন— যেদিন প্রভা নিতান্ত কৌতূহলবশে, হয়তো খানিক সন্দেহও ছিল তাতে, জিগ্যেস করেছিল, 'তুমি কতদিনের ছুটিতে এসেছো?'

এরকম একটা প্রশ্ন যে প্রভা করতে পারে কিংবা অন্য কেউ— তা যেন আনন্দর ধারণার বাইরে ছিল। ফলে চট্ ক'রে কোনো উত্তর দিতে পারলো না। এ ক'মাসে প্রভা আনন্দর স্বভাব-আচার-আচরণবিধি সম্পর্কে খানিকটা আন্দাজ করতে শিখেছে। সে বললো, 'দিল্লি যাচ্ছো কবে?'

চট্‌জলদি উত্তর, 'যাচ্ছি না।'

—'সে কী! কেন?'

আনন্দর একটু মজা করতে ইচ্ছে হয়েছিল, বলেছিল, 'যেতে ইচ্ছে করছে না। কতদূর— একা-একা— তুমি এখানে থাকবে, একা।' কিন্তু ওইসব কথায় মজা পাওয়ার মতো কিছু ছিল না হয়তো, অন্তত প্রভা মজা পায়নি। বরং তার মনে যে একটু সন্দেহ ছিল, তা প্রকাণ্ডরূপ নিলো আর ভ্রূ কুঁচকে সে বললো, 'সত্যি ক'রে বলো তো— কী হয়েছে তোমার?' সেই প্রথম লক্ষ করেছিল, দীঘির পাড় থেকে সমস্ত সবুজ উধাও— সে এক অচেনা চোখ, চোখের দৃষ্টি— এ মেয়ে সত্য জানতে চায়, গোপন করা ঠিক হবে না, আনন্দ বলেছিল, 'চাকরিটা নেই।' যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিল প্রভার মাথায়।

—'কই, আগে বলোনি তো! কবে জানলে?'

—'দিল্লি থেকে আসার আগেই জেনেছিলাম।'

—'তুমি বিয়ে করলে কোন্ সাহসে?'

প্রভার মুখের দিকে তাকালো আনন্দ— এ মেয়েটিকে সে যেন কোনোদিন দ্যাখেনি। একটা অচেনা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার ঘরে— বিপন্ন, বিধ্বস্ত; সে তার তলপেটে দু'হাত রেখে যেন কোনো কিছুর ভেঙে পড়াকে সামলে নিতে চাইছিল। আনন্দ বলেছিল, 'ভেবেছিলাম, এ ক'মাসে পেয়ে যাবো আর একটা—' তারপর যেন নিজেকে শোনালো, 'বাস্তবিক পাওয়া উচিত ছিল।' তারপর সে বিড়বিড় করলো, 'তব, এখনও পাইনি— এটাও বাস্তব।'

আর এই বাস্তবের ভয়ঙ্কর রূপ যে কী হ'তে পারে তার খানিকটা আন্দাজ ততদিনে করতে পেরেছিল প্রভা— সংসারে নিত্য অভাব-অনটন, কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েও যে এক-একজন মানুষের ক্ষোভ-দুঃখ-অভিমান দৃষ্টিকটুভাবে প্রকাশ পায় কণ্ঠস্বরে, ঠোঁট ফোলানিতে

গোমড়া মুখে কিংবা বাসনপত্রের ঝনঝনানিতে— সেটা তার নজর এড়ায়নি, শ্রবণেও ধরা পড়েছে— প্রভার খুব অবাক লাগে— যে শাশুড়িমাতা তাকে দেখে তাঁর ছেলের বউ ক'রে এনেছেন, তাঁরও ব্যবহার কেমন যেন— তার স্বামী বেকার ব'সে আছে, সেটাও যেন তার অপরাধ, যেন সে আনন্দকে কাছ-ছাড়া করতে চায় না।

—'শোনো। তুমি কিছু একটা করার চেষ্টা করো। যা কিছু। অন্তত এখানে তুমি থেকো না। চ'লে যাও, কোথাও— ঢাকা, কোলকাতা— অন্তত এরা জানুক আমি তোমাকে আঁচলে বেঁধে রাখিনি।' একথা প্রথম যেদিন প্রভা বলেছিল, ওই কথার মধ্যে না-বলা আরও কত কথা-যে ছিল— আনন্দ কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়েছিল। একটা বিপন্ন আশালতা দারিদ্রের তীব্র দহনে শুকিয়ে যাচ্ছিল, তাকে উজ্জীবিত করা প্রয়োজন— অনুভব ক'রেও, তার যে কিছুই করার নেহ, এটা এত রূঢ়ভাবে তার জানা ছিল যে, আনন্দ কিছু বলতেও পারেনি— অন্তত সামান্য আশ্বাসের কথা যদি সে বলতে পারতো! আর তখনই প্রভার বিষণ্ণ আর্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে আনন্দর মনে হয়েছিল প্রভা যেন ডানাছেঁড়া প্রজাপতির মতো প'ড়ে আছে সর্বানন্দ ভবনে।

আনন্দ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। কোথায় প্রেম? বিবাহিত জীবন একটা চুক্তির জীবন। অভাব-অনটনে নানা আশার অচরিতার্থতায় সে চুক্তিও কেমন ধ'সে যায়— বেশ টের পাচ্ছে আনন্দ; তবু টিকে থাকে, টিকে আছে এখনও, করুণা-মমতায়; প্রেম নেই কোথাও— কারও প্রতি কোনো মুগ্ধতা নেহ, প্রভার রূপ ঝ'রে গেছে, চোখ-দুটো ফ্যাকাসে নিরক্ত ক্লান্ত— স্বভাব-মেজাজ কেমন খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছে— প্রেমে তো একটা মুগ্ধতা থাকার প্রয়োজন, দাম্পত্যেও— থাকলে তবেই প্রেম পল্লবিত হয়— এরকম ভাবনায় বিমর্ষ হ'তে গিয়ে আনন্দ ভাবলো মুগ্ধ হওয়ার মতো জিনিস তো ছিল প্রভার মধ্যে। আমার মধ্যেও কি ছিল না— অন্তত একজন তো... দারিদ্র কি তাহলে মানুষের জীবন থেকে সব মুগ্ধতা ঝরিয়ে দেয়?

—হ্যাঁ। বড় উদাহরণ তো তুমি নিজেই।

—না। দারিদ্র বাহ্যিক অবস্থা কিংবা জাগতিক, কিন্তু মুগ্ধতার বিষয় আত্মিক— স্পিরিচুয়াল— আমি তো এখনও মুগ্ধ হ'তে চাই প্রভার দু'চোখে চোখ রেখে, কিন্তু...

—প্রভাকে মুগ্ধ করার মতো তোমার কিন্তু কোনো জিনিস নেই।

—জানি।

—তাহলে আর দাম্পত্য প্রেম কীভাবে জন্মাবে! তুমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারো— প্রভাকে সেই গল্পটা শুনিয়ো, গিফ্‌ট অব মেজাই! তারপর, হয়তো একদিন তোমাদের দাম্পত্যই হয়ে উঠবে যথার্থ একটি প্রেমের গল্প।

আনন্দকে যেন ইদানিং গল্পে পেয়ে বসেছে। প্রায় দু'বছর সে কোনো কবিতা লেখেনি। হয়তো সে-কারণে গল্পের ভাবনা বেশি ক'রে ভাবছে সে— জীবনকে একটা গল্পের কাঠামোয় দাঁড় করাতে না-পারলে— কী হবে এই জীবন নিয়ে? এমন হয়েছে— যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা চাকরি পেলেই এ-জীবন মহাকাব্যিক বিস্তার পাবে। অথচ বিয়ের প্রথম দিকের কয়েক মাস, এ সংসার, সংসারের সব সদস্য যে-অর্থব্যবস্থার মধ্যে ছিল, তার থেকে খুব একটা হেরফের কিছু হয়েছে ব'লে মনে হয় না, তব, সেই প্রথমদিকে একটি সার্থক গল্প অন্তত প্রভা আর আনন্দকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল— সে-গল্পকে ঠিক দাম্পত্যের গল্প হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু তা অনুভব করা যাবে। গল্পটা এভাবে শুরু হ'তে পারে:

মিলুর বিয়ের পর সর্বানন্দ ভবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা— একটা বাথরুম তৈরি হয়েছে। প্রভার জন্য। আর দ্বিতীয় ঘটনা সর্বানন্দ ভবনে পুলিশের আগমন। সেই বঙ্গভঙ্গ-যুগ থেকেই সর্বানন্দ ভবনের মানুষজন স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত। চরমপন্থাকে মেনে নিতে পারেনি কেউ-ই। অতএব পুলিশ আসার প্রশ্নই ছিল না।

আনন্দ সেই ঘটনাটাকে ফিরে দেখছে: মাধবীলতার একটা ডগা মুচড়ে দিয়ে কয়েকজন পুলিশ আর তিনজন লোক সর্বানন্দ ভবনে ঢুকছে। পুলিশ দেখে সকলেই তটস্থ। কিছু কৌতূহলী, অতি উৎসাহী লোকজন, ছেলেবুড়ো রাস্তার ওপর গেটের পাশে দাঁড়ানো। আনন্দ তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লোক-তিনজনের একজন তাদের পরিচয় জানালো— তারা আই.বি. দপ্তর থেকে এসেছে।

—'লাবণ্যপ্রভা দাশ কে?'

—'আমার স্ত্রী।'

—'মিসেস দাশের নামে ওয়ারেন্ট আছে। আমরা তার ঘর সার্চ করবো।'

আনন্দ নীরবে বাঁ হাত পেছনদিকে প্রসারিত ক'রে তার ঘর দেখিয়ে দিলো।

তল্লাসি চলতে থাকলো। কবিতার খাতাগুলো নির্মমভাবে উল্টে পাল্টে দেখলো ওরা। পদস্থ অফিসার টেবিলের ওপর পা ঝুলিয়ে ব'সে 'ঝরাপালক'-এর পাতা ওল্টাচ্ছিল।

তেমন কিছু পাওয়া না-গেলেও একেবারে শেষের দিকে একটা বই দেখিয়ে খাটের ওপর বসা অফিসার, প্রভাকে যে জেরা করছিল, জিগ্যেস করলো, 'এ বইটা কার?' বইটাকে দেখলো আনন্দ— আয়ারল্যাণ্ড বিপ্লবের ইতিহাস, বইটা তারই আনা, রমেশ তাকে পড়তে দিয়েছিল তার বিয়ের বেশ কিছুদিন আগে। সেভাবে পড়া হয়নি। বইটির কথা ভুলেও গিয়েছিল সে। কী উত্তর দেবে— একটু ভাবতে গিয়ে যে-সময়, তার মধ্যেই প্রভা ব'লে উঠলো, 'আমার।'

বইটা তুলে ধ'রে নাচাতে-নাচাতে অফিসার আনন্দকে বললো, 'দেখলেন তো, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে বিপ্লবীদের সম্পর্ক রয়েছে!'

প্রভার মুখের দিকে এক পলক তাকালো আনন্দ। কিন্তু হতবাক। তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'না, ওর সঙ্গে বিপ্লবের কোনো যোগাযোগ নেই।'

তৃতীয়জন তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললো, 'এরা ঢাকার মেয়ে। কতটুকু চেনেন আপনি এদের?' তাদের চেনা যে কতখানি সঠিক, তাও ফুটে উঠলো তার বাচনভঙ্গিতে। খাটের

ওপর বসা অফিসার বললো, 'এরপর কি আপনার আর কিছু বলার আছে?' কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে তার এক হাতে উঠে এলো ওয়ারেন্ট, অন্যহাতে কলম— এন্‌কোয়ারি রিপোর্ট তৈরি হবে।

আনন্দ তখন নিষ্পলক তাকিয়েছিল প্রভার দিকে, দৃষ্টিতে কেমন অসহায় ভাব।

প্রভা বললো, বেশ গম্ভীরভাবেই বললো, 'আছে। কোনো দেশের বিপ্লবের ইতিহাস ঘরে থাকলে যদি বিপ্লবী দলের সঙ্গে থাকা হয়, তাহলে বি.এ. ক্লাসের সব ছাত্র-ছাত্রীদের, বিপ্লবী ব'লে ধরতে হয়— ওটা বি.এ. ক্লাসে ইতিহাসের রেফারেন্স বই হিসাবে পড়ানো হয়। বি.এম. কলেজে গিয়ে যাচাই করতে পারেন।'

ততক্ষণে আনন্দর চোখ থেকে অসহায় ভাব মুছে গিয়ে ফুটে উঠেছে মুগ্ধতা।

—'বি.এ. ক্লাসের বই আপনার কাছে কেন? তাছাড়া এতরকম গল্পের বই থাকতে বিপ্লবের ইতিহাসই-বা পড়েন কেন?'

প্রভা ঝর্ণার ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে হেসে উঠলো। হাসি থামিয়ে বললো, 'আই.এ.-তে আমার ইতিহাস আছে। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসও আমাদের পড়তে হয়।'

তৃতীয়জন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রভাকে বুঝতে চাইছিল। সে বললো, 'তাহলে আপনার নাম আমাদের কাছে এলো কীভাবে?'

—'সে তো আপনারাই ভালো জানেন স্যার।'

কবিতার বই পড়তে থাকা অফিসার বললো, 'আর কেন? এবার নিল্‌ লিখে উঠে পড়া যাক।'

যাওয়ার সময় সে বললো, 'দাশবাবু, কবিতার বইটা কি আমি নিয়ে যেতে পারি?'

আনন্দ বললো, 'অবশ্যই। এ আমার সৌভাগ্য!'

তারা চ'লে যাবার পর, বাড়ির লোকজনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অবসিত হ'লে একান্তে যখন দু'জন— কী-এক মুগ্ধতায় প্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে নিষ্পলক ব'সে ছিল আনন্দ, কেবল দেখছিল নির্বাক!

—'তুমি রাগ করোনি তো?'

—'কেন?'

—'তোমার কবিতার খাতাগুলো যেভাবে ওরা... আমার জন্যই তো।'

—'আমি গর্ব অনুভব করছি প্রভা, তুমি স্বাধীনতার কথা ভাবো, একটু অন্যরকম ক'রে ভাবো ব'লে!'

—'ভাবি আর কই— ভাবতাম!' মুহূর্তের জন্য কেমন যেন উদাস, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল প্রভা, 'আমারও ভালো লাগছে, তোমার ঘরেও বিপ্লবের ইতিহাস—'

গল্পটা এভাবে শেষ হ'তে পাবে: নতুনভাবে একে অন্যকে আবিষ্কারের আনন্দে তারা মুগ্ধভাবে পরস্পরকে দেখছিল।

একটি আলোক নিয়ে বসে থাকা চিরদিন;
নদীর জলের মতো স্বচ্ছ এক প্রত্যাশাকে নিয়ে;

সত্যি-সত্যিই আনন্দ দেখতে পাচ্ছিল প্রভার সেই মুখ, চোখ— চোখের দীপ্তি আর মুগ্ধতা।

—'আচ্ছা, ব'সে-ব'সে এভাবে দিনগুলোকে মাটি করতে তোমার ভালো লাগে?'— প্রভার কণ্ঠস্বর।

—'ভালো লাগছিল— তোমার কথা ভাবছিলাম, তোমার সেই মুখ— মুখের বিপ্লবশ্রী।'

—'শোনো! তোমার মতো অত ভাব আমার আসছে না!'

—'সে আমি জানি। বিয়োনোর ধকলটা তো আর কম না!'

—'কথাবার্তায় একটু কি মার্জিত হওয়া যায় না? তুমি তো কবি, কবিতায় কি এসব লেখো—'

আনন্দ ঘাড় কাত্ করলো। তারপর বললো, 'কিন্তু কবিতা আমি বহুকাল লিখিনি। হয়তো আর লেখা হবে না।'

—'তাহলে হয়তো কিছু হবে তোমার— আমাদের।'

—'প্রভা, তুমি বোধহয় কিছু বলবে ব'লে এসেছিলে!'

—'ওই তো বললাম— মা আর পিসি মিলে গজগজ করছে— কোনো দায়িত্ববোধ হবে না তোমার, লাজলজ্জা বলতে কিছু নেই।'

আনন্দ অদ্ভুত এক হাসি হাসলো। বললো, 'তুমি কি একটু বসবে আমার কাছে?'

—'কেন?'

—'তোমাকে একটা গল্প শোনাতাম।'

—'না। সময় নেই।'

প্রভা চ'লে গেল।

প্রভা এরকমই। আনন্দর কাছে যা খুব প্রয়োজনের, প্রভার কাছে তার যেন কোনো মূল্যই নেই। যে-দৃশ্যকে আনন্দর মনে হয় একটা দেখবার মতো জিনিস, দেখাবার মতো জিনিস— প্রভার কাছে তা খুবই তুচ্ছ; প্রকৃতির এত সুর-ছন্দ-রঙ— কত কীটপতঙ্গ-প্রজাপতি— কোনোকিছুর প্রতি প্রভার কোনো বিস্ময় আছে ব'লে মনে হয়নি, প্রভাবে সে মুগ্ধ হ'তে দ্যাখেনি কখনও; তবু তার রূপ দিয়েই আনন্দ তার নিজের জীবনকে মুগ্ধ ক'রে নিতে পেরেছিল, সে রূপ ঝ'রে যাচ্ছে। কেমন যেন মনে হয় তার নিজেরই পাপে। নারীসৌন্দর্য যদি প্রতিভা-প্রয়াসে ফলানো যেতো তাহলে হয়তো প্রভাকে রিপেয়ার ক'রে নিতে পারতো। আনন্দর মনে হয়, এ এক অন্তর্গত ক্ষয়, হয়তো একেই বলে বন্দিত্বের অসুখ, বাস্তবিক সর্বানন্দ ভবনের এই চৌহদ্দির মধ্যে যেন খাঁচার পাখি প্রভা; নিজস্ব একটা বাড়ি না-হোক, একটা বাসা চেয়েছে সে— 'তাহলেই আমার মুক্তি।'

প্রভা মুক্তি চায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনি চেয়েছিল ঝড়ের বাতাস।

এই চাওয়া-মাফিক যদি কোনো প্লট পাওয়া যেতো তাহলে হয়তো কোনো গল্প... ছড়িয়ে পড়তো ভালোবাসার সৌরভ। আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'ফ্লেভার অব লভ।' সুগন্ধ আস্বাদনের অনুভবের মুদ্রা ফুটে উঠলো আনন্দর সমস্ত শরীরে। নিমীলিত দু'চোখের পাতা। মনিয়ার মুখ ভেসে উঠলো। এতদিন পরও! এত স্পষ্ট!

গত জুলাই মাসের শেষের দিকে, মনিয়াকে খুব মনে পড়েছিল— একদিন যাদের ব্যবহারে প্রেমের স্পর্শ পেয়েছে তাদের দিক থেকে এখন উপেক্ষা অনাদর ছাড়া আর কিছুই পাওয়ার নেই তার, কিন্তু স্মৃতিগুলো ভারী সুন্দর— মনিয়া মাইথ ফ্লেভার মাই লাইফ উইথ লভ— পারতো; বাট— মনিয়ার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সেই সম্ভাবনাও বিলীন, এরকমই ভেবেছিল আনন্দ; কিন্তু বনির সঙ্গে আলাপের পর, সে বুঝতে পেরেছিল, বিলীন হয়নি— ঘুমিয়ে পড়েছিল, আগ্নেয়গিরির মতো ফের জেগে উঠেছিল, জাগিয়েছিল, বনি— কিন্তু বনি আজ কতদূরে!

আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'সব মানুষই গল্পের পৃথিবী চায়।'

—তবু কেউ-কেউ অনুভবের পৃথিবীই চায়, বনি চেয়েছিল—

—চেয়েছিল নাকি?

—না-চাইবে যদি, কীভাবে এসেছিল সে আমার কবিতার পৃথিবীতে?

—এসেছিল নাকি?

—আসেনি! তবে এ স্মৃতি কোথা থেকে পেলাম আমি? এই আকাঙ্ক্ষা? সত্তাকে ভুলে থাকতে আমি ফের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছি— এও কি মিথ্যে তবে!

—মিথ্যে মিথ্যে— মায়া!

—হয়তো-বা। কিন্তু না, সে এসেছিল। তার আসাটা সত্য।

—চ'লে গেছে, তা-ও সত্য।

—তবে মিথ্যা কোন্‌টা?

—অনুভবের পৃথিবী। তাই বুঝি সে— কবিতার জগৎ থেকে দূরে স'রে গেছে!

—তাকে ডেকে নিয়ে গেছে গল্পের পৃথিবী।

—না। হয়তো তা-ও ঠিক নয়— আমার কবিতার পৃথিবীতে তার উপযুক্ত ফসল ফলছিল না ব'লে— কবিতাও তো বলে আশা আর অপেক্ষার কথা, আমি শোনাতে পারিনি, কিন্তু জীবন অপেক্ষায় বাঁচে, আশায়— আমার কোনো আশা নেই— এই-যে পৃথিবীতে হেমন্ত এসেছে, বাতাসে ভাসছে ফসলের গান, সুপারির গাঢ় সবুজ থেকে ঝ'রে যাচ্ছে নীল...

গায়ের চাদরটা যেন আরও জড়িয়ে নিয়ে জড়োসড়ো বসলো আনন্দ।

—কবিতার আশাও নেই?

—না।

—অপেক্ষা?

—আছে।

—কীসের অপেক্ষা?

—সেই চৈতন্য, যাকে ভালোবাসবার আকাঙ্ক্ষা আমার, এই বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি যার মুগ্ধতা আছে। যে ক্লান্তির সময় তার সমস্ত ভার আমাতে অর্পণ করতে দ্বিধা করবে না, কিংবা আমি; আমার চৈতন্যের খামতিটুকু সে পূর্ণ ক'রে দেবে।

—বনির তো ছিল মুগ্ধ হওয়ার মতো একটা মন!

—ছিল। হয়তো আছেও।

—কিন্তু আনন্দ, একটু ভেবে দেখো, এসবই অ্যাবসার্ড; নয় কী? পৃথিবীর সম্পর্কের ইতিহাসে— এসব কোথাও ঘটেনি।

—ঘটেছে। আমরা তাকে ভুলে গেছি। তাই মনে হয় ইতিহাসে নেই। কিংবা আছে। আমরা খুঁজি না। আমাদের চোখ নেই। কিংবা আমরা স্বীকার করিনি সেই কন্ট্রিবিউশন।

—একটা উদাহরণও কি দিতে পারবে তোমার পক্ষে?

আনন্দ মাথা চুলকালো। তার মনে পড়লো কবি অশ্বঘোষ আর প্রভার কাহিনী—

—কাহিনী! ফিক্‌শন্‌! তাও সেই কবি!

—শুধু কবি নন, নাট্যকার— প্রথম ভারতীয় নাট্যকার!

—অশ্বঘোষ-প্রভার মিথ্‌টাকে তুমি ইতিহাস ব'লে মনে করো?

—মিথ্‌ তো ইতিহাসবর্জিত নয়!

—তুমি বিশ্বাস করো, অশ্বঘোষের কবিপ্রতিভাকে শাশ্বত তরুণী হয়ে, শাশ্বত সুন্দরী রূপে প্রভা চিরদিন প্রেরণা যুগিয়ে যাবে— এমন আকাঙ্ক্ষায় সে আত্মদান করেছিল, সেটা আত্মহত্যা ছিল না?

—হ্যাঁ, করি। আর বিশ্বাস করি ব'লেহ, অপেক্ষায় থাকা— হয়তো একদিন বনি ফিরে আসবে, কিংবা, এরকমও তো মনে হয়, দু'বছর আগে লেখা কবিতাগুলো লেখানোর জন্যই বনির এই দূরে চ'লে যাওয়া। যদি ফিরে না-ও আসে, তবু, কৃতজ্ঞ থাকবো— আমি যেন বনির অমর্যাদার কারণ হয়ে না-উঠি।

আনন্দ এখন স্পষ্ট বনির সেই অপার্থিব হাসি দেখতে পাচ্ছে, ওই হাসির মধ্যে লুকিয়ে আছে তার-প্রতি বনির গভীর অনুরক্তির প্রকাশ; ওই চোখে রয়েছে এমন এক দৃষ্টি যার সম্পাতে পৃথিবীর সব বিষণ্ণ রঙ ধুয়ে গেছে।

কখন প্রভা এসে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল করেনি আনন্দ। প্রভা বললো, 'ব'সে-ব'সে তুমি ঘুমুচ্ছিলে?'

—'কই না তো!'

—'ঘুমুচ্ছিলে— দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলাম, বুড়ো খোকার দেয়ালা। একদম খুকির মতো।'

আনন্দ চুপ ক'রে থাকলো। ভাবলো, রোমন্থনেও এত আলো! আর ওই ভাবনাটুকুতেই সে আবারও বিষণ্ণ হয়ে পড়লো। পরক্ষণেই প্রভার দিকে তাকালো, 'কী দেখলে, আমি হাসছিলাম?'

প্রভা যে ঠিক কী দেখেছিল, আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে সেইটা বোঝার চেষ্টা করছিল, বললো, 'ঠোঁটের কোণে হাসি তো ছিলই, তাছাড়া আরও কী যেন।' আনন্দ প্রভার চোখে চোখ রাখতে চাইলো, প্রভা চোখ সরিয়ে নিয়ে বললো, 'কেরোসিন তেল নেই, মা বললো তোমাকে আনতে যেতে হবে।'

আনন্দ বললো, 'যাচ্ছি। আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি সেই গল্প শুনতে এলে!'

কোনো কথা না-ব'লে কেবল মুখ ঘোরানিতে যা বলার ব'লে প্রভা চ'লে যাচ্ছে— তার চ'লে যাওয়ার মধ্যেও বিরূপ ভাব সেদিন, শেষ যেদিন এসেছিল বনি, কী ভাব প্রকাশ ক'রে যে সে চ'লে যাচ্ছিল— এখানে ব'সে তুমি দেখছিলে তাকে। এখন স্পষ্ট কল্পনা করতে পারলো আনন্দ সে-দৃশ্য— দ্বিধা ছিল, যেন পিছুটান, তবু যেতে বাধ্য হওয়া।

আনন্দ বুঝতে পারছিল স্মৃতি তার সত্তাকে গ্রাস ক'রে ফেলছে। সেই গ্রসন থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যই বোধহয় সে তেড়েফুড়ে উঠে দাঁড়ালো।

তখনই কে যেন বললো, চ্যারিশ হার স্মাইল!

আনন্দ নিজের চারপাশে তাকালো। বিভ্রম মনে ক'রে সে উঠোনে এসে দাঁড়ালো। হেমন্তের সন্ধ্যা নামছে, কুয়াশা— শালিকের কিচিরমিচির, হাঁসেদের ঘরে ফেরার গান ছাড়া আরও কত সব আওয়াজ— তার মধ্য থেকে আনন্দ আবারও শুনতে পেলো, নেভার ফর্‌গেট হার বীমি আইজ!

আনন্দ তার চারপাশের নির্জনতার মধ্যে তখন কাউকে অনুভব করার চেষ্টা করছিল।

সেদিকে যাবার পথে চোখ তার ভর্ৎসনা বেদনা ভয় থেকে মুক্তির মতন
আকাশ নদীর জল শ্মশান এয়ারোড্রাম ঝাউয়ের সাগরে
হঠাৎ সকলই সূর্য— নিজেও সে সূর্য একজন।

বেকার জীবন যত দীর্ঘ হচ্ছিল, আনন্দ তত কুঁকড়ে যাচ্ছিল। আর ভাবছিল, এত বড় ভুল সে কী ক'রে করতে পারলো! স্বামী হওয়ার যোগ্যতা তার ছিল না— একথা আনন্দ নিজে যেমন জানতো, তেমন অন্যরাও জানতেন; বিশেষ ক'রে মা-বাবা। তবু কেন যে...

এক-একসময় প্রভা অদ্ভুত তাকিয়ে থাকে আনন্দর মুখের দিকে, কেমন করুণ আর্ত সে চাহনি। অবিশ্বাস্য কিছু— কিন্তু অস্বীকার করার উপায় না-থাকলে যে মনোভাব ফুটে ওঠে চোখের তারায়, তারও আভাস থাকে। কিংবা অদৃষ্টের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার পরও যে অসহায় ভাব, তারও ছায়াপাত— এরকমই মনে হয় আনন্দর। আর, সব মিলিয়ে প্রভাকে কেমন দুঃখী, দুঃস্থ দেখায়। একটা করুণাবোধ জেগে ওঠে। মনটা একটু নরম হয়ে আসে; আর তখনই আনন্দর মনে হয় করুণা করার জন্যও যোগ্য হ'তে হয়। যাকে প্রেম দেওয়ার কথা, তাকে করুণা করার মতো জায়গায় যখন থাকে না প্রেমিক— তখন দুটো মানুষই কি নষ্ট হয়ে যায় না?

প্রভা যখন বলে, 'তুমি আমার জীবনটাকে নষ্ট করেছো।' তখন আনন্দর আর্তনাদ ক'রে উঠতে ইচ্ছে হয়, 'প্রভা, আমিও ধ্বংস হয়ে গেছি!' কিন্তু বাস্তবত সে চুপ থাকে। তখন আশ্চর্য এক স্তব্ধতা নেমে এসে তাদেরকে জড়িয়ে ধরে। প্রভা মনে করে তার অনুযোগ আনন্দ মেনে নিয়েছে। আর তখনও আনন্দর কিছু বলতে ইচ্ছে করে— শুশ্রূষার মতো কোনো কথা।

একদিন আনন্দ বলেছিল, 'প্রভা, আমি ভাবি— যে-তুমি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ছিলে, এত বড় একটা ভুল সেই তুমি কীভাবে করতে পারলে!'

—'বিয়ে করাটাকে তুমি ভুল বলছো?'

—'হুঁ।'

—'তা যদি বলো— ভুল আমি একা করিনি— সবাই মিলে করেছি।' তারপর কী ভেবে বললো, 'ভুলই-বা বলছো কেন— এ আমার কপাল!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর, 'কিছু মনে কোরো না, বিয়ে আমি করতে চাইনি। জ্যাঠামশাইকে খুব দৃঢ়ভাবেই জানিয়েছিলাম।' প্রভা যেন সেই দৃশ্যের মধ্যে ডুবে গেছিল, তার কথায় আনন্দ স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছিল:

—'তুমি-যে বিয়ে করতে চাইছো না— কেন?' অমৃতলালের স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর।

প্রভা নীরব। মাথা নিচু।

—'তোমার দিদির বিয়ের কথা চলছে। হয়তো শিগ্‌গিরি ঠিক হয়ে যাবে। আমার শরীরের অবস্থা খুব একটা ভালো না, আমি চোখ বুজলে কে দেখবে তোমাকে?'

আনন্দ শুনছিল, 'তখন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমি আমার একুশ বছর পর্যন্ত জীবনটাকে এক ঝলক দেখে নিলাম— বাবার মৃত্যুর পর, আমার তখন সাত বছর, আমার মা তাঁর চার সন্তানকে নিয়ে তাঁর বাবার বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন— বাবার মৃত্যু শ্রাবণে, মা-ও চ'লে গেলেন অঘ্রাণে'— এসব কথা আনন্দ এর আগে শুনেছে, অমৃতলাল তখন ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের কাজে গিরিডিতে, প্রভার জায়গা হয় ব্রাহ্ম স্কুলের ছাত্রীনিবাসে— পিতৃ-মাতৃহীন জীবন যে কী!— 'ঠিকই তো, কে আছে আর আমার! তবু বললাম, অন্তত বি.এ.-টা পাশ করি। তিনি তখন বললেন, বিয়ের পরও তুমি পড়তে পারবে। আর কী আপত্তি করতে পারতাম আমি?'

—'কেন, তুমি বলতে পারতে, আমাকে তোমার পছন্দ হচ্ছে না।' বিদ্রূপের হাসি হেসে প্রভা বলেছিল, 'পুরুষেরা-যে সোনার আংটি!'

—'কিংবা তুমি বলতে পারতে— দেশমাতৃকার পায়ে তুমি নিজেকে উৎসর্গ করেছো!'

—ব্যঙ্গ করছো?

—'না! একটুও না।'

—'কত কিছু পারা যেতো ব'লে মনে হ'তে পারে এখন, কিন্তু কিছুই তো পারিনি— সেসব কথা তুলে কেন কষ্ট দিতে চাও তুমি?' একটু চুপ থেকে বলেছিল, 'যেটা হয়েছে, সেটাও তো ভালো হ'তে পারে।' কথাটা শেষ ক'রে আনন্দর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রভা আক্ষেপের সুরে বলেছিল, 'তাও হবার নয়— এটা বুঝেছি, কোনো উদ্যম নেই তোমার!'

তার সম্পর্কে প্রভার এই মূল্যায়ন যথার্থ, তবু কেন যেন মেনে নিতে পারে না আনন্দ— মন খারাপ হয়, কিন্তু এ-ব্যাপারে মন খারাপ করাও যে অনুচিত— এই উপলব্ধি তাকে আরও বিপন্ন ক'রে তোলে।

এই বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি তার যে মুগ্ধতা, যার প্রকাশে তার মা-বাবাও খুশি হয়েছেন, বিস্মিত হয়েছেন এবং সে প্রশংসিত হয়েছে— সেই মুগ্ধ হওয়ার মতো মনটিও রয়ে গেছে—। ছড়ানো আকাশ, নীল পটভূমিতে একটি চিলের ভেসে থাকা দেখে আজও আনন্দর মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য, কাকের মুখে খড়কুটো— কী গভীর আকাঙ্ক্ষা আর আশ্রয়ের তাৎপর্য নিয়ে যে হাজির হয়! —এসব উপলব্ধি-অনুভব ভাগ ক'রে নেওয়ার মতো কেউ নেই! কেউ নেই যখন আমিও কারও নই।

—ওই একরত্তি মেয়েটিরও কি কেউ নও তুমি?

এ প্রশ্নকে এড়ানো সম্ভব নয়— ওই মেয়েটিও তো একটি দৃশ্য— দর্শনীয় বস্তু— ওর হাসি, কচি হাত বাড়িয়ে দেওয়া— কাকের মুখে খড়কুটো— এই দৃশ্যের সঙ্গে কোথায় যেন ওই মেয়েটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে— এড়ানো অসম্ভব জেনে আনন্দ আরও বিমর্ষ হয়ে পড়লো। সে যেন দিশাশূন্য অসহায়— তার চোখ খুঁজছে অবলম্বন। আচমকা তার নজরে পড়লো কৃষ্ণচূড়া—

আনন্দ যখন অক্সফোর্ড মিশনের হোস্টেলবাড়িতে থাকতো, সেখানে সে কৃষ্ণচূড়া ফোটা দেখেছিল, যেন আগুনের শিখা জ্বেলে ফুলগুলো ফুটে থাকে— মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো জিনিস— তারপর কবে যেন সে কোলকাতা থেকে একটা চারা নিয়ে এসে পুঁতেছিল— কতদিন হয়ে গেল— ওই গাছটার মতো মঞ্জুও, ঠিক যেন বাড়ছে না, সেই এটুখানি পুঁচ্‌কে। ডাক্তার বলেছে অপুষ্টি। প্রভার বুকে দুধ নেই। দুধের যোগান বাড়ানো দরকার। কিন্তু সর্বানন্দ ভবনের আয় বাড়ার কোনো সম্ভাবনা আপাতত নেই। কী এক অস্থিরতায় আনন্দ উঠে বসলো।

প্রভা বললো, 'তুমি জেগেও স্বপ্ন দ্যাখো না কি?'

—'দুঃস্বপ্ন।'

—'কী?'

—'তুমি মমি হয়ে যাচ্ছো।'

—'আমি ম'রে গেলে তুমি শান্তি পাও, না?'

খুব আত্মগতভাবে বললো, 'মঞ্জুকেও দেখলাম।'

—'কী দেখলে?'

—'সেও মমি হয়ে যাচ্ছে।'

পাশে ঘুমিয়ে থাকা মঞ্জুকে দেখলো প্রভা— আটমাস হ'তে চললো, তেমন বাড় নেহ, হাত-পায়ের চামড়াগুলো এখনও কেমন কোঁচকানো, চোখ-দুটো কোটরে ঢোকানো— প্রভার চোখে সেই করুণ-আর্ত চাহনি।

আনন্দ বললো, 'ভাবছি কোলকাতায় যাবো।'

—'সে তো কবে থেকে শুনছি।'

—'কোলকাতায় যাবার টাকাও তো জোগাড় করতে পারলাম না—'

—'এবার পারবে?'

—'দেখি। বাবাকেই বলবো ভাবছি।'

—'একটা কথা জিগ্যেস করবো?'

—'বলো!'

—'তুমি যেদিন দেখতে গিয়েছিলে— জ্যাঠামশাই যখন তোমাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, মনে আছে তোমার, তিনি কী বলেছিলেন?'

আনন্দ তাঁর কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করলো, যথাযথ সব মনে না-পড়লেও একটা কথা অবিকৃতভাবে তার মনে এলো, 'উনি দিল্লির রামযশ কলেজে অধ্যাপনা করেন।' আনন্দ— মনে আছে ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।

—'তখন তো তোমার অধ্যাপনার চাকরিটা ছিল না।'

আনন্দ অপরাধীর মতো মাথা নাড়লো।

—'তখন তুমি কেন বলোনি, চাকরিটা তোমার নেই?'

এ প্রশ্নটা সে নিজেকেও করেছে অনেকবার, কেন আনন্দ— কেন গোপন করেছিলে?

—বনির স্মৃতিকে আমি প্রভার সত্তায় লোপ করতে চেয়েছিলাম। ওঃ! আমি যদি বোদলেয়রের মতো... ব্রথেলের পথে আমিও তো হেঁটেছি, চোখে আশ্চর্য গভীরতা নিয়ে কোনো-কোনো মেয়ে তো ইশারা রেখেছিল— যদি পারতাম!... পারেনি ব'লেই কেবলমাত্র রক্ত-মাংসের দাবির কাছে নতিস্বীকার ক'রে আনন্দ ওই সত্যকে গোপন রেখেছিল। আনন্দ তার গভীর বিমর্ষতাকে আড়াল করার জন্য বললো, 'বিয়েটা ভেঙে যাক আমি চাইছিলাম না। আর আমি তো তোমাকে বলেছি— ভেবেছিলাম, চাকরি একটা পেয়ে যাবো।'

—'অথচ পেলে না— সম্ভাবনাও কি আছে? নেই। অন্তত ফুলশয্যার রাতেও যদি তুমি বলতে...

—'কী হতো বললে?'

প্রভা ক্ষিপ্তভাবে মঞ্জুকে নির্দেশ ক'রে বললো, 'এর আসাটাকে বন্ধ করতে পারতাম!' প্রভার চোখে এভাবে আগুন জ্ব'লে উঠতে এর আগে দ্যাখেনি আনন্দ। অপমান আর গ্লানিতে সে রুদ্ধবাক্। প্রভা ঘৃণা ছিটিয়ে বললো, 'কাছে আসতে না-দেওয়াটা সেই রাত থেকেই শুরু হয়ে যেতো।'

এখন রক্ত-মাংসের স্বাদ পাওয়ার কোনো সাধ নেই প্রভার— বরং এক ধরনের বিতৃষ্ণা তাকে যেন পেয়ে বসেছে, খিট্‌খিটে ক'রে তুলেছে তাকে। সাধ নেই ব'লেই কি তার মেদ-মাংস ঝ'রে যাচ্ছে? জীবনটাকে এত রূঢ়-রুক্ষ ব'লে দেখছে ব'লেই কি এত বিতৃষ্ণা? অভাব-অনটনের মধ্যেও তো মানুষ বেঁচে থাকে— তারা কি জীবনকে উপভোগ করে না! রাস্তার কুকুর-বেড়াল?

—তব, তোমার তো নিজেকে মনে হয়েছে কুকুর-বেড়ালেরও অধম!

—তব, মানুষ তো! অসফল, ব্যর্থ— কিন্তু আজও তো জ্যোৎস্নারাতে শিশির পড়ার শব্দের ভিতর কোনো এক জন্মের স্মৃতি যেন জেগে উঠবে— এমনই মনে হয়। কিংবা দুটো পাখি— পালকে পালক ডুবিয়ে— এ দৃশ্যে সংসর্গ ও সমবেদনার যে শান্তি রয়েছে তা যেন ফলবে আমাদেরও জীবনে, মনে হয়, মানুষের জীবনে, ঘটা উচিত। এই আশা আর প্রকৃতির দিকে তাকালে জীবনকে তো শুকিয়ে যাওয়ার জিনিস মনে হয় না!

প্রভা শান্ত হয়ে আসছে। তার চোখে জ্ব'লে ওঠা আগুন নিভে গেছে। এখন সেখানে জমছে অশ্রু-বাষ্প। বেদনাবোধ, সহমর্মিতা— সবই রয়েছে প্রভা-তে, তবু কবিতার পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ গ'ড়ে ওঠেনি। স্কুলপাঠ্য কবিতাও সে মন দিয়ে পড়েনি, এমন-কী— 'অন্তত একটা ছড়া— জল পড়ে/পাতা নড়ে/পাগলা হাতি মাথা নাড়ে— এরকম কিছু?' প্রভা লাজুক হেসে বলেছিল, 'কিছু মনে নেই সেভাবে।'

'ঝরাপালক' বইটা সে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে— পড়ার চেষ্টাও করেছে, দেখে

অন্তত সেরকমই মনে হয়েছে আনন্দর কিন্তু প্রভা কিছু বলেনি। তার মুখ দেখে মনেও হয়নি যে, কাব্যবিভা তাকে আলোকিত করেছে। তবু আনন্দ চেষ্টা করেছে— আনন্দ জানে— কবিতা শেখানো যায় না; কবিতার প্রতি আগ্রহ ইন্‌টিউটিভ, স্পিরিটুয়াল ব্যাপার; তব, প্রভার মধ্যে স্পিরিট জিনিসটা যে নেই— এটা ভাবতে পারে না আনন্দ— সব মানুষের মধ্যে যা থাকা স্বাভাবিক প্রভার মধ্যে তা থাকবে না— এ ভাবনাটা বিদ্বেষ-প্রসূত; এই বিদ্বেষ-বিষ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যই আশাকে আঁকড়ে ধরেছে আনন্দ— একদিন ঘটবে, সামান্যতম হ'লেও, স্পিরিটুয়াল রিলিজ ঘটবে; আর ঘটলেই প্রভা নিজেকে আবহমান কালচারের অনুসারী ক'রে তুলবে— হয়তো কেবলমাত্র নিজের শান্তির জন্য। আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'অ্য লিটল স্পিরিটুয়াল রিলিজ—' দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'মানুষ যে কী চায়!'

—'কিছু বললে?' প্রভার কণ্ঠস্বর কত কোমল। প্রভা কিছু শুনতে চায়। তার প্রত্যাশামতো কী বলতে পারে আনন্দ? ভালোবাসার কথা— নেই। আশার কথা— তাও নেই। ভাবতে-ভাবতে নিজের অজান্তেই আনন্দর মাথাটা 'কিছু না' ভঙ্গিতে মৃদু ন'ড়ে উঠলো। প্রভার মুখে যতটুকু রোদ্দুর ফুটে উঠেছিল তাও ঢেকে গেল আরও গাঢ় মেঘের অন্তরালে।

আনন্দ নিজেকে জিগ্যেস করলো, 'তুমি কি তোমার চাওয়াটা বোঝো আনন্দ?' আনন্দ মাথা নাড়লো। —অনুভব দিয়ে সবকিছু বোঝা যায় না। তুমি রোজগার না-করলে প্রভার বেঁচে থাকাটা তুমি অনুভব করতে পারবে না— করুণা-দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকা যে কী অসম্মানের— এটা উপলব্ধির বিষয়, বিষয়টা একেবারে গদ্য-গদ্য— স্রেফ গল্পের, কোথাও কবিতা নেই। আর আশ্চর্য কী জানো? তুমি সেই গল্পের মধ্যেই আছো!

তাহলে আমি গল্প লিখতে পারি!

বিমর্ষ ভাব কেটে গিয়ে খানিকটা ম্লান আভা ছড়ালো। কিন্তু প্লট কোথায়?

তার তেত্রিশ বছরের বেঁচে থাকা পর্যালোচনা ক'রে আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'লাইফ ইজ প্লট্‌লেস। তবু গল্পের মধ্যে আছি!' যেন একটা বিস্ময়। বিস্ময়ের ঘোর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল। গল্পের মধ্যে আছি— ঠিকই, কিন্তু নায়ক নই, পার্শ্বচরিত্র। পরক্ষণেই তার মনে হলো— এক মহাগল্পের অংশ সে, তার একক জীবন— ছক না-জানার কারণেই তার নিজস্ব কোনো প্লট্ নেই, নেই আগামী কোনো নির্মাণের আভাস কিংবা আকাঙ্ক্ষা।

তাহলে কী লিখবো?

নিজের কথা। কিন্তু আত্মজীবনী নয়— যে হওয়াটুক সবাই জানে, হিমশৈলের চূড়ার মতো, আর অদৃশ্য যা কিছু— যা কেবল তোমার জানা, অনুমিত। কিংবা আকাঙ্ক্ষা— যা হয়েছো তা নয়, যা হ'তে পারতে কিংবা এখনও সম্ভব।

আনন্দ পুলকিত— তার মানে নিজের কথা লিখে নিজেকে দেখবার একটা আয়োজন— আত্মপ্রতিকৃতি! আনন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠলো, ভ্যান গখের আত্মপ্রতিকৃতি— স্টেট্‌সম্যানে ছেপেছিল ছবিটা— কানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে—
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে

কোলকাতা থেকে নতুন একটা পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়েছে গত শ্রাবণ থেকে। তখন সে কোলকাতায় ছিল। পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত দু'-একজন আনন্দর পরিচিত। তারা তার কাছে লেখা চাইতে পারে— এমন একটা প্রত্যাশা আনন্দর ছিল। ছিল, বিষ্ণু তেমনই যেন একটা আভাস রেখেছিল, কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি— এটা ভাবেনি সে। বিষ্ণু তার কাছে কবিতা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। 'পরিচয়'-এর জন্য তো বটেই, তাছাড়া— একটা ইংরেজি কবিতা, সম্ভবত কোনো সঙ্কলনের জন্য। প্রায় বছর-দুই পর এরকম একটা চিঠি পেয়ে আনন্দ হঠাৎ আবিষ্কার করলো— গভীর এক মনখারাপ তার ভালো হয়ে যাচ্ছে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সঙ্কলনে আনন্দর কবিতা ঠাঁই পায়নি। তার চেয়েও নবীন কবি, একটি সঙ্কলনও নেই যার, সেও আছে, এমন-কী তার বন্ধুদের সকলেই আছে— সে নেই জেনে অনেকেই বিস্মিত, কিছু করার নেই ব'লে যেন খানিকটা বিষণ্ণও— কেউ বলেছেন, 'আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্কলন হচ্ছে আর সেখানে তুমি নেই— এ সঙ্কলকের অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই না!' আনন্দ তখন বিড়বিড় করেছে, 'ইভিলস অব পয়জনাস প্রপোগণ্ডা'— তবু গভীর এক মনখারাপের মধ্যে ডুবে গেছিল তার কবিসত্তা— দীর্ঘদিনের মেঘ ফেটে আজ রোদ-ঝলমলে একটা দিন যেন এসে গেছে উত্তাপ নিয়ে, প্রত্যাশার প্রেক্ষাপট নিয়ে; কিন্তু তবু বিষাদ— ইংরেজি ভাষায় সে একসময় কবিতা লিখতো ঠিকই কিন্তু অনেকদিন তা ছেড়েও দিয়েছে, বিষাদের কারণ এটাই, তাছাড়া আরও একটা আশঙ্কা রয়েছে, গত দু'বছরেরও বেশি যে একটিও কবিতা লিখতে পারেনি, সে কি পারবে?

পারবে— এমন আশা ক'রেই আনন্দ চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠিতে সে জানিয়েছে: ইংরেজি কবিতা সে দিতে পারছে না। নভেম্বরের শেষাশেষি সে কোলকাতায় যাবে। এখন অক্টোবর শেষ হ'তে চললো— কবিতা হ'তে পারে এমন কোনো ভাবনা আজও সে পায়নি। অবশ্য ইতিমধ্যে সে একটা গল্প লিখে ফেলেছে— গল্প হয়েছে কিনা সে জানে না, পাঠক হিসেবে তার সংশয়ও আছে। প্রচলিত গল্প-কাঠামোর বাইরে তার গল্প— তাকে যদি আদৌ গল্প বলা যায়, তবে। আনন্দকে যেন গল্প-ভাবনায় পেয়ে বসেছে। খুব সাধারণ দৃশ্যের মধ্য থেকে গল্প উঠে আসতে চাইছে। এই এখন যেমন অনেকটা ভাবশূন্য মনে সে ব'সে ছিল বারান্দায়। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উদাস তাকিয়েছিল চালের বাতার দিকে। আচমকা দেওয়ালে সাঁটা হরিণের শিংঅলা মাথা তার দৃষ্টিকে টেনে নিলো।

আনন্দ স্পষ্ট একটা হরিণের মুখ দেখতে পাচ্ছিল, হীরকদ্যুতি ছড়ানো। দেওয়াল ফুঁড়ে মাথাটা বেরিয়ে এসেছে, তার মায়াবি দু'চোখ কাউকে যেন খুঁজছে, কান খাড়া— কোথাও কি মৃত্যু ওঁৎ পেতে আছে? কিংবা প্রেম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হরিণী ডাকলে পুরুষ হরিণদের মধ্যে সাড়া প'ড়ে যায়, তারা ডাক লক্ষ ক'রে ছুটে যেতে থাকে—' এটা কার কণ্ঠস্বর— সেই যে এক রাজমিস্ত্রি, কী যেন নাম— মনিরুদ্দি না মনিরুদ্দিন— তার? মনিরুদ্দি নাকি শিকারি ছিল, শিকারের ছলা-কলা ছিল তার জানা— তার কাছ থেকে কত শিকারের গল্প সেই ছেলেবেলায় আনন্দ শুনেছে; না কি অতুলকাকা বলেছিলেন— অতুলকাকাও শিকারি; শিংঅলা ওই করোটি তারই আনা— হ'তে পারে হরিণশিকারের গল্পটা ঠাকুমাই শুনিয়েছিলেন। সেই গল্প শুনতে-শুনতে কেমন এক গা ছম-ছম রহস্যময় বনজঙ্গল ভেসে উঠতো চোখের সামনে... আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে— এক বনের ধারে মাঠের মধ্যে তাঁবু ফেলা হয়েছে। বনের মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে এক হরিণীকে যার শোণিত-প্রবাহে জেগে উঠছে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। সে ডাক ছড়িয়ে দিচ্ছে— ডাক শুনে দলে দলে পুরুষ হরিণ আসবে, তার মধ্য থেকে হরিণী বেছে নেবে এমন কাউকে যে সুস্থ-সবল সন্তানের জন্ম দিতে পারবে... প্রাণসৃষ্টির এই ডাকে তবু কোথাও মৃত্যু ওঁৎ পেতে থাকে, মৃত্যুর কথাও ভুলে যায় প্রেমিক হরিণ, বাস্তবিক কোনো বাঘ বা চিতাবাঘও হামলে পড়ে না তার ওপর— বস্তুত, হরিণীকে ঘিরে হরিণের ভিড় জ'মে উঠলে গ'র্জে উঠবে বন্দুক...

তবু মৃত্যু— দেওয়ালের ওই হরিণটা কি সেভাবেই মরেছিল? আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, প্রেমার্ত দু'চোখ, খাড়া কান খুঁজছে ডাক— ডাক-দিক নির্ণয় ক'রে সে ছুটছে... ওই তো হরিণীর সম্মুখে, রূপমুগ্ধ হরিণ— লালসা-কামনা-প্রেম-স্বপ্ন সব একাকার... খেলছে জোছনায় হাওয়ায়... গুলির শব্দ...

হরিণটাকে লুটিয়ে পড়তে দেখলো আনন্দ— ওই দৃশ্যে তার হৃদয় বেদনায় ভ'রে উঠলো। তারপর কেমন এক অবসাদ পেয়ে বসলো তাকে।

নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে থেকে কী বুঝলো হরিণী কে জানে। আবারও সে ডেকে উঠলো— মৃত্যু বাস্তব তবু সত্য নয়— সত্য সৃষ্টি, সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা— আবারও আসবে হরিণ... আবারও... বারংবার... বার বার আমিও— প্রেমিক পুরুষের হৃদয় কি ওই পুরুষ-হরিণের মতো?

প্রেমকে ব্যবহার ক'রে এই যে হত্যার আয়োজন— এ তো প্রাকৃতিক নয়— প্রেমের সাহস-সাধ-স্বপ্ন— কী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে মানুষ— মানুষ!

তবু এসব নিয়ে বেঁচে থাকি আমরা— ব্যথা পাহ, ঘৃণা পাহ, উপেক্ষা অনাদর— তবু...

আঃ! যদি অমন হন্তারক হ'তে পারতাম!

আনন্দ কী এক ঘোরের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। দেওয়াল ফুঁড়ে বেরোনো হরিণের সম্মুখে, সে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে হরিণের মুখে— সে যেন নিজেই হরিণী হয়ে যাচ্ছে...

তখন মঞ্জু ঘুমঘোরে কেঁদে উঠলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন; আজও আমি জানি নাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

কোলকাতার যে-পথে পরিচিতজনের সঙ্গে দেখা হ'তে পারে, সে-পথে আনন্দ আর হাঁটছে না। হাঁটার কথা ভাবলেই— কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনা— তা সত্যি হ'লে যে দৃশ্য যে সংলাপ— দু'-ই ক্লিশে— যদি বাবার বন্ধুবান্ধব কেউ হয়, দেশের দু'-একটা কুশল কথা বিনিময়ের পর অনিবার্য প্রশ্ন,

—কী করছো?

—কিছু না।

—ব'সে আছো!

এই ব'সে আছো কথাটা শুনলেই আনন্দর মাথায় রক্ত চ'ড়ে যাবে। চিৎকার ক'রে বলতে ইচ্ছে করবে, বেকার কখনও ব'সে থাকে না। তারা কর্মপ্রার্থী কিংবা করুণাপ্রার্থী হয়ে কেবল দাঁড়িয়ে থাকে, দে রান অ্যাণ্ড গ্রব অ্যাণ্ড প্যালপিটেট—

আর তখন কোনো অপ্রীতিকর দৃশ্যের জন্ম— রুখে দেওয়া খুবই মুশকিল। আর যদি একসময়ের কোনো সহপাঠী কি সহকর্মীর মুখোমুখি হ'তে হয়— কেমন আছি, কেমন আছোর পর,

—এখনও কিছু জোগাড় করতে পারলে না!

—নাঃ!

—তাহলে তো ভালো থাকার কথা নয়।

—ভালো আছি— বলিনি তো! বেঁচে আছি— কুকুর-বেড়ালের অনুপ্রেরণা থেকে বঞ্চিত হইনি এখনও।

এভাবে নিজেকে অপমানিত করা কিংবা তাদের সফলতার আস্বাদ উপলব্ধি করানোর উদ্দীপক হওয়ার কোনো মানে নেই। তাছাড়া আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা হ'লে, যারা জানে অতুলকাকা তার জন্যে শিলংয়ে একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটা সে কেন নেয়নি কিংবা সে-সম্পর্কে ফের চিন্তাভাবনা করছে কিনা— এসব কথা উঠবে,

—তুমি কিন্তু ঠিক করোনি মিলু! বিশ্বজুড়ে মন্দা— চাকরিবাকরি পাওয়া খুব মুশকিল।

—বুঝতে পারছি। গ্রেট ডিপ্রেশন।

—এখনও বোধহয় সময় আছে। তুমি অতুলের সঙ্গে যোগাযোগ করো! কোলকাতা তোমাকে কিছুই দেবে না এখন।

—কখনও তো দেবে তাহলে— আমি সেই আশাতেই হাঁটছি—

তাকে বিমূঢ় দাঁড় করিয়ে রেখে দ্রুত হাঁটতে থাকার মধ্যে কেবল তার বিরাগভাজন হওয়া ছাড়া আর তো কোনো প্রাপ্তি নেই—

তবু, যদি সেসব পথে একান্তই হাঁটতে হয়, সে কেবল পথের দিকে চোখ রেখেই হাঁটে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ হাঁটছিল।...

এখন আমি প্রকৃত অর্থেই যাকে বলে মোস্ট লোন্‌লি ম্যান, দ্য মোস্ট ফ্যরল্যর্‌ন্‌— ভাবছিল আনন্দ, মানুষ তো আশা নিয়ে যায় আর একটা মানুষের কাছে— সেরকম দু'-একজন যাঁরা ছিলেন— আনন্দর ভাবতে অবাক লাগে, যে মানুষটার কথা নানা জনের মুখে শুনে-শুনে মনে হয়েছিল মুশকিলআসান কিন্তু কেউ তাঁর সঠিক ঠিকানা বলতে পারেনি, কেবল একটা আভাস ছিল, আনন্দ তাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছে; যদি দেখা হয়, হয়তো একটা কাজ সে পেয়ে যাবে— এই আশাই তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে ঢাকুরিয়া থেকে কাঁকুড়গাছি। অবশেষে তাঁর সন্ধান পাওয়া গেছে। দু'-একজন মানুষকে দেখে আনন্দর অভিভূত হয়ে যাওয়া— একটা পুরনো রোগ— হাঁটতে-হাঁটতে আনন্দ স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছিল সেই মুখ, দাড়িগোঁফ কামানো সৌম্যশান্ত মুখশ্রী, করুণাঘন— হিতোপদেশ এ-মুখেই মানায়।

—'তোমাকে আমি একটা কথাই বলতে পারি, হেমেন্দ্র তোমাকে পাঠিয়েছে ব'লে নয়, তুমি আমার ছাত্র ছিলে, এই অধিকারে— হতাশ হয়ো না— হতাশাব্যঞ্জক নানা ঘটনা প্রতিমুহূর্তে ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক।'

—'হ্যাঁ স্যার, সেই জন্যই তো স্যার আপনার কাছে আসতে পারলাম, ইনফ্যাক্ট স্যার আমার কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছে—'

—'আশা আর বিশ্বাস— এছাড়া বেঁচে থাকার আর কী অবলম্বন আছে, বলো! শোনো! তুমি তোমার ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যাও— দেখি কী করতে পারি। আমার ঠিকানাটা মনে রেখো!'

আনন্দ অভিভূত হয়ে গেছিল। তার তখন মনে পড়ছিল আব-একজনকে। ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত, ওকালতিতে প্রভূত সাফল্য পেয়েছেন, প্রভাবশালী— তাঁর কাছে দরবার করেছিল আনন্দ, সঙ্গে অবশ্য একটা চিঠি ছিল, তবু অদ্ভুত বিরক্তি প্রকাশ ক'রে তিনি বলেছিলেন, 'এখানে আমরা রিলিফ কমিটি খুলে বসিনি—' সেদিনকার সেই মনখারাপ কী অদ্ভুত ভালো হয়ে যাচ্ছিল হিন্দু এই অধ্যাপকের ব্যবহারে। তাঁর চিঠির অপেক্ষায় আছে আনন্দ। তাছাড়া আর কারও কাছে যাবার নেহ, প্রত্যাশা নেই।...

বোর্ডিং ছাড়িয়ে খানিকটা চ'লে যাওয়ার পর খেয়াল হলো। নিজের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক মাথা ঝাঁকিয়ে আনন্দ বোর্ডিঙের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। বড় ক্লান্ত লাগছে। স্বপ্ন-আশা-বিশ্বাস— এসব যেন কোথাও আর নেই। এক অদ্ভুত ধরনের শূন্যতা— সেখানে সামান্য একটা আশাব্যঞ্জক কথাও কী গভীর ব্যাপ্ত হয়ে বিরাজ করতে থাকে, অন্তত তেমন একটি কথা— কেউ নেই কোথাও যে শোনাতে পারে।

লেটার বক্স হাতড়ালো। সেখানেও কিচ্ছু নেই। না-থাকাই ভালো। কে আর লিখবে— প্রভা, মা'র কথামতো— কেবল অভাব-অনটনের ফিরিস্তি, হৃদয়ের অন্তর্গত সংলাপ-সম্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি অক্ষরও যদি থাকতো!— এই প্রবাসে, একা; বিরহ! নেই। থাকলে আমি লিখতাম সেকথা কিংবা প্রভা। আচমকা তার মনে হলো, সে যেন কালীদাসের সেই যক্ষের মতো অভিশপ্ত— অর্থের খোঁজে আমাকে চিরদিন ঘুরে মরতে হবে, কোনোদিন পাবো না— এই শীতের রাতে নারী-শরীরের ওম্‌ ছাড়া, কী করুণ অসহায় অসহনীয় অবস্থা! প্রভারও। প্রভা হৃদয়ের শীত ব্যক্ত ক'রে কখনোই কোনো চিঠি লিখবে না। বনির একটা কার্ড হয়তো আসতে পারে, তাতেও হৃদয় আন্তরিক নয়— আর খুকুনের চিঠির আশা না-করাই ভালো—

নিজের প্রতি বিশ্বাস হারানো মানুষের মতো আনন্দ তার তক্তপোষের ওপর পা ঝুলিয়ে হাঁপিরুগির মতো ব'সে থাকলো একেবারে চিন্তাশূন্য অবস্থায়। একসময় খুকুনের মুখটা মনে পড়লো, খুব আন্তরিক তার চোখের রঙ, নরম চাহনি— এ মেয়েটি যদি তার বোন না-হতো—

—'মিলুদা, আমি জানি— সেদিন তুমি আমার কথায় দুঃখ পেয়েছিলে।'

—'কী জানি!'

—'কিন্তু আবারও বলছি, তুমি নিশ্চয়ই জানো— অ্যাডজাস্ট না-করতে পারলে কোনো জীবই বাঁচতে পারে না।'

—'জানি, তবু...'

—'শোনো! রামযশ নিয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে বলছি না। আমি ভাবছি তোমার জন্য।'

সেইদিন সান্ত্বনাবাক্য মনে হ'লেও দিল্লি থেকে ফেরার পথে কেমন যেন আশাসঞ্চারী হয়ে উঠেছিল কথাটা। দেশে ফেরার পরও মাঝেমধ্যে মণিকার চিঠির প্রত্যাশা জেগে উঠেছে— চিঠি এসেছিল, পাঞ্জাবের দু'-দুটো কলেজে তার অধ্যাপনার চাকরি হ'তে পারে— এমনই ব্যবস্থা করেছিল মণিকা।

বাড়ির সবাই যখন ওই সম্ভাবনার বার্তা পেয়ে খুশিতে উজ্জ্বল, তার পাঞ্জাবে যাবার জন্য রসদ-সংগ্রহে ব্যস্ত সত্যানন্দ, তখনই সে ঘোষণা করেছিল, 'বাংলার বাইরে আমি কোনো কাজ নিয়ে যেতে পারবো না।'

কুসুমকুমারী বললেন, 'কেন?'

—'কেন ঠিক বলতে পারবো না— আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। এটাই একমাত্র কারণ ভাবতে পারো।'

—'তাহলে আর কী— খুকুনকে চিঠি লিখে দে যে, তুই যাচ্ছিস না।'

—'সে আমি লিখে দেবো।'

আনন্দ লিখেছিল। সেই চিঠি-অনুষঙ্গে আনন্দ নিজেকে জিগ্যেস করলো, সত্যিই কি নীতিগত কারণে তুমি বাংলার বাইরে যেতে চাওনি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও কিছু কারণ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে কিন্তু সবই ওই নীতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আনন্দ, এই বাংলায় থেকেও সবার থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছো— শূন্য ডাকবাক্স কিন্তু তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

কেবল শূন্যতার ইঙ্গিত নয়— ওই শূন্যতার মধ্যে রয়েছে উপহাস বিদ্রূপ।

ওই শূন্যতাকে বিষয় ক'রে একটা গল্প লেখার কথা ভাবলো আনন্দ...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার দু'চোখ দিয়ে একদিন কতবার চেয়েছ আমারে।
আলো-অন্ধকারে
তোমার পায়ের শব্দ কতবার শুনিয়াছি আমি!

গল্প লিখতে ব'সে আজ, বোর্ডিঙের এই নির্জন ঘরে, নিজের গল্পের পাঠক আরও একবার হলো আনন্দ। এ গল্পটা তার নিজেকে দেখার প্রথম আয়োজন— সরাসরি নয় অবশ্য, অন্য নামের আড়াল আছে, কল্পিত ঘটনার আড়ালে রয়েছে তার জীবন থেকে বনির দূরে স'রে যাওয়ার প্রেক্ষিত— তার লেখা গল্প সে যখনই পড়ে, গল্পের চরিত্রদের যে-যে নামের আড়ালে বনি, প্রভা, সত্যানন্দ, কুসুমকুমারীরা রয়েছেন এবং সে নিজে, আড়াল তুলেই পড়ে— আনন্দ পড়ছে:

> বনি তাকে খুবই ভালোবাসে বটে কিন্তু তবুও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে আনন্দ অনেকবার উপেক্ষা করতে চাইলেও শেষপর্যন্ত বনি একবারও সাহস পেলো না, কেন পেলো না? তেমন প্রেম এই মেয়েটির ছিল না ব'লে হয়তো; কিংবা প্রেম, সে-প্রেমও হয়তো ছিল, কিন্তু পৃথিবীর সামান্য উপকরণ নিয়ে পদে-পদে জীবনের তাড়া খেতে-খেতে দুটো প্রাণীকে অচিরে উচ্ছন্নে যাবার ভয়াবহ স্বপ্ন বনিকে হয়তো থামিয়ে রেখেছে; এ-মেয়েটির সমস্ত ভালোবাসার ভিতর দিয়েই পরিমাণবোধ জিনিসটা বেশ তীক্ষ্ণভাবে, তাজা হয়ে, চ'লে এসেছে; এক এক সময়ে এর মাত্রাজ্ঞানের অন্যায় কঠোরতায় কষ্ট পেয়ে মনে হয়েছে— বাস্তবিক এ-মেয়ে ভালোবাসে কি?

আনন্দ সিলিঙের দিকে তাকালো— সত্যিই ভালোবাসা ব'লে কিছু কি আছে? কোনো উত্তর না-পেয়ে ফের ফিরে এলো গল্পে:

> জীবনের কোনো স্থূল স্বাদই মেটাতে পারেনি বনি— কিন্তু চিন্তা ও কল্পনার ভিতরে কোনো অনুভূতিকেই জাগাতে সে বাকি রাখেনি; নিজের শরীরটাকে ব্যবহারে না-লাগিয়েও শরীরের আস্বাদের অনির্বচনীয় প্রয়োজন-যে প্রেমিকের— বুঝতে দিয়েছে তা; সমস্ত পৃথিবীর ভিতর প্রেমিক যে একজনেরই নাক-মুখ-ঠোঁট-চুল চায়— পৃথিবীর বাকি সমস্ত নারীসৌন্দর্য বা লাম্পট্য তার কাছে যে অত্যন্ত কদর্য কুৎসিত নিরর্থক, বুঝতে দিয়েছে তা।

আনন্দর মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো। যেন এসব আজগুবি কল্পনাবিলাস— নারী-পুরুষ উভয়ই রক্তমাংস চায়, চায় সফলতা— এ তত্ত্বের বাইরে আর কিছু নেই আনন্দ— তোমার অচরিতার্থতা, অক্ষমের কল্পনাবিলাসকে তুমি প্রেমের নামে প্রচার করতে চাইছো? কী নির্বোধ তুমি! ঈর্ষা-আকাঙ্ক্ষা আর বিষাদ ছাড়া কী আছে এর মধ্যে— নিজেকে ফিরে দেখার আয়োজন! কী দেখছো? নিজের দুঃখ-বিষাদ-বেদনাকে বড় ক'রে দেখতে গিয়ে বনিকে কি তুমি ছোট ক'রে ফেলোনি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচমকা আনন্দর মনে হলো, গল্পটা পড়ার পর এই জন্যই কি বনি প্রথমে কোনো কথা বলতে চায়নি? এবার কোলকাতায় আসার দিন-দুই পরেই আনন্দ বনিদের বাসায় গিয়েছিল। কল্পনায়, ধ্যানমগ্নতায় বনির মুখ সে স্পষ্ট দেখতে পায়— একদিন দেখছিল সে, তখন প্রভা এলো— মঞ্জুকে বসিয়ে দিলো কোলের ওপর— যেন একটা প্রলয় ঝড়ে তছনছ হয়ে গেল সেই বিগ্রহ, বাইরে কোথাও তার প্রকাশ ছিল না— আনন্দ বলেছিল, 'প্রভা, তুমি ওই গানটা জানো— চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে?'

প্রভা কী অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলেছিল, 'ভুলে গেছি।' ভুলে যাওয়ার বেদনা আছে, মনে রাখার বিড়ম্বনার চেয়ে তা যেন ভালো, স্বস্তির— এসব ফুটে উঠেছিল তার চোখে-মুখে, স্বর-প্রক্ষেপণে। ইচ্ছে ক'রে কি ভুলে যাওয়া যায়?

নক্ষত্রের আকাশ, পূর্ণিমার চাঁদ— গভীর ঘন অন্ধকারে জোনাকিব স্নিগ্ধ আলো, টিপটিপ বৃষ্টি কিংবা তুমুল বর্ষণ— এই সবকিছুর মধ্যে বনি— কীভাবে ভুলবে আনন্দ? এক-একদিন সে জানালা-দরজা বন্ধ ক'রে, রাত্রির রূপ দেখবে না ব'লে নিজেকে অন্যকিছুর মধ্যে ব্যস্ত রাখতে গিয়েও কখন বিমুগ্ধ হয়ে দেখেছে— ঘরের মধ্যে জোনাকির জ্বলা-নেভা— আর ভেসে উঠেছে বনির সেই হাসি, এ হাসি একবারই দেখা যায় জীবনে, আনন্দর কেমন যেন মনে হয়, সে যদি আঁকতে পারতো— মোনালিসার হাসিও ম্লান হয়ে যেতো। তবু রক্তমাংসের বনিকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। কতদিন দ্যাখেনি তাকে। গতবার কোলকাতায় থাকার সময় বনির জন্মদিন গেছে। আনন্দ তাকে শুভেচ্ছা জানাতে ফোন করেছিল। যেসব কথায় জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর রীতি, সেসবের কোনো একটি কথাও আনন্দ বলতে পারেনি, বলেছিল, 'ভোরের সূর্য, দ্যাখো, তোমার কপালে টিপ হয়ে আছে।' ওপ্রান্ত নীরব ছিল।

তব, এবার কোলকাতায় এসে, গল্প পড়ানোর অজুহাতে আনন্দ গিয়েছিল বনির কাছে। অনিচ্ছা নিয়ে গল্পটা পড়েছিল বনি। পড়া-শেষে বন্ধ ক'রে খাতাটা রাখার মধ্যে কী যেন একটা ছিল, অবর্ণনীয়,— কিন্তু নিমেষে তার অভিঘাতে আনন্দর সমস্ত আশা যেন নিঃশেষ হয়ে গেছিল। তবু জিগ্যেস করেছিল, 'কিছুই হয়নি, না?'

বনি কেবল একটি কথাই বলেছিল, 'প্লট কোথায়?' আনন্দ নীরব ছিল।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ওই কথার মধ্যে যেন একথাও প্রচ্ছন্ন ছিল— যদি প্লট থাকতো তাহলে কল্যাণীকে অত ছোট দেখাতো না।

এসব ভাবনায় আনন্দ খুব আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। সে দু'চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকলো— ওই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বনির মুখ— নাক, ঠোঁট, চোখ, ভ্রূ, চোখের মণি— টিপ— আমার হৃদয় যখন তুমি-ভরা হয়ে আছে তখন কীভাবে— তোমাকে ছোট করলাম আমি! বনি যেন হাসছে।

আজ আবার বনিকে দেখতে ইচ্ছে করছে খুব। এই ইচ্ছেটা— বনির রক্তমাংসের সামনে নিজেকে উপস্থিত করানোর এই বাসনা আনন্দকে উত্যক্ত করে খুব, বিব্রত করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনিদের বাড়ির পথ ধরে সে, কখনও-কখনও মাঝপথ থেকে নিজেকে অন্যপথে ঢুকিয়ে দেয়। কখনও-বা বনিদের গলির মুখ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে এনেছে। একদিন তো দরজার কড়ায় হাত রেখেও হাত সরিয়ে থম্ মেরে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ।

আনন্দ মনস্থির করলো, সে যাবে। সমস্ত উপেক্ষার দৃষ্টিকে সে স্বাগত জানালো। ঠাণ্ডা শীতল কথাবার্তা যা-সব হ'তে পারে, হওয়া সম্ভব, মেনে নিয়ে আনন্দ বের হলো।

যেন ভীষণ কোনো জরুরি কাজ— তার হাঁটার গতি, ছন্দ দেখে এরকমই মনে হ'তে পারে যে-কারও। সত্যিই জরুরি। এ-জীবনে প্রকৃত ভালোবাসার স্বাদ যার কাছ থেকে পেয়েছি, অনেকদিন পর তার কাছে যাওয়া জরুরি বৈকি! তবু একটা বিরুদ্ধ শক্তির উপস্থিতি টের পাচ্ছে আনন্দ। সে-শক্তি তাকে অন্যপথে নিয়ে যেতে চাইছে।

যা-কিছু প্রকৃত— এ-জীবনে একবারই পাওয়া যায় তাকে, কেন বিরক্ত করতে যাচ্ছো? আর শেষ যে কার্ডখানা পেয়েছিলে তুমি, তাতে তো সে লিখেছিল— মিলুদা, বুলুর মাধ্যমে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়, সেই বুলু আমার ব্যাপারে কেমন উদাসীন।—

একথার মানে বোঝো? কেন যাচ্ছো তবু?

যাচ্ছি— সেই পাওয়াকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবো ব'লে। সেই প্রাপ্তির মধ্যে এক বিস্ময় ছিল। আমি আজও জানি না তার উৎস কোথায়।

বিস্ময়ের উৎস খুঁজতে যেও না— পরিণাম খুব মারাত্মক হ'তে পারে!

তা কি মৃত্যুর অধিক?

একটা তাচ্ছিল্যের হাসি, সবকিছুকে নস্যাৎ করার তীব্র ঘোষণা যেন ফুটে উঠলো তার গতিময়তার মধ্যে।...

হাত বাড়ালেই দরজার কড়া। মাধবীলতার একথোকা ফুল স্বাগত জানালো আনন্দকে। বাড়িটাকে ঘিরে আছে এ পৃথিবীর ধুলো-ধোঁয়া আলো-হাওয়ার কোলাহল। ভিতরটা যেন নিস্তব্ধ। অন্তত ব্যস্ততার মধ্য থেকে অসাবধানে জেগে ওঠা কোনো শব্দের আওয়াজও আনন্দ শুনতে পাচ্ছে না। না— নিস্তব্ধ মনে হওয়াটা ঠিক নয়, অন্তত যেখানে প্রাণের স্পন্দন আছে— শান্ত, অচঞ্চলতার মধ্যে কেমন এক কোমল ব্যাপারস্যাপার থাকে— বসন্তের দু'-একটা দুপুরে যেমন— হঠাৎ একটা কোকিল ডেকে উঠলে, সেই কোমল ব্যাপারের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া কুহু কেমন এক মায়া ছড়িয়ে দেয়— ঘরের ভেতরটা তেমন অনুভব ক'রে, অন্তত চুড়ির রিনরিন— কান পেতেছিল আনন্দ। কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও নিরাশ আনন্দর ফের মনে হলো, নিস্তব্ধতা— কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে— এ বাড়িতে এখন তারা তিনজন, বনি, তার শাশুড়ি আর চাকর সহদেব— বনির বরের এখন বাড়ি থাকার কথা নয়— যদি থাকেও হয়তো ঘুমুচ্ছে সবাই। ঘুমন্ত মানুষ আর কাজের মানুষকে বিরক্ত করতে আনন্দর ভালো লাগে না।

আনন্দ তুমি ওদের ঘুমুতে দাও— তুমি ভাবো কেমন পুশি বিড়ালের মতো বনি

তার পুরুষের বুক ঘেঁষে ঘুমিয়ে আছে, ঘুমানোর অপূর্ব স্বাদে! তুমি বরং অন্য কোনোদিন... নিস্তব্ধতা যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। অনুচ্চারিত চিৎকারে 'না' ঘোষণা ক'রে সেই নিস্তব্ধতাকে গুড়িয়ে দিতেই যেন সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে কড়া নাড়তে থাকলো।

দরজা খুলে গেল। সহদেব। সহদেবের নষ্ট চোখের কোটরে অন্ধকার। ভালো চোখটার একরাশ বিরক্তি— মিলিয়ে যাচ্ছে, ফুটে উঠছে বিস্ময়, দেশের মানুষকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার আনন্দে বসন্তের দাগভরা মুখটা হাসির বিস্তারে দারুণ একটা দেখার জিনিস হয়ে উঠলো।

—'আসেন। আসেন। ঘুমাইয়া পড়ছিলাম! আসেন।'

দরজা বন্ধ ক'রে সহদেব তাকে বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। তাদের দেশের খবরাখবর কিছু জেনে চ'লে গেল ভিতরের ঘরে।

কিছুক্ষণ পর বনি এলো। বসলো। তার চোখে-মুখে এখনও ঘুম জড়িয়ে আছে। তাতে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে। আনন্দ মুগ্ধ দেখছে— ওই ঠোঁট... গালে কি একটু রক্ত জ'মে আছে? গ্রীবা...

—'কোলকাতায় আছেন? না দেশ থেকে?'

—'না, দেশে ফেরা হয়নি এখনও। কেমন আছো?

—'এ-ই।' ব'লে ডান হাতে অদ্ভুত এক মুদ্রায় বাকি কথাটা জানিয়ে ফের বললো, 'আপনি?'

—'আমি—' বনির চোখের দিকে তাকালো আনন্দ কিন্তু বনির দৃষ্টি সচেতনভাবে অন্যদিকে— বনি চাইছে না তার চোখে চোখ পড়ুক— চোখ ফিরিয়ে বনির আঙুলগুলো দেখতে দেখতে বললো, 'এ-ই আছি।'

ব্যাস্— কথা থেমে গেল। বনির দৃষ্টি জানালার দিকে। তার বসার ভঙ্গি ক্রমশ আরও তির্যক হয়ে যাচ্ছে। জানালার ওপাশে একটা পাঁচিল। সেখান থেকে আলো ঠিক্‌রে এসে পড়ছে এ-ঘরে— পড়েছে বনির মুখটাতে। বনির কিছু বলার নেই। অনেকদিন আগেই তা জানিয়ে দিয়েছে। তবু আনন্দ আসে।

একদিন স্বপ্নে বনি জিগ্যেস করেছে, তুমি কেন আসো মিলুদা?

—তা তো জানি না।

—কীসের আশায়— এটা তো বলতে পারবে?

—কী আর আশা!

—তাহলে না-আসাই ভালো।

তবুও, আসি। কেন?

সাইড প্রোফাইল। সেই চোখ ভ্রূ, এবার বনির জন্মদিনে ভোরের সূর্যটাকে দিগন্ত

থেকে মধ্যমার ডগায় ধ'রে আনন্দ ওই ভ্রূ-সন্ধির ঠিক ওপরে বসিয়ে দিয়েছিল...

সেই ঠোঁট কমলাকোয়ার মতো, কিন্তু নিরস যেন, কামনার কোনো দ্যুতি ছড়াচ্ছে না।

চুলগুলো এলো, মেঘের মতো— মেঘের ফাঁকে চাঁদের মতো দেখাচ্ছে ওই মুখ...

—'কী করছেন এখন?'

—'দুটো টিউশনি। আর চাকরির চেষ্টা।'

—'বউ কেমন আছে?'

—'আছে!'

—'বাচ্চা?'

—'আমরা সবাই ভালো আছি।'

আবারও কথা ফুরিয়ে গেল।

বনি যদি জিগ্যেস করতো—

কবিতা লিখছো মিলুদা?

না।

কেন?

কবিতা আসছে না।

তার মানে তুমি ভালো নেই।

নেই-ই তো— ভালো নেই ব'লেই তো তোমার কাছে আসা।

এ আবার কী কথা!

এ-ই তো গূঢ় কথা!

বুঝলাম না।

পরে বলবো।

না। এখন বলো। এখনই।

আগে কিন্তু বলেছি।

আমার মনে নেহ, তুমি বলো!

পুরনো কথা। তোমার শুনতে...

আঃ! বলোই না!

—'আপনাকে একটা কথা বলি—' ব'লে বনি একবার পাশ-দরজার দিকে তাকালো, ও-পথে সহদেব চা নিয়ে আসবে, একটু সতর্ক হওয়া, 'সেদিন সহদেব জিগ্যেস করছিল— দাদাবাবু অমন চুপচাপ ব'সে থাকে কেন?'

সেদিন— মানে কতদিন আগে, দীর্ঘদিন পর সে এই কিছুদিন আগে এসেছিল, চুপচাপ ছিল ঠিকই, তখন তো বনি তার লেখা গল্পটা পড়ছিল— তাকে নীরব থাকতে দেখে বনি বললো, 'এর কোনো মানে নেই।'

AMARBOI.COM

আনন্দর বলতে ইচ্ছে হলো, কত কথা মনে মনে— তোমার সঙ্গে; সত্যিই কি তুমি তা বুঝতে পারো না! অথচ একসময় আমার মুখ দেখে কত কথা জেনে যেতে— আমার চোখে চোখ রেখে কত স্বপ্নের রঙ তুমি লক্ষ করেছো।

বনির অন্যদিকে ফেরানো মুখের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'তোমার চোখের আলোস্পর্শে কথার কুঁড়িরা ফুটে উঠতো একসময়, তুমি ভুলে গেছ!' বনিকে উঠে যেতে দেখছে আনন্দ— একইসঙ্গে চা নিয়ে আসছে সহদেব...

চা পর্ব শেষ। বনি কি আর আসবে? বাইরে ডিসেম্বরের বিকেল দ্রুত ম'রে আসছে। সেই প্রথম গল্পে যেমন লিখেছিল তেমন ডেক্‌চেয়ার থেকে আলগোছে উঠে আনন্দ বেরিয়ে পড়লো। বড় ক্লান্ত লাগছে।

সেদিন রাতে আনন্দ তার লিটারারি নোট রাখার খাতায় লিখলো

> if you begin to indulge in By to much, she gets hold of you even now in dreams or in walking. So keep aloof.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বধূ শুয়ে ছিল পাশে— শিশুটিও ছিল;
প্রেম ছিল, আশা ছিল— জ্যোৎস্নায়— তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তাঁর?

মাঘনিশীথের যে-কোকিল ভুল ক'রে ডেকে উঠে আনন্দকে মনে করিয়ে দিয়েছিল সমাসন্ন তার জন্মঋতু, জন্মমাস— আর ডুবে গেছিল গাঢ় বিষণ্ণতায়, সেই কোকিলের স্বরতন্ত্রীতে এখন সুরের স্ফূর্তি— আজ আনন্দর জন্মদিন।

এসময়ে তার কোলকাতায় থাকার কথা। টিউশনি পড়ানো আছে। তবু এক সপ্তাহের জন্য সে এসেছে। ঠিক এক সপ্তাহ না— সাত দিনের দিন সে কোলকাতায় পৌঁছে যাবে, সন্ধেয় পড়ানোর কথা আছে। এটা নতুন টিউশন। একটি মেয়েকে পড়াতে হচ্ছে। পড়াতে ভালো লাগছে না, তবু... মিষ্টি দেখতে মেয়েদের বোধহয় টিউটর দরকার হয় না— যদি হতো!... মঞ্জুর জন্মদিনের দিন বিকেলে আনন্দ বাড়িতে এসে পৌঁছেছিল। সবাই কেমন অবাক হয়ে গেছে তাকে দেখে। সবাই প্রায় একই সুরে জানতে চেয়েছে, 'ফিরে এলে যে!' আনন্দ মাকে বলেছে, 'হ্যাঁ, হঠাৎ মনে পড়লো— মঞ্জুর প্রথম জন্মদিন।' মা যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

প্রভাকে বলেছে, 'হঠাৎ মনটা কেমন করছিল— মনে হলো, কত দিন তোমাকে, মঞ্জুকে দেখিনি।' প্রভার মুখ ঝামটে উঠেছিল প্রায়। বাবাকে বলেছে, 'ফিরে আসিনি— দু'-একদিনের মধ্যেই চ'লে যাবো।' আনন্দর মনে হয়েছিল, বাবাকে সে নিশ্চিন্ত করতে পেরেছে।

আর মঞ্জুকে কোলে নিয়ে সে বলেছে, 'একদম খাঁটি কথা— তোকে এটা দেবো ব'লেই এসেছি।' একটা কাঠের পুতুল মঞ্জুর সামনে ধরতেই কচি হাত বাড়িয়ে দিলো মেয়ে...

রাতে প্রভা বললো, 'প্রথম জন্মদিন, একটা দামি কিছু দেবার মুরোদ হলো না!'

—'এটা কিন্তু কম দামি নয়— এর একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে। এটা নিয়ে একমনে মঞ্জু যখন খেলবে— ঘুম পাড়াবে— সে একখানা দৃশ্য— তুমি দেখে নিও!'

—'ঢের দেখেছি। এ কি একটা উপহার হলো? এ তো যে-কোনোদিন দেওয়া যেতে পারতো— এতগুলো পয়সা নষ্ট ক'রে কী দরকার ছিল আসার?'

—'আছে আছে— দরকার তোমারও আছে।'

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে প্রভা বললো, 'না। আমার কোনো দরকার নেই। খবরদার কাছে ঘেঁষবে না বলছি।'

আনন্দ একটু ম্লান হেসে বলেছিল, 'তাহলে একটা গল্প বলি।'

—'না। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

—'কিন্তু আমার তো ঘুম পাচ্ছে না। আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে আদর করতে।'

—'এত নির্লজ্জ তুমি!'

—'শোনো না! গল্পটা শোনার পর তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমি বাকি রাতটা... সে যা হোক একভাবে ফিনিস ক'রে দেবো। বলি?'

—'কী আর করবো— বলো, শুনি।'

—'এক দম্পতির গল্প। ধরো, বউটির নাম কল্যাণী; বরের নাম— আচ্ছা, বরের নামটি তুমি বলো।'

প্রভা চুপ।

—'যে-কোনো নাম— বলো!'

—'অনুপম।'

—'বাঃ! বেশ নাম। তাহলে এবার গল্পটা শুরু করা যাক। ওই দম্পতির নিজস্ব দু'টি সম্পদ ছিল। একটি— সোনার ঘড়ি। ঘড়িটা অনুপম উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। আর অন্যটি— কল্যাণীর চুল। অন্যদের কাছে দু'টিই ছিল দর্শনীয় আর ঈর্ষার জিনিস। এ দু'টির জন্য তারা পরস্পর গর্বিত ছিল।

কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। রোজগারের জন্য অনুপমকে বাইরে থাকতে হতো। কিন্তু যেখানেই থাকুক, বিয়ের দিনটি তারা একসঙ্গে কাটাতো। পরস্পরকে উপহার দিতো। এই উপহারের জন্য, প্রায় সারা বছরই কল্যাণীকে মুদি, সব্জি-বিক্রেতা, কসাই— সকলের সঙ্গে দর কষাকষি ক'রে জিনিস কিনতে হয়। তাতে এক-দু'আনা সাশ্রয় হবে ব'লে। এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা— এক-একটা সুখময় ঘণ্টা কাটায় কল্যাণী— শুধু কী উপহার দেওয়া যায়— একথা ভেবে-ভেবে, পরিকল্পনা ক'রে। তো, সেবার ঠিক আগের দিন কল্যাণীর মনে পড়লো, কাল তাদের বিয়ের দিন। কল্যাণী তার ঝাঁপি খুলে বসলো। যতবারই সে গোনে— পাঁচ টাকা সাড়ে বারো আনা। তার কান্না পাচ্ছিল। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদলো। আর জীবন সম্পর্কে আশ্চর্য এক সত্যকে সে আবিষ্কার করলো— এ জীবন ফুঁপিয়ে কান্না, দীর্ঘশ্বাস, আর মৃদু হাসি দিয়ে গড়া। কিন্তু ওই পাঁচটাকা সাড়ে বারো আনা কিছুতেই তাকে মৃদু হাসির স্তরে পৌঁছে দিতে পারবে না। অনুপমের জন্য সে এমন একটা উপহার কিনতে চেয়েছে যা দুর্লভ, তৃপ্তিদায়ক, আর যথার্থ মূল্যবান— যা অনুপমকে সম্মান এনে দেবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কল্যাণী আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তার বিষণ্ণ মুখখানা ঘিরে কুঞ্চিত কেশরাশি ঘোমটার মতো হয়ে আছে— খোঁপা খুলে দিলো। যেন একটা জলপ্রপাত সবেগে নেমে গেল হাঁটুর নিচে পর্যন্ত। একটু তেরছাভাবে দাঁড়িয়ে তার চুল দেখতে-দেখতে একটা উপায় খুঁজে পেলো কল্যাণী। তার চোখ আবারও ভ'রে উঠলো। অশ্রুতে। শুনছো?'

সাড়া পেয়ে আনন্দ নিজেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। বললো, 'তারপর কল্যাণী কী করলো জানো— সে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। হাঁটতে হাঁটতে

একসময় সে দাঁড়ালো— চুল, চুলের সামগ্রী কেনাবেচা হয় এমন একটা দোকানের সামনে।' একটু থেমে আনন্দ বললো, 'অত সুন্দর চুলগুলো সে বিক্রি ক'রে দিলো।'

হ্যারিকেনের আলোছায়ায় প্রভাকে কেমন বিস্মিত মনে হলো আনন্দর। মনে হলো এখনই যেন সে ব'লে উঠবে, চুলও বিক্রি হয়! কিন্তু তা না-ব'লে প্রভা বললো, 'তারপর?'

—'তারপর কল্যাণী অনুপমের জন্য একটা যথার্থ মূল্যবান উপহার খুঁজতে থাকলো। এক দোকান থেকে আর এক দোকান। অবশেষে এক দোকানে একটা জিনিস দেখে তার মনে হলো— এটা অনুপমের জন্যই তৈরি হয়েছে।'

—'কী সেটা?'

—'একটা পকেটঘড়ির চেন। সাদাসিধে নক্‌শা করা। অনুপমের ঘড়িটায় পুরনো চামড়ার ফিতে। সবার সামনে ঘড়িটা বের করতে তার সঙ্কোচ হতো। চেনটি মানাবে ভালো। চেনটি সে কিনে ফেললো। তারপর— তারপর কল্যাণী বাড়ি ফিরে, ফের আয়নার সামনে দাঁড়ালো, নিজেকে দেখে নিজের মনেই বললো, এছাড়া আমি আর কী-ই-বা করতে পারতাম! কিন্তু অনুপম যদি তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়? কল্যাণীর মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলো, হে ঈশ্বর! দয়া ক'রে তাকে মনে করিও, আমি এখনও সুন্দরী।' আনন্দ একটু যেন দম নিতে চুপ থাকলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললো, 'অনুপম যথাসময়ে ফিরে এলো। কল্যাণীকে দেখে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো তার দিকে। সে-দৃষ্টিতে না-ছিল ক্রোধ, না-ছিল বিস্ময় বা বিতৃষ্ণা। কল্যাণী আর্তনাদের মতো বললো, ওভাবে তুমি আমার দিকে তাকিয়ো না। চুলগুলো আমাকে বিক্রি করতে হয়েছে— একটি উপহারের জন্য। তোমার জন্য। কী চমৎকার মনোরম— আমি পেয়েছি! তারপর অনেক কথা, অনেক সংলাপ— একসময় অনুপম তার পকেট থেকে একটা মোড়ক বের ক'রে টেবিলের ওপর রাখলো। বললো, ওটা খোলো, তাহলে বুঝবে,— কেন আমি মুহূর্তের জন্য অমন ভেঙে পড়েছিলাম। কল্যাণী মোড়ক খুলে অর্তনাদ ক'রে উঠলো— চিরুনি আর মণিমুক্তো বসানো চুলের অলঙ্কার। গভীর আবেগে সেগুলি তার বুকে জড়িয়ে ধরলো। ঝাপ্‌সা দৃষ্টি। কিন্তু ফুটে উঠছে মৃদু হাসি। কল্যাণী বললো, আমার চুল খুব দ্রুত বাড়ে— তারপর সে অনুপমের ঘড়িটি চাইলো।

অনুপম ধপাস্ ক'রে চেয়ারে ব'সে পড়লো। তার মুখেও মৃদু হাসি। সে জানালো, কল্যাণীর জন্য উপহার কিনতে সে তার ঘড়িটি বিক্রি ক'রে দিয়েছে।'

প্রভা ব'লে উঠলো, 'যাঃ! কী হলো!'

আনন্দ বললো, 'গল্পটা যতবার মনে পড়ে, আমিও তাই ভাবি— কী হলো! একটা দৃশ্য অবশ্য ফুটে ওঠে: গভীর আলিঙ্গনাবদ্ধ দু'টি মানুষ-মানুষী, চিরন্তন ভাস্কর্য যেন-বা।'

দু'জনই নীরব। আনন্দর চোখের সামনে ভাসছে মিথুন মূর্তি। ওরকম কোনো দৃশ্যের জন্ম যদি তাদের জীবনে ঘটতো— সার্থকতা পেতো তার এই আসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভা বললো, 'হঠাৎ এ-গল্প শোনাতে ইচ্ছে হলো তোমার?'

—'এম্নি, অবশ্য অনেকদিন আগে একবার গল্পটা শোনাতে চেয়েছিলাম।'

—'আমাকে খুব বোকা ভাবো, না?'

—'এমা! এর মধ্যে বোকা চালাকের কী হলো!'

প্রভা ভাবলো, তাও তো ঠিক। এক্কেবারে পাতি একটা গল্প— গল্পে এরকম হয়। কিন্তু জীবনটা— গল্পের মতো কি হ'তে পারে জীবন? আমি কল্যাণী হ'তে পারছি না। মঞ্জুর বাবাকে আমি অনুপম ভাবতে পারছি না। আমাকে দেখে যদিও ও মুগ্ধ হয়েছে, আমার চোখ ও কণ্ঠস্বর ওকে মুগ্ধ করেছে। আমার জন্মদিনে একটা কাজললতা উপহার দিয়েছিল। কিন্তু মুগ্ধ হওয়ার মতো ওর মধ্যে আমি কিছু খুঁজে পাইনি। ও ছুক্‌ছুক্ করছে, আমার কাছ ঘেঁষতে চাইছে। আমার একদম ইচ্ছে করছে না। বাঁচা গেছে, লোকটার সাহসও কম, জোর করবে না।

প্রভাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে আনন্দ আর কথা বাড়ায়নি। তার তখন মনে পড়ছিল প্রভাস ঘোষের কথা। সে যদি প্রভাসের মতো হ'তে পারতো— প্রথমে সে কাকুতিমিনতি করতো,— প্রভা, দরজা খোলো, খো-লো— প্লীজ!

প্রভা খুলতে চাইছে না। কিংবা দেরি করছে। আনন্দ তখন ব'লে উঠতো,— এই মাগি, খোল্!

এখানেই বোধহয় পুরুষ হিসাবে সে ব্যর্থ। যেখানে ডাক নেই নিবেদন নেই, আনন্দর মনে হয়, বলপ্রয়োগ সেখানে প্রকৃতিবিরুদ্ধ— হস্তমৈথুন আর নিষ্প্রেম সঙ্গমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এটা অন্তত সে অনুভব করতে পারে, দুটোতেই অনিবার্য অবসাদ, সঙ্গমে বাড়তি পাওনা— ক্লেদ।

তবুও, খুব মনখারাপ নিয়ে আনন্দর ঘুম ভেঙেছিল। ভোরের রোদ আর কুয়াশায়, দোয়েলের শিসে, কুহুতে, ঘাস-পাতায়— সব, সবকিছুতে মুগ্ধ হওয়ার মতো নানান উপকরণ সাজানো ছিল, কিন্তু নিজেকে প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন মনে হওয়ায় তার কিছুই ভালো লাগছিল না। সে হাঁটছিল... একসময় গাঢ় কুয়াশায় আবৃত হলো সমস্ত চরাচর। কুয়াশার মধ্যে ফুটে ওঠা রোদ্দুরের নানা ভাস্কর্য ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে দেখে আনন্দ মনস্থির ক'রে ফেলেছিল— সেদিনই রাতের স্টিমারে চেপে বসবে সে।

কুসুমকুমারী শুনে বললেন, 'না, আর তো দুটো দিন মাত্র— থেকে যা!'

প্রভা কথাটা শুনে ফেলেছিল। বললো, 'চ'লে যাচ্ছিলে না কি?

—'ভাবছিলাম।'

—'এই তো এলে— কোলকাতা তোমাকে খুব টানে, না?'

আনন্দ অবাক হচ্ছিল। এ কোন্ ধরনের ছিনালি! তব, সে কিছু বলতে পারেনি। থেকে গেছে।

আজ খুব ভোরে আনন্দ ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল। প্রভার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে

দেখছিল মশারির ঘেরাটোপের মধ্যে থাকা প্রভার মুখ। ভোরের আলো আশ্চর্য অঙ্গরাগ হয়ে প্রভার ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে দারুণ এক লাবণ্য ছড়িয়েছে— লাবণ্য-টলটলে ভরাট মুখের জাদু কিংবা মাংসের মায়া কেমন অস্থির ক'রে তুলছিল আনন্দকে, তখনই প্রভার কোল ঘেঁষে শুয়ে থাকা মঞ্জু পাশ ফিরলো, কেঁদে উঠতে পারে, তার আগেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। হালকা কুয়াশার আস্তরণ ওড়নার মতো ছেয়ে ছিল সমস্ত চরাচরে। তাল, তেঁতুল, হিজল পৃথক-পৃথকভাবে এক-একটা ছবি যেন, আবার একসঙ্গে দারুণ নিসর্গ চিত্র। মুগ্ধ দেখছিল আনন্দ। একই দৃশ্য, আটপৌরে— তবু নতুন, রহস্যময়। দোয়েলের শিস ভেসে আসছে। খুব কাছে কোথাও ডাকছে পাখিটা। অন্য পাখিদের ডাক এখনও শোনা যায়নি। কান পেতে ডাকের উৎস আন্দাজ করতে চাইছিল আনন্দ— হয়তো আমগাছে, হ'তে পারে ওই জামরুলের ডালে কিংবা ডুমুরগাছটায়— আনন্দ হাঁটতে-হাঁটতে ডুমুরগাছ পেরিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিল...

ফিরিয়ে আনলো সত্যানন্দের কণ্ঠস্বর। তিনি উপনিষদ পাঠ করছিলেন।

সেই পাঠ শুনতে-শুনতে আনন্দর মনে হচ্ছিল কার যেন মঙ্গলকর-স্পর্শে পবিত্র হয়ে উঠছে এ বিশ্বচরাচর। নিজের অজান্তেই তার দৃষ্টি উর্দ্ধ আকাশে, চুঁইয়ে আসা নরম নীল... ভিজিয়ে দিচ্ছিল তার চোখ, চোখ থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল তার বুকের মধ্যে... পাঠ শেষ হ'তেই সম্বিতে ফিরেছে আনন্দ। বাবাকে প্রণাম করেছে। বাবার হাতে ফুটে উঠেছে ঋষিমুদ্রা। আনন্দ অনুভব করেছে তাঁর অনুচ্চারিত আশীর্বাণী। ...মা তাঁর স্নেহচুম্বন ডান হাতের পাঁচ আঙুলের মাথায় ধ'রে বসিয়ে দিয়েছেন আনন্দর চিবুকে।

কুসুমকুমারীর মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দ ভাবছিল— তেত্রিশ বছর আগে এই দিনে জরায়ুর অন্ধকার ছিঁড়ে আমি আলোয় এসেছিলাম— প্রথম আলো-অনুভবের বিস্ময়ে, উত্তাপ হারানোর হাড়হিম করা আতঙ্কে আমি চিৎকার ক'রে উঠেছিলাম। হয়তো-বা সেই চিৎকারে ছিল এ পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় আমার অধিকার প্রাপ্তির উল্লাস ঘোষণা— আনন্দ শুনতে পাচ্ছিল তার জন্মকান্না... কেমন করুণ বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা লক্ষ ক'রে কুসুমকুমারী বললেন, 'যা— খুকি কাঁদছে।'

এতক্ষণ তাহলে আমি খুকির কান্না শুনছিলাম।

আনন্দ দ্রুত পা চালিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কাঁথা সমেত মঞ্জুকে তুলে নিলো বুকে। তার কান্না থামানোর চেষ্টা করতে করতে একসময় বললো, 'জানিস তো আজ আমার জন্মদিন।'

কে যেন কবে বলেছিল ফাল্গুন যার জন্মমাস তার কপালে দুঃখ অশেষ— হয়তো এরকম একটা ধারণা— সে নিজেই তৈরি ক'রে নিয়েছে। নক্ষত্রদোষটোষ খুব একটা মানে না আনন্দ; তব, কোথায় যেন জন্মদাগের মতো রয়ে গেছে সংস্কার— মনে হয় নক্ষত্রদোষেই তার সবকিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বার বার, প্রেমের পথে এসেছে বাধা, এমন-কী বিয়েটাও

নষ্ট হয়ে গেছে— এই মেয়েটিও কি... একটা অপচিন্তা আনন্দকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছিল। বাঁচালো প্রভা, 'সাতসকালে এত প্রণামের ঘটা?'

প্রভা জানে ছয়ই ফাল্গুন আনন্দর জন্মদিন। কিন্তু খেয়াল নেই। অবশ্য ভুলে যাওয়াও স্বাভাবিক। তার কথা মনে রাখলে হয়তো খুশি হতো আনন্দ। অন্তত এমন বিস্বাদে ভ'রে যেতো না ফাল্গুনের এই আলো-হাওয়া, কূজন-সুবাস— যতটুকু দুঃখবোধে সে আক্রান্ত তাকে নস্যাৎ করতে আনন্দ বললো, 'আজ আমি জন্মেছিলাম।'

প্রভার দিক থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। কিংবা হয়তো গভীর কোনো প্রতিক্রিয়াকে আড়াল করতে সে মুখ ফিরিয়ে কাজে মন দিয়েছে।

মেয়েটি বুকের মধ্যে নড়েচড়ে উঠলো। যেন একটু দাঁড়াতে চায়। সত্যি-সত্যি সে তার শালিকের ঠ্যাঙের মতো পা-দুটো আনন্দর বুকে বাঁধিয়ে সোজা করতে চাইলো শিরদাঁড়া। আনন্দ মঞ্জুর চাওয়াটাকে সহজ ক'রে দিতেই বাপ-মেয়ে মুখোমুখি। কী দেখছে মেয়েটা? এ বয়সের বাচ্চাদের চোখ যেমন নীলাভ হয়, এ মেয়েটির চোখ তেমন নয়। কেমন যেন নিরুজ্জ্বল, ফ্যাকাসে মুখ— ওর মায়ের মতো— রক্তমাংসে যেন প্রাণের উচ্ছ্বাস নেই। কেমন করুণ-মায়াময়; যেন-বা বিষণ্ণ। আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'এই ফাল্গুনে তোকেও ডেকে আনলাম।' আবার ফিরে এলো সেই অপচিন্তা— এত রোগা! দুর্বল ফলের মতো অকালে ঝ'রে যাবে না তো!— যেন ওই আশঙ্কা রুখতেই আনন্দ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

প্রভা যদি 'হ্যাপী বার্থ ডে' বলতো কিংবা অন্য কোনোভাবে তাকে শুভেচ্ছা জানাতো, অন্তত আজ তার জন্মদিন— একথা জেনে যদি বলতো, 'ঈমা! একদম ভুলে গেছি!' তাহলেই অন্য একটা মাত্রা পেয়ে যেতো আজকের দিনটি। গেল বার এ-দিনটায় প্রভা আঁতুর ঘরে, তার আগের বছর প্রভা এ-বাড়িতে এসে পৌঁছোয়নি, তার ছবি পৌঁছে গেছে আনন্দর কাছে— সে তখন প্রভার সঙ্গে একটা মানসিক সম্পর্ক গ'ড়ে তুলতে চাইছিল— সম্ভবত আজ— তার জন্মদিন শুনে প্রভার মধ্যে বিতৃষ্ণা জন্মেছিল।

যদি না-জন্মাতাম— জন্মেছি ব'লেই প্রভার দুঃখের কারণ আমি; জন্মেছি ব'লেই খুকি তোর জন্মের কারণ আমি, জন্মেছি ব'লেই...

অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় দগ্ধ মুখাবয়বে বিষণ্ণতার ছায়া...

তবুও, হাওয়ায় বাসমতীর সুবাস— বাতাসে বাসমতী মানেই সর্বানন্দ ভবনে কারও জন্মদিন। কার? মনে পড়ছে, অথবা খোঁজ নিয়ে জানা যাচ্ছে— আজ মিলুর জন্মদিন।

একটা অসফল নিষ্কর্মা মানুষ কী ক'রে যে বিয়ে করার সাধ ও সাহস দেখালো— ওঃ! নিষ্কর্মার সাধ ও সাহস যে কী অনাসৃষ্টি তা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে প্রভা— 'তুমি জন্মেছিলে ব'লে সার্থক জনম আমার'— এই অনুভব যদি প্রভা-তে জাগাতে পারতাম!

তখন দেশ জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা— ইতিমধ্যে যা 'গ্রেট ডিপ্রেশন'-রূপে চিহ্নিত হয়েছে— ডিপ্রেশন! সত্যিই কি আমি গভীর কোনো অবসাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অমন হটকারী কাজ করেছিলাম? কোনো মেয়েকে আমার জীবনে ধ'রে রাখার ক্ষমতা নেহ, ছিল না— এটা জেনে যেতেই কি মা-বাবার ইচ্ছের বিরোধিতা করিনি আমি?

খুকিকে দোলনায় শুইয়ে দিয়ে একবার তাকালো তার দিকে— এখনও হামা দিতে শিখলো না। দোলনা দুলিয়ে দিয়ে বাইরে এলো আনন্দ।

এমন হতভাগা বাবা আমি, জন্মদিনে মেয়েকে একটা জামা দেওয়ার ক্ষমতাও নেই আমার! সব দিয়ে যাচ্ছেন বাবা। এমন-কী তাঁর এই ধেড়ে খোকার জন্য, অন্তত একটা গেঞ্জি, তিনি আনিয়েছেন তো। আবারও সেই অস্থিরতা। কোকিল ডাকছে কোথাও। ডাকছে বৌ-কথা-কও, ঘুঘু— কূজনমাখা রোদ্দুর, ফুলের গন্ধ মাখা হাওয়া, চারদিকের কচি সবুজ রঙ অস্থির আনন্দকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে কোথাও— হাঁটছে হন-হন...

মর্গের পাশ দিয়ে যাবার সময় পচামাংসের গন্ধ পেলো সে। মদ্দা মানুষ আর মেয়ে মানুষের গন্ধের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে— লাস হয়ে গেলে পর? যদি মর্গের ওই লাস মেয়েমানুষের হয়— মেয়েমানুষের মাংসের ঘ্রাণ নিষ্প্রাণ হয়ে গেলে এমন বিকট? মাংসের অহংকার! প্রভার মাংস ঝ'রে যাচ্ছে! নষ্ট অহংকারের শোকে কি প্রভা অমন খিট্‌খিটে ছিচকাঁদুনে— কথায়-কথায় কপালে করাঘাত, অদৃষ্টকে অভিশাপ দেওয়া, নিজের মৃত্যুকামনা— কখনও মঞ্জুর, কখনও-বা একসঙ্গে দু'জনার। প্রভার শরীরে কেমন আঁশটে গন্ধ— পচা ওই গন্ধটা কোনো পুরুষের হ'তে পারে, প্রভাস ঘোষের মতো আত্মতৃপ্ত কোনো পুরুষালি পুরুষের— যে পেশিশক্তিতে বিভোর রমণী তাও প'চে গেলে এমন!

আচমকা আকাশের দিকে মুখ তুলে আনন্দ দাঁড়িয়ে থাকলো। সকালের নীলাভ আকাশ এখন গাঢ় নীল। আনন্দ ভাবলো, মানুষ কেন মর্গে প'চে মরে? আনন্দ একবার পেছন ফিরে মর্গের দিকে তাকালো।

যে মানুষটা মর্গে শুয়ে আছে, যার রক্তমাংসে পচন ধরেছে, তারও তো একটা জন্মদিন ছিল! কবে? পরশু কিংবা আগের দিন— তরশু, হয়তো জানতো না— কবে সে জন্মেছে। কিংবা জানতো, তাৎপর্যহীন বেঁচে থাকতে-থাকতে সে ভুলে গেছে।

এমনও তো হ'তে পারে— জীবন কোনো চরিতার্থতা পায়নি ব'লে সে জন্মদিনের দিন-ই মৃত্যুদিন তৈরি করেছে— জন্ম-মৃত্যুর একই দিন।

ছয়ই ফাল্গুন— আমার মৃত্যুদিন হ'তে পারে।

আনন্দর মনে হলো— এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন। আহা মরণ— এক্কেবারে শ্যামতুল্য!

এক ঝলক রবীন্দ্রনাথের মুখ মনে পড়লো। আহা! প্রেম!

প্রেম শব্দটা যতবার উচ্চারিত হয়েছে জীবনে, ততবারই নীল জ্যোৎস্না মাখা কিংবা হেমন্তের ভোরের কুয়াশা মাখা অস্পষ্ট এক নারী ভেসে উঠেছে চেতনায়, কেমন যেন

অবগুণ্ঠিত— ঘোমটা তুললেই সে-মুখ কখনও মনিয়ার, কখনও-বা বনির। আজ কোনো নারীমুখ ভেসে উঠলো না। কেবল মনে হলো, মৃত্যু ইক্যুয়াল টু প্রেমিক।

যন্ত্রণাদগ্ধ এ-জীবন কি তবে রাধার মতো? প্রভা মৃত্যুকামনা করে— মৃত্যুর কথা ভাবে, তার মানে সে শ্যামের কথা ভাবে— শ্যাম তবে অন্য কোনো পুরুষের রূপ হ'তে পারে— কোনো পুরুষ যখন মৃত্যুর কথা ভাবে— তখন তার চেতনায় কোনো নারীমূর্তি ফুটে ওঠে না কী? আকাঙ্ক্ষিত জন যখন আকাঙ্ক্ষীর নিকট পৌঁছোয় তখন পিছনের সব সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় ব'লে কি তাকে মৃত্যু বলে? আর ওইসব বন্ধন-সম্বন্ধের নিরিখেই কি নিজেকে মৃত ব'লে মনে করে সে, যার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো? আসলে তা কি অন্য এক সম্পর্ক রচনা নয়, কিংবা জন্ম?

নদীর পাড়-বরাবর দ্রুত হাঁটছিল আনন্দ...

সম্পর্কের কি জন্মদিন হয়? হয়। হয়ই তো। নইলে আজও কেন নোনাফল হাতে মনিয়ার কথা মনে পড়ে— সেদিনই তো ছিল আমাদের সম্পর্কের জন্মদিন!

কিংবা বনি— সেই যে আশ্চর্য দৃষ্টিতে চোখ রেখেছিল আমার চোখে— সেদিনই তো ছিল আমাদের সম্পর্কের উদ্বোধন, জন্মদিন; অতএব, সম্পর্কেরও মৃত্যুদিন থাকে। এ-পথে বনি আর সে বার-কয়েক হেঁটেছে নিবিড়। তারই স্মৃতি-স্বাদ অনুভবের মধ্যে এনে জীবনের কয়েকটা চরিতার্থ মুহূর্তকে ফের উপলব্ধি ক'রে আনন্দ খানিকটা তৃপ্তি পেলো। বনি আনন্দর জন্মদিন মনে রেখেছিল— আজও কি মনে পড়ছে তার? আরও এক বিষণ্ণতার গাঢ় রূপালি রেখা দেখতে পেয়ে আনন্দ আকাশের দিকে তাকালো। একটা চিল ভেসে আছে স্থির। এমন যদি অনড়-স্থির থাকা যেতো!

নিজের মনে মাথা নাড়লো আনন্দ। বেভুল দশা থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে সে আবারও চিলটাকে দেখলো। ভেসে থাকার অর্থ শিকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ— নিশ্চিত সাফল্যে পৌঁছানোর মহড়া বা প্রস্তুতি। আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'সে প্রস্তুতি তোমাতে নেই— শিকারি-শিকারের সম্পর্কে তুমি বাঁচতে শিখলে না, কোনো টার্গেট নেই তোমার। বাস্তব আর কল্পলোকের মধ্যে কোনো সেতু তুমি তৈরি করতে পারো না— পারোনি। যদি পারতে— প্রভা অন্তত এভাবে ক্ষয়ে যেতো না। তোমার কল্পিত নারীর সঙ্গে প্রভার খুব কি অমিল ছিল? প্রথম যেদিন এক পলক প্রভার চোখে তোমার চোখ পড়েছিল— সে চোখের উপমায় তো কাজলনয়না হরিণীর কথাই মনে এসেছিল। সেই চোখ আজ কেমন প্রাণের উচ্ছ্বাস নিভে আসা চোখের মতো, যে চোখে নীল আকাশের স্নিগ্ধতা ছিল— সেই চোখ কেমন ঘষা কাচের মতো। অর্থ আর কীর্তির অভাবে ভাদ্দুরে নদীর মতো একটা শরীর কেমন শীর্ণ...

মনে পড়লো মঞ্জুর মুখ। আর ফিরে এলো সেই অপচিন্তা, অস্থিরতা। আনন্দ হাঁটছে। সূর্য মাথার ওপরে। ফণিমনসার ঝোপটার পাশে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো— ক্যাকটাস, গাঢ় সবুজের শরীর ফুঁড়ে কালচে রক্তিম কাঁটা— বেঁচে থাকার আশ্চর্য প্রতিরক্ষা...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়েস ছাড়া আর কোনো নতুনত্ব ছিল না আজকের দিনটায়। এক বাটি পায়েস বেশ তৃপ্তি ক'রেই খেয়েছে আনন্দ। সে যখন খাচ্ছিল প্রভা অবাক দেখছিল তাকে। আমি বোধহয় একটা জানোয়ার হয়ে উঠছি দিনদিন। শরীরসর্বস্ব। যে পুরুষের অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা নেই তার এত পেনিস উচ্ছ্রিত হয় কীভাবে! এবং প্রভা খ্যাঁক্ ক'রে উঠবে জেনেও ভাদ্দুরে কুত্তার মতো আমি আনন্দ, ইংলিশে এম.এ., সেকেণ্ড ক্লাস, একদা অধ্যাপক কীভাবে প্রভার কাছে যাই!

আনন্দ প্রভার বিছানার পাশে। শুক্লা দশমীর চাঁদ ডুবে গেছে ব'লে ঘরে জমাট বেঁধেছে অন্ধকার। জানালা-পথে বাইরের যে-খণ্ডটুকু দেখা যায় সেখানেও অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। তবু সে জানালাটার দিকে তাকিয়েছিল। যেন কোনো অপার্থিব ইশারা আসবে, যা তাকে উদ্ধার করবে তার এই সারমেয় স্বভাব থেকে। জানালার ফ্রেমে আঁটা নিকষ অন্ধকারে একবিন্দু আলো, আলোর কণিকা— মুহূর্ত-কয়েকের জন্য— মিলিয়ে গেলেও দৃশ্যটাকে যেন দেখতে পাচ্ছিল আনন্দ, মুগ্ধ বিভোর; তাকে চমকে দিয়ে ডেকে উঠলো পেঁচা। সে স্পষ্ট কল্পনা করতে পারলো ফসলহীন মাঠে দু'-এক দানা খাদ্যের খোঁজে বিষণ্ন ইঁদুর— দুদ্দাড় ঢুকে পড়ছে গর্তে— মৃত্যুর বেশে এসে তবু জীবনকে সতর্ক ক'রে দেয় না কি মৃত্যু?

দরজার দিকে সন্তর্পণে স'রে এলো আনন্দ। গোপন অভিসারে যাওয়ার মতো ক'রে দরজার খিল খুললো। বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। বাইরের নিস্তব্ধতায় কোনো আঁচড় না-কেটে দরজা ভেজিয়ে দিলো।

উঠোন। ওপরে নক্ষত্রের আকাশ।...

সমস্ত আকাশখানা নেমে এসেছে পৃথিবীতে— টলটলে আকাশ দেখতে-দেখতে আনন্দ স্পষ্ট কল্পনা করতে পারলো জলের নিচে সে ঘুমিয়ে আছে— ঘুম থেকে সে জেগে না-উঠে কেবল ভেসে উঠবে...

আজ আমার জন্মদিন— রাত পোহালেই শেষ হয়ে যাবে। আমি কখন জন্মেছিলাম— জানা হয়নি। স্মৃতিতেও নেই। থাকার কথাও নয়, তবু— এমনই মৃত্যুর মতো জন্মেরও আয়োজন শুরু হয়েছিল। অগভীর একটা দীর্ঘশ্বাস— দীর্ঘশ্বাসে মিশে থাকা উত্তাপটুকু মিলিয়ে গেল কুয়াশা-কুয়াশা হিমের মধ্যে— অনুভবে স্পষ্ট ধরা পড়লো এসব। পরক্ষণেই পুকুরের জলে তার ভেসে থাকা দেখতে পেলো— দেখতে পেলো মা-বাবা-পড়শিদের ভিড় পুকুড়পাড়ে, বুক চাপড়ানি...

একটা ঢিল ছুড়ে দিয়ে সমস্ত আকাশটাকে ঘেঁটে দিলো আনন্দ। তখনই মঞ্জুর কান্না ছুটে এসে তাকে জাপটে ধরলো।... কেঁদেই চলেছে মেয়েটা। প্রভা ম'রে গেল নাকি? মেয়েটাকে থামাচ্ছে না কেন? প্রভার হার্টফেল করা অসম্ভব কিছু না— উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় বাড়ির দিকে পা বাড়ালো আনন্দ। যেন জীবন ছুটছে মৃত্যুকে রুখে দিতে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলে তুমি চলে গেলে কবে!
সেই থেকে অন্য প্রকৃতির অনুভবে
মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত হয়ে জেগে উঠেছে হৃদয়

বিস্ময় জাগাতে পারে— পৃথিবীতে এমন জিনিস যে কত আছে! এক পাল ভেড়ার বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট ধ'রে হ্যারিসন রোডের দিকে যাওয়া দেখে ভাবছিল আনন্দ— ইট-কাঠ-পাথরের এ-জঙ্গলে ভেড়ার বেঁচে থাকা এবং রাজপথে এমন প্রবাহ সৃষ্টি করা সত্যিই অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার বটে। সবগুলো প্রায় একই মাপের— একই সঙ্গে জন্মেছে সব! মাংসের ফলন, ওমের ফলন— প্রবল কামপ্রবৃত্তি আছে ব'লেই জীবনের এই সার্থকতা— জন্ম দিয়ে যাওয়া আর ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত করা। এটাই প্রকৃতির নিয়ম— এই নিয়মের মধ্যে আনন্দ নিজেকে আবিষ্কার ক'রে একটু বিমর্ষ হলো। এবং এক ঝলক সত্যানন্দের মুখটা মনেও পড়লো, কিন্তু তাঁর সন্ত-সন্ত চেহারার কোথাও টোল খেলো না।

কিন্তু আমি তো ধ্বংস হয়েই যাচ্ছি!

তবুও তুমি সন্তানের জন্ম দিয়েছো।

আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'ঈশ্বর যদি এত বেশি সেক্সুয়াল ডিজায়্যার না-দিতো!'

মানুষ কী অদ্ভুত বিশ্বাস করে, 'জীব দেছেন যিনি আহার দেবেন তিনি—'

তা কি দিচ্ছে না? শহরের রাস্তায় তো ভেড়া চ'রে বেড়াচ্ছে! তুমি তো মুমূর্ষু কুকুরের মুখে রুটির টুকরো তুলে দিতে পারছো!

পারছি, মানে— পেরেছি একদিন মাত্র; তবু মঞ্জু অপুষ্টিতে ভুগছে। প্রভার মাংস ঝ'রে যাচ্ছে, তার ডিজায়্যার ফুরিয়ে গেছে অথচ নিজেকে ভীষণ কামুক মনে হয়— অস্বাভাবিক মনে হয়— নইলে কেন আমি গ্রে স্ট্রিটে ঢুকে পড়ি? কেনই-বা অন্ধকারে সারি-সারি দাঁড়িয়ে থাকা রূপহীনা মেয়েগুলোর দিকে তাকাই— একটা বেদনাবোধ জাগে ঠিকই তবু বোদলেয়রের আত্মার উপস্থিতিও টের পাই।

কিংবা দেখতে ভালো না ছাত্রীটিকেও তো তুমি সুন্দর দেখতে চাও!

চাই বটে তবু সে-সুন্দরবোধকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায় মৃত মনিয়া— অনতিক্রম্য দূরত্বে চ'লে যাওয়া বনি— কখনও-বা প্রভা—

প্রেম আর করুণা জীবনকে— জীবনের সহজ গতিকে কেমন পঙ্গু ক'রে দেয়, তাই না!

কিন্তু জীবনটা সত্যিই সহজ, সরল?

হয়তো সহজ হতো যদি একটা চাকরি থাকতো!

প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে বঙ্কিম চ্যাটার্জির মুখটাতে সে দাঁড়িয়ে ছিল স্থির— তার ভাবনায় ছেদ ঘটালো একটা ষাঁড়, ষাঁড়ের ঠুসো থেকে তাকে বাঁচাতে কেউ একজন তার বাহু ধ'রে টান মেরে সরিয়ে দিয়েছে। ষাঁড়টা দুলকি চালে চ'লে যাচ্ছে। আনন্দও ছেলেটির দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি ঢেলে কলেজ স্ট্রিট বরাবর হাঁটতে থাকলো।

হাঁটতে-হাঁটতে একটা গল্পের কথা ভাবছিল। গত অক্টোবর-নভেম্বর ধ'রে দশ-দশটা গল্প লিখেছে সে। কিন্তু প্রতিটি গল্পেই বড়বেশি ধরা পড়েছে তার নিজের জীবন— জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা— যথার্থই নিজেকে দেখা, কিন্তু নিজেকে দেখতে গিয়ে অন্যদেরকে সে ছোট ক'রে ফেলেছে। একদমই শিল্পসম্মত হয়নি। বরং নিজেরও শঠতা, নিচুতা, এমন-কী নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেয়েছে—

গত পরশু প্রায় সারারাত জেগে সে একটা গল্প লিখেছে, সেই গল্পের একটা ব্যাপার তাকে কাঁটার মতো বিঁধছে এবং সে বিস্মিত— অমন ঘটনা সে কীভাবে ঘটাতে পারলো গল্পের মধ্যে— যদিও ঘটনাটা ঘটেছে স্বপ্নে, স্বপ্ন মানে অবচেতন বিশ্ব, ফ্রয়েডের কল্যাণে শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই জানে, ভেবলু তো জানেই— এ গল্প যদি কোনোদিন ভেবলুর হাতে পড়ে, সে ভাবতে পারে, দাদার মনে তার মৃত্যুকামনা ছিল!

নতুন গল্পের ভাবনা উধাও হয়ে গেছে। আনন্দ এখন সেই কাঁটার খোঁচা খেয়ে দ্রুত হাঁটছে। যেন রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে, তাতে শুশ্রূষা দিতে হবে— গল্পের কাছে সে ফিরতে চাইছে...

গল্পের প্রথম পাতায় একবার চোখ বুলালো। তার পরিচিত, আত্মীয়স্বজন— যে-কেউ পড়লে বুঝবে— এ গল্প তাদের মিলুর, মিলু অবশ্য উপন্যাস-গল্প লেখে না, কবিতা লেখে— 'সুবোধের উপন্যাসখানা কোনো সম্পাদকই নিলো না।' গল্পের শুরুটা যে-কেউ এভাবে পড়তে পাবে: মিলুর কবিতার পাণ্ডুলিপি কোনো সম্পাদকই নিলো না।

এ গল্প যদি অমূল্য পড়ে— 'শহরের শেষ গ্যাসলাইট কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল।' এই বাক্য অনিবার্যভাবে তাকে মনে করিয়ে দেবে, 'চলো অমূল্য— একটু হেঁটে আসি—'

—'কোথায়?'

—'এই তো এই রাস্তা ধ'রে।'

খানিকটা যাওয়ার পর অমূল্য বলেছিল, 'আর কত দূর?'

—'এই গ্যাসলাইট যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে।'

—'না। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

এবং অমূল্যর মনে পড়তে পারে, রাস্তা বরাবর হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টিতে আনন্দর উদাস তাকিয়ে থাকা।

আর এইসব অনুষঙ্গে সুবোধের ভাইয়ের মৃত্যুকে যে-কেউ ভেবলুর মৃত্যু ভাবতে পারে। কিন্তু সে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে— বাস্তবত ভেবলুর প্রতি আনন্দর একটা অভিমান কাজ করছে, বাড়িতে সে টাকা পাঠানোর পরিমাণ একবছর আগে যা ছিল তার চেয়েও কমিয়ে দিয়েছে। অথচ সংসার খরচ বেড়েছে। আনন্দ এমনও আকাঙ্ক্ষা করেছিল— ভেবলু তাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু টাকা দেবে, তার কবিতা লেখার জন্য মনটাকে খানিকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারমুক্ত করার জন্য। এই-যে কারও প্রতি আকাঙ্ক্ষা, আস্থা— নষ্ট হয়ে গেলে সেই মানুষটাকে আমরা কি মৃত ব'লে ঘোষণা করবো? সেরকম কোনো ব্যাপার কি ফুটে উঠেছে লেখার মধ্যে?

পাণ্ডুলিপি-খাতার একেবারে শেষদিকে চ'লে এলো আনন্দ— এ গল্পটা 'আর্ট' বয়ে বেড়ানো একটা মানুষের গল্প— অস্বাভাবিক মানুষের, তার সঙ্গেও যথেষ্ট মিল আছে আনন্দর— '...এই যে মন, যাতে কোনো ধোঁকা নেই, সন্দেহ নেই, বিষণ্ণতা নেই, বিবর্ণতা নেই,— এই হচ্ছে স্বাভাবিক হৃদয়! কী যে স্বাভাবিক! আর্টের চেয়ে কত যে দূরে।'

কে না জানে তার মনের ধোঁকা সন্দেহের কথা— আর বিষণ্ণতা-বিবর্ণতা তো তার মুখে— আনন্দ বিড়বিড় করলো 'ইনডেক্স অব মাইণ্ড।'

একটা লেখাও তাই নয় কি?

আর একটা পাতা উল্টে আনন্দ পড়তে থাকলো:

> রাতে স্বপ্ন দেখল, কে যেন দরজায় এসে ধাক্কা দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখল, তার ভাই, ছোটভাই, বিশ বছরের ছোকরা শিয়ালকোট থেকে এসেছে। সেখানে একটা অফিসে চাকরি করত সে। এবং দাদাকে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাত। এমন ভাই এই পৃথিবীতে কারু হয় না। সে যতদিন বেঁচে ছিল সুবোধকে টুইশনও করতে হত না।...

মাথা চুলকালো আনন্দ। সুবোধের জায়গায় আনন্দ বসিয়ে ফের সে বাক্যটাকে পড়লো। নিজের প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাব জেগে উঠলো। তবু সে পড়বে— সুবোধের আড়াল না-রেখেই— পড়ছে:

> ...কিন্তু সে ভাই ত মরে গেছে। আবার কী করে এল সে! আনন্দ অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। দেখলে ভাই সে আরো অন্ধকারে সেই লম্বা শীর্ণ ছেলেটি কুলির ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছে। তারপর আনন্দর ঘরের ভিতর ঢুকে বললে, 'সাতদিনের ছুটিতে এসেছি, আমি দেশে যাচ্ছি দাদা, তুমি কি যেতে পারবে?'

আনন্দর বুকের মধ্যে কীরকম যেন হু-হু ক'রে উঠলো— এরকমই তো ঘটেছে। এ.জি. অফিসের চাকরি ছেড়ে অশোক তখন পুনেতে— পুনে থেকে সেবার সে এমনই এসেছিল, সাতদিনের ছুটি— কতদিন সে মাকে দ্যাখেনি— মায়ের কাছে যাবে, তাকেও যেতে বলেছিল। আনন্দ বলেছিল, 'না রে— এখন আমার যাওয়া হবে না। এই তো এলাম— একমাসও হয়নি।'

এটা বাস্তব, কিন্তু বাস্তবও নয়— কারণ ভেবলু জীবিত— এ কেবল আর্টের মায়া।

শুধুই কি মায়া? এ তোমার অবচেতনের বাস্তব— যে সম্পর্ক তোমার আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে পারে না তাকে তুমি মৃত্যুদণ্ড দাও— দাও না কী? দিয়েছো তো আরও! প্রভাকে—

আনন্দ— লেখা হয়ে যাওয়া আর একটা গল্পের মধ্যে ডুবে গেল। গল্পটা লিখেছিল গত অক্টোবরে। আসলে ওই গল্পে আনন্দ তার বাবা হওয়ার সময়কে ফিরে দেখেছিল। কী করুণ মর্মস্পর্শী বিবরণে অভাবী ঘরের প্রথম পোয়াতির, যার স্বামী শিক্ষিত বেকার— তার, তাদের জীবনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, প্রেম-প্রেমহীনতা ফুটে উঠেছে।

আমি কিন্তু যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলাম।

ঠিক। ঠিক ততখানি— যতখানি তোমার অসহায়তা প্রকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল।

এসব কি নিক্তি মেপে হয়?

তেমনই তো হয়েছে। নইলে শেফালীকে তুমি মারলে কীভাবে? তোমার কি তখন একবারও মনে পড়েনি প্রভার মুখ— প্রসবকালীন ব্যথা-বেদনা— তুমি তো তা অনুভব করেছিলে সমমর্মিতায়, তবু— কী অবলীলায় তুমি লিখলে: পূর্ণিমার দিন টেলিগ্রাম এলো— সন্তান, মেয়ে। বেঁচে আছে। কিন্তু শেফালী চ'লে গেছে।— যদি সত্যিই গল্পের মতো হতো জীবনটা— এই জীবন! আনন্দ যেন কঁকিয়ে উঠলো। না। মৃত্যু যে-গল্পে নিষ্কৃতি হয়ে আসে, জীবন সেই গল্পের মতো হোক— চাই না, চাই না।

না-ভঙ্গিতে আনন্দর মাথা আন্দোলিত হচ্ছে।

তবুও তো নিষ্কৃতি পেতে চাও— অন্তত সেদিন মায়ের সঙ্গে কথায় কথায় যখন বললে,— কী ক'রে যে প্রভাকে নিয়ে চলবো আমি— তার মধ্যে কি নিষ্কৃতি পাওয়ার সুপ্ত বাসনা ছিল না? ছিল। ছিল ব'লেই, সেটাকে বুঝতে না-দেবার জন্য তুমি ফের বলেছিলে, আমাকে নিয়েই-বা প্রভা চলবে কেমন ক'রে?

আনন্দর যে-কোনো সমস্যা-অসুবিধা সমাধানের জন্য কুসুমকুমারীই তার শেষ ভরসা— এটা ঠিক যে, তাঁর কাছে কথাগুলো বলার মধ্যে মীমাংসা পাওয়ার একটা অভিপ্রায় ছিল— কিন্তু আনন্দ অবাক হয়ে লক্ষ করেছিল, কুসুমকুমারীর মুখে মীমাংসা করবার কোনো ইচ্ছা কিংবা আপাতভাবে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো রুচিও যেন ছিল না।

তার মানে একটাও গল্প হয়নি— তবু আরও একটা গল্প লিখতে চাইছে সে; সেই ভাবনার মধ্যে ঢুকে পড়লো আনন্দ—

কিছুদিন যাবৎ তার মনে হচ্ছিল চারপাশের সব দৃশ্যাবলী কেমন যেন ঝাপসা-ঝাপসা। এমন-কী এই যে তক্তপোষের ওপর সে ব'সে আছে, এখান থেকে সামনের দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডার পড়তেও তার অসুবিধা হচ্ছে। কয়েকদিন আগে বোর্ডিঙের চাকরকে সে বলেছিল, 'দ্যাখ্ তো আজকের তারিখ কত।'

সে স্পষ্টভাবে বার-সহ তারিখ জানাতেই বিস্মিত হয়েছিল আনন্দ। তা দেখে সে আরও পিছিয়ে গিয়ে বলেছিল, 'এখান থেকেও আমি স্পষ্ট দেখছি।'

অতএব, আনন্দর চোখ যে ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে— এ বিষয়ে তার কোনো সংশয় ছিল না এবং পরিণাম ভাবছিল। এই বিষয় নিয়েই সে একটা গল্প লিখতে চাইছে।

এবং এই গল্প থেকে কিছুতেই প্রভাকে বাইরে রাখা যাচ্ছে না— অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সে কান দিয়ে দেখবে, পানকৌড়ির ডাক শুনে যে-ছবি তৈরি হবে, এই এখনও সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তাদের শৃঙ্গার-মুহূর্ত; ঘুঘুর ডাক থেমে গেলে যে-দৃশ্য তৈরি হয়— ঘুঘুর বুকের ভিতর ঘুঘু কিংবা গুমোট গরম আর নিস্তব্ধতার গন্ধে সে বুঝতে পারবে মেঘ আর তার মনময়ূর উঠবে নেচে; প্রবল বর্ষণের পর ব্যাঙের ডাক— সে যেন একদিন প্রভাকে দেখিয়েছিল একটা মোটাসোটা ব্যাঙের পিঠের উপর ছোট ব্যাঙ... একবারই— এরকম কত দৃশ্য দেখাতে ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু প্রভার মুখঝামটার ভয়ে দেখানো হয়নি, দৃশ্যের জন্ম হয়, হয়তো প্রভাও দ্যাখে, দ্যাখে কেবল; হয়তো কোনো অনুভূতিও জাগে, কিন্তু প্রবল বিতৃষ্ণায় দৃশ্যেরা মুছে যায়, তবু— এসব দৃশ্যরা জন্মাবে...

এসব ভাবনায় প্রভাকে এড়ানো সম্ভব নয়...

দরকার কী! তুমি তো আর গল্প লিখছো না— নিজেকে লিখছো, নিজেকে ফিরে দেখার অভিপ্রায়ে।

কিন্তু কেন এই দেখার আয়োজন? জীবন কি তবে অপেক্ষা করছে কিছুর জন্য?

করছেই তো। অন্ধত্ব, আত্মহত্যা— কিংবা, বিচ্ছেদ, একাকিত্ব।

ঘাম দিয়ে ধুমজ্বর ছেড়ে গেলে সমস্ত দেহমনে যেমন একটা স্বস্তি ছড়িয়ে পড়ে, অনেকটা তেমনই— একটা নিস্তার তবে আছে কোথাও— এমন বোধে আনন্দ নিজেকে বেশ ভারশূন্য মনে করলো।

মেসে লোকজন ফিরছে সব। ক্লান্ত বিষণ্ণতা ধুয়েমুছে মাথাটাকে ঘর-সংসার ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে একটু পরে তাসের আসর বসাবে, আনন্দ ভাবলো নিজেকে এই শূন্যতায় নিবিষ্ট রাখতে আজ সে তাসে বসবে। ব্রে-ফিস নয়, ব্রিজ— এতে একটা মজা আছে, খেলা-শেষে নানান মন্তব্য থেকে যখন ঝগড়া শুরু হয়, সে একখানা দেখবার জিনিস, উপভোগ করে আনন্দ— তার আরও ভালো লাগে ইচ্ছে ক'রে হেরে যেতে— জিতে যাওয়া মুখের হাসি উপভোগ করবার মতো জিনিস... আনন্দ মনে-মনে প্রস্তুত হচ্ছিল।

আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।
তারপর চলে যায় কোথায় আকাশে?

মাথার মধ্যে অসংখ্য কথা। পাখির কাকলির মতো। আলাদাভাবে ঠিক-ঠিক চেনা যায় না তেমন— কোন্‌টা যে কার কথা! কথাগুলো থেকে আনন্দ এক এক জনের কথা আলাদা ক'রে সাজাতে চেষ্টা করছিল অনেকক্ষণ ধ'রে। এই এতক্ষণে সে কবিতা-বিষয়ে নিবিষ্ট হ'তে পারলো।

আজ কলেজ স্ট্রিটে দেবের সঙ্গে আনন্দর দেখা হয়ে গেছে। না-দেখার ভানে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে দেবও তাকে দেখে ফেলেছে এবং দ্রুত পা চালিয়ে তার সামনে—। দেব পাকাপাকিভাবে কোলকাতায় চ'লে এসেছে। তার অনুরাগী, বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষী। তবু তাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার জন্য তাকে সামনে দেখে আনন্দ একটু কুঁকড়ে গেল।

—'আপনি আমাকে দ্যাখেননি?'

—'না।' গলা কেঁপে যাওয়া বোঝা না-গেলেও, কথাটা ঠিকমতো ফুটে ওঠেনি।

—'অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম— মানে আপনার কবিতা।'

—'ভালো লেগেছে?'

—'একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি— প্রকৃতির এমন লীলাবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন! অসাধারণ— প্রেম, প্রেমের সময়—' কয়েক মুহূর্ত থেমে কী এক মগ্নতায় দেব বলছিল, 'এই প্রেম সবদিকে রয়ে গেছে—/কোথাও ফড়িঙে-কীটে,— মানুষের বুকের ভিতরে,/ আমাদের সবের জীবনে।' আনন্দর ভালো লাগছিল। তবু বললো, 'শুনেছেন বোধহয়, এডিটোরিয়াল বোর্ড কবিতাটা ছাপতে রাজি হয়নি!'

—'হ্যাঁ, বিষ্ণুর সম্মানার্থে নাকি ছাপতে হয়েছে। ছাড়ুন তো, এরা এখনও আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি— হ'তে এখনও ঢের দেরি।'

আনন্দ সসঙ্কোচে বললো, 'শনিবারের চিঠি, মাঘসংখ্যা, দেখেছেন?

—'হুঁ। সিম্প্‌লি নন্‌সেন্স। কিন্তু একটা দারুণ শব্দপ্রাপ্তি হয়েছে আমাদের— হৃৎতুতো।'

আনন্দ আওড়ালো শব্দটাকে বার-কয়েক। মনে মনে।

—'বিষ্ণু বোধহয় আর কবিতা চাইবে না।'

—'আপাতত। চিন্তা করবেন না— নতুন ক'রে একটা কাগজ করার কথা ভাবছি।'

—'জানেন তো— লেখাটা একেবারেই অন্য রকমের, নতুন ব'লে মনে হয়েছিল— এত সহজ আটপৌরে শব্দ তবু মনে হয়েছিল, সাদা ভাষা বটে কিন্তু বোঝার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটবে— নইলে নির্বিবাদে এমন অশ্লীল বলতেন না— খুব করুণ যে ঘটনাটি ঘটেছে, আপনাকে বলছি— সিটি কলেজে চাকরিটা ফিরে পাবার একটা আশা ছিল, মাঝে-মাঝে খোঁজখবর নিতে যাই— গিয়েছিলাম, ঘরে ঢোকা মাত্র বিকারগ্রস্তের মতো

প্রিন্সিপ্যাল আমাকে বেরিয়ে যেতে বললেন, ঘাই-হরিণী লিখেছো— ঘাই-হরিণী—'

আনন্দর চোখের সামনে এখন প্রিন্সিপ্যালের সেই বিকারগ্রস্ত মুখ ভেসে উঠলো। যেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দ, —স্যার, প্লীজ। আমাকে একটু শুনুন! প্লীজ! স্যার আমি বুঝতে পারছি শ্লীল-অশ্লীল সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান হয়নি— স্যার কবিতাটি, কবিতাপাঠক হিসেবে যতবার পড়েছি, ততবারই মানুষের, কীট-ফড়িঙের— সবার জীবনের নিঃসহায়তার সুর ফুটে উঠেছে— শিকারি, শিকার, হিংসা— প্রলোভনে ভুলিয়ে-যে হিংসা সফল— এই সুর; বিষণ্ন। একটা ডাক তো থাকেই— প্রেম-প্রাণ-স্বপ্নের; স্যার থাকে না কী? সেই ডাক ব্যবহার ক'রেই তো ওলটপালট ধ্বংসের আয়োজন— নিরবচ্ছিন্ন, সবদিকে— উই আর কিল্ড্ ফর দেয়ার স্পোর্ট, মারণখেলা— জীবনসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় যে ডাক, মাপ করবেন, বিকৃত কামনা-পীড়িত মনই কেবল তাকে অশ্লীল ভাবতে পারে। হৃদয়ের বোন— এই প্রতীতির মধ্যে যৌন-ইশারা পেতে পারে কেবল প্রভ্যারিয়েন্ট মন, বাই দ্য বাই— হৃদয়ের বোন— এই এক্সপ্রেশনটির জন্য শেলীর কাছে আমি ঋণী—

দাঁড়িয়ে থাকার মতো সাহস যদি কয়েক মুহূর্তের জন্য পেতো আনন্দ, তাহলে স্থিরভাবে এই কথাগুলো শুনিয়ে দিতে পারতো— এরকম ভাবনায় সে বিড়বিড় করলো, 'ঠিক সময়ে আমি কিছু পারি না।'

তব, কথাগুলো লিখে ফেলা উচিত ব'লে তার মনে হচ্ছে— লেখাটাকে আনন্দ শনিবারের চিঠিতেই পাঠাবে ব'লে মনস্থির করলো।

লেখাটা প্রকাশ পাওয়ার পর, অবশ্য যদি ছাপে, প্রিন্সিপ্যালকে এক কপি পাঠানোর ব্যবস্থা সে করবে। আনন্দ পুলকিত।

AMARBOI.COM

ঘুম ভাঙলো কাকের ডাকে। নাকি ঘুম ভাঙতেই কাকের ডাক শুনছে। এরকম একটা সংশয়— সে যেন স্পষ্ট দাঁড়কাকের ডাক শুনেছে— কিন্তু চারপাশে পাতিকাকের ডাকাডাকি ফ্যাস্‌ফ্যাসে চিরল; তবে কি স্বপ্ন? ডাকটা শুনতেই, বুকের মধ্যে কেমন যেন কেঁপে উঠেছিল— একটা অশুভ আশঙ্কা— মঞ্জু-প্রভা— খুব কি দূরে কোথাও ডাকছে কাকটা?

একটা কাক উড়ে এসে বসলো রেলিঙে— হালকা কুয়াশা মাখা কাক। আনন্দকে দেখলো সে। কিছু কি বলছে? চোখ-দুটো স্পষ্ট দেখতে পেলে হয়তো আন্দাজ করা যেতো তার মনটি— কিন্তু ঝাপসা, কুয়াশার জন্য তো বটেই— তাছাড়া তার চোখেও কুয়াশা।

ভোরের আলোটাও কেমন নিরুজ্জ্বল। কাকটা ব'সে আছে। একা। এই তো খড়কুটো সংগ্রহের সময়— এমন একা কেন তুই? আঁস্তাকুড়ের ঝগড়া বুঝি তোর ভালো লাগে না! আনন্দ তার বিস্কুটের কৌটো থেকে একটা বিস্কুট বের করলো। ভেঙে-ভেঙে জানালা-পথে সে বারান্দায় ছড়িয়ে দিলো কয়েক টুকরো। নির্ভয়ে নেমে এলো কাকটা।

আনন্দর দু'চোখ বেশ তৃপ্ত— অনুভব করছে সে।

দিনের শুরুটা যদিও আশঙ্কায় শুরু, তবুও আশ্বাস আছে। আশ্বাস রয়েছে কোথাও— জীবনের স্বাদ।

বুদ্ধদেব বলছিল— নতুন কাগজ করবে, কবিতার কাগজ।

কতদিন কবিতা লেখা হয়নি!

কাকটা উড়ে গেল— এই উড়ে যাওয়া, দেখার মতো জিনিস, যদি এটাকে ধরা যেতো কবিতার ভাষায়— এই আলো কুয়াশা আর ডানা— আর নীল আকাশ

মাথার মধ্যে একটা কূজন— জেগে উঠছে যেন...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা করে গেছি; যে নক্ষত্র— নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বারবার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তা ভুলিয়া গেছি;

বিয়ের মাস-কয়েকের মধ্যেই প্রভার সঙ্গে আনন্দর দেহ-মনের দূরত্ব বাড়ছিল। অথচ প্রভা মা হ'তে চলেছে। ভাবী সন্তানকে ঘিরে মা-বাবা— হৃদয়ের গভীরে যে উত্তাপ পোহায়, তা তাদের মধ্যে ছিল না। থাকা উচিত ছিল। জীবন তো তেমনই দাবি করে নিবিড়তার আকাঙ্ক্ষা। আনন্দ বিদেশি উপন্যাসে পড়েছে: জরায়ুর অন্ধকারে লালিত হচ্ছে যে প্রাণ, তার স্পন্দন অনুভব করা যায়— তার সঙ্গে কথা বলা যায়, আনন্দর ইচ্ছে হয়েছে প্রভার গর্ভপ্রদেশে কান পেতে শোনে সেই স্পন্দন, কিন্তু প্রভা এত দূরে— তার কাছে পৌঁছানোর সাহস-সামর্থ আনন্দর ছিল না। সেই সময় তার কাঁধে হাত রেখেছিল বনি— বনির স্মৃতি। একটা তাড়না সে অনুভব করছিল। কিন্তু বনি এমন একটা বিষয় যা কেউ জানে না— অন্তত কেউ জানে ব'লে আনন্দর কাছে কোনো খবরও ছিল না। বুলু কিছু আন্দাজ করলেও করতে পারে। আনন্দ সচেতনভাবে বনি-প্রসঙ্গ তার সামনে তোলেনি কখনও— আজ প্রসঙ্গই ওঠে না। কাউকে সে বলেওনি। অবশ্য আনন্দর মনে হয়, এসব কথা কাউকে বললে সম্পর্কের মধ্যকার যে সৌন্দর্য তা নষ্ট হয়ে যায়। তব, তখন মনে হতো যদি কাউকে জানাতো তাহলে তাকে দিয়ে অন্তত বনির ঠিকানাটা জোগাড় করতে পারতো। আর সে আশ্চর্য হয়েছে— যে পদাবলী কবিতা তার জীবনকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে ব'লে সে মনে করে— সেখানে তো তৃতীয় কেউ ছিল, সে অমান্য করলো সেই রীতি! যদি না-করতাম।

যারা অসহায়, ঈশ্বর তাদের সহায় হন— এরকম কথা কতবার সে শুনেছে বাবার মুখে, ভবকার মুখে— সেবার তার জীবনেই যেন তা সত্য হয়ে দেখা দিলো।

ভবকার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আচমকা। মিশনের কাজে সে দেশে ফিরেছে। সর্বানন্দ ভবনে তাকে পাদ্রিবেশে দেখে প্রথমে কেমন অচেনা মনে হয়েছিল। হিন্দু থেকে ব্রাহ্ম, ব্রাহ্ম থেকে খ্রিস্টান। ভবকা বললো, 'না, মোটেই আমি ব্রাহ্ম ছিলাম না। কিংবা এখনও কি আমি খ্রিস্টান? ঠিক বুঝি না জানো!'

আনন্দ বললো, 'কিন্তু বহিরঙ্গে তুমি যিশুর উপাসক!'

একটু অন্যমনস্ক ভবসিন্ধু মাথা নাড়লো। তারপর বললো, 'ছোট একটা চাকরি করতাম, সর্বানন্দ ভবনের সঙ্গেও বেশ একটা সুখের সম্পর্ক ছিল, তবু কী যে ভূত!'

আনন্দর মনে হয়েছিল, ভূত না, মায়া— ম্যাজিক। বলেছিল 'লাডুচ সাহেব তোমাকে জাদু করেছিল।'

ভবসিন্ধু আরও অন্যমনস্ক। যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠছেন বরিশাল ব্যাপটিস্ট চার্চের মিশনারি লাডুস সাহেব, তার কাঁধে হাত রেখে হাঁটছেন তিনি। কথা বলছেন নিচুস্বরে।... সম্মোহিত হয়ে পড়ছে ভবকা। এরকম কল্পনা ক'রে আনন্দ বললো, 'কী ভাবছো?' ভবসিন্ধু বললো, 'ভাবছি— মানুষ যে কী চায়!'

—'সে তো এক এক মানুষের এক এক রকম চাওয়া— আর তা চরিতার্থ করতে হার্টলেস, সোল্‌লেস যত আয়োজন— নাস্তিক-আস্তিকে প্রভেদ দেখিনে।'

—'তুই ঠিক বলেছিস মিলু— হার্টলেস, সোল্‌লেস...! জানিস, সেটা বুঝতে পারি, চারদিকে অচেনা মুখের ভিড়ে— একটা চেনা মুখ দেখলে সেটা টের পাই— কী যে আনন্দ হয় বুকে!'

—'অচেনা মুখও তো চেনা হয়ে যায়।'

—'তা যায়— বাইরে, ভেতরটা না-চিনতে পারলে— তারও তো একটা বয়েস লাগে, না—'

—'এখানকার কারও সঙ্গে দেখা হয় না?'

—'খুব কম। মাঝে একদিন অনন্ত সেনের মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।' ঠিক সেই মুহূর্তে আনন্দ ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করেছিল।

—'কোথায়?'

—'শিয়ালদায়।'

—'থাকে কোথায়?'

—'পার্ক সার্কাসের দিকে—' জোব্বার পকেট থেকে একটা নোটবুক বের ক'রে দেখে ঠিকানাটা জানিয়েছিল। মনে মনে ঠিকানাটা আওড়ে আনন্দ বলেছিল, 'কোলকাতায় আর একটা আস্তানা হলো। জানো তো ভবকা, অনন্ত সেনের মেয়ে আমাদের বুলুর খুব বন্ধু।'

এভাবেই ক্লোজ্‌ড চ্যাপ্টার রি-ওপেন হয়েছিল। পার্ক সার্কাসের দিকে সেভাবে তার যাতায়াত ছিল না। তব, সে কল্পনায় একটা রাস্তা তৈরি ক'রে নিয়েছিল— সে-রাস্তা বনিদের বাড়ির সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেই পথে আনন্দ হেঁটেছে। দরজা থেকে ফিরে এসেছে।... দরজার কড়া নেড়েছে। দরজা খুলে বিস্ময়ে বনি ব'লে উঠেছে, ও মা! মিলুদা তুমি?

বাস্তবে দরজা খুলেছিল তাদের বাড়ির চাকর।...

বনিকে সেদিন আন্তরিক মনে হয়েছিল— যতটা আন্তরিক হ'তে পারে, হওয়া সম্ভব পূর্বপরিচিত দেশের কোনো মানুষকে দেখে— তার বেশি নয়; বনির চোখে সেই দীপশিখা ছিল না। তব, দু'জন মুখোমুখি বসেছিল। কথায় কথায় বনি তার স্বামী সম্পর্কে কতকগুলো তথ্য জানিয়েছিল, তাতে যেন সে বলতে চেয়েছিল, বড় রকমের ভুলের হাত থেকে বনি রেহাই পেয়েছে। তার স্বামী সবকিছুতেই পারদর্শী। পরিহাসপ্রিয়, আমুদে— বনি সুখী, তৃপ্ত।

'মিলুদা, একদিন ছুটির দিন দেখে এসো! আমার বরের সঙ্গে তোমার আলাপ হলো না!'

নিমন্ত্রণ ছিল। গিয়েছিল।

'তাহলে আপনি হলেন গিয়ে আমার বড় কুটুম। আসবেন। সময় পেলেই চ'লে আসবেন! আপনার বোনটি তাতে অন্তত একজন কথা বলার সঙ্গী পাবে।'

অতএব যাওয়ায় বাধা ছিল না।... গত দু'বছরে বার-কয়েক গেছে... বনিরা কি বার্থ কণ্ট্রোল ক্যাম্পের পরামর্শ অনুসারে চলছে? এরা কী বিবেচক, বুদ্ধিমতী— অ্যানিম্যালিটি কম— জীবনটা উপভোগ করছে বেশ!

কিন্তু তা না-ও হ'তে পারে। গণ্ডগোল আছে কোথাও। কোনো পক্ষে। কার?

তাহলে কি বনির গুটিয়ে থাকার অন্য কারণ আছে? বনির সঙ্গে কথা হয় না বললেই চলে। আসলে হৃদয় আর কবিতা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আনন্দ কথা বলায় সড়গড় নয়। কবিতা থেকে জীবনের যে-কোনো গদ্যময় বিষয়ে সে ডুবে যেতে পারে অনায়াসে, কিন্তু, যে-কোনো বিষয় থেকে কথা শুরু করা কিংবা চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব— এটা আনন্দ জানে ব'লেই বনিকে সে কবিতার মধ্যে টেনে আনতে চেয়েছে। বনি বিরক্তি, অনীহা প্রকাশ করেছে রুচিসম্মতভাবে। কিন্তু সেবার তার সেই বিতর্কিত কবিতার পাণ্ডুলিপি প'ড়ে সে জানিয়ে দিয়েছে, কবিতা তার আর ভালো লাগছে না। বনি গ্রামোফোনে গান শোনে। গল্পের বই পড়ে। গল্প! তার গল্প প্লটলেস— প্লটলেস গল্প বনির অপছন্দ; একথা জানা সত্ত্বেও আনন্দ— তার পছন্দ হ'তে পারে এমন গল্প একটিও লিখতে পারেনি।

প্লট-সমৃদ্ধ একটা গল্পের কথা ভাবতে গিয়ে আনন্দ ভেবেছিল, বনি অন্তত এটা জেনেছে যে, সে ইম্পোটেণ্ট নয়— বিয়ের এক বছরের মাথায় তার বউকে সে মা বানিয়েছে। বনি নিশ্চয়ই নিজেকে বাঁজা ভাববে না এত সহজে। কিন্তু তা প্রমাণ করার উপায়ই-বা কী তার? এই লোকটা হ'তে পারে সেই উপায়— তার চোখে যদি একবার কামনার শিখা জ্ব'লে ওঠে তবে লোকটা আলোপোকার মতো ছুটে আসবে...

এসব সম্ভাবনা যাতে সৃষ্টি না-হয়, তার জন্যই কি বনির এত কুঁকড়ে যাওয়া? চোখে চোখ রাখতে না-চাওয়া? এতসব উপেক্ষা করবার সচেতন আয়োজন? কিন্তু বনি যদি বলে, মিলুদা, এই নির্জন দুপুর— কেউ কোথাও নেই— এই যে মেঘলা আকাশ, যে-কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি শুরু হ'তে পারে অঝোর ধারায়— এইসব আয়োজন— ঈশ্বর কি নতুন একটা অনুচ্ছেদ লিখতে চাইছেন না? আর একইসঙ্গে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠবে অবর্ণনীয় সেই রূপ, যা প্রাণসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় এ-পৃথিবীর সমস্ত জীবের মেয়েজাতির মুখে ফুটে ওঠে। সেই অনুচ্ছেদ শেষ হওয়ার পর...

ক্রমে রটিবে এই বার্তা— দুপুরের দিকে যে-লোকটা আসতো মাঝেমধ্যে— সে-ই পেট বাঁধিয়ে দিয়েছে। অথচ যতবারই আনন্দ ওই কথাটা পাড়ায় আড্ডায় মেসে শুনেছে ততবারই অদ্ভুত একটা মনখারাপ সে টের পেয়েছে। তবু নিজেকে যেন খানিকটা প্রস্তুত

ক'রে নিয়েছিল আনন্দ। তবু, বনি থেকে, তার স্মৃতি থেকে, এমন-কী সম্ভাবনা থেকে নিজেকে অ্যালুফ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল— নিয়েছিল— তবু এখন সে পার্ক সার্কাসের দিকে হাঁটছে।

—কেন যাচ্ছো আবার?

—বনিকে বলবো, সে যদি তার বরকে ব'লে আমার একটা কাজের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারে।

—করুণা প্রার্থনা করতে যাচ্ছো? নিজেকে এভাবে অসম্মান করতে তোমার ভালো লাগে?

—মানসম্মান বোধটা থাকলেই তবে না! বেকার স্বামী, বেকার বাপের ওসব থাকে না।

—তাহলে তুমি চায়ের দোকান দাও। দেশে ফিরে যাও পোলট্রি করো!

—ভাবছি।

—কিন্তু পারবে না। পারলে তুমি শিলং-এ যেতে, খুকুনের সহমর্মিতা থেকে বঞ্চিত হ'তে না। আসলে যে-আকাশের তলে বনি রয়েছে, সেখান থেকে তুমি নড়তে চাইছো না। যাতে তুমি এক-একটা অজুহাত তৈরি ক'রে বনির কাছে যেতে পারো।

—লাভ কী তাতে?

—লাভ— ব্যথায় মশগুল হয়ে যাওয়া— সেই লাস্ট রাইড টুগেদাব-এর মতো, একসঙ্গে খানিকটা হাঁটলে— তারপর দু'ভাগ হয়ে গেল পথ, সেদিন থেকে যতবার বনির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে, ততবার কি আরও ব্যথা পেয়ে ফেরোনি?

—রবীন্দ্রনাথের ওই গানটা শুনেছো তো— জীবনটা সত্যিই ধূপের মতো, প্রদীপের মতো। তাকে তো জ্বালতে হবে, পোড়াতে হবে!

—জীবন থেকে একটা পচা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে না কী, নইলে প্রভা এভাবে তোমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে কেন?

—প্রভা ফ্রেশলেস— হাড়গোড়। অভিশপ্ত রাজকুমারীর মতো। বন্দি।

—তুমি রাজকুমার হ'তে পারোনি। হওয়া উচিত ছিল।

—আমি সত্য-কুসুমের কুমার— ঘোড়া নেহ, তরোয়াল নেই। ব্রহ্ম ভরসা আমাদের। আমরা পুলিশকে ভয় পাই। রণেশ বেচারার জায়গা হলো না সর্বানন্দ ভবনে—

—ভালোই হয়েছে। রণোর সঙ্গে প্রভার এমন একটা মাখামাখি— পেট বাঁধানো কাণ্ড ঘ'টে যেতে পারতো।

—না। কুঁজো রণেশের থেকে আমি ঢের সুন্দর।

—কিন্তু তুমিও টেরা।

—আমি কিন্তু চেয়েছিলাম— রণেশের সঙ্গে প্রভার একটা সম্পর্ক গ'ড়ে উঠুক, অন্তত রাজনীতির সম্পর্ক। কিন্তু কিছুই ঘটলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তবুও তো ঘটলো— বুলু-সুচরিতা জাগরণী পত্রিকা হাতে লিখে দিচ্ছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অপ্রত্যক্ষ অংশীদার হচ্ছে তারা। এটা একটা আশার কথা। সর্বানন্দ ভবনে ইংরেজপ্রীতির চাপটা যদি তাতে একটু ফিকে হয়।

—তা কী ক'রে সম্ভব— চার্চ আর ব্রহ্মমন্দিরের আঁতাত তো বেশ পুরনো— দুটোর মধ্যেই একটা পিউরিটান ব্যাপার আছে। বনির পেট বাঁধানোর কথা ভাবতে পারো? তুমি তো ব্রহ্মের পোলা।

—সৈয়দপুরের সেই পাদ্রি— পেরেছিল— কিন্তু, মনিয়া...

আনন্দর পথ চলা মন্থর হয়ে এলো। চৈত্রের রোদ্দুর মেলে দিচ্ছে মনিয়ার স্মৃতি— এই রোদ্দুরে আমকুশি গাঢ় সবুজ হয়ে উঠছে, নোনাফলের ত্বক মসৃণ হ'তে হ'তে ঝরিয়ে দিচ্ছে সবুজ রঙ, ভিতরে চলছে ভিয়েন— ক্ষীর তৈরি হচ্ছে। ফিকে হলুদ, গাঢ় সিঁদুরে লাল— এমন দু'টি নোনাফল... বুকের মধ্যে কেমন এক হাহাকার উঠলো, ফাঁকা মাঠে, রাস্তায় তৈরি ঘূর্ণির মতো— ভূতের হাওয়ার মতো। আনন্দ মৌলালির মোড় থেকে বোর্ডিঙের রাস্তা ধরলো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি।
হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনোদিন;
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।

বিডন স্ট্রিট ধ'রে হাঁটছিল আনন্দ। ভাবছিল— কোলকাতার রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে, নানা অফিস-প্রতিষ্ঠানে— ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং, কর্পোরেশন, ইন্সিওরেন্স অফিসে বার বার যেতে-যেতে তার একটা ধারণা হয়েছে,— সংসারে যারা সফল— তাদের জাত আলাদা; সহানুভূতি, মায়া-মমতা, এমন-কা করুণাবোধকেও তারা বাহুল্যজ্ঞানে বর্জন করেছে— সফলতা হয়তো তেমনই দাবি করে— এক-একটা মানুষের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, বসতেও বলে না; কেমন একটা উপেক্ষা তাচ্ছিল্য— দুটো রূঢ় কথার চেয়েও বেশি আঘাত করে। খুব চেনা লোক কেমন অচেনা হয়ে যায়, অপরিচিতের মতো আচরণ করে। উষারঞ্জন তাকে এক ইন্সিওরেন্স অফিসারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। এল.আই. এজেন্ট রূপে নিজেকে তখন তৈরি করতে চাইছিল আনন্দ, অনেকটা ইচ্ছের বিরুদ্ধে। লাইফ ইন্সিওরেন্স লিটারেচার পড়াশুনো ক'রে রীতিমতো শিক্ষিত দালাল হ'তে চাওয়ার সেই সময়ে একদিন সেই অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। অবশ্য আরও একটা আগ্রহ ছিল। আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় আনন্দ-যে কবিতাটবিতা লেখে— এটা উষারঞ্জন সেই অফিসারকে জানিয়েছিল, অফিসার বেশ উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিল, 'তাই নাকি!' তাকে কেমন নস্টালজিক দেখাচ্ছিল, 'জানেন, আমিও একসময় একটু-আধটু লিখতাম।'— ব্যাস্; আগ্রহের বিষয় ছিল ওই কবিতা লেখা— যে একসময় কবিতা লিখতো, আর না-লিখলে তার কি কবিমন ম'রে যায়? নইলে সেদিন অমন ব্যবহার কীভাবে করতে পারলো, একদা কবিতা লেখা মানুষটা— তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে, একবার চোখ তুলে ফের কাজে মন দিয়েছিল সে। কিন্তু চোখ তুলে তাকানোর মুহূর্তেই আনন্দ বলেছিল, 'কেমন আছেন?'

—'ভালো।' আনন্দ দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত অফিস ঘরটাতে কাজ চলছে। কিন্তু হৈ-হট্টগোল নেই। কিছুসময় পর অফিসার বললো, 'কিছু বলবেন?'

—'আজ্ঞে না।'

অফিসার আবার তাকালো। তাহ'লে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?— এমন একটা ভাষা তার দৃষ্টিপাতে। কিংবা দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার অন্য কোনো মতলব আছে কিনা— একটা নিরীক্ষণ যেন-বা।

—'আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারছেন না।'

অফিসারের মাথা না-ভঙ্গিতে নড়লো। তবু তাকে বসতে বললো না। অনেকটা পথ হাঁটতে-হাঁটতে একটু জিরিয়ে নেবে ভেবে সেখানে ঢুকে পড়েছিল। আনন্দ বলেছিল, 'আমারও ভুল হ'তে পারে। হ'তে পারে কী— হয়েছে। স্যরি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনই মনে হয়েছিল— ভালোবাসা এক ধরনের অপচয়— জীবনের। আজ মনে হলো, সফল মানুষেরা ভালোবেসে জীবনটাকে নষ্ট করে না। সফলতাকেই তারা ভালোবাসে বেশি।

—তাহলে বুঝতে পারছো, তুমি একটা উল্টো মানুষ!

—আমি যে উল্টো মানুষ— তুমি ছাড়া আর কে বুঝবে?

—আচ্ছা, তুমিই বলো— হ্যারিসন রোড ধ'রে অতটা হেঁটে লোয়ার সার্কুলার ধরলে, তোমার চোখ কী যেন খুঁজছিল— তারপর একটা জায়গায় থমকে দাঁড়ালে, তোমার সামনের একটা বাড়ির একতলার দিকে তাকিয়ে থাকলে কয়েক মুহূর্ত, তারপর ওপরের দিকে তাকালে— তারপর হাঁটতে-হাঁটতে এই রাস্তা ধরেছো— কোনো উদ্দেশ্য নেই! আর কী বলতে পারি তোমাকে?

—সত্যিই আমি কিছু খুঁজি— খুঁজছিলাম; যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলাম— একদিন ওখানে আরব্য রজনীর পাতা থেকে উঠে আসা কাউকে দেখেছিলাম, ক্লাসিক টাইপ অব বিউটি— কিন্তু সেই সৌন্দর্যের মধ্যে একটা বিষণ্ণতা যেন ছিল, কেমন যেন নিভে যাওয়া একটা ভাব; হ'তে পারে আমাদের এই জলহাওয়া তাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। আমি তাকে আর একবার দেখতে চেয়েছিলাম—

—কেন? তুমি কি পশ্চিমের জলহাওয়ায় পরিপুষ্ট একটি মেয়ে পুবের জলহাওয়ায় কীভাবে ভাস্কর্যের মতো ঝ'রে যায়— দ্যাখোনি?

—ঝ'রে যাচ্ছে— চোখের কোটরে অন্ধকার, নাকের ডাসা ভেঙে গেছে, বুক ভেঙে যাচ্ছে বীভৎস!

—সেইজন্য কি তুমি কোলকাতায়?

—তাহলে কাজের খোঁজটাকে বলতে হয় উপলক্ষ! কিন্তু এখানে কোনো তৃপ্তি নেহ, নিস্তার নেহ, স্থিরতাও নেই। মায়া-মমতার যে ঘরোয়া গন্ধ আমাকে তৃপ্ত করে— এখানে তা কোথায়? রক্তপাত কেবল।

—তাহলে স্বীকার করছো— লড়াইবাজ বাজপাখির আকাশের মতো জীবন— এই জীবন?

—তবুও তো চড়াইয়ের আকাশ আছে। নীড় বাঁধার সাধ-সফলতা— আছেও তো তা!

—আছে। কিন্তু যারা দুর্বল তারাই কেবল মায়া-মমতার দোহাই পাড়ে আর জীবনের ভিতর বিধাতার লীলা দ্যাখে— তুমি তার উত্তরাধিকার বহন করছো মাত্র।

—না। তার অনিয়মও দ্যাখে, উচ্ছৃঙ্খলাও দ্যাখে— তারা কেবল অনিয়মের শিকার হয়।

থমকে দাঁড়ালো আনন্দ। কর্ণওয়ালিশের মোড়। একটা ট্রাম যাচ্ছে শ্যামবাজরের দিকে। সে কোন্‌দিকে যাবে? আনন্দ ভাবলো কোনোদিকে নয়। বরং পার্কটায় একটু বসা যাক। দু'দণ্ড জলের দিকে চেয়ে। হয়তো-বা শুনতে পাবো বুলবুলির গান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্ক থেকে বেরিয়ে সে বিডন স্ট্রিট ধ'রে পুবদিকে মন্থর যেতে থাকলো। না-জিরোলে হয়তো এই ক্লান্তিবোধ এখনই আসতো না। বড় রাস্তার মোড়ে এসে তাকে আবারও দাঁড়াতে হলো। পকেট হাতড়ে পয়সাগুলো সব বের করলো। রাস্তা পেরিয়ে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে একবার আনন্দ আকাশের দিকে তাকালো।

বাসে বসার জায়গা পেলো। আর পেলো মনোরম একটি মুখ। কী দারুণ সুন্দর চোখ! রবীন্দ্রনাথের সেই 'কালো হরিণ চোখ' যেন! আনন্দ দেখছিল। সম্ভবত মেয়েটির কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। কিংবা আনন্দর দেখাটাকে সে অ্যালাউ করছিল, না-দেখার ভানে; হ'তে পারে বাস্তবিক সে অন্যমনস্ক। যা-ই হোক, আনন্দ দেখতে-দেখতে একসময় আর দেখছিল না। আনন্দর স্মৃতিতে তখন টলটলে জল, জলের বুকে আকাশ— ক্রমে জল ঘিরে তাল খেজুর লতাপাতা, জামজারুল, নারকেল, সুপারি— ঝোপ-জঙ্গলের ছায়ায় আড়ালে জেগে উঠলো আনন্দর কিশোর সময়— কে যেন তার ডাকনাম ধ'রে ডাকছে, আর এক কিশোরকে দেখতে পাচ্ছে সে, তলতা বাঁশের ডগা আকাশমুখী হ'তে হ'তে কেমন ঝুঁকে পড়েছে মাটির টানে, সেদিকে তাকিয়ে আছে সেই কিশোর, ডাকছে, মিল্, এদিকি আয়। মিলু যাচ্ছে, লতার ডগা আলতো সরিয়ে, বিছুটির ডগা এড়িয়ে কাঁটা নোটের ঝাড়টা লাফিয়ে— মতিলালের পাশে, মতিলাল— নাকি শুকলাল— কেউ একজন— সে বাঁশের সেই ডগা দেখিয়ে বলছে, 'ওই ডগাখান— একটা দারুণ ছিপ হয়!'

কণ্ডাক্টর টিকিট চাইছে। ঘেঁটে গেল দৃশ্যটা। পয়সা দিয়ে ফের সে মেয়েটির দিকে তাকালো। কিন্তু মেয়েটা ততক্ষণে নেমে গেছে আগের কোনো স্টপে। আনন্দ চোখ বন্ধ করলো। এতক্ষণে বুঝলো চোখ-দুটো কেমন জ্বালা-জ্বালা করছে।

বাস থেকে নেমে ভাবলো, একবার শিয়ালদা প্লাটফর্মে গিয়ে বসলে হয়। কিন্তু শরীরটা যেন একটু শুতে চাইছে। ফিরে এলো মেসে। মেস এখন ফাঁকা। নির্বিঘ্নে একটু ঘুমানো যেতে পারে। অবেলায় ঘুমালে শরীর খারাপ করবে। কিন্তু শরীর-যে খারাপ হয়েই আছে। কেমন যেন ব্যথা সর্বশরীরে। চোখে-মুখে জল দিয়ে, জল খেয়ে শরীরটাকে ছেড়ে দিলো বিছানায়। শুয়ে শুয়ে সে রেলিঙে চড়ইদের খুনসুটি উপভোগ করছিল। অনুভব করছিল কার্নিসের পায়রাদের দাম্পত্য। তারপর কী মনে ক'রে সে উঠে বসলো। টিনের স্যুটকেস থেকে লেখার খাতা বের করলো। সোয়ান এক্সারসাইজ বুক। গভীর নীল রঙের ওপর লেখা— যতবার এই মলাটের ওপর ওই লেখাটা সে দেখেছে ততবারই নীল জলের ওপর শ্বেতশুভ্র এক রাজহাঁস ভেসে উঠেছে— আর্ট সম্পর্কে নতুন এক ভাবনার বিষয় হ'তে পারে ব্যাপারটা। তারপর সে খাতাটা নিয়ে বসলো।

মেস-জীবন নিয়ে একটা গল্প সে লিখেছিল কয়েক মাস আগে। কেমন যেন মনে হচ্ছে গল্পটা সত্যি হয়ে যাবে এবার। প্রবল একটা জ্বর সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু তার তো এই মুহূর্তে দেশে ফেরার কোনো কথা নেই— আয়োজন নেই। চোখ-দুটো

কেমন বুজে আসছে। গল্পটা— তার মৃত্যুর গল্পটা পড়বে ভেবেছিল। না-প'ড়ে বালিশের নিচে রেখে শুয়ে পড়লো। মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাবে। কোথাও কোনো শুশ্রূষার হাত নেই— বাড়িতেও তো এমন জ্বরজারি হয়েছে। কেউ পাশে এসে বসেনি। মা অবশ্য একটু খোঁজখবর নিতেন। নাড়ির টান। কিন্তু তার বিয়ের পর থেকে সেই মা-ও কেমন যেন হয়ে গেলেন। তবু আনন্দ বনির কথা ভাবলো। বনির মধ্যে আশ্রয় আর স্নেহের অদ্ভুত একটা আভাস সে দেখেছিল। কীভাবে-যে সব নষ্ট হয়ে যায়! নক্ষত্রদোষ? চারদিক কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে। তাহলে হয়তো সন্ধ্যা নামিছে মন্দ মন্থরে... ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ— আনন্দ তার হাত-দুটো ডানার মতো ক'রে আন্দোলিত করার চেষ্টা করলো। সব পালক ঝ'রে গেছে। অথচ রয়েছে নক্ষত্রের আকাশ, ওড়া নেই। কোথাও কোনো বিহঙ্গ নেই। অন্ধকার। জীবনে কেবল আর্থিক অধঃপতন। এ এক ক্ষমাহীন অপরাধ। কতবার সে নিজেকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে; যেমন লিখেছে বালিশের নিচে রাখা ওই গল্পটায়— 'কেরোসিন কাঠের টেবিলে ডিটমারের লণ্ঠনটা নিভিয়ে অন্ধকারের ভিতর মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে প্রতিদিন রাতের বেলা মনে হয়েছে, এই অন্ধকারের যেন শেষ না-হয় আর, কোনোদিন যেন আর উঠতে না-হয়।' তেমনই এই বিকেলবেলায় আনন্দ কামনা করছে— গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সে যেন ফসিল হয়ে যেতে পারে আজ...

আনন্দর দু'হাত এখনও পালকহীন ডানার মতো আন্দোলিত হচ্ছে, যেন অন্ধকার জড়ো করছে ন্যাড়া ডানা-দু'টি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;

অনেকদিন পর এমন বৃষ্টির রিমঝিম দিন। অবিরাম। বৃষ্টি দেখছিল আনন্দ। বৃষ্টির ঝালরের মধ্য দিয়ে ধূমল ভিজে সবুজের চরাচর, মেঘ দেখতে-দেখতে আনন্দর মনে হলো— এই বৃষ্টিদিনের একখানা ছবি যদি আঁকা যেতো! বাইরের ছবি। অন্তরের ছবি। তার বন্ধ দু'চোখের সামনে জলরঙে আঁকা একখানা ল্যাণ্ডস্কেপ ভেসে উঠলো, আর সে স্পষ্ট শুনতে পেলো রবীন্দ্রভাষ্য:

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী—
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী
আজিকে এমন দিনে শুধু মনে পড়ে—

মনে কি পড়ছে কিছু? বাস্তবিক কিছুই মনে পড়ছে না। মনে পড়ার মতো কোথাও কিছু নেই। এই যে এমন বৃষ্টিভেজা দিন— রুক্ষ, অগ্নিময়। বিরহ নেই। মিলনের প্রত্যাশাও নেই। এই তো সামনের ওই উঠোনটুকু পেরুলেই প্রভার ঘর, মেয়েকে নিয়ে শুয়ে আছে, তত নিবিড় নয়— হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে; উঠোনটুকু পেরিয়ে ও-ঘরে যাওয়া কিংবা এ-ঘরে আসার প্রবৃত্তি নেই কারও। তবু এমন ঘনঘোর বর্ষা এমন দিনে তারে বলা যায়—; কাকে, কী বলার আছে আমার? কেউ নেহ, কোথাও আছে ব'লেও মনে হয় না; তবু— এমন দিনে কোলকাতায় থাকলে আনন্দ বেরিয়ে পড়তে পারতো।

অনুচ্চারিত চিৎকারে আনন্দ ব'লে উঠলো, এখানে আমি কী করতে পারি! তারপর হতাশভাবে অনুযোগ করলো, কবিতা নেই। সেই-যে নিজেকে ভেঙে-ভেঙে দেখার যে আয়োজন সে একসময় করেছিল, তাও ফুরিয়ে গেছে ব'লে মনে হয়, কিংবা নিজেকে দেখতে আর ইচ্ছে করছে না— নিজের প্রতি সে যথেষ্ট বিরক্ত। এই দেখার মধ্যে কোথাও ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কোনো আভাস সে দ্যাখেনি। যথেষ্ট আন্তরিক আর পক্ষপাতিত্ব রয়েছে সেইসব গল্পে— আদৌ যদি তা গল্প না-হয়ে ওঠে— তব; কিন্তু দেখাটা কি সম্পূর্ণ হয়েছে? না-দেখাও তো থেকে যেতে পারে। এমন ভাবনায় আনন্দ তার ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে খাতাগুলো বের করলো। খাতাগুলোকে সাল-তারিখের ক্রম অনুসারে সাজালো। তারপর প্রথম খাতাটা তুলে নিলো। লেখার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে আনন্দ যেন শুনতে পাচ্ছে: আমি প্রমথ। আমার সমস্ত দুঃখের উৎস আমার প্রেমিকার শরীর— এরকমই মনে হচ্ছে আমার। নির্বিবাদে সেই শরীর সে তার স্বামীকে দিচ্ছে। হয়তো তার লোভ না-থাকা সত্ত্বেও। অথচ কত মহার্ঘ ছিল তা আমার কাছে, যতদিন ছিল সে আমার পাশে— নিঃশ্বাসছোঁয়া দূরত্ব, তবু— আমার আকাঙ্ক্ষা-কামনা

যদি কেবল তার শরীরকে ঘিরেই আবর্তিত হয়ে থাকে, তার যে সঞ্চয় তা কেবল আমার যৌবনকে অকর্মণ্য, জীবনকে নিরর্থক ক'রে তুলেছে, আত্মাকে দিয়ে অপচয় করাচ্ছে শুধ; কেমন এক মোহ—

—কেন মোহ বলছো প্রমথ? ধর্মের মতো তার মাদকতা— নয় কী? দেবতার মতো পবিত্রতা? ভগবানের রাজ্যের মতো অনির্বচনীয় সে। তুমি তো দেখেছো তা, অনুভব করেছো— তার মুখের ওপর, ঠোঁটের ওপর, ভুরুর ওপর তুমি তোমার চোখের দৃষ্টি আবেগপ্রবণ চুমোর মতো চেপে ধ'রে কতবার বলেছো, সুন্দরের থেকে শরীরকে কী ক'রে ছাড়াবো, প্রেম! বলেছো তো?

—তাহলে কি তার দেহ ধর্মোন্মত্ত ক'রে তুলেছে আমাকে?

ধর্মোন্মত্ততার ভয়ঙ্কর পরিণতির ছবি আনন্দর সামনে সহসা হাজির হলো— তখন সে কোলকাতায়, কিন্তু দাঙ্গার সেই রক্তাক্ত সময় মুছে দিতেই যেন সে পরের গল্পে 'ভালোবাসা'র মধ্যে আশ্রয় নিলো:

> সবসময়ই এক ভালোবাসা একটা দ্বিধার জিনিস বটে। কিন্তু তবুও হিমাংশু জানতো এ মেয়েটি যদি কাউকে ভালোবাসে পৃথিবীতে, তাহলে তাকেই।

আনন্দ স্পষ্ট দেখছে— হিমাংশু মাথা নাড়ছে। বলছে:

> ভালোবেসে জীবনটা আজও খেয়ে যাচ্ছে যেন, একরকম খরচ হয়ে যাচ্ছে। কেবলই দ্বিধা, কেবলই বাধা, কেবল যাতনা, অপচয়। কোনো শান্তি বা স্থিরতা না পেলে জীবনের কোনো কাজই যে আরম্ভ হতে পারবে না।

আনন্দ যেন কঁকিয়ে উঠলো, 'উঃ! অপচয়শীল অনিশ্চিত একটা প্রেম জীবনটাকে কেমন ছাই ক'রে দিয়ে গেল!'

—অথচ প্রেমকে সম্বল ক'রে জীবন চালাতে চেয়েছিলে!

—কে? ও, অজিত! হুঁ চেয়েছিলাম, কিন্তু মাত্র প্রেমকে সম্বল ক'রে আগাগোড়া জীবন চালাবার ব্যবস্থা পৃথিবীতে কোথাও নেই— মানুষের সে শক্তিও নেহ, রুচিও নেই।

—এ সার তবে বুঝেছো— প্রেম ব্যাঘাত-মাত্র, শুধু ব্যাঘাত!

—তব, কারও কারও জীবনকে তো সহজ করে— সাবলীল করে।

এমন এক বিশ্বাসে আত্মস্থ হয়ে পরের খাতাটা খুললো আনন্দ:

—আমি দেবব্রত।

আনন্দ যেন 'থাক্' ভঙ্গিতে হাত তুললো।

—কেন? দ্যাখো! এও তো তোমার এক রূপ— নিজেকে উদার ক'রে তুলে ধরা। স্ত্রীকে পরকীয়ার দিকে অনুপ্রাণিত করা— উদারতা বৈকি! সত্যিই তো জীবন অবকাশ দেয় মানুষকে, সুযোগ দেয়।

—তুমি কি ব্যঙ্গ করছো?

—একটুও না। এটাই তো তুমি প্রভাকে, থুড়ি, মৃণালকে বোঝাতে চেয়েছো। তার পরম প্রয়োজনটাকে বুঝে নিতে বলেছো। বলেছো, 'আমি তোমার স্বামী বটে, কিন্তু আমাকে দেখলে সম্পদ-সুখ তো দূরের কথা, কোনো শান্তি, এমন-কী কোনো আশ্রয়ও তোমাকে দিতে পারলাম না। হয়তো কোনোদিনই পারবো না, মৃণাল, চিরদিনই এইসব ভণ্ডুলের ভিতর দিয়ে আমাদের চলতে হবে। এতে জীবন না-পায় কোনো পরিতৃপ্তি, না-পায় কোনো সার্থকতা।'

—মিথ্যে বলিনি। এই ক'দিন আগেও বলেছি— আমার মতো এক ঘাটের মড়ার কুৎসিত হাত চেপে ধ'রে কেন আছো, প্রভা? বাস্তবিক, সে কিন্তু আমার হাত চেপে ধরেনি— কিন্তু আমার অনুভব তেমন।

—তার মানে তুমি নিস্তার পেতে চাইছো?

—কেউ কারও প্রতি এম্প্যাথেটিক হ'লে অনেক সময় তার নিজের কথাই ভাবছে ব'লে কারও মনে হ'তে পারে। তুমি ভাবো দেবব্রত— এই যে এই লাইন ক'টি লিখেছি, তুমি-আমিকে উহ্য রেখে এমন-কী কোনো নারীকে উল্লেখ না-ক'রেও যদি পড়ি:

> অন্ধ আবেগের এই ভালোবাসা কাল হয়তো জ্ঞানের ঘৃণায় দাঁড়াবে গিয়ে। কিন্তু কালও হয়তো তা অন্ধ আবেগের ভালোবাসাই থাকবে। কোনো জ্ঞান অভিজ্ঞতা কোনোদিন তাকে নষ্ট করতে না পারলেও পেটেরই ক্ষুধায় এমন স্থূল জিনিসটায় আজই হয়তো তা গভীর রাতেই ব্যথিত হয়ে উঠতে পারে, চিন্তিত; যেখানে চিন্তা রয়েছে সেখানে কোনো নীড় থাকতে পারে না। পারবে কি?

উদারতা নয়। বাস্তবিক এমন যদি কোনো উপায় থাকতো। যেখানে নীড় তৈরি ক'রে নিতে পারবে প্রভা, আমি সে-আকাশে প্রভাকে উড়িয়ে দিতাম।

কোনো একটা খাতার মধ্য থেকে কে যেন ব'লে উঠলো, সেই যে আমি যেমন দেখেছিলাম:

> দুটো পাখি। মাটির উপরকার বাসা থেকে আমাকে দেখছিল। যেন আমারই চমকে ওঠার অপেক্ষা করছিল তারা। বনের ভিতর আর কোথাও কোনো ভয় নেই যেন, অস্থিরতার কোনো প্রয়োজন নেহ, প্রেমে কোনো বাধা নেহ, শান্তির কোনো শেষ নেহ,— সমস্ত শীতের রাত ভরে পালকে পালক ডুবিয়ে সংসর্গকে বোধ করা— তেমনই এক নিশ্চয়তা হয়তো তখন পাবে প্রভা।

—হয়তো। আহা যদি পাওয়া যেতো— গৃহের ভিতর অন্তত একটা স্থিরতা— সংসর্গ-সমবেদনার একটা শান্তি, নিবিড় ওমের আরাম!

আনন্দ আর একটা গল্পের সামনে:

আমি অমূল্য— আমার বিবাহিত জীবন আপাত শেষ হ'তে চলেছে। কী আশ্চর্য! ছ'মাস আগে এই মাথাটা ডাইভোর্সের কথা ভেবেছিল, হেমের হাত থেকে নিস্তার পেতে চেয়েছিলাম। মৃত্যু হেমকে নিস্তার দিচ্ছে। আর আমি মৃত্যুকে রুখে দেওয়ার উপায় খুঁজছি। যদিও জানি উপায় নেই কোনো। জানি। জানি— হয়তো প্রভার মৃত্যু, থুড়ি, হেমের মৃত্যু— হয়তো আমাকেও একটা নতুন জীবন এনে দেবে— সাধের, চরিতার্থতার, উল্লাসের, আনন্দেব;...

আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'ভাগ্যিস ঘটেনি এসব—'

আমি প্রমথ—

অবাঞ্ছিত জনকে দরজার সামনে দেখে যেভাবে দরজা বন্ধ ক'রে দেয় কেউ, তেমনই খাতাটা বন্ধ করলো আনন্দ। একবার বাইরের দিকে তাকালো। বৃষ্টি ঝরছে। অথচ এতক্ষণ যেন বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল না। শব্দটা আবারও মুছে যাচ্ছে। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে প্রমথর কণ্ঠস্বর যেন আনন্দ শুনতে পাচ্ছে: আমাকে দিয়ে তুমি তোমার ইচ্ছে পূরণ ঘটিয়েছো। অমূল্যকে তুমি প্রভার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রেখেছিলে— কিন্তু আমার বেলায় সে আড়ালটুকুও রাখোনি, প্রসবের সময়ই তাকে মেরে ফেলেছো। আত্মপক্ষ সমর্থনে আনন্দ ব'লে উঠলো, 'এ পৃথিবীর ঢের মেয়েমানুষ বিয়োতে গিয়ে ম'রে যায়।'

—তাই বুঝি পূর্ণিমাকেও মরতে হলো!

—চমকে উঠলে! আমি সন্তোষ।

—পূর্ণিমার মৃত্যুটা এখানে আর্ট হয়ে এসেছে।

—কিন্তু প্রসবের ভোরে পূর্ণিমার মৃত্যুতে আমার চোখে সমস্ত পৃথিবী যেন নরম কোমল, মধুর ও নিবিড় হয়ে উঠেছে— এরকমই লিখেছো তুমি, এর মানে কী?

আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'নিষ্কৃতি।'

তব, গল্পটা— শেষ অনুচ্ছেদটা না-লিখলেই পারতে, তার আগেই শেষ হ'তে পারতো।

আনন্দ পড়ছে শেষ পাতাটা:

জীবনের দিনরাত্রির সংসর্গের এমনই একটা জোর, স্বামী-স্ত্রীর জীবনের অজস্র খুঁটিনাটির ভিতর মোহ এত কম, লালসা এত কম, অনুকম্পা এত বেশি, এবং পৃথিবীটা যতটুকু স্থির হয়ে বেঁচে রয়েছে, তুমি ভেবে দেখো তা অনুকম্পারই অতি তুচ্ছ খণ্ডাংশ নিয়েহ, লালসা বা মোহ, উত্তেজনা, ক্ষুধা বা হিংসার জোরে নয়— এ জিনিসটা এত বেশি শক্তিশালী। তোমাদের বিধাতাকেও তোমরা এই দিয়েই সৃষ্টি করেছ— দাম্পত্য জীবনেও স্বামীও স্ত্রীর প্রতি উদাসীন হতে গিয়েও এরই আকর্ষণ শেষপর্যন্ত কিছুতেই

এড়িয়ে যেতে পারে না— যে স্ত্রীর সঙ্গে সাতটি দিনও ঘর করেছে সে অনুকম্পায়, করুণায় তারই জন্য অভিভূত হয়ে পড়ে।

নইলে, জীবনের সব জিনিসের প্রতিই তো শেষপর্যন্ত গিয়ে বিমুখই ছিলাম— স্ত্রীর রূপ ও মোহও একদিন লালসার খাদ্য জোটাল না আর, জীবনের অশ্রু-মমতার ভিতর তলিয়ে গেল। এই অশ্রু-মমতাই সত্য— দাম্পত্য জীবনে বধূকে নিয়ে এই মমতা ও অশ্রু।

তা পারে। —ভাবলো আনন্দ। তাহলে রি-রাইট ক'রে লেখাটা কোনো কাগজের দপ্তরে পাঠানো যেতে পারে। পারে! কিন্তু... আনন্দর মাথায় নেতিদোলন।

কেমন একটা ক্লান্তি লাগছে। তবু আনন্দ উল্টে যাচ্ছে খাতার পাতা। কোনো পাতায় একটু থিতু হ'লেই সে দেখতে পাচ্ছে নিজেকে, কিন্তু এক এক সময় দেখতে ইচ্ছে করছে না। এই যেমন এখন— এই পৃষ্ঠা থেকে 'আমি সত্যব্রত' ব'লে ওঠার আগেই আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'আমি এখনও প্রেমাস্পদশূন্য জীবন উপভোগ করছি, তুমি এখন আসতে পারো।'

আরও একটা খাতা টেনে নিলো।... এই গল্পটা শেষ ক'রে প্রভাকে পড়াতে চেয়েছিল— এই কথাগুলো কতবার আনন্দ তাকে বলতে চেয়েছে, চায়ও, এখনও; বলতে পারেনি। বললে কি আর এভাবে বলতে পারতো? কোলকাতার বোর্ডিং থেকে এমন তো একখানা কার্ড সে লিখতে পারতো— কতকিছু ভাবে আনন্দ, কিন্তু শেষপর্যন্ত আর হয়ে ওঠে না। একথাগুলোই যদি সে চিঠিতে লেখে, কেমন হয়— চিঠির বয়ানে আনন্দ পড়তে থাকলো:

প্রভা, তুমি নিজেকে আমার প্রেমিকা না মনে করে আমাকে ভালোবাসতে না পারলেও, স্বামী মনে করে আমাকে মমতা না করে পারবে কি? পৃথিবীর কোনো স্ত্রীই যে তা পারে না কিংবা তা যে অনুচিত, তা নয় কিন্তু তুমি তা পারনি আজও— জানি না কোনোদিন পারবে কি না। তুমি তা পারনি আজও। মাটিতে আঁচল পেতে আমাদের দুজনার বিছানাটা ছেড়ে কদিন শুতে পারলে?

পেরেছে তো। এখন পারছে তো ঢের। তব, এখন লিখতে দোষ কী:

শুধু মাটির শীত ড্যাম্পই নয় প্রভা, এর ভেতর আরো কিছু রয়েছে। সারাদিনের ভেতর আজকাল তোমাকে বড় একটা বুঝে দেখবার অবসর দাও না, কিন্তু রোজ রাতেই সমস্ত ঝঞ্ঝাটের পর তোমার মৃদু হাত দুটো তোমার আপদমস্তকের নিবিড়তা দিয়ে আমাকে বেড়ে রাখবার কি দরকার তোমার?

আহা! যা বলছো তার এক আনাও যদি ঘটতো! এমন মিথ্যে লিখতে পারবে তুমি? এ তো মিথ্যে নয়! এ আমার আকাঙ্ক্ষা। প্রভাকে জানানোটাই উদ্দেশ্য। যদিও আমি তা কখনও প্রকাশ করিনি এভাবে:

আমার নিজের মনের অভিমান ও সম্মান শেষপর্যন্ত তো অক্ষুণ্ণ রাখি। তুমি যে আমাকে তোমার অন্তরের সমস্ত মমতা দিয়ে জড়িয়ে রয়েছ বুকের ভেতর সবসময় তা অনুভবও করতে পারি না। কিন্তু যখন জেগে থেকে এ জিনিসটাকে বোধ করতে থাকি, তখনই মনে হয় তুমি আমাকে ভালোবাসো আর নাই বাসো, তোমার ওই মৃদু হাত দুটো, মুখখানা আমার বুকের উপরেই হয়তো, তোমার অজস্র চুল আমার মুখটার উপরই লতিয়ে লতিয়ে— তোমার আঙ্‌লের হিম, নিশ্বাসের উষ্ণতা— এরকমই কোনো প্রেমলিপ্সার থেকে না হোক যে মমতা নিবিড়তার থেকে জন্মেছে সে সবেরই প্রয়োজন রয়েছে আমার। ঘুমের ভেতর তোমার কোনো রুচি নেহ, মন নেহ, অনুভব নেহ, কিন্তু তবুও আমি ঘুমিয়ে গেলে রোজই যে তুমি একবার জাগো, মমতাময়ী স্ত্রীর মনের মাধুরী নিয়ে শাঁখার মতো সাদা দুগাছা শীর্ণ হাত দিয়ে আমাকে যে ঢেকে রাখ...

আনন্দর দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। অক্ষরগুলো ধুয়ে ভেসে যাচ্ছে। এ গল্পটা সত্যিই প্রভাকে পড়ানো উচিত। কী আছে এ গল্পে? প্রেমের মোড়কে নিজের অক্ষমতাকে আড়াল ক'রে বউকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার আয়োজন করেছো মাত্র। হ্যাঁ— এই আয়োজনটুকুই জানানো। বাস্তবিক আমি তা-ই চাই। পৃথিবীর সমস্ত রকম সম্পর্কে অবসন্ন হয়ে পড়েছে প্রভা, এটা আমি অনুভব করতে পারি, নিজেকে অপরাধী মনে হয়, মায়া হয়; কষ্ট পাই— আমি যেমন বনির সান্নিধ্য পেলে জীবনের একটা মানে খুঁজে পাবো ব'লে মনে হয়, এখনও তো মনে হয়; তেমনই মনে হয় দ্বিতীয় কোনো পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধেই প্রভার উন্নতি, আনন্দ, মঙ্গল, পরিণতি— সবকিছুই—

দু'চোখ বন্ধ ক'রে আনন্দ ভাবছিল। ভাবনাটা যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। জেগে উঠছে রিমঝিম। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে। অস্বাভাবিক নয়, তবু যেন ঘুমটাকে তাড়াতে চাইলো। চোখ মেলে তাকালো, কতকগুলো হাঁস উঠোনে— কেঁচো ধরতে তাদের গ্রীবা আর ঠোঁটের ক্ষিপ্রতা দেখবার মতো জিনিস। দেখবার কেউ নেই। সবাই যে যার ঘরের মধ্যে। পিসি কি কাঁথা সেলাই করছে ও-ঘরে? ভুবনমামা কোথায়? মা? বাবা? —সবাই কেমন যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, একা নিজেকে নিয়ে কেমন মশগুল। আহ! এমন বাদলার দিনে— মেয়েটাকে দিয়েছে দু'ঘা বসিয়ে, হয়তো বিছানা ভিজিয়েছে কিংবা কোনো বায়না— মেয়েটা তার ফুসফুসের সমস্ত শক্তি জড়ো ক'রে যেন কাঁদছে। এই শান্তির আবহাওয়ায় এ যেন তার বিদ্রোহ। এখনই হয়তো এ-ঘরে পাঠিয়ে দেবে। এমন সম্ভাবনায় আনন্দ খাতাগুলো দ্রুত ট্র্যাঙ্কের মধ্যে চালান ক'রে দিলো।

—তুমি কি ভয় পাও?

—পাই।

—কেন?

—আমি যা নহ, তা-ই আমাকে সবাই ভাবে। কিন্তু আমি যা, তা কেবল ওই খাতাগুলোর মধ্যে লেখা আছে। আমি যা, তা কেউ জানলে অশান্তি— এই অশান্তিকে আমি ভয় পাই।

—তাছাড়া আরও কিছু ব্যাপার আছে। নিজেকে দেখতে গিয়ে অন্যকেও তো ভেঙেছো তুমি, দেখেছো।

—হ্যাঁ, সে কেবল প্রভাকে।

—কেন, বনিকেও তো!

—আমি কিন্তু কাউকে অসম্মান করিনি!

লেখার খাতাটা টেনে নিলো আনন্দ। পরপর লিখলো:

আমি হিমাংশু

আমি প্রবোধ

আমি অমূল্য

আমি প্রমথ

আমি অজিত

আমি দেবব্রত

আমি সত্যব্রত

আমি প্রভাত

আমি সন্তোষ

তারপর নামগুলোর ডানপাশে সেকেণ্ড ব্রাকেট দিয়ে লিখলো— আমরা সবাই ইকুয়াল টু আমি— বিশ্বাস করি: নারী-পুরুষের একটা বিবাহিত জীবন থাকা উচিত।

যেমন একটা ঘর (আশ্রয় অর্থে)—

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়— ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি—
তবে ঐ পৃথিবীর দেয়ালের 'পরে
লিখিতে যেয়ো না তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে
অন্তরের কথা!—

নিজেকে ভেঙে-ভেঙে দেখা বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। আনন্দ আর লিখতে পারছে না। এবছর শেষ গল্পটি লিখেছে সে মে মাসে। সে-গল্পও তার নিঃসঙ্গতাকে ফিরে দেখা, সঙ্গ কামনার গল্প। চিঠির বয়ানে। প্রভার যদি বাপের বাড়ি থাকতো আর সে বাপের বাড়ি গিয়ে যদি অনেকদিন থাকতো তাহলে যে চিঠি লিখতো আনন্দ, সেটাই গল্প হয়েছে— তার আকাঙ্ক্ষার নির্লজ্জ প্রকাশ যে কাব্যিক ব্যঞ্জনায় ঘটেছে তার মধ্যেই যেন একটা আভাস ছিল ওই সমাপ্তির।

বছরের গোড়ার দিকে একটা উপন্যাস শুরু করেছিল। কিন্তু শেষ করতে পারেনি। আজ সেই উপন্যাসটা নিয়ে ভাবছিল আনন্দ। ঠিক উপন্যাসকে নিয়ে নয়, তার কেন্দ্রিয় চরিত্র— বিভাকে ভাবছিল। বিভা ইকুয়াল টু প্রভা নয়, বিভা— বনি নয়। বছর-দুই আগে এমনই এক বৃষ্টির দিনে, তখন ভাদ্র, সে শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' আর 'পরিণীতা' পড়েছিল। আনন্দর মনে যে মানসী, তার সঙ্গে 'দত্তা'র বিজয়া কোথায় যেন মিলে যাচ্ছিল— এক হয়েও কোথায় যেন আলাদা, কিন্তু তার কল্পিত রূপটি আনন্দর কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার প্রায় দেড় বছর পর একদিন এক বিদেশি সিনেমা দেখতে দেখতে আনন্দর মনে পড়েছিল মনিয়াকে— নায়িকা রুথ চ্যাটার টমের সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল মনিয়ার; তার কিছুদিন পর মেসবাড়ির জানলা-পথে সে একটি মেয়েকে দেখেছিল, তার মুখেও মনিয়ার মুখ মনে করানোর মতো কিছু ছিল— তিনজনের মুখে একই আদল— একজনকে সে দেখেছিল রূপালি পর্দায়; একজন মৃত, কেবল স্মৃতিতে উজ্জ্বল; আর মেসবাড়ির বিপরীত জানলায় মাঝেমধ্যে দেখতে পাওয়া যায় সেই মেয়ে— তার দিকে তাকিয়ে কবে একদিন ওই উপন্যাসভাবনা এসেছিল... কেন যে শেষ হলো না, নিজেকে দেখার কোনো আয়োজন ছিল না ব'লে?

এটা ঠিক আমি নিজেকে দেখতে চাইনি, কিন্তু দেখছিলাম আমারই মধ্যে থাকা সেই মানুষীকে— গভীর হৃদয়ের সেই নারী! যে 'আনা কারেনিনা' পড়েছে, 'ওয়ার অ্যাণ্ড পিস' পড়েছে— প্রেম ও সাহিত্য বিষয়ে যার গভীর জ্ঞান রয়েছে— রয়েছে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হওয়ার মতো দু'টি চোখ— ভোরের আলোয় পাখিদের আনন্দ দেখে তার হৃদয় ভ'রে যায়, নীল আকাশের উপমা হয়ে আসে শিশুর সরল চোখ— নীল আকাশের পটভূমিতে সাদা পায়রাদের মেলানো ডানা— এসবে সে মুগ্ধ হ'তে পারে, এসবের ভেতর ঈশ্বরকে অনুভব করার মতো একটা মন আছে— মন্দির-মসজিদ-চার্চে যাওয়ার কোনো কারণ আছে ব'লে সে মেয়ের কখনও মনে হয়নি—

তবু মাঝপথে লেখাটা থেমে আছে। নতুন ক'রে তাকে নিয়ে বসারও তেমন ইচ্ছে হয়নি।

আজ তার কথা মনে পড়ছে মাত্র। খাতাটা নিয়ে বসতেও ইচ্ছে করছে না। অথচ করার নেই কিছু। মঞ্জুকে নিয়ে কিছুটা সময় সে কাটিয়েছে। বেদনায়, অপরাধবোধে। —মেয়েটির মুখে তেমন সজীবতা নেই, এলো না আজও। কেমন করুণ বিষণ্ণ। কী দরকার ছিল এর পৃথিবীতে আসার! মেয়েটির গায়ে-মাথায় সে হাত বুলাচ্ছিল। এ মেয়েটি যেন তার মা'র বিষ-জ্বালা উগরে দেওয়ার আধার— হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে সেই বিষ যেন ঝেড়ে ফেলতে চাইছিল আনন্দ। মঞ্জু তার বুকের ওপর শুয়েছিল অনেকক্ষণ— সলতের মতো হাত দু'খানা আনন্দর দু'কাঁধে রেখে, লিকলিকে পা দু'খানা মাঙ্গলিক চিহ্নের মতো আনন্দর পেটের দু'পাশ দিয়ে নামিয়ে দিয়ে, পরম নিশ্চিন্তে যেন আনন্দর হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনছিল কিংবা উপশম অনুভব করছিল মেয়েটি।

তারপর একসময় উঠে চ'লে গেল। যেতে দিলো আনন্দ। তার যাওয়া দেখতে-দেখতে আনন্দর মনে হলো, এই মেয়েটির আয়নায় নিজেকে কেমন দেখায়— দেখার একটা আয়োজন করলে বেশ হয়— খাতাটা টেনে নিলো। লিখলো: মঞ্জু, মঞ্জুর মা, ঠাকুর্দা, ঠাম্মা— সত্যানন্দের ব্যথিত মুখটা মনে পড়লো আনন্দর— 'এতটুকু বয়সে এত মার খাচ্ছে মেয়েটা!'

আনন্দ মনে মনে বলেছিল, তোমারও তো লাগছে। আমারও। আমাদের সবার। এমন-কী প্রভারও, তা যদি না-হবে, তার চোখে অত জল আসে কোথা থেকে?

ভাবছিল আনন্দ। হঠাৎ তার নজরে পড়লো বেড়ায় উইয়ের আলপনা। বইগুলোতে উই ধরেনি তো? বইগুলো একবার নেড়েচেড়ে দেখলো। কেমন ড্যাম্প ধ'রে গেছে। বইগুলো রোদে দিতে হবে। বেশ রোদ্দুরের দিন ভাদ্র না-এলে পাওয়া যাবে না। তখন সে কোলকাতায় থাকবে। ব'লে যেতে হবে মাকে, প্রভাকে। প্রভার কি মনে থাকবে? বইয়ের প্রতি তেমন দরদ আছে ব'লে তো মনে হয় না। তার প্রতি যদি সামান্য দরদ থাকতো, তাহলেও আনন্দ আশা করতে পারতো বইগুলো রোদ্দুর পাবে।

কেন যে দরদ জন্মালো না।

প্রভার রূপ ছিল, গুণ ছিল— রূপ ঝ'রে গেছে, গুণ ফুটে উঠতে পারলো না।

—'কী দিয়েছো তুমি আমাকে?' প্রভার এই কথার মধ্যেই, অনুচ্চারিত রয়েছে, 'যা ছিল সবই নষ্ট ক'রে দিয়েছো'। —এটা বোঝে আনন্দ। প্রভার দিদির বিয়ে হয়েছে ভালো ঘরে-বরে। টাকাপয়সা যে কীভাবে মানুষের জীবনে লাবণ্য ফুটিয়ে তোলে, চরিতার্থতা এনে দেয়— তা তার দিদি প্রমীলা আর জামাইবাবু বসন্তকে দেখে প্রভা উপলব্ধি করেছে। আর নিজেকে মনে করেছে নিঃস্ব। বাস্তবিক— আজ যা তার রূপ,— প্রেতিনীর মতো যেন-বা— প্রমীলার পাশে দাঁড়ালে কেউ বলবে না, প্রভা তার বোন— এক মায়ের পেটের।

প্রমীলার চেয়ে প্রভা ঢের রূপমতী ছিল। বসন্ত কত হাসিখুশি, আমুদে-উদার— পয়সা থাকলে এসব হয়; পয়সা না-থাকলেও হয়, দেখেছে আনন্দ, ফুটপাতে-প্লাটফর্মে এমন-কী ভিখারিরাও জীবনকে উপভোগ করতে জানে। তবুও তারা কর্ম করে। হাত পেতে দাঁড়ায়। মুখটা করুণ-আর্ত ক'রে তোলে। তুমি তাও পারো না। প্রতিবার কোলকাতা যাওয়ার আগে প্রতিজ্ঞা করো, এবার কিছু একটা করবোই। কিছুই করতে পারো না। প্রভা হতাশ হয়। বাবা বিপন্ন হন।

মা আরও বিষণ্ণ।

কিছুদিন আগে, একটা বিশেষ মুহূর্তে দেখা বাবার মুখ আনন্দর মনে পড়লো। তখন সেজকাকা এসেছিলেন। তাঁকে চাকরি জোগাড় ক'রে দেবার কথা আনন্দ বলেছে কিনা, জানতে চেয়েছিলেন সত্যানন্দ। আনন্দ বলেছিল, 'বলেছি।'

—'কী বললেন?'

—'বললেন, ইহকালটা নমো-নমো ক'রে কাটিয়ে দিতে। পরকালে হয়তো কপাল খুলে যাবে আমাদের।' কথাটা শুনে সত্যানন্দের মুখটা কেমন শ্রীহীন হয়ে গেছিল— সেই মুখখানা—

এর জন্য আমি দায়ী— প্রভা ঠিকই বলে— আমার কোনো উদ্যম নেই। যদি থাকতো আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম...

হয়তো আমি মরিস বা অস্টিনের মতো মোটর তৈরি করতে পারতাম! হয়তো বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর মতো কোনো প্রতিষ্ঠান। হয়তো স্বরাজ পার্টি কিংবা কংগ্রেসের নেতা হ'তে পারতাম।

পারিনি ব'লেই বাবার মুখ অমন শ্রীহীন হ'তে পারে। একেবারে যে আকাঙ্ক্ষা ছিল না— তা তো নয়, এখনও তা রয়েছে, যদি তা বলতে পারতাম বাবাকে— আমার কী ইচ্ছে করে জানো বাবা! মস্ত বড় একটা মাঠের মধ্যে কুঁড়েঘর বানাই, তার পাশে একটা নদী থাকবে, মেঘনা কিংবা কর্ণফুলী, অথবা ইছামতী— পেটের জন্য কোনো চিন্তা থাকবে না। দিনরাত শুধু পড়বো আর লিখবো।

আনন্দ কল্পনা করলো। বাবাকে সে ওই কথা বলেছে। সত্যানন্দ চুপ থেকে গোঁফে তা দিয়ে বললেন,— একে তুমি সখ বলতে পারো, জীবনের সখ— জীবন হলো কি?

—কেন নয় বাবা?

—অনেক মানুষের সাপেক্ষে নিজেকে তুলে ধরার আয়োজন নেই এর মধ্যে।

—জীবন মানে কি তবে এই ভিড়ের মানুষ হয়ে, যা করতে ইচ্ছে করে না, ভাবতে ভালো লাগে না— সেইসব কাজ ও চিন্তা ক'রে যাওয়া?

সত্যানন্দ নীরব।

—বাবা, এই যে তুমি— তুমি তো ভিড়ের মানুষ হওনি!

সত্যানন্দ একবার চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকালেন। যেন ব্রহ্মকে স্মরণ করলেন। বললেন,— জীবনের আরাম-বিলাসের উপকরণগুলো যাদের হাত থেকে ফসকে যায়, তারাই অবশেষে ত্যাগ ও মহিমার ভক্ত হয়ে ওঠে; না, কোনো কৃত্রিমতা নেই তাতে। আনন্দ যেন একটু সচেতন হলো। নিজেকে বললো, তুমিও কি তা-ই হওনি? কারুবাসনার আড়ালে তুমি কামনা করো অনন্ত ঘুম— মৃত্যু নয় কি তা?

সত্যানন্দ উঠোন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। খালি গা। রোগা চিমসে শরীর। একটু বেঁকে গেছে শিরদাঁড়া। চোয়াল ভাঙা, রগের দু'পাশ দেখলে অনুমান করা যায়।

বাবাকে যদি জিগ্যেস করি, বাবা, এতটা বছর তো বাঁচলে— তুমি তৃপ্ত?

বাবা বলবেন, তা বলতে পারো। রোজগারের জন্য আমাকে বিদেশ-বিভুঁইয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে না— দেশের বাড়িতে, নিজের বিছানায় এই শুয়ে থাকার মধ্যেও তো একটা তৃপ্তি আছে— আছে না?

—আচ্ছা বাবা, এখন যদি বিধাতা এসে জীবনের পুনরাভিনয় করতে বলেন, যাতে জীবনের ভুলভ্রান্তি শুধরে নেবার অপ্‌শন থাকবে— তুমি কি আবার নতুন ক'রে শুরু করবে?

—না। তাঁকে বলবো, ভবিষ্যতের জন্য যা সঞ্চিত আছে, তা-ই দাও আমাদের।

আনন্দ ভাবলো, আমি কি তবে বাবার স্বভাব পেয়েছি! তার জন্যই কি এই আটচালা ঘর এত ভালো লাগছে? এই ঘরই তো স্বর্গ হয়ে উঠতে পারতো। এই আম-জাম-কাঁঠাল, নারকেল-সুপারি-বাঁশবন, মাঠ-ঘাট-নদী— এসবকে যদি আপন ক'রে নিতে পারতো প্রভা!

আনন্দ হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।

তবু তার লেখার ইচ্ছে জাগছে।

আনন্দ লিখবে— মঞ্জুর প্রতি প্রভার নিষ্ঠুরতা, তার আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তি; লিখবে বাবার নিঃসঙ্গতা— ইহজীবনে বাবা তাস-পাশাও খ্যালেননি। আনন্দ খেলতো। এখন খ্যালে না। ঘরকুনো হয়ে গেছে। তার বেকার-বিবাহিত জীবন ঘিরে নানা মানুষের নানা কৌতূহল, কৌতুকের বিষয়ও কারও-কারও কাছে। সমবেদনা-রসিকতা সবই কেমন তীর হয়ে বেঁধে। হৃদয়ে। চৈতন্যে। তাই এই গৃহবন্দি— স্বেচ্ছাবন্দিত্ব।

কোথায় যেন একটা বেড়ালের বাচ্চা কাঁদছে। আহা, মা নেই বুঝি বাচ্চাটার! কোথায় তার মা?

আনন্দ ভাবলো, বাচ্চাটাকে সে নিয়ে আসবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবনাটা কেমন নেতিয়ে গেল। কী খেতে দেবে তাকে? তার মেয়েরই ঠিকমতো দুধ জোটে না। খুব কাঁদছে বাচ্চাটা।

যেন তার বুকের ভেতরই কাঁদছে সেটা। কতবার একটা বেড়ালের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের দুঃস্থতা অনুভব করেছে, বেড়ালেরও অধম মনে হয়েছে নিজেকে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ আনন্দ যেন প্রকৃতই অস্তিত্বশূন্য। একটা বাচ্চা বেড়ালকে করুণা করার মতো সামর্থ্যও নেই তার!

এসবই সে লিখবে...

সে লিখবে এইসব সম্ভাবনার কথা— যা তার হিতার্থীরা বলেছেন।

—টেক্‌নিক্যাল কিছু শেখো! হাতের কাজ।

—দর্জিগিরি। চায়ের দোকান। কিংবা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার।

—পোলট্রি ফার্মিং। মাছের ব্যবসা।

—দুধের ব্যবসা। মদের দোকান।

—মিল্ক কোম্পানির বিজ্ঞাপনের পাশে গরুর ছবিগুলোর একটা বর্ণনা থাকবে।

—মোটর ড্রাইভিং শিখতে পারো।

—চাষ করতে পারো। ক্যালকাটা ইউনিভারসিটিকে জলে ফেলে দিতে পারছো না। আশি হাজার এম.এ. পাশ ছাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এইসব মানুষগুলোকে ভেঙে-ভেঙে দেখানোর কথা ভাবতে-ভাবতে আনন্দর মনে পড়লো, কে যেন কবে বলেছিল: পৃথিবীকে যদি উপভোগ করতে চাও তাহলে সৃষ্টির স্রোতের ভিতরকার অক্লান্ত সুবিধাবাদ ও অশ্রাব্য আত্মপরতাকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে শেখো, ভগবানও আশীর্বাদ করবেন, নারীও হাতের পুতুল হবে।

কেউ কি বলেছিল? নাকি কারুবাসনার অন্তরালে নির্বাসিত আত্মার কণ্ঠস্বর? ঠিক বুঝলো না আনন্দ। কিন্তু তখনই তার একটি মুখ মনে পড়লো— অপরূপ রূপের সেই মেয়েটি, মৃত্যু না-হ'লে সেও কি কারো হাতের পুতুল হয়ে যেতো? এই মেয়েটিরও তো একটা রূপ দিতে হবে, নাম।

খাতাটার ওপর আনন্দ একটা নাম লিখলো— বনলতা।

আমার সকল প্রেম উঠেছে চোখের জলে ভেসে!—
প্রতিধ্বনির মতো হে ধ্বনি, তোমার কথা কহি
কেঁপে উঠে— হৃদয়ের সে যে কত আবেগে আবেশে!

চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর রাজনীতি সম্পর্কে আনন্দর কোনো আগ্রহ ছিল না। পৃথিবীটাকে ভাগবাঁটোয়ারা ক'রে ক্ষমতাবানেরা খেয়ে আসছে সেই বর্বরযুগ থেকে। এর পরিবর্তন হওয়ার জন্য যা দরকার তা এখনও মানুষের মধ্যে গ'ড়ে ওঠেনি। —এ সার আনন্দ বুঝেছে ব'লে রাজনীতির প্রতি তার আগ্রহ নেই। কিন্তু বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত যে রাজনৈতিক, এ-বিষয়ে সে সচেতন— তবু রাজনীতিটাকে সে সুন্দরভাবে এড়িয়ে চলতে চায়। তবু এক এক সময় কথার পিঠে কথা ভাবতে হয়েছে।

এতদিন দেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান-শিখ ব্যাপারটা ইংরেজদের কাছে তুরুপের তাস ছিল, সময়মতো যে যেমন পেরেছে খেলেছে। এর সঙ্গে গতবছর থেকে শুরু হয়েছে হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বিরোধ— যেন এ-বিরোধ আগে ছিল না, ছিল ব'লেই তো গত দশক থেকে একটা আন্দোলন ঘনীভূত হ'তে পেরেছে বাবাসাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে; আনন্দর মনে আছে, সেবার— তার 'ঝরাপালক' প্রকাশের বছরে, জাতবর্ণের সংবিধান নামে পরিচিত মনুস্মৃতিকে আম্বেদকর দাহ করেছিলেন, সম্ভবত পঁচিশে ডিসেম্বর— তারপর গত পাঁচ বছর ধ'রে চলা সেই আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পৃথক নির্বাচনের অধিকার নাকি ছিনিয়ে এনেছে; শুধু কি তাহ, নিম্নবর্গের হিন্দুদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছে ব্রিটিশরাজ।

এসবের কোনো মানে নেই— ভাবলেও মাঝেমধ্যে কীরকম রাগ হয়, ক্ষোভ জন্মে— ভাগ হয়ে অংশের দাবিদার হ'লে যে শেষপর্যন্ত কিছুই মেলে না— নীতিমালার গল্পটাকে কেন-যে মানুষ মনে রাখতে পারে না— এসবের মধ্য দিয়ে তবু মাঝেমধ্যে আশ্বাসের মতো কিছু বেরিয়ে আসে, সেটাই আশার কথা— গান্ধিজী যেমন অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছেন— এ আন্দোলনের অর্থ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মন পরিবর্তন করা— তাদের মধ্যে সমতাবোধকে জাগিয়ে তোলা, বাংলায় ব্রাহ্মরা যেমন শুরু করেছিল এক সময়।

এই সমতার প্রশ্নে সেদিন বোর্ডিঙে কথা বলতে বলতে কে যেন বলেছিল, 'হিন্দুর নানা ভাগ— সে কি আজকের— ক'দিন আগে চণ্ডীদাস দেখলাম, সেখানেও সেই ভাগ— শাক্ত আর বৈষ্ণব— উঁচু জাত, নিচু জাত—' আর তখনই আনন্দর মনে পড়েছিল— সমতাবোধ মানে সখ্যপ্রেম— প্রেম; উচ্চবর্ণের মধ্যে কি ওই প্রেম জাগাতে পারবেন গান্ধিজী— নারী-পুরুষের মধ্যেই সে প্রেম আজও জাগতে দিলো না সমাজ— যদি পারেন তাহলে ভারতবর্ষের রাজনীতি, পৃথিবীর রাজনীতি মানবিক হয়ে উঠবে।— এরকম ভাবনায় আনন্দ পুলকিত হয়ে উঠেছিল সেদিন; আর তখনহ, একমাত্র তখনই— রাজনীতিকরাও ব'লে উঠবেন,— সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চণ্ডীদাস গতবছর পুজোর আগে-আগে রিলিজ হয়েছিল। সবাক ছবি। একজন অন্ধগায়ককে দিয়ে অভিনয় করিয়েছেন পরিচালক। এসব কারণে টকিটা দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময়-সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তারপর যখন জেনেছিল, বনি চণ্ডীদাস দেখেছে— তখন সিনেমাটা দেখার আর তেমন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু সেদিন চণ্ডীদাস সম্পর্কে টুকরো-টুকরো কথায় আনন্দর মনে হয়েছিল অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তার সঙ্গে কোথায় যেন এ-টকির অবদান আছে— বৈষ্ণব পদাবলীর কবির জীবন— দেখতে হবে। দেখতে হবে।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি তার আসক্তি সেই ছোটবেলা থেকে। আনন্দর মঝেমধ্যে মনে হয়েছে, প্রেম ভেবে-ভেবে জীবনটাকে নষ্ট করার মূলে ওই আসক্তি।— চণ্ডীদাস দেখতে-দেখতে এরকমই মনে হলো ফের। আর প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে যেখানে রামী চণ্ডীদাস— সে একসঙ্গেই হোক, কি এককভাবে, বনিকে মনে পড়েছে, এমন-কী পর্দায় উমাশশীর মুখটা কেমন বদলে গেছে, যেন বনি— বনিই তো অমন কথা বলতে পারতো। বলছে—

আর্টের পৃথিবীতে কত সাবলীল কত কিছু ঘটে!

হল থেকে বেরিয়ে আনন্দ হাঁটছিল। আর্টের পৃথিবীর জলবায়ু তাকে কোমল ক'রে রেখেছে।— আমি যখন বনির কাছে যাই, কেন যাই, এই টকি দেখতে-দেখতে তা কি বুঝেছে বনি? খুব স্পষ্ট ক'রে বলেছেন দুর্গাদাস, থুড়ি চণ্ডীদাস, আমারই কথা—

—কী ঠাকুর, ছিপে মাছও খেলে না বড়শিও কাটা গেল!

—বড়শি তো কাটা যায়নি।

—যায়নি! ভালো। কিন্তু তুমি আর মাছ ধরতে এসো না।

—কেন?

—কেন, তুমি মাছ ধরতে আসো না।

—জানি।

—তাও জানো দেখছি।

—কিন্তু কেন আসো তা জানো?

—জানি।

—কেন?

—তোমায় দেখতে।

—মন্দিরে তো রোজ আমায় দ্যাখো।

—অতটুকু দেখায় আমার আশা মেটে না। আমার মন চায় সর্বক্ষণ দেখতে। কী আশ্চর্য তাকিয়েছিল উমাশশী দুর্গাদাসের মুখপানে— এমনই তো একবার বনি— কিন্তু এমনই তো এখন সে বনির মুখের দিকে চেয়ে থাকে— রামীর মতো বনি যদি বলতো, যদি এখন কোনোদিন বলে, কেন অমন চেয়ে থাকো! আনন্দ তখন, চণ্ডীদাস যেমন বলেছে তেমনই বলবে, আমি তোমাকে দেখতে চাই। বনি, আমি তোমাকে দেখতে চাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সব ইন্দ্রিয়কে চোখের দুয়ারে এনে। তোমার ওই স্থির সৌন্দর্যের মন্দিরে প্রহরী হয়ে যুগ-যুগান্ত ধ'রে ব'সে থাকতে চাই নিদ্রাহীন, তন্দ্রাহীন, পলকহীন— তখন বনি হয়তো রামীর মতো ক'রেই বলবে, তুমি কবি তাই কবিতা ভাবছো। মানুষের জীবন কবিতা নয়, তা রক্ত-মাংসে গড়া। তার সমাজ আছে, শাসন আছে। তুমি বোঝো না, আমাকে ভালোবাসা চলে না। ওকথা বলা তোমার পাপ। ওকথা শোনা আমার মহা পাপ।

রামীর কিংবা উমাশশীর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলো আনন্দ, বনির মুখ কল্পনা ক'রে কুঁকড়ে গেল সে। অথচ ওই মেয়েটিকেও তো পদাবলীর কিশোরীর মতো মনে হয়েছিল একদিন; কী আশ্চর্য, ক্রমে-ক্রমে সে কেমন প্রেমহীন ক্ষমাহীন—

আনন্দ হাঁটছে...

একটা গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়ছে সে— সেই গল্পের পৃথিবীতে চ'লে আসছে গ্যয়টে-মিলা হার্জলিস, দিদোর-ইলিয়াস, উর্বশী-পুরুরবা— কিন্তু রামী-চণ্ডীদাসই শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে হলো তার, রামী-চণ্ডীদাসের এই গল্পে পাঁচটি প্রেমরসের ভিয়েন— বীর-বীভৎস-করুণ রসের কোনো জায়গা নেই, এমন-কী হাস্যরস— ওই পাঁচটি রসের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে—

বোর্ডিঙে ফিরে অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মতো ব'সে থাকলো আনন্দ। তারপর... অনেক রাত্রে সে তার নোটবুকে লিখলো: All along while seeing চণ্ডীদাস, I thought of Y who had seen it previously. Did she understand all the points? Did she ever think of me? Or poets or poetry?

তারপর গল্প লেখার জন্য একটা নতুন খাতা নিয়ে বসলো।

এক সময় তার মনে হলো, এও তার নিজেকে দেখার রকমফের। অবশ্য মায়ের সঙ্গে অনেক কথা হলো— বাস্তবে যদি এমন হতো!

ঘুম পাচ্ছে। খাতাপত্র গুছিয়ে ট্র্যাঙ্কের মধ্যে চালান করবার আগে লেখার শেষটা একবার সে পড়লো:

> মা বিক্ষুব্ধ হয়ে ছাদের এক কোণায় গিয়ে বসলেন। এখন অবিশ্যি বৈষ্ণব কবিতা চাপা পড়ে গেছে; মাঝে-মাঝে ডন ভালো লাগে, মাঝে-মাঝে হুইটম্যান, এ্যালেন পো, কিংবা সেকস্পিয়ার-এর সনেট— কিন্তু এসব করেই সাংসারিক জীবনটা খোয়া গেল আমার, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হলেও ভালো হতো, কিন্তু পাশ করলাম ইংরেজি লিটারেচারে এম.এ.। এখন এই বয়সেও আমার জুতো সেলাই শিখতে ইচ্ছে করে।

আনন্দ নিজের মনে বিড়বিড় করলো, 'অস্পৃশ্যতা আর কাকে বলে!'

চণ্ডীদাস-এর ঘোর এখনও কাটেনি। কাটেনি যে, সেটা পনেরো-কুড়ি দিন পরে— লেখাটা যখন শেষ হলো তখনও টের পেয়েছে— এর আগে একটা লেখায় সে চণ্ডীদাস সম্পর্কে লিখেছিল: কী যে সরল হৃদয় ছিল মানুষটির। বিধাতায় শিশুর মতো বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল— নারীর প্রতিও... সেই বিশ্বাসেই যে আনন্দ গল্পটা শেষ করেছে তা-ও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার লেখার মধ্যে। আজও আনন্দ গল্পের শেষ কথাগুলো নিজের মনে আওড়ায়:

> যদি কোনো ভবিষ্যৎ জন্ম থাকে, এই নক্ষত্রেই ফিরে আসতে যদি হয় আবার, ইছামতীর পারে, কোনো একটা নিশুতি বটগাছের পাশে, গেরুয়া রঙের ইটের একখানা বাড়ির ভিতর বিনতাকে নিয়ে আমাকে একটা জীবন কাটিয়ে দিতে দিও বিধাতা।

আজ আনন্দ লেখাটা ফের পড়লো। তেমন কিছু হয়েছে ব'লে মনে হলো না। তবু একটা দীর্ঘশ্বাস জ'মে উঠলো বুকের মধ্যে। তাকে মুক্ত ক'রে এমনভাবে তাকিয়ে থাকলো যেন তার সামনে কেউ একজন দাঁড়িয়ে, তাকেই সে বললো, 'মানুষকে সবচেয়ে' বড় ব'লে আখ্যাত করেছো; ঠিকই আছে,— আমার কিন্তু অনেক সময় মনে হয় একটা শালিক কি একটা চড়াই অনেক মানুষের চেয়ে ঢের বড়—'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গারের মতো তেজ কাজ করে অন্তরের তলে—
যখন আকাঙ্ক্ষা এক বাতাসের মতো বয়ে আসে,
এই শক্তি আগুনের মতো তার জিভ তুলে জ্বলে!

প্রভার শরীর একটু ভালো হ'তে আবার পড়াশুনো শুরু করেছে। কলেজে যাচ্ছে। অনিয়মিত। মঞ্জু বেশিরভাগ সময় আনন্দর কাছে থাকছে। কত রকমের বায়না। সব মেটানো তার পক্ষে অসম্ভব। কখনও বিরক্ত হয়ে দু'-একটা কানমলা চড়— এ বিরক্তিটা যে ঠিক কার ওপর— বায়না পূরণ করতে না-পারার অক্ষমতা-জনিত গ্লানিতে নিজের ওপর, নাকি সত্যিসত্যিই মঞ্জুর অবিবেচকের মতো বায়না করার জন্য?

যা-ই হোক, মেঘ-থমথম মুখ ক'রে মঞ্জু তার ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে বিস্ময়ে। একটু সহানুভূতির ছোঁয়া পেলেই কেঁদে ফ্যালে ঝরঝর। তখনই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরা ছাড়া উপায় থাকে না। তারপর তাকে ভোলানোর জন্য এটা দেবো ওটা দেবো বলতে হয়। পৃথিবীটা কেবল দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। কী আশ্চর্যভাবে গ'ড়ে ওঠে— চাওয়ার মানুষটি, দেওয়ার মানুষটি— কী স্বাভাবিকভাবে আমরা চিনে ফেলি। আবার দেওয়া-নেওয়ার চুক্তি— এই যে বিবাহ, বিবাহের ফসল মঞ্জু। অযাচিত। অবাঞ্ছিত।

তবু আদরের। ভালোবাসার। আনন্দর মনে হয়েছে, এ পৃথিবীতে বাস্তবিক যদি কোনো ভালোবাসা থেকে থাকে, তা একটি মেয়ের বাপকে ভালোবাসা— আনন্দ যখন প্রভার সঙ্গে কথা চালাচালিতে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হয়ে একা মনমরা ব'সে থাকে, ওই একরত্তি মেয়ে তখন তার পাশে এসে দাঁড়ায়। গলা জড়িয়ে ধরে। কী যেন বলবে, ভেবে পায় না, কেবল 'ও বাবা, ও বাবা, বাবা'— ডাকতে থাকে। এখন কোলকাতায় যেতে গেলে বড্ড বেশি মনখারাপ হয়। ফিরে আসার সময়ও— তেমন কিছু আনতে পারে না মেয়েটার জন্য। এবার কোলকাতায় গেলে কিছু একটা না-ক'রে ফিরবে না— এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে গেলেও নানা কারণে ফিরতে হয়। কিন্তু মনে হয় সবগুলোই মেজর কারণ, এক এক জনের কাছে এক-একটা কারণ উত্থাপন করা— তাই নয় কি? শরীরের খিদে। সে-খিদে মিটবে না জেনেও আমি আসি। প্রস্তাব রাখি। খারিজ হই। এটা অবশ্যই মেজর কারণ।

কিন্তু মেসের রেলিঙে চড়ই দেখে মঞ্জুর মুখখানা যেই মনে পড়ে, তখনই-যে দেশে ফিরতে ইচ্ছে করে, এমন-কী কতদিন আলপথে হাঁটিনি— হাঁটার ইচ্ছেও আমাকে ফিরিয়ে আনে।

আবার যেতে হবে।

এর মধ্যে একটা নিস্তার আছে। মৃতদারের মতো বিবাহিত জীবন পালনের থেকে নিস্তার। কীভাবে-যে কামনা জাগে! কিছুতেই তাকে দমন করা যায় না। রুচি-বুদ্ধি-হৃদয়, মান-সম্মানবোধ সব ভুলে নিতান্ত মোহবশে কী-যে মায়াটান— এই এখন যেমন, কলেজ থেকে ফিরছে প্রভা। ঠিক যেন কিশোরীর মতো। ওই-যে তোরণপথে— মেঘভাঙা রোদ্দুরের আভা প্রভার চোখেমুখে— কেমন যেন একটা কামনা জাগাচ্ছে। এই জেগে ওঠা কামনাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু-একটু ক'রে বৃদ্ধি পাবে। আনন্দ অপেক্ষায় থাকবে, সুযোগ মতো নিবেদন করবে। প্রভা যথারীতি বাতিল করবে তাকে। তবু কাকুতিমিনতি। প্রভা বিরক্ত হবে। তখন নিজেকে কুকুর মনে হবে আনন্দর। কুত্তির পেছনে ভাদ্রমাসে ঘুরঘুর করতে থাকা সবচে' দুর্বল কুকুরের মতো, তবু বিবাহিত জীব হিসাবে দাবি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে প্রভা দু'হাত জোড় ক'রে বলবে, আমাকে দয়া করো— রেহাই দাও।

আনন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। ভগবান আর কিছু না-দিক— এত সেক্স-ডিজায়্যার দিয়েছেন আমাকে!

প্রভাও বলেছে, 'এত কামুক কেন তুমি?'

আনন্দ বলেছে, 'কামই তো জীবকে সুন্দর করে! তুমি দ্যাখোনি ভাদ্দরমাসের কুকুরদের? একটা নেড়িও কী সুন্দর হয়ে ওঠে, কী গুমোর তার!'

—'কিন্তু তোমাকে আমি একটুও সুন্দর দেখছি না!'

—'কিন্তু আমি তো দেখছি।'

—'কিন্তু আমি কামনা করছি না তো তোমাকে!'

—'তবু করছো তো কাউকে।'

একথার পর প্রভা কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আনন্দর মুখে তখন মিচকি হাসি। প্রভা তখন বিমূঢ় যেন। বিস্মিত। আনন্দ বলেছিল, 'তুমি হরিণ শিকারের গল্প শুনেছো?'

প্রভা বিস্ময়ের ঘোরে বিমূঢ়ভাবে মাথা নেড়েছিল।

—'শোনাবো একদিন— কাল তুমি ঋতুস্নান করেছো, না?'

প্রভার মুখ আরক্ত। দেখবার মতো জিনিস। উপভোগ করবার মতো। তবু আনন্দ তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

কিন্তু আজ প্রভা তার ঘরে এসেছে। ক'দিন কথা বন্ধ। প্রায় মুখ-দেখাদেখি নেই। মুখোমুখি হ'লে মুখ ঘুরিয়ে চ'লে যাওয়া তাদের নিয়তি। মান-অভিমান ভাঙানোর দায় আনন্দর। অনুকম্পা-বশত। কখনও মাংসের লোভে। যে-মেয়েটা একসময় কথায়-কথায় হাসতো, এখন সে ছিচকাঁদুনে। মা-বাবা নেই। আত্মীয়স্বজন সব দূরে-দূরে— এ বাড়ির সবাই তার পর যেন... কিন্তু এ-মেয়েটি তো এই বিশ্বপ্রকৃতিরই অংশ— একটা বিড়াল কাঁদলে যে দুঃখ, বেদনা বোধ অনুভূত হয়, তা তো এই মেয়েটিও দাবি করতে পারে— পারে, তাকে অস্বীকার কিংবা উপেক্ষা করতে পারে না আনন্দ, তা করলে যেন সে নিজের কাছেই ছোট হয়ে যায়। আনন্দ বললো, 'কিছু বলবে?'

প্রভা বসলো। কেমন এক দ্বিধা যেন।

তার মাথায় স্নেহের হাত রাখতে ইচ্ছে হলো আনন্দর। কিন্তু যদি ফোঁস ক'রে ওঠে!

—'কী হয়েছে?' ব'লে মাথায় হাত রাখলো আনন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমি জানি, তুমি আমাকে পেয়ে খুশি হওনি।' আচমকা ওই কথায় আনন্দ বোধবুদ্ধি সব যেন হারিয়ে ফেললো। কিছুদিন আগেও তার মনে হয়েছে তাদের বিয়েটা নষ্ট হয়ে গেছে, স্ক্র্যাপ; ঝগড়াঝাঁটি তার কোনোদিনই ভালো লাগার বিষয় ছিল না। প্রভা অবুঝের মতো কান্নাকাটি করেছে। ঝগড়া করেছে। দাবি জানিয়েছে। সেইসব দাবি সঙ্গত, স্বাভাবিক— কিন্তু তা পূরণ করার ক্ষমতা তার নেই। প্রভা আলাদাভাবে থাকতে চায়, তাতে তার পরাধীনতাবোধ নষ্ট হ'তে পারে। প্রভার আচরণ যে খাঁচাবদ্ধ পাখির মতো, সেটা আর কেউ না-বুঝলেও আনন্দ বোঝে। কিন্তু এখন ওই কথাটির উৎস কোথায় বুঝতে পারছে না।

—'আমি কবিতা বুঝিনে।' প্রভার কণ্ঠস্বর ভিজে-ভিজে, 'আমি তোমাকে বেঁধে রাখতে পারিনি।'

ভারি আশ্চর্য হলো আনন্দ। বললো, 'আমি তো কখনও তোমাকে উপেক্ষা করিনি। বরং আমাকে পেয়ে তুমিই খুশি হওনি— বুঝিয়েছো বারে বারে। আমি টাকা রোজগার করতে পারিনে। এ খোঁটা তো তুমি কতবার দিয়েছো। বাস্তবিক তা।'

—'তা কি শুধু আমার জন্য? তোমার মা-পিসিও তো কম বলেন না!'

—'তুমি কি আমার কাছে একটু সময়ের জন্য বসো!'

—'উপায় আছে? তাছাড়া তুমিও তো কবিতার খাতা নিয়ে মুখ গুঁজে থাকো। মা তোমাকে বিরক্ত করতে মানা করেছেন।'

—'কিন্তু আমি যখন তোমার কাছে যাই— তোমাকে যেন শীতে পেয়ে বসে!'

—'ভয়।'

—'মানে?'

—'যদি আবার বাচ্চা এসে যায়!'

—'আসলে আসবে।'

—'কী!' প্রভার চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, 'একটা মেয়েকে খেতে দেবার ক্ষমতা নেই— আরও একটা!' ব'লে প্রভা নিজের কপাল চাপড়ালো। চুপ ক'রে গেল একেবারে। তারপর উঠে চ'লে যাচ্ছিল। আনন্দ তার হাত ধ'রে টানলো।

—'ছাড়ো!'

—'কী যেন বলতে চেয়েছিলে তুমি!'

—'হ্যাঁ, কী যেন— ভুলে গেছি।'

আনন্দর হাত শিথিল হয়ে যাচ্ছে। প্রভা একটু জোর দিতেই খ'সে পড়লো হাতটা। তবু ভালো লাগছে আনন্দর। তিক্ত-রুক্ষ-হতাশ সম্পর্কের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য বসন্তবাতাস বয়ে গেল, জমাট অন্ধকারে আশাদীপের একটি দুর্বল শিখা— খুব ঝলমলে হয়ে উঠতে পারে।

হঠাৎ তার পারুলের কথা মনে পড়লো। সুধীর যেমন বলেছিল। নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপের জ্ব'লে ওঠার মতো পারুলের সেই আকাঙ্ক্ষা-কামনার শিখাটিতে সুধীর পতঙ্গের

মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পারুল জানতো, সে এই জীবন থেকে নিস্তার পেতে চলেছে— যাবার আগে একবার, শেষবার কামনাটিরে কামনা করেছিল বোধহয় হৃদয়ের সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে— প্রভার ব্যাপারটা কি তেমন কিছু? প্রভা মৃত্যুর কথা ভাবে। ভগবানের কাছে মৃত্যু কামনা করে। কেন তার মৃত্যু হচ্ছে না, তার জন্য অনুযোগ-বিলাপের অন্ত নেই। সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা হয়েছিল গতমাসে— তিন-চারদিন সে যেন নিভৃতে অনশনব্রত নিয়েছিল। ঘরের দরজা বন্ধ। যেন কারও মুখ দেখতে চাইছিল না। কেমন যেন ভূতগ্রস্ত। কখনও করুণ সুরে কান্না। কখনও একেবারে নিথর নিস্তব্ধ। কারও অনুনয়-বিনয় তার কানে যেন পৌঁছাচ্ছিল না। আনন্দর নিজেরই কেমন ম'রে যেতে ইচ্ছে করছিল। গল্পে-গল্পে তার মৃত্যু কামনা করেছে আনন্দ। কিন্তু বাস্তবে সে তার নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রভাকে নিস্তার দেবে— এমন একটা ভাবনাই সে গত কয়েক মাস আগে প্রায় একমাস ধ'রে লিখেছে, তার পরেও সে বেঁচে আছে— ভাগ্যিস বেঁচে আছি! সেই মেয়ের আজ এমন আচরণ— যেন ভালোবাসায় নিবিড় হ'তে হ'তে— তারই দোষে কিংবা এটাই স্বাভাবিক, পারুল যেমন শেষ মুহূর্তে তীব্র প্রতিরোধ তৈরি করেছিল। পারুল ম'রে গেছে। মৃত্যুবীজ ছড়িয়ে গেছে সুধীরের ফুসফুসে। ভালোবাসবার মতো একটা মন ছিল মেয়েটির। তব, কী এক অভিমানে, বাঁচার ইচ্ছে ছিল না তার। প্রভারও নেই যেন। এমনই মনে হয়েছে আনন্দর, কিন্তু প্রভারও আছে— আছে সেই মন— যে তার আভাস দিয়ে গেল। আনন্দ জানে, একবার যদি সে একটা চাকরি পেয়ে যায় প্রভা তাকে অনেক পরিপূর্ণতা দেবে।

কিংবা যে-কোনোভাবে টাকা রোজগার করতে পারলে। লাইফ ইন্সিওরেন্স-এর ব্যাপারটা আর-একবার ভেবে দেখলে হয়, ভেবেছে এর আগেও। উষারঞ্জনের কাছে না-গেলেও চলবে। কলেজের এক বন্ধুর সঙ্গে আনন্দর দেখা হয়েছিল। আনন্দ তাকে প্রথমে চিনতেই পারেনি। পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। সেই বন্ধুই তাকে তার পেছন থেকে জামা টেনে ধরেছে। স্যুটেড-বুটেড বন্ধুটিকে তার চিনতে অসুবিধে হচ্ছিল। নামটাও মনে পড়ছিল না। আসলে আনন্দ অবাক হয়েছিল অমন 'সাহেব' চেহারার কেউ তাকে আন্তরিকভাবে ডাকতে পারে ভেবে।

তারপর কথা হলো। আনন্দকে ভরসার কথা শোনালো সে। জীবনবিমার এজেন্ট হওয়ার পরামর্শ দিলো। উৎসাহ যোগাতে চাইলো নিজেকে দৃষ্টান্ত রেখে, 'এবছর প্রায় একলাখ টাকার পলিসি তৈরি হয়েছে— কমিশন ছ'হাজার প্রায়।'

আনন্দ হতবাক। মনে মনে হিসেব করেছিল, মাসে পাঁচশ! চোখ-দুটো বোধহয় তার একটু কপালে উঠেছিল। সে তার পোষাকআশাক, হাতের অ্যাটাচি-কেস আর মুখে আত্মবিশ্বাসের রঙ দেখে বলেছিল, 'আমি কি পারবো?'

—'না-পারার কিছু নেই। নেমে পড়তে হবে। দ্যাখো, যতক্ষণ না তুমি কোনো কাজে নেমে পড়ছো, ততক্ষণ তুমি জানো না তুমি কী পারো, আর কী পারো না। এই আমি, আমারও মনে হয়েছিল— প্রথম বছরে আমি কত আয় করেছিলাম জানো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কত?'

—'নয়শো।'

আনন্দ হিসেব ক'রে ফেললো, পঁচাত্তর টাকা পার্ মান্থ্। মাসে একশো টাকা আয় করতে পারলে যথেষ্ট।

সে যেন রাজি হয়ে গেছিল। তার যা-সব কর্তব্য-করণীয় সেসব বুঝে নিয়েছিল বন্ধুটির কাছ থেকে।

আনন্দ বুঝেছিল তার এই হোদকা মার্কা চেহারা আর মুখচোরা স্বভাব 'এজেণ্ট' হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয়— 'একটা মানুষকে প্রথমে ইম্প্রেস করতে হবে, তারপর তাকে কন্‌ভিন্স করাতে হবে— জীবনের রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে তার সাপেক্ষে আইডেনটিফাই ক'রে, জীবনের সুরক্ষা, জীবনকে সুরক্ষিত করা যে কত জরুরি তা তাকে বোঝাতে হবে—'

আনন্দ বলেছিল, 'আমি বোধহয় পারবো না।'

—'কেন?'

—'তোমাকে বলতেও দ্বিধা হচ্ছে। আসলে কী জানো, যার মধ্যে নিজের স্বার্থ আছে, সে-বিষয়ে কথা বলতে গেলে কীরকম একটা জড়তা এসে যায়।' বন্ধুটি কী-যেন ভেবেছিল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলেছিল, 'কবিতা লিখছো?'

—'না। পারছি না।'

—'তাহলে লেগে পড়ো।'

—'কবিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?'

—'সম্পর্কটা কবিতার সঙ্গে না— কবিতা তুমি পারতে, পারছো না। এটা বিষয়।'

—'বুঝলাম না।'

—'যা তুমি পারবে না ভাবছো, তা তুমি পারতে পারো।'

বন্ধুর যুক্তি দেখে চমৎকৃত হয়েছিল। আনন্দ ভেবেছিল, তার আবেগ যত— যুক্তিবোধ বোধহয় ততটাই কম।

—'কবি যখন, কল্পনার খামতি নেই আশা করি।'

আনন্দর মুখে তখন ঠোঁটচাপা হাসি।

—'কল্পনায় টাকাপয়সা আছে এমন কারও মুখোমুখি ব'সে, এল.আই. লিটারেচার মাফিক কথা বলা প্র্যাকটিস্ করো। হয়ে যাবে।' ব'লে সে তার অ্যাটাচি থেকে একগুচ্ছ কাগজ দিয়েছিল।

আনন্দ সেই কাগজগুলো নিয়ে বসলো আবার।

এই যন্ত্রসভ্যতা যত ডেভেলপ করছে, আমাদের জীবনের নিরাপত্তা তত কমছে। অ্যাক্সিডেন্ট, মৃত্যুর কথা কিছুই বলা যায় না— কিন্তু আমার মৃত্যুতে আমার সন্তান-স্ত্রী, এমন-কী আমার মা-বাবা কী নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে পড়তে পারে!

জীবনবিমা— এইখানে জীবনকে সুরক্ষা দেয়। প্রত্যেক দায়িত্বশীল নাগরিককে জীবনবিমার আওতায় নিয়ে আসার কথা ভাবছে সরকার।

কিন্তু গেট্‌আপটা যে পাল্টাতে হবে। জীবনের এই পলিসি তো বিদেশি— ইংলিশ স্টাইলে জীবনকে সুরক্ষিত করা। অতএব, তোমাকেও লাইফ্‌স্টাইলটা বদলাতে হবে। সবার আগে দরকার স্যুট, অ্যাটাচি-কেস, বুট। কিন্তু টাকা কোথায়?

আনন্দর সমস্ত পরিকল্পনা আগের মতো ভেস্তে যাচ্ছে।

যাক। এই 'সময়' আমাকে ফের দালাল বানাতে চাইছে। স্বদেশ থেকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছে, পারেনি; এই 'সময়' আমাকে দিয়ে বলাতে চেয়েছে: শাসকের শিল্পরীতিতে সভ্যতার শীর্ষবিন্দু! এই 'সময়' প্রবল বিকর্ষণে আমাকে যেন কোথায় নিক্ষিপ্ত করতে চাইছে, যেন প্রবল ঘূর্ণির মধ্যে—

আনন্দর মনে পড়লো, কয়েকদিন আগে সে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছিল, দুঃস্বপ্ন— এক-এক ক'রে তীব্র ঘূর্ণিপাকে ডুবে যাচ্ছে নৌকা— আর অসহায় দেখছে সে...

আমি চাঁদ সদাগরের মতো কেউ?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বানন্দ ভবনের সকলের অনুকম্পায় আনন্দর এই কর্মহীন বেঁচে থাকা অর্থহীন; একটা শুয়োরের মতো এই বেঁচে থাকা, মাংসের ফলনের নিয়মে; তবু, কোনো দাম নেই শুয়োরের মতো। অবসাদ আর গ্লানির মধ্যে তবু সে প'ড়ে আছে নির্জীব। কারও কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই যেন। কেবল প্রভা মাঝেমধ্যে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে, 'তুমি আমার জীবনটাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছো।' আত্মপক্ষ সমর্থনে আনন্দর কোনো কথা নেই। তবু বলতে ইচ্ছে করে— আমরা সময়ের শিকার। বলা হয়নি। আর কখনও বলা হবে ব'লেও মনে হয় না। প্রভাও কেমন যেন পোষ মানিয়ে নেওয়া কোনো জন্তুর মতো। খাঁচায় আটকে পড়া পাখি যেমন শিক কাটার ব্যর্থ চেষ্টার পর কেমন এক অবসাদে ঘাড় গুঁজে প'ড়ে থাকে বিষণ্ণ, প্রভাও তেমন যেন; সে মেনে নিয়েছে এ-ই ভবিতব্য, আর আনন্দর প্রতি কেমন প্রসন্ন হয়ে উঠছে, হয়তো তার নিজের প্রতিও। অনেক বেশি সহমর্মি হয়ে উঠছে যেন, আন্তরিক। অথবা, সবকিছু নিয়তির নিয়ন্ত্রণে— এই উপলব্ধি হয়েছে তার। সে যেন আর কোনোদিন বলতে পারবে না— তুমি আমার জীবনটা নষ্ট ক'রে দিয়েছো।— একথা আর শুনবে না ভেবে আরও গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে জীবনটা— এই উপলব্ধি আনন্দকে বিমর্ষ ক'রে তুলছিল। নিজেকে গালাগাল করলো, শালা শুয়োরের অধম। আর তখনই প্রভা ঘরে ঢুকলো। একটু আগে সে কলেজ থেকে ফিরেছে। বসলো। বললো, 'আমাদের কলেজ থেকে একজন অধ্যাপক চ'লে যাচ্ছেন।'

—'কে?'

—'এম. কে. জি.।'

—'আমি কি আর সবার নাম জানি— পুরো নাম বলো।'

—'মন্মথ কুমার ঘোষ।'

—'ইংরেজি পড়ায় তো তোমাদের?'

—'হ্যাঁ। সেইজন্যই তো বলছি তোমাকে।'

অনেক নিপীড়ন, অনেক বিতৃষ্ণার মধ্যেও মাঝেমধ্যে এমন মুগ্ধ করে মেয়েটা, এমন বিমূঢ় করে। একটা রূপালি রেখা যেন দেখতে পাচ্ছে আনন্দ। একটা প্লট, যেন গল্পের জমি জেগে উঠছে, ঘরবাড়ি,... যে গল্প— ঔপন্যাসিক বিস্তার পাবে। রক্তেমাংসে ফের জেগে উঠবে আহ্লাদ, আমোদ। আনন্দ বললো, 'মন্মথ আমার ক্লাসমেট ছিল। কোথায় যাচ্ছে? শুনলে কিছু?'

—'হ্যাঁ। দিল্লির কোন্ কলেজে যেন।'

—'তাহলে রামযশেই যাচ্ছে।'

—'তুমি কি একটু খোঁজ নেবে? বাবাকে বলবো?'

আনন্দ অন্যমনস্ক মাথা কাত্ করলো।

ব্রজমোহন কলেজের পরিচালনভার সরকার-নিয়ন্ত্রিত। অক্সফোর্ড মিশনের প্রভাব রয়েছে তার ওপর। বাবার সঙ্গে মিশনের যোগসূত্র ছিঁড়ে যায়নি এখনও। তবে বেশ নরম হয়ে গেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাবা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তখন তিনি ব্রজমোহন স্কুলের সহকারী প্রধান, অশ্বিনী দত্ত স্কুলটাকে জাতীয় স্কুলে পরিণত করালেন— কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকের মত ছিল না তাতে, ওই অধিকাংশের মধ্যে ছিলেন সত্যানন্দ। তখনই তৈরি হয়েছিল মডেল স্কুল, তাঁর উপর ছিল প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার। অক্সফোর্ড মিশন যদি তার ফেভারে থাকে আর মন্মথ যদি তার জন্য একটু সুপারিশ করে— হয়ে যেতে পারে।

আনন্দ খুব উদ্যমী হয়ে উঠলো।...

—মন্মথ, শুনলাম তুমি বি.এম. ছাড়ছো?

—ঠিক শুনেছো।

—তুমি কি আমাকে একটু উপকার করতে পারো?

—বলো!

—তুমি বোধহয় জানো— পাঁচ বছর আমি বেকার ব'সে আছি। যে-কোনো কারণেই হোক, যা-কিছু একটা করার মতো মানসিকতা আমি হারিয়ে ফেলেছি, এমন-কী দেশ ছেড়ে কোথাও যেতেও ইচ্ছে করে না। তুমি যদি আমার হয়ে একটু বলো, ব্রজমোহনে পড়ানোর কাজটা পেলে, আমার খুব উপকার হয়! প্লীজ!

মন্মথ আনন্দর মুখের দিকে চেয়ে থেকে কী বুঝলো, কী-ই-বা ভাবলো, বিহ্বল আনন্দ ঠিক আন্দাজ করতে পারলো না। কিন্তু সে শুনলো, 'ট্রাই টু মাই লেভেল বেস্ট।'

—'থ্যাঙ্কয়ু!'

ফেরার পথে নিজেকে খুব তারিফ করলো আনন্দ, 'এই তো পারো! বাঃ! বেশ পারো!' বাড়ি ফিরে প্রভাকে বললো, 'মন্মথের সঙ্গে কথা হলো।'

—'কী বললেন উনি?'

—'সময়মতো অ্যাপ্লাই করতে বললো। যাতে হয়— সে-ব্যবস্থা করবে ব'লে মনে হলো।'

—'মা, মাগো! মুখ তুলে চাও মা!'

—'কোন্ মা?'

—'মা কালী!'

প্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আনন্দ ভাবলো, বাবা শুনে বলবেন, সবই ব্রহ্মের ইচ্ছা।

—'কী ভাবছো?'

—'কালীর রূপ— রূপের মধ্যেই কেমন এক মোহিনীশক্তি আছে, না? অনেকদিন আগে আমার এরকম মনে হয়েছিল।'

—'তুমি হিঁদু হয়ে যাচ্ছো নাকি?'

—'কী জানি! তবে ধর্ম আমাকে খুব ফাঁসিয়েছে।' একটু থেমে বললো, 'কালী আর কৃষ্ণের মধ্যে অনুপ্রাণিত হবার মতো একটা ব্যাপার আছে— সংহার!'

পলকের জন্য প্রভা তার স্বামীকে কেমন অচেনা দেখলো। আর চকিতে মনে পড়লো, একটা মুখ, স্বাধীনতার জন্য নিবেদিতপ্রাণ সেই যুবকের চোখের দীপ্তি যেন আনন্দর চোখে দেখলো সে, চোয়ালের পেশিতে তেমনই প্রত্যয়...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোকিল কুকুর জ্যোৎস্না ধুলো হয়ে গেছে কত ভেসে।
মরণের হাত ধ'রে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে?

জীবন তাহলে শেষপর্যন্ত স্থিরতা পেলো! এই সফলতাটুকু চেয়েছিল প্রভা। রৌদ্রদগ্ধ চন্দ্রমল্লিকা যেন ফের হিমের পরশ পেয়েছে। মেলে ধরছে নিজেকে। তার কণ্ঠে গান ফিরে আসছে আবার! গানের খাতা নিয়ে বসছে। কথার মধ্যে গানের অনুষঙ্গ এসে পড়ছে। মাঝে একদিন প্রভা জানতে চাইলো 'মনে আছে তোমার— ফুলশয্যার রাতে তুমি একটা গান শুনতে চেয়েছিলে?'

আনন্দ বললো, 'ওটা কি ভুলে যাবার বিষয় যে মনে থাকবে না?'

—'জানো, আমি কতবার ভেবেছি— অমন দিনে তুমি ওই গান কেন শুনতে চেয়েছিলে!'

—'কেন?'

—'কোনো উত্তর পাইনি। কেন বলো তো!'

আনন্দ তখন মুখ টিপে হাসছিল।

—'বলো না!'

—'কী বলবো?'

চোখেমুখে যৌনতার আভা ছড়িয়ে প্রভা বললো, 'প্রথম দিনেই জীবন মরণের সীমানা ছাড়াতে চেয়েছিলে কেন?' প্রভার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে আনন্দ বললো, 'আচ্ছা, এই লাইন-দুটোর অর্থ বলো তো!— আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া/তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া।'

প্রভা চুপ ক'রে, যেন ভাবছে— এমন ভঙ্গিটা যত ভেঙে যাচ্ছিল তত আনন্দর রক্তপ্রবাহে ছড়িয়ে পড়া প্রভার চোখ-মুখের সেই আভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, একটা দীর্ঘশ্বাস জমছিল, সে আস্তে-আস্তে বললো, 'জীবনের আরম্ভে, শুভ আরম্ভেই তো এ গান গাওয়া উচিত এবং শোনাও উচিত।' প্রভার ম্লান মুখখানা লক্ষ ক'রে সে ফের বললো, 'আমাদের সৌভাগ্য— তুমি গেয়েছো— আমি শুনেছি।'

—'তব, আমাদের জীবনে যেন দুর্ভিক্ষ লেগেছিল— তোমাকে কত কুকথা বলেছি।'

—'জীবনপ্রণালী এমনই— মনে রেখো না। যদি ভুলতে না-পারো, ভেবো— তার মধ্যেও সমবেদনা ছিল। ছিল না?'

—'ছিল নাকি? কী জানি!'

—'ছিল— আমার মুখ দেখে তবুও তো তোমার দুঃখ হতো, সে-দুঃখ এত খাঁটি, এত তীব্র ছিল...' আনন্দ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো, তার মনে পড়ছিল,— প্রভার সেই কথাটা একটা উপন্যাসে সে এভাবে লিখেছে: এই যে তুমি অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো,

তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখ করে আমার— এ কোনো বানানো দুঃখ নয়; বুঝবার ভুল নয়; খাঁটি জিনিস। তুমি ম'রে গেলে কপালের সিঁদুর মুছবার নিয়ম আমার, বিধবার থান পরতে হবে— তাতে যত-না দুঃখ হবে, তুমি বেঁচে থাকতে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে এক এক সময় তার চেয়ে ঢের বেশি বিচ্ছেদ ও কষ্ট অনুভব করি—

—'কী ভাবছো?'

—'ভাবছি সমস্ত বেদনার আড়ালে প্রেম তো রয়েছে তবু কোথাও। হৃদয়ে। ছিল ব'লেই তো তুমি একদিন বললে, আমার রোগা শরীর তোমার ভালো লাগে না। আমার মধ্যে কোনো কবিতা নেই। —জানো প্রভা, সেদিন আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। তুমি কবিতার কথা ভাবছো!'

—'বলেছিলাম নাকি? কৈ, মনে পড়ছে না তো!'

—'না-পড়াই ভালো!' আনন্দ ফের অন্যমনস্ক, সে উপন্যাসে লিখেছে:

> —করবীর করুণ একখানা শাখার পুষ্পিত রূপ— তা নিয়ে কবিতা লেখা যায়, ছবি আঁকা যায়— আটপৌরে জীবন কি চলে?
>
> —ব্যথা দিতে ভালো লাগে তোমার?
>
> —কবিত্ব ও শিল্পের দিক দিয়ে ঠাট্টার জিনিস তুমি নও।

আনন্দ বললো, 'প্রভা, তোমার কি এখনও মাঝেমধ্যে মনে হয়— কোথায় হারিয়ে গেছ তুমি?'

প্রভা একটু অন্যমনস্ক থেকে মাথা নাড়লো। এবং একইসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

স্টাফ রুমে ব'সে এসব ভাবছিল আনন্দ। ভাবছিল— চাকরি পেলে প্রভা-যে তাকে পরিপূর্ণতা দেবে— এই ভাবনার মধ্যে একটু ভুল ছিল— প্রভা এখন ভয়-মুক্ত, তবু— কোথায় যেন অতৃপ্তি রয়েছে, একটা সার্থক সঙ্গমের পরও, স্বমেহনে যেমন অবসাদ, তেমন এক অনুভব আনন্দকে বিনিদ্র রাখে। পরের দিন ঘুম ভাঙতে দেরি হয়। অদ্ভুত এক ক্লান্তি তাকে পেয়ে বসে। মনে হয়, কোথায় যেন একটু খামতি থেকে যাচ্ছে, সম্পন্ন হওয়া যাচ্ছে না ঠিকমতো। স্থিরতার অন্তরালে এক ধরনের আলোড়ন। তাকে আবার আগের মতো ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এক-একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না। আগের মতো আনন্দ ছোট্ট এই শহরটার চৌহদ্দি পেরিয়ে মাঠে-প্রান্তরে হেঁটে বেড়ায়, কখনও ছুটির দিনে কোথায় কোথায় তার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। এক এক সময় মনে হয় অনন্তকাল ধ'রে সে হাঁটছে— ইতিহাসের জনপদে প্রাসাদ-দুর্গ, মঠ-মন্দির, বিহার-স্তূপের মধ্য দিয়ে, স্তম্ভ-শিলালিপির সামনে সে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায়...

আনন্দ ভাবছিল, আশ্চর্য! বছর-দেড়েক আগে, বেঁচে থাকার দু'টি রসদ— অর্থ আর প্রেম যখন তার জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, বেঁচে থাকার ইচ্ছে তলানিতে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠেকেছে, তখন এভাবে হাঁটতে-হাঁটতে রোদ্দুরের রঙে সে অনুভব করতো স্বপ্নের গন্ধ, পাকা ধানিলঙ্কার মতো লাল ফড়িং তাকে শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে, পঁয়ত্রিশ বছরের এক আধবুড়ো লোক একটা ফড়িং ধরার প্রয়াস চালাচ্ছে— দেখবার মতো দৃশ্য হয়েছে... ঘাস লতাপাতা ফুল, কীটপতঙ্গ, পাখি— সবাই এক-একটা দৃশ্য হয়ে জীবনের দুঃখ-বেদনা অনিবার্যতার মধ্যেও যে অনাবিল আনন্দের আয়োজন আছে, তা-ই যেন দেখাতে চাইতো তাকে। কতদিন শস্যশূন্য মাঠের মধ্যে একা ব'সে থাকতে-থাকতে আনন্দ শুনতে পেয়েছে অশ্বখুরের শব্দ— স্পষ্ট দেখেছে কুয়াশামাখা অশ্বারোহীরা জকির মতো অশ্ব ছোটাচ্ছে, তাদের পুচ্ছে গতির আবর্ত...

কলেজ থেকে বেরিয়ে আনন্দ হাঁটছিল। এক সময়ে বনিদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার মনে হলো, একবার ওইসব গাছপালার ভিতর দিয়ে হেঁটে আসে। এসব মনে হওয়া যেমন মনেই থেকে যায়, তেমনই থাকলো। কেবল কার্তিক মাসের আকাশের এই নীল দেখে তার মনে হলো, এমন তো ঘটতে পারতো, বনির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল... কেমন উদাস চেয়ে থাকলো আকাশের দিকে, পাখিদের ঘরে ফেরার সময় এখন, একটা চিল তবু দিনশেষের রোদ মেখে ভেসে আছে দূর আকাশে। আর তারপর আনন্দর চোখের সামনে কেবলই দৃশ্যের জন্ম হ'তে থাকে— চিলের নেমে আসা, দু'-একটা নক্ষত্রের জ্ব'লে ওঠা, দিগন্তে যেন কোন্ জন্মের চাঁদ জাগে ঝাউ-অশ্বত্থের আড়ালে...

একটা শেয়াল ডেকে ওঠে কোথাও, আরও একটা, আরও... এ ডাক কি মঞ্জু শুনতে পাচ্ছে কিংবা তাদের বাড়ির সামনে ওই মাঠ-ঝোপজঙ্গল থেকেও তো ডেকে উঠতে পারে শেয়ালেরা— মঞ্জু ভয় পাচ্ছে কিংবা পাবে, আর সে একটা নিরাপদ কোল খুঁজবে, সবাই ব্যস্ত... কীভাবে যে এই ভয়টা তার মধ্যে ঢুকে পড়লো— সে হয়তো আমাকে খুঁজছে।

আনন্দ ফেরার পথ ধরলো।

বাড়ি ফিরতেই প্রভা কর্কশ ব'লে উঠলো, 'কোথায় থাকো! আবার কি তাসের আড্ডায় যেতে শুরু করেছো?'

—'না। এই একটু সন্ধেবেলা ঘুরতে ইচ্ছে হলো।'

—'তোমার ক্লাস সম্ভবত সন্ধে পর্যন্ত ছিল না।'

আনন্দ চুপ ক'রে থাকলো।

—'খুকি বড় হচ্ছে। ওকে নিয়ে তো একটু বসতে পারো।'

—'কিন্তু ওর এখন শঙ্খমালা-কাঞ্চনমালা, শুয়োরানি-দুয়োরানির গল্প শোনার বয়েস— আমি তেমন গল্প জানিনে।'

বাবার গলা পেয়ে কখন মঞ্জু তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। —'বাবা তুমি ছড়া বলো।'

আনন্দ মেয়েকে কোলে তুলে নিলো। তারপর তার চোখে পড়লো এক ঝাঁক জোনাকির

জ্বলা-নেভা— সে মঞ্জুকে দেখালো ওই অপরূপ দৃশ্য কিন্তু মঞ্জু ভয়ে ভয়ে বললো, 'বাবা, ওগুলো তো শেয়ালের চোখ!'

—'কে বলেছে?'

—'মা।'

—'অন্ধকার তো, মা তাই দেখতে পায়নি। ওগুলো আলোমাছি। দাঁড়া।'

কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে আনন্দ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ফিরে এলো। মঞ্জুর সামনে হাত মেলে ধরলো। হাতের তালুতে জ্বলছে-নিভছে আলো। অন্ধকারেও তার বিস্মিত মুখখানা দেখতে পাচ্ছে আনন্দ। জ্বলতে-নিভতে থাকা জোনাকিটা আনন্দর হাত বেয়ে উঠে আসতে-আসতে উড়ে গেল— আর তার আলোপথ-বরাবর বাপ-বেটি দু'জনেই তাকিয়ে থাকলো, যেন অপার বিস্ময়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সকল ইচ্ছা প্রার্থনার ভাষার মতন
প্রেমিকের হৃদয়ের গানের মতন কেঁপে উঠে
তোমার প্রাণের কাছে একদিন পেয়েছে কখন।

—'কী করছো?'

কথাটার মধ্যে কথা-আরম্ভের ইশারা ছাড়া আর কোনো গভীর বার্তা আছে ব'লে আনন্দর মনে হলো না। কিন্তু প্রভার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে যা তাকে মুগ্ধ করলো। ইদানিং ছোট-ছোট নানা ঘটনায় আনন্দ মুগ্ধ হচ্ছে খুব। ছোট-ছোট দু'-একটা সাধ পূর্ণ হ'লে জীবন কেমন নরম হয়ে আসে! আনন্দ বললো, 'এই তো— কিছু পুরনো কবিতা দেখছি।' মুখ তুলে তার দিকে তাকাতেই আনন্দ দেখলো ঘরের বাতাসে ঘূর্ণি তুলে প্রভা চ'লে যাচ্ছে। ভাবখানা এমন— কবিতা দেখছো, দ্যাখো! আমি চললাম। প্রভার সঙ্গে কবিতার কোনো বিরোধ নেই। কবিতার সঙ্গে প্রভার ভাবও নেই। কবিতার সঙ্গে আনন্দর সম্পর্ক যে ঠিক কী, তা বোধহয় প্রভা বোঝেনি, বুঝলে অন্তত তার লেখার সময় মঞ্জুকে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে যেতো না। ওই ব্যাপারটা মাঝেমধ্যে ঘটতে থাকায় একদিন কুসুমকুমারী প্রভাকে বলেছিলেন, 'লেখার সময় মিলুকে কিছু বোলো না— সবটাই পণ্ড হয়ে যাবে।' প্রভাও খেয়াল ক'রে দেখেছে, লেখার বাইরে আনন্দকে দিয়ে অনেক কাজই করানো যায়।

তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে। রবিঠাকুর আনন্দর কবিতার প্রশংসা করেছেন। তার কবিতাকে তিনি 'চিত্ররূপময়' আখ্যা দিয়েছেন। প্রায় পাঁচ বছর পর তার কবিতা ছাপা হয়েছে— সব মিলিয়ে সর্বানন্দ ভবনে বিষয়টি আলোচনার বিষয় হয়েছিল। 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাটি প্রভা পড়েওছে। কী বুঝেছে কে জানে! পড়া শেষ হবার পর-পরই আনন্দ বলেছিল, 'পৌষের সন্ধ্যায়, একদিন, নির্জন খড়ের মাঠে আমি আর তুমি— হাঁটবো।'

প্রভা কথার পিঠে কোনো কথা বলেনি। পত্রিকার ওপর আরও একবার চোখ রেখে, পরে সে বলেছিল, 'বটের লাল লাল ফল, দারুণ দেখতে, না?'

আনন্দ সায় দিয়েছিল চোখের ভাষায়। তখন প্রভাকে দেখে তার মনে হচ্ছিল প্রভা যেন কবিতায় বিবৃত নিবিড় বটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এইসব অনুষঙ্গে, প্রভা যদি কবিতার খাতাটা দেখার ভঙ্গিতে একটু ঝুঁকে পড়তো— ভালো লাগতো আনন্দর। কিন্তু তা হয়নি ব'লে-যে খারাপ লাগছে, তা কিন্তু নয়। তবে তার চ'লে যাওয়ার মধ্যে কোথাও বিক্ষোভ নেহ, ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব'লে মনেও হয়নি— এটাই আনন্দর কাছে স্বস্তির বিষয়। আনন্দ আবার কবিতায় ফিরে গেল।

'ঝরাপালক' প্রকাশের বছর-দুই পর— এই কবিতাগুলো নিয়ে একটা বই প্রকাশ করার ইচ্ছে হয়েছিল আনন্দর। তার মনে হয়েছিল এই কবিতাগুলো একত্রে বনি যদি পড়ে, তবে সে বুঝবে তাকে হারিয়ে আনন্দ কতখানি বিষণ্ণ, তার হৃৎপিণ্ড কত দগ্ধ, এবং সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইছে শুশ্রূষা; আর কারও কাছে নয়— কেবল বনির কাছে। কিন্তু আনন্দর যখনই মনে পড়েছে— অন্তত দু'টি কবিতা সে বনিকে পড়িয়েছিল, পড়ার পর বনির সেই নিরাবেগ নিশ্চুপ থাকা মুখখানা সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে; আর তখনই বই প্রকাশের ইচ্ছেটাকে সে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। রেখেছিল।

কিন্তু কিছুদিন আগে, কবিতার প্রতি যখন তার আস্থা ও আবেগ ফিরে আসতে শুরু করেছে, তখন— একদিন কবিতার খাতাখানা নিয়ে বসেছিল আনন্দ; কবিতাগুলো ধূসরতর হয়ে গেছে— তবুও প্রাণে যেন খামতি নেই কোথাও, বরং সাম্প্রতিক রচনার চেয়ে অনেক বেশি প্রাণবন্ত। তার মনে হয়েছে— এ কবিতাগুলো তাকে খ্যাতি দেবে। আর মনে মনে সে বনির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছে। এখনও হৃদয়ের কোনো গভীর অনুভবের কথা লিখবার সময় কিংবা পড়বার সময় বনিকে মনে পড়ে। লিখবার সময় আজও মনে হয়— এসব কথা বনিকে উদ্দেশ ক'রে নিবেদিত হচ্ছে। তবু বিস্ময়— আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'জীবনের স্বাদ নিয়ে তুমি বেঁচে আছো, তবুও মৃত্যুর ব্যথা দিতে পারো—' তুমি!

না। এভাবে তুমি তাকে দোষ দিতে পারো না! সময়। তুমি আর প্রভা যেমন সময়ের শিকার, তেমনই— বনিকে লক্ষ ক'রে তুমিই তো লিখেছো: আমার নিকট থেকে তোমাকে নিয়েছে কেটে কখন সময়!

বমি উগরে দেবার একটা আওয়াজ যেন কানে এসে লাগলো। আনন্দ কান পাতলো। কেউ বমি করছে। কে? মা? সুচরিতা? হ'তে পারে প্রভা। ব্যাপারটাকে আমল না-দিয়ে ফের কবিতার মধ্যে ডুবে গেছিল সে।

ঘরের মধ্যে কার যেন ছায়া। প্রভা। আনন্দ জিগ্যেস করলো, 'কে যেন বমি করছিল?'

—'আমি।'

অকৃত্রিম উদ্বেগ উঠে এলো কণ্ঠস্বরে, 'কেন?' পরক্ষণেই প্রভার মুখে সলজ্জ হাসির আভা লক্ষ ক'রে আনন্দ বেবোধের মতো তাকিয়ে থাকলো। কিন্তু খুব দ্রুত সে প্রভাকে পড়তে পারলো। হাত বাড়িয়ে কাছে টানলো তাকে। যেন একটু এলিয়ে পড়লো প্রভা।

—'বাঃ!'

—'কী?'

আনন্দ তার ডান হাতটা রাখলো গর্ভপ্রদেশে। বললো, 'এই গর্ভ। তুমি ভাবো প্রভা, পাঁচ-পাঁচটা বছর এই প্রাণকে আমরা অপেক্ষায় রেখেছিলাম।'

—'অপেক্ষায় রেখে তার ভালোই করেছি। খুকির মতো অন্তত অপুষ্টিতে ভুগতে হবে না।'

—'জানো তো প্রভা— এই কবিতাগুলোও আট-দশ বছর অপেক্ষা করছে—'

—'কেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনন্দ বললো, 'বই হবে ব'লে—।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর সে প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বাইরের দিকে তাকালো, একটা জিনিস সে আজই আবিষ্কার করেছে, সেই আনন্দটুকু প্রভার সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে চাইলো। বললো, 'অপেক্ষা শুধু— যে আসছে, তার নয়, কিংবা কবিতার; আরও একটা অপেক্ষা ছিল।' ব'লে সে প্রভার মুখের দিকে দৃষ্টি ফেরালো।

—'কী বলছো— আমি বুঝতে পারছি না!'

—'কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকাও।'

প্রভা তাকালো। সবুজ পাতায় ঘেরা একথোকা কুঁড়ির মধ্যে ফুটি-ফুটি করছে একটা কুঁড়ি, লাল আভা ঠিকরোচ্ছে। আনন্দ বললো, 'অবশেষে কৃষ্ণচূড়া ফুটলো।' কিন্তু কোনো উচ্ছ্বাস বা মুগ্ধতার আভাস প্রভার দিক থেকে লক্ষ না-ক'রে আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'মাই ইন্‌টেন্‌স্‌ ডিজায়্যার টু মেক দীজ ব্লস্যামিঙস্‌ রিমেইন ইট্যার্ন্যাল।'

তখন মধ্যরাত গড়িয়ে যাচ্ছে, কবিতা বাছাইয়ের কাজ আপাত স্থগিত। ঘাড় টনটন করছে। উঠোনে এসে দাঁড়ালো সে। জোনাকির আলো ঝিঁঝির ডাক আর মাধবীফুলের গন্ধ- মাখা হাওয়ার স্পর্শে এই পৃথিবীর বীজক্ষেতে আনন্দ নিজেকে খুব সম্পন্ন চাষা ব'লে মনে করলো— এ পৃথিবীর বীজক্ষেতে আরও একজন আসছে— কৃষ্ণচূড়ায় বীজের আয়োজন... অন্ধকার মাখা গাছটার দিকে তাকালো, একটা ভাবনা এলো— আবারও সে বিড়বিড় করলো, 'মাই ইন্‌টেন্‌স্‌ ডিজায়্যার...' ফিরে এলো ঘরে। বাক্স থেকে তার ব্যক্তিগত নোট রাখার খাতা বের করলো। লিখলো: এক-একটা গাছের পিছনে মানুষের জীবনের কত যে patience & waiting-এর ইতিহাস... অবশেষে কৃষ্ণচূড়া ফুটলো... my intense desire to make these blossomings remain eternal... why alas should they fade so quickly the grass strewn with red dead leaves...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ— গভীর— গভীর।

সতেরোটি কবিতা বাছাই হয়েছে। গ্রন্থিত হবে। কাজও শুরু হয়েছে। কোলকাতায়। এবার তদারকি করছে বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব আনন্দর কবিতার ভক্ত পাঠক। পরিপোষকও বটে— তার সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় এখনও পর্যন্ত আনন্দ মেজর পোয়েট। কিন্তু বইটার নামকরণের ব্যাপারে বুদ্ধদেবের সঙ্গে একমত হ'তে পারছে না আনন্দ। তার প্রস্তাবিত 'পাণ্ডুলিপি' গভীর তাৎপর্যের বাহক, ঠিকহ; কিন্তু সবটা যেন তাতে ধরা পড়ছে না। যদি এমন হয়— লিখতে-লিখতে ভুল হয়ে যাওয়া কোনো উপন্যাসের পরিচ্ছেদ, যা প্রসঙ্গ হারিয়েছে, সংলগ্ন হওয়ার মতো কোনো পরিসর নেই যার, তবু বুনট-বয়নে দেখবার মতো জিনিস, দেখাবার মতো— চমৎকৃত হওয়া যায়, তবুও প'ড়ে থাকে অবহেলায়, বিবর্ণ হ'তে থাকে, ধুলো জমে— ধুলো, কখনও-কখনও ধুলো ঝেড়ে তার ওপর চোখ বুলানো।— এর মধ্যে একটা গল্পের আভাস আছে। ধূসর একটা জগৎ যেন— আনন্দর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। নাম-রূপ— প্রচ্ছদ, মলাটের আড়ালে আর-এক সত্য— আর-এক নয়, একই— অন্তত নাম-রূপ যেন ভেতরের সত্তার আভাস হয়। প্রচ্ছদের একটা রঙ ভেসে উঠছে আনন্দর চোখের সামনে...

বুদ্ধদেবকে একটা চিঠি লেখার কথা ভাবলো আনন্দ। খুব স্পষ্টভাবে জানাতে হবে— 'পাণ্ডুলিপি'র আগে একটা শব্দ বসবে। 'ধূসর'। আর প্রথম কবিতা হবে... বনির মুখটা যেন মনে পড়লো। তাকে উদ্দেশ ক'রে বললো, 'আমারে করেছো তুমি অসহিষ্ণু, ব্যর্থ— চমৎকার।'— এই বাস্তব, বাস্তব তবু স্বপ্ন রয়েছে— অন্তত কিছু-কিছু দৃশ্যে স্বপ্ন জেগে ওঠে, যদিও তা কবিতার পৃথিবী নয়, রূঢ় বাস্তবহ, একটু অন্যরকম—

শ্রাবণের মেঘের মতো গর্ভভারে নুয়ে-পড়া প্রভাকে দেখে আনন্দর মনে অন্য একটা ভাবনা এলো— যে সন্তান জন্ম নেবে, মেয়ে হ'লে তার নাম হবে শ্যামা আর যদি ছেলে হয়— অনেকদিন আগে নিজেকে ফিরে দেখার সেই সময়ে একটি ছোট্ট ছেলের বড় হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে কোথায় যেন আনন্দ লিখেছিল— তার লাল টুকটুকে পা ক্রমে কাঁটা ফুটিয়ে নেবার উপযুক্ত হয়ে উঠবে— যেমন লিখেছিল তেমনই যেন কোনো এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্র ভেসে উঠলো আনন্দর চোখের সামনে, সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ট্রেঞ্চের ভিতর ছুটে বেড়াচ্ছে সেই দুটো পা— যদি ছেলে হয় তার নাম রাখবে সমর। সমরের সঙ্গে ব্রাহ্ম রীতিতে যুক্ত হবে আনন্দ— সমরানন্দ। মঞ্জুশ্রীতে অহিংসা বিষয়ক যে রোমাণ্টিকতা ছিল তার ফলনের কোনো লক্ষণ আনন্দর চারপাশে কোথাও যেন নেই। টিকে থাকার পক্ষে যুদ্ধের অনিবার্যতা কেমন যেন বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে— সবাই যেন বলছে, এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। এমন-কী আনন্দও তার পক্ষে যুক্তি সাজাতে নিজেকে বলে: তুমি তো দেখেছো ভোরের দোয়েল, জামরুল কিংবা ডুমুরপাতার আড়ালে— ভোরের আকাশ ভরিয়ে দিচ্ছে সুমধুর শিসে— সেই দোয়েল দুপুরবেলা একটা পোকা, হয়তো ফড়িং মাটিতে আছড়ে-আছড়ে টুকরো ক'রে খায়— দেখেছো তো, তার ঠোঁটে মৃত্যু থাকা সত্ত্বেও কী মিষ্টি দেখতে, দ্যাখোনি কি? কত কবিতা তাকে নিয়ে— কত র‍্যাপ্‌স্যাডি!

এবং শেষপর্যন্ত তার সিদ্ধান্ত: দিস ওয়ার্লড ইজ বিল্ট আপ্‌ন ক্রুয়েল্‌টি, কিলিং অ্যাণ্ড ডেথ্।

তবুও স্বপ্ন, স্বপ্ন দিয়েও তো কেউ কেউ পৃথিবী বানায়। এসব ভাবনায় আনন্দ বইয়ের শেষ কবিতা সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো।

বারান্দায় পা ছড়িয়ে ব'সে আছে প্রভা। বাইরের দিকে তাকাতেই এই দৃশ্য চোখে পড়লো তার। আকাশে বোধহয় আবার মেঘ ঘন হয়ে উঠছে। কেমন এক অন্ধকার, যেন আলোয় অন্ধকার মিশছে মিহি— প্রভাকে মনে হচ্ছে প্রাচীন কোনো মাতৃকামূর্তি, পূজিত হবার অপেক্ষায়।

আনন্দর স্মৃতিতে যেন ভেসে উঠতে চাইছে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া কোনো এক নগরীর রাজপথ, প্রাসাদ, অপরূপ খিলান-গম্বুজ।

আনন্দর মনে হলো সে যেন এক প্রাসাদের মধ্যে কী যেন খুঁজছে।

কী খুঁজছো?

আমার হৃদয়, যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কবে একদিন। আমার মৃত চোখ। আমার সেইসব স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা আর...

আর?

সেই নারী।

কে সে?

যে আমাকে চেয়েছিল একদিন। দেখেছিল আমার দু'চোখে নীলাভ ব্যথা। তারও চোখে ছিল শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার।

আর?

একবারই তো পেয়েছি তাকে!

তাই বুঝি ফিরে ফিরে আসো?

চুপ ইশারায় আনন্দর হাতটা একটু ন'ড়ে উঠলো।

—'শুনছো!'

হ্যাঁ। বলো! কোথায় তুমি?

—'শুনছো!'

হ্যাঁ। শুনছি তো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। এখনই ভেঙে পড়বে এ প্রাসাদ।...

ঘোর কেটে যেতেই আনন্দ দেখলো মঞ্জুশ্রী তার চেয়ার ধ'রে নাড়াচ্ছে।

—'কী হলো?'

—'মা তোমাকে সেই কখন থেকে ডাকছে।'

আনন্দ প্রভার কাছে গেল। বসলো তার পাশে।

—'কী যে ভাবো এত?'

—'হয়তো তোমাকেই ভাবছিলাম।'

—'বাজে বোকো না তো।'

—'সত্যি বলছি।'

প্রভা তার মুখের দিকে তাকালো। তার চোখ যেন বলছে— আমি আবার ভাবনার বিষয় হলাম কবে থেকে!

—'ভাবছিলাম, যদি মেয়ে হয় তার নাম রাখবো শ্যামা—·তুমি তো কালীভক্ত!'

—'তুমি আবার মেয়ে কামনা করছো?'

—'না, তা নয়—'

—'যদি ছেলে হয়?'

—'তার নাম হবে সমর— আমার মতো যেন স্বপ্নবাজ না-হয়, যুদ্ধবাজ তবুও ভালো!'

—'এইসব ভাবছিলে তুমি!'

—'হ্যাঁ— আমাদের নামগুলো কেমন ব্যঙ্গ করে আমাদের— আমরা যা নহ, আমাদের নাম যেন তা-ই প্রকাশ ক'রে চলেছে আবহমান— সার্থকতা যে একেবারে নেই তা নয়— বলো! ডাকছিলে কেন?'

—'থাক্। পরে বলবো।'

আনন্দ আর কথা বাড়ালো না। বাইরে রোদ্দুরের রঙটা কেমন যেন ঠিক গেরুয়া নয়, আবার কমলাও নয়— তব, সেই রোদ যেন আনন্দকে ডেকে নিয়ে উঠোনে দাঁড় করালো। রোদ্দুরের রঙ মাখা মেঘ, মেঘ ঠিক্‌রানো আলোস্নাত গাছপালা— চরাচর, আনন্দ উঠোন পেরিয়ে তোরণের দিকে...

AMARBOI.COM

সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার; শেষ মুহূর্তের
আমি এক— সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি;

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে আনন্দ টপ্‌মোস্ট ফিগার হয়ে উঠবে— এরকম একটা ধারণা অগ্রহায়ণে বই প্রকাশের পর-পরই কীভাবে যেন গ'ড়ে উঠেছিল, পুরো বৈশাখ মাস ধ'রে তার মনে হচ্ছিল ধারণাটা সত্য হয়ে উঠছে— বইটি প্রকাশিত হবার প্রায় তিনমাস পর দীর্ঘ চিঠি সহ এক কপি বই রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিল আনন্দ। তার উত্তরে মাত্র দু'টি বাক্য লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ: তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।

চিঠিখানা যতবার সে পড়েছে, শুনতে পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর। চৈত্র সংখ্যার 'কবিতা'তে বুদ্ধদেব আনন্দকে 'প্রকৃতির কবি' আখ্যা দিয়ে, ওই শিরোনামে দীর্ঘ এক আলোচনা করেছে গ্রন্থখানির। সেই আলোচনাও মাঝেমধ্যে খুলে পড়েছে আনন্দ। কখনও মনে হয়েছে— এ নিতান্তই বন্ধুকৃত্য। তখনই বুদ্ধদেব যেন ব'লে উঠেছে, 'ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারাও এই মতামত গঠিত হ'তে দিইনি।' আর আনন্দ পাতা উল্টে চ'লে গেছে শেষ পৃষ্ঠায়, নিজের মনেই বলেছে, 'বুদ্ধ ঠিকই লিখেছে— আমাদের দেশে কোনো ক্ষেত্রেই কোনোরকম স্ট্যাণ্ডার্ড নেহ, সাহিত্যে একেবারেই নেই। প্রতিভা অবজ্ঞাত হয়, ঠিক; তৃতীয় শ্রেণীর কবি অভিনন্দিত হয় অসাহিত্যিক কারণে— একশো বার ঠিক।'

তার মানে আনন্দ, তুমি প্রথম শ্রেণীর কবি?

কী জানি!

বুদ্ধ তো লিখেছে— তুমি প্রকৃতই কবি এবং প্রকৃত অর্থে নতুন।

হ্যাঁ লিখেছে, কিন্তু আমি তো তা ঘোষণা করেছি আমার চতুর্থ কবিতায়: আমার পায়ের শব্দ শোনো, নতুন এ— আর সব হারানো— পুরনো।

কিন্তু এবার কোলকাতা থেকে ফিরে, সবকিছুই কেমন যেন অলীক ব'লে মনে হচ্ছে। আজ পর্যন্ত তার সম্বল দু'টি আলোচনা আর রবীন্দ্রনাথের চিঠি। আর কোথাও আলোচনা হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। 'পরিচয়'-এর পুস্তক-পরিচিতিতে গ্রন্থটির কোনো মূল্যায়ন প্রয়াস আছে ব'লে আনন্দর মনে হয়নি। যথাযথ মূল্যায়ন যদি না-হয় তাহলে কবিতা-পাঠকের আগ্রহ জন্মাবে কীভাবে? আর আগ্রহ যদি না-জন্মায়— কীভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছাবো আমি?

তাহলে কি আমি ঠিক ভাবিনি?

বইয়ের প্রথম কবিতায় চোখ রাখলো আনন্দ। স্পষ্ট সে বনির মুখ মনে করতে পারলো— এই অনুভব কি মিথ্যে? কিংবা এইসব প্রকাশ আন্তরিক ছিল না!

কে যেন আনন্দর কাঁধে হাত রাখলো— ছিল ব'লেই তো তুমি ভেবেছিলে— এরা তোমাকে খ্যাতি দেবে। আমিও ভেবেছিলাম— আমার 'লে ফ্লর দু মাল' আমাকে সফলতা এনে দেবে। তার পরের ব্যাপার তো তুমি জেনেছো!

—হ্যাঁ, ঈশ্বরনিন্দা আর অশ্লীলতার দায়ে আপনি অভিযুক্ত হলেন।

—ভাগ্যিস ঈশ্বরনিন্দার অভিযোগ বাতিল হয়েছিল! নইলে আমাকেও হয়তো ঈশপের মতো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো!

—কিন্তু অশ্লীলতার অভিযোগে আপনার কবিতাগুলোর কী হাল হয়েছিল! তা কি মৃত্যুদণ্ডের অধিক ছিল না?

—দ্যাখো, কী স্ববিরোধ! আমি তো আত্মহত্যার কথা ভেবেছি, মৃত্যু চেয়েছি। কী পরিহাস— তবু কবিতার কথা ভেবেছি, তবু...

—আপনারও মনে পড়েছে সেই নারীর মুখ, যে আপনাকে আহত করেছে সবচে' বেশি!

—তুমি তো জানো, শিল্পীকে সৌন্দর্যের কাছে যেতেই হয়।

—হ্যাঁ, মৃত্যুর কাছে— মৃত্যুর মধ্য থেকে জীবনকে মুক্ত করতে।

—বাঃ! আমিও অনেকটা এরকমই ভেবেছিলাম— কুৎসিতের মধ্য থেকে আমি সৌন্দর্যকে মুক্ত করবো, তাই বোধহয় আমি মৃত্যুর কবলে পড়েছি।

কাঁধ থেকে হাত স'রে গেছে তবু আনন্দ বললো, জীবনে তবু গ্লানি আসে, ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে। জীবনে যে কত কাঙালিপনা আছে!

রবীন্দ্রনাথের চিঠিটা আরও একবার পড়লো আনন্দ। কিন্তু আর তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো না। কত কথা লিখেছিল সে! তার উত্তরে এই দুটো কথা! আচ্ছা আমি কি খুব যশপ্রার্থী হয়ে উঠেছিলাম? আপনার কী মনে হয় রবীন্দ্রনাথ? চিঠিতে কি তেমন কিছু ছিল? এটা ঠিক, আপনার সম্পর্কে আমি অনেক কথা বলেছি,— তাকে কি স্তাবকতা মনে হয়েছে আপনার? নিজের সম্পর্কেও বলেছি, তা কি জাহির করা মনে হয়েছে?

একথা কিন্তু মিথ্যে নয় যে, আপনাকে অনেকবার দূর থেকে দেখেছি। ভিড়ের মানুষ যেমন দ্যাখে আর হারিয়ে যায় ভিড়ে— তেমনই। অনেকবার ভেবেছি, যদি চিঠি না-লিখে আপনার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতাম, যদি পৌঁছুতে পারতাম, কী বলতাম আপনাকে— হয়তো আপনার প্রদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম অপলক— হয়তো প্রণাম করতেও ভুলে যেতাম, নির্বাক। হয়তো বইটা আপনার হাতে কাঁপা-কাঁপা হাতে তুলে দিতাম। হয়তো বলতাম, পড়বেন। হয়তো আর কিছু বলা হতো না।

চিঠিতে তাই অনেক কথা ব'লে ফেলেছি। চারপাশে এত নিন্দা, উপেক্ষা, অনাদর— হয়তো অভিমান ফুটে উঠেছে, দাবিও। দাবির জন্য অবশ্য আমি লজ্জিত নহ, এ বিষয়ে

কালিদাস আমাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছেন— শ্রেষ্ঠজন মানুষের আন্তরিক দাবির সম্মান দেখাতে জানেন, এই ভরসা। তব, হয়তো দাবি নয়, প্রার্থনাই প্রকাশ পেয়েছে, তাই কি আপনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন না? আঃ! যদি রাখতেন! সে একখানা দৃশ্য হতো!

বুদ্ধদেব একা আমাকে আর কত তুলে ধরবে!

তবু, এবার কোলকাতায় গিয়ে নানানজনের কথায় আনন্দ জেনেছে, অনেকেই বুদ্ধদেবের কথা মেনে নিয়েও একটা 'কিন্তু' তুলেছে। কথাগুলো সাজালে এরকম হয়:

—ঠিক। কবিতাগুলো ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। কিন্তু যে পৃথিবীতে আমরা বাস করছি— যুদ্ধ-দাঙ্গা বিধ্বস্ত, যেন অগ্নিবলয়ের মধ্যে, আমাদের কবি কি তার বাইরে, তাকে কি কিছুই স্পর্শ করেনি? আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'না, আমিও তার মধ্যে— আয়াম্ বাউণ্ড আপ্‌ন্ অ্যা হুইল অব ফায়ার— পুড়ছি, কিন্তু যন্ত্রণাদগ্ধ আত্মার আর্তস্বর সবার তো এক হবার কথা নয়! যুদ্ধ মানে তো দখল আর হত্যার আয়োজন— 'ক্যাম্পে' কি তা ধরা পড়েনি? আগুন তো প্রকৃতিকেও পোড়ায়! পোড়ায় ব'লেই কারও চৈতন্য যদি প্রকৃতিসংলগ্ন থাকতে চায়?' বেশ জোরে মাথা নাড়লো আনন্দ।

এ ঘরের দরজার সামনে এসে পড়ায় প্রভার নজরে পড়লো তার মাথা নাড়ানো। আনন্দ নিশ্চয়ই তাকে লক্ষ করেনি। অন্যান্য দিনের মতো প্রভা ব্যাপারটাকে আমল না-দিলেও পারতো, তাতে কারও কিছু এসে যেতো না। কিন্তু আজ প্রভা জিগ্যেস করলো, 'কী হলো?'

আনন্দ ব'লে উঠলো, 'ভুল।'

—'কোথায়?'

—'জীবনে।'

প্রভা দাঁড়িয়ে আছে! যেন 'জীবন' শব্দটা তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আনন্দ তার মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থেকে, ধীরে, প্রায় স্বগতোক্তির মতো ক'রে বললো, 'কত ভুল! চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেও—'

প্রভা ঘরে ঢুকলো। বইপত্র ছড়ানো। রবীন্দ্রনাথের চিঠিটা এক পাশে। আনন্দ প্রভার চোখ লক্ষ করছিল, ছড়ানো বইপত্রের দিকে প্রভার নজর পড়ুক— সে চাইছিল।

প্রভা আন্তরিকভাবেই জানতে চাইলো, 'কীসে ভুল দেখতে পেলে!

—'প্রত্যাশায়।'

—'কীরকম?'

আনন্দর মনে হলো উত্তরের অনেক রকম অপ্‌শন আছে— এই মুহূর্তে এই সব বই-পত্রের সঙ্গে প্রভার যে সম্পর্কটি গ'ড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল, তা-ও আনন্দর পক্ষ থেকে একটা প্রত্যাশা; এরকম প্রত্যাশা তার প্রায়ই গ'ড়ে ওঠে— প্রভা জানতে চাক সে কী লিখছে কিংবা পড়ছে, এটা এখন উদাহরণ হয়ে আসতে পারে। উদাহরণ হ'তে পারে

তাদের বিয়ে। কিন্তু এসবে যে তর্কবিতর্ক কিংবা তিক্ততা গ'ড়ে উঠবে, তা তাদের দু'জনেরই দিনযাপনটাকে গ্লানি-অবসাদে ভরিয়ে তুলবে— প্রভার মুখের দিকে তাকিয়েছিল আনন্দ, বললো, 'এবার যে বইটা বেরিয়েছে— তার একটা আলোচনার জন্য বাংলাসাহিত্যের একজন নামকরা সমালোচককে অনুরোধ করেছিলাম— অনুরোধ করাটাই ভুল।'

প্রভা একটু যেন অপ্রস্তুত, তার উৎসাহ হারিয়ে গেল। তব, আনন্দর মনে হলো প্রভা যেন ভাবছে— এই ভুলের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক ঠিক কোথায়?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগুন বাতাস জল: আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
আমাকে দিল লিপি রচনা করবার আবেগ:
যেন আমিও আগুন বাতাস জল,
যেন তোমাকেও সৃষ্টি করছি।

যে-পথে সব মানুষ যায়, সহজ সদর সে-পথে আনন্দর যেতে ইচ্ছে করে না। বগুড়া আর কলেজপাড়ার মাঝামাঝি তার বাড়ি। একেবারে রাস্তার পাশেই। তবু বগুড়া রোড না-ধ'রে কলেজের পেছনে যে পুকুর— তার পাড় দিয়ে মাঠ ভেঙে আনন্দ বাড়ি ফেরে, বাড়ি থেকে কলেজে যায়। এ তার নিজস্ব পথ। পথের দু'পাশে আকন্দ-ভাট, বুনো কচুর ঝোপ, শিশু-ডুমুর, খেজুব-বাবলা; খেজুরের গা-বেয়ে ধুন্দুল লতা, তেলাকুচো— প্রজাপতি, ফড়িঙের পৃথিবী, পাখি-গিরগিটিদের বসতি— এ-পথে হাঁটলে নিজেকে পর্যটক ব'লে মনে হয়। এ-পথে হাঁটলে বর্ণ-গন্ধ সুর-সঙ্গীতের স্পর্শ পাওয়া যায়।

কিন্তু আজ হেরম্ব যখন জানতে চাইলো, 'আপনি সদর রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন না কেন?'

হেরম্ব তার সহকর্মী, প্রতিবেশি। 'শনিবারের চিঠি'র গ্রাহক— মাসে একবার অন্তত তার বাড়িতে যায় আনন্দ, 'শনিবারের চিঠি'র জন্য। বিশেষ ক'রে যে মাসে তার কোনো কবিতা প্রকাশ পায়, তার পরের মাসে। 'শনিবারের চিঠি'র অনুকরণে হেরম্বও তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছে, গায়ে মাখেনি আনন্দ। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ শুনতে-শুনতে নিত্য বেত খাওয়া পড়ুয়ার মতো সেও সহ্যশক্তি অর্জন করেছে। তাকে ঘিরে কৌতূহল প্রকাশের মধ্যে বিদ্রূপের সামান্য আভাস থাকলে আনন্দ চুপ ক'রে থাকে। কিন্তু কৌতূহল আন্তরিক মনে হ'লে সে উত্তর দেয়, আজও দিয়েছে 'সেভাবে কোনো কারণ নেই— শর্টকাট আর নিরিবিলি হয় ব'লে যাই।'

এর অর্থ আরও কারণ থাকতে পারে। কিন্তু হেরম্ব আর কিছু জানতে চায়নি। তার ক্লাস ছিল, ক্লাসে চ'লে গেছিল। আনন্দ নিজেকে জিগ্যেস করলো, আর কী-কী কারণ থাকতে পারে?

চেনা মুখ— না-চেনার ভান ক'রে চ'লে যেতে হয়।

কেন?

কে-যে কখন বিকৃত নামে ডেকে ওঠে! যে কখনও একটিও কবিতা পড়েনি, যদি ব'লে ওঠে, কী কবি— কেমন আছো!— এইসব সম্ভাবনা এড়ানো যায়।

কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে— কেউ তোমাকে খুঁজছে।

আনন্দ না-ভঙ্গিতে সজোরে মাথা নাড়লো— যদি খোঁজে, খুঁজুক; পেলে তার স্বপ্নভঙ্গ হবে।

কিন্তু তোমার তো সাধ পূরণ হ'তে পারে।

সাধ? ভালোবাসবার, ভালোবাসা পাবার? —হতাশ ভঙ্গিতে আনন্দর ঠোঁট বিকৃত হলো, মাথাটাও নড়তে থাকলো। তারপর বললো, ভালোবাসবার সাধ যদিও প্রবল— রক্তের দোষ— মনে হয় কোন্ আদিম দেবতা, দেবতারা আমাদের রক্তের ভিতর দিয়েছে প্রবল অগ্নি, উত্তাল সমুদ্র, আর গভীর হাওয়ার গতি,— কিংবা এসবেই নির্মিত হয়েছে নারী— নারীর রূপ; দু'-একটা নারীকে দেখে, এই বগুড়া রোডেহ, আমার তেমনই মনে হয়েছে। পুরুষের রক্তে মাছির মতো কামনা— অনুভব করেছি।

নিজেকে খুব পুরুষ ভাবো বুঝি!

একদিন নিজের রূপে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তারপর কবে একদিন আয়নায় মুখ দেখতে-দেখতে এই সত্যে পৌঁছেছি— পৌরুষ বা সৌন্দর্য কিছুই আমার নেহ; বুদ্ধ, সুধীন, অচিন— এদের সান্নিধ্যে এসে বুঝেছি পুরুষের সৌন্দর্য কী জিনিস, সেটা কেবল বাইরের দেখ্‌নাই নয়, ভেতরের জিনিসও— আমার ভেতর-বাহির সমান— চ্যাপ্টা নাক, গলা খাটো, কালো নাদুসনুদুস কুনোব্যাঙের মতো কুৎসিত, কোনো কিছুতে দক্ষ নহ, চালাক-চতুর হ'তে পারিনি, সাংগঠনিক ক্ষমতা নেহ, গান গাইতে জানি না, মুখচোরা স্বভাবের— কাউকে মুগ্ধ করার মতো কোনো ক্ষমতা আমার নেই। —ভালোবাসা তো মুগ্ধতা চায়! অথচ মুগ্ধ হওয়ার মতো মন রয়েছে আমার, আসলে যা কামনাই— কেন মাছি হয়ে অন্যকে বিরক্ত করবো?

তাই তুমি না-পথে হাঁটো?

হ্যাঁ, এটাও একটা কারণ হ'তে পারে— আমি দেখেছি, ইঁদুর-বেড়ালের রাস্তা যেমন ক্রিসক্রস, তেমনই মেয়েদের সঙ্গে আমার পথ; পৃথিবীতে যদি আয়না আবিষ্কার না-হতো!

তাহলে কী হতো?

কেবল পুরুষের মুগ্ধ হওয়া দেখে নারী তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারতো। তাতে হয়তো ভালোবাসা পাওয়ার একটা আশা থাকতো আমার। এমন একটা জায়গায় আমার চ'লে যেতে ইচ্ছে করে, যেখানে কোনো আয়না নেহ, কোনো নারী নেই।

স্টাফ রুমের কোণের দিকে একটা চেয়ারে ব'সে আনন্দ এসব ভাবছিল। আর একটা ক্লাস নিতে হবে তাকে। তারপর, আনন্দ নিজেকে যেন দেখতে পেলো; এখন হেমন্ত, তবু তার মনে হলো সে দাঁড়িয়ে আছে ফাল্গুনের মাঠের মধ্যে, সন্ধ্যার আকাশে একটা-দুটো ক'রে নক্ষত্র ফুটে উঠছে। শুকনো নাড়া, হলুদ হয়ে যাওয়া ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো সে, মৃত্যুর কথা মনে পড়লো তার, এইসব ঘাস লেগে থাকবে তার শরীরে, ওই নক্ষত্ররা চেয়ে থাকবে তার মুখের দিকে— ভাবতে-ভাবতে আচমকা তার মনে হলো, পৃথিবীতে হেমন্তের ম্লান রোদ্দুর, পুকুরের ওই টলমলে জলে তবু তার চিকিমিকি, কলমি লতায় ফুল-ফুলকুঁড়ি, খুব কাছ থেকে দেখলে হয়তো মাছেদের রূপালি ঝিলিকও দেখা সম্ভব— পুকুরের জল ছুঁয়ে ফড়িঙের ওড়াউড়ি— পৃথিবীতে কোথাও কোনো ব্যথা নেহ, বেদনা নেই— অনাবিল শান্তি আর সুখ— আমি কেন মৃত্যুর কথা ভাবছি তবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘণ্টা পড়লো। আনন্দ তার কাঁধের ওপর পাট-করা চাদরটা ফেলে চক-ডাস্টার নিয়ে ক্লাসের উদ্দেশে বের হলো।

ক্লাস থেকে ফিরতেই হেরম্ব বললো, 'আজ একসঙ্গে ফিরবো। মানে আপনার পথে।'

'সে কী কথা!'

'হ্যাঁ। চলুন।'

কলেজ থেকে বেরিয়ে আনন্দ বললো, 'চলুন সদর রাস্তা দিয়েই যাই।'

—'কেন? আমি তো আপনার পথেই যেতে চাইছি।'

—'ধ্যুৎ, আমার আবার পথ কী— চলুন!'

—'আমিও আপনাকে ব্যঙ্গ করেছি— এটা ভাবতেই এখন এত খারাপ লাগে!'

কী বলা উচিত আনন্দ ভেবে পেলো না।

—'আপনি এখন আমার গর্বের বিষয় বলতে পারেন।'

আনন্দ থমকে দাঁড়ালো।

—'মানে আপনার কবিতা।'

আনন্দর দু'ভ্রূ-তে ভাঁজ।

—'আমাদের নতুন ডেপুটি— অবনীমোহন, তিনি তো আপনার ভক্ত।'

—'তাই নাকি! তা আপনি জানলেন কী রূপে?'

—'অবনী আমার বন্ধু। কোলকাতায় একসঙ্গে পড়েছি। তো, কথায়-কথায় এখানকার কথা উঠলো, আর তখন আপনার কথা। আমি বললাম, তিনি আমার প্রতিবেশি, বর্তমানে সহকর্মী। অবনী যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।'

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের নতুন কোনো ঢঙ কিনা আনন্দ বোঝার চেষ্টা করছিল। কেমন যেন বিমূঢ় চেয়েছিল নির্বাক।

—'বাইরে তখন বিকেল ম'রে আসছে— অবনী তার বাংলোর বাইরে, জানলা-পথে চেয়ে থেকে কেমন এক ঘোরের মধ্যে ব'লে উঠলো: সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন/সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল— তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে, বললো, তুমি চেনো এই কবিকে! তার ওই চোখের দৃষ্টি দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি— আপনি কত বড় মাপের মানুষ!'

আনন্দ হেরম্বর কাঁধে হাত রাখলো।

—'অবনী বলছিল, আপনার সঙ্গে আলাপ করবে।'

এবার আনন্দ একটু যেন সঙ্কুচিত। বললো, 'আমাকে না-দেখাই ভালো। স্বপ্নভঙ্গ হ'তে পারে ডেপুটি সাহেবের।' তারপর বিড়বিড় করলো, 'স্বপ্নভঙ্গের বেদনা বড় কষ্ট দেয়।'

—'কিছু বললেন?'

—'হ্যাঁ বলছিলাম— দেখা না-করাই ভালো।'

—'আমি তাকে কথা দিয়েছি, আগামী রবিবার সে আসছে, আমার বাড়িতে— না কি আপনার বাড়িতে নিয়ে যাবো?'

—'ঠিক আছে— আমিই যাবো।'

খাওয়ার পর-পরই আনন্দ ফিরবে ব'লে ভেবেছিল। কিন্তু এখনও উঠতে পারেনি। অবনীমোহন পান চিবুচ্ছে। যেন গভীর কোনো ভাবনায় ডুবে আছে। আনন্দর মুখে সুপারির কুচি। হেরম্ব চুরুট ধরিয়েছে। কোনো কথা নেই। একটা তৃপ্তির ঢেকুর উঠতেই আনন্দ বললো, 'পুঁই চচ্চড়িটা দারুণ হয়েছে। ডিমের ঝোলটাও।' অবনীমোহন সায় দিলো। আরও কয়েক মুহূর্ত নীরবে চ'লে যাবার পর আনন্দ বললো, 'এবার তাহলে ওঠা যাক।'

অবনীমোহন হাতের ইশারায় বসতে বললো।

হেরম্ব বললো, 'খুব কি তাড়া আছে?'

অবনীমোহন পানের পিক ফেলে বললো, 'এখনই চ'লে যাবেন কেন—'

—'কিন্তু থাকবোই-বা কেন— কথা তো ফুরিয়েছে।'

—'না— একটু আগে ভাবছিলাম, এক-একটা পংক্তিতে কীভাবে আমার দেখা দৃশ্য— এই যেমন কাকের উড়ে যাওয়া, চলচ্চিত্রের মতো ফুটে ওঠে— প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!— দেখেছি তো; এমন-কী, অনুভবও; খুব জানতে ইচ্ছে করছে— একটা কবিতা কীভাবে লেখা হয়।' অবনীমোহন জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে দিয়েছে আনন্দর মুখের ওপর।

আনন্দ ভাবছিল। একসময় বললো, 'আমার ক্ষেত্রে যা ঘটে— একটা ইম্প্রেসিভ লাইন পাওয়ার পর নানা কথা নতুন-নতুন উপমা-উৎপ্রেক্ষায় প্রকাশ হ'তে থাকে— তারপর, কাটাকুটি চলে, চলতে থাকে— একসময় কবিতা হয়ে ওঠে।'

—'কিন্তু আমি শুনেছি— কবিতা নাকি স্পণ্টিনিয়াস—'

—'হ্যাঁ স্বভাব-কবিদের ক্ষেত্রে তা সত্য— আমাকে নির্মাণ করতে হয়।'

হেরম্ব বললো, 'কিছু মনে করবেন না— এই যে একটা ইম্প্রেসিভ লাইন পেয়ে যাওয়ার কথা বললেন— কেউ কি দেয়?'

নিচের ঠোঁট কামড়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকার পর আনন্দ বললো, 'গ্রহীতা থাকলে দাতার অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়—'

অবনীমোহন বললো, 'কে দেয়?'

আনন্দ যেন উত্তর ভাবছে।

—'সে কি নিরাকার ব্রহ্মের মতো কেউ?'

—'না। কবি নিজেই দাতা, নিজেই গ্রহীতা।

—'তা কি সম্ভব?' বললো হেরম্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'সম্ভব। কিন্তু সে-সম্ভাবনার আধার খুবই কম— তাই সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি—'

অবনীমোহন বললো, 'একটু যদি বুঝিয়ে বলেন!'

আনন্দ আবারও ভাবনার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে— কথা সাজাচ্ছে। সেখানেও যেন কাটাকুটি চলছে। কিছু সময় পর বললো, 'হৃদয়ে কল্পনা রয়েছে সকলের, কিন্তু সবার কল্পনার ভিতর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা থাকে না— এই যে চিন্তা, অভিজ্ঞতা— এ তো প্রাত্যহিক জীবন থেকে মানুষ আহরণ করে— সব মানুষই তা করে; কিন্তু সব মানুষ তা, হৃদয়ে যে কল্পনা রয়েছে— তাকে দিতে পারে না— যারা পারে তারাই কবি।' আনন্দ যেন আরও গভীর ভাবনায় ডুবে যাচ্ছে। একেবারে নির্বাক। অবনীমোহন যেন সমস্ত ব্যাপারটাকে অনুধাবন করতে চাইছে। সেও নির্বাক। হেরম্ব একমনে চুরুট পোড়াচ্ছে— তারও মধ্যে চিন্তার কাটাকুটি চলছে যেন।

অবনীমোহন বললো, 'তাহলে আমরা যে প্রেরণার কথা শুনি— দান্তে, পিত্রার্কা, এমন-কী শোনা যাচ্ছে আমাদের রবীন্দ্রনাথের জীবনেও— নারী সেই প্রেরণা, আপনার বনলতাও মনে হয় তেমনই কেউ!'

আনন্দ অস্থিরভাবে মাথা নাড়লো। কয়েক মুহূর্ত পর খুব শান্তভাবে বললো, 'বনলতা জাস্ট অ্যা কন্‌সেপ্‌শন্‌, বাট— বিয়ত্রিচে বা লরা কিংবা বনলতা যদি রক্তমাংসের হয়ও, তারা সকলেই অভিজ্ঞতা বা উদ্দীপক; আর কিছু না, আর কিছু না।'

শ্রোতা দু'জনের ভ্রূ-তে ভাঁজ। হেরম্ব বললো, 'তাহলে প্রেরণা কিছু নয়?'

—'অবশ্যই কিছু— তা হলো অন্তঃপ্রেরণা— এটা-যে ঠিক কী, বোধহয় বুঝিয়ে বলার বিষয় নয়, অনেকেই একে ঐশ্বরিক শক্তি রূপে দেখাতে চায়, কিন্তু আমি সেভাবে দেখি না, রবীন্দ্রনাথ বোধহয় একেই জীবনদেবতা আখ্যা দিয়েছেন।'

অবনীমোহন বললো, 'অন্তঃপ্রেরণা বলতে আমরা কী বুঝবো?'

আনন্দ ভাবলো, এরা বোধহয় খেয়াল করেনি— ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার মতো নয়, বলেছি। নিচের ঠোঁট কামড়ে নিস্তব্ধ ব'সে থাকার পর সে বললো, 'যদি এমন হতো— কোনো রসায়ণাগারে কল্পনা-চিন্তা-অভিজ্ঞতা মিশ্রণের ফলে একটা স্ফটিক জন্ম নিলো— কল্পনা করুন!' আনন্দর ডান হাতের মুদ্রায় একটা গোলাকার বস্তু যেন মূর্ত হয়ে উঠছে, 'বহুমাত্রিক।'

দু'জনেরই মুখ-চোখে অদ্ভুত একটা আভা লক্ষ করলো আনন্দ, 'আমি কি বোঝাতে পারলাম?' তার মুখে ঠোঁটচাপা হাসি।

অবনীমোহন বললো, 'তাহলে কবিতা কি একান্ত নিজস্ব জিনিস— তার কোনো সামাজিক উপযোগিতা নেই?'

—'হ্যাঁ। কবিতা একান্ত নিজস্ব জিনিস। কিন্তু সামাজিক উপযোগিতা বলতে আপনি কি প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ইশ্‌তেহারে যেমন বলা হয়েছে তেমন কিছু বোঝাতে চাইছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমি সে-ইশ্‌তেহার পড়িনি— নানান আলোচনায় শুনেছি—'

—'একান্ত নিজস্ব জিনিস হ'লেও তার সামাজিক উপযোগিতা আছে— আমি তা মনে করি। আমি তো সমাজের বাইরের কেউ নহ, বাইরের নই ব'লেই যা আমার একান্ত ছিল, তা-ই তো আপনার হয়েছে— হয়নি?'

অবনীমোহন মাথা নাড়লো।

—'তার মানে সংযোগ স্থাপন হয়েছে!'

অবনীমোহন সায় দিলো।

—'আঁদ্রে জিদ, নাম শুনে থাকবেন, ফরাসী কবি, প্রগতিপন্থীদের একজন মুখপাত্র, তাঁর মতে: সংযোগ স্থাপনই লেখকের উদ্দেশ্য হবে— আমি তো সচেতনভাবে ওই উদ্দেশ্য নিয়ে লিখিনি, তবুও তো আপনার সঙ্গে আমার সংযোগ হলো! তবু বলবো, কবিতা সকলের জন্য নয়। কিন্তু হওয়া উচিত ব'লে মনে করি।' আনন্দ জানলা-পথে বাইরের দিকে তাকালো। পড়ন্ত বিকেলের আলো মেখে সমস্ত চরাচর কেমন নিস্তব্ধ। একটা টুনটুনির ডাক সেই স্তব্ধতার ওপর দিয়ে যেন ভেসে আসছে। আনন্দর মাথার মধ্যে কথা জন্মাচ্ছে। উচিত,— কিন্তু সকল যেখানে, সেখানেই ভিড়— ভিড়ের হৃদয় পরিবর্তন না-হ'লে তা সম্ভব নয়। সেই পরিবর্তন আদৌ কি সম্ভব? কে আনবে পরিবর্তন? কবি? রবীন্দ্রনাথ যেমন শান্তিনিকেতনে শুরু করেছেন?

তার মনে পড়ছে জিদ-এর একটি কথা— তাঁর নিজের কথা বলতে গিয়ে জিদ বলেছেন যে, তাঁর জন্ম ও শিক্ষা বুর্জোয়া সমাজে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য-জীবনের শুরুতেই তিনি অনুভব করতেন যে, তাঁর মধ্যে যা কিছু খাঁটি, যা কিছু মূল্যবান, সাহসিক,— তার সঙ্গে প্রচলিত রীতিনীতি অভ্যাস ও পারিপার্শ্বিক মিথ্যাচারের ঠোকাঠুকি লাগছে।

সে তো আমারও লেগেছে— লেগে আছে; রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারিনি, পারলে মা খুশি হতেন।

তাহলে কি জিদ-এর মতো তুমিও বিশ্বাস করো— আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রকৃত সাহিত্যকে বিরোধিতার সাহিত্য হ'তে হবে?

যে-কোনো সমাজে— কেবল ধনতান্ত্রিক সমাজে নয়— আমাদের এই সমাজ কি ধনতান্ত্রিক সমাজ?

আনন্দ আচম্‌কা উঠে দাঁড়ালো, 'চলি।' এক মুহূর্ত আর দাঁড়ালো না।

আসল কথা হৃদয়ের পরিবর্তন। নারী-পুরুষ— উভয়েরই। কিন্তু লোভ-লালসা— হৃদয়ের বড় শত্রু; লোভের বিরুদ্ধে একটা লড়াই সোভিয়েতরা শুরু করেছে— এমনই লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ— সভ্যতার মোড় ঘুরে গেলে কি তা সম্ভব, এদেশে? হয়তো। তাহলে কমরেডদের ওপর আস্থা রাখা যায়। কিন্তু কমরেডরা যে আবেগকে মূল্য দিতে চায় না— রণেশরা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকদিন পর আচমকা রণেশের কথা মনে পড়লো আনন্দর। রণেশ রাজনীতির মানুষ। আনন্দ ভেবেছিল রণেশের সান্নিধ্যে প্রভার মধ্যে ফের রাজনীতির ব্যাপারটা জেগে উঠবে। তা হয়নি। তার সঙ্গেও কখনও রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করেনি রণেশ। কেবল তার কবিতা প'ড়ে সে মন্তব্য করেছে, 'বড্ড বেশি আবেগ।' আবেগ তো হৃদয়েরই জিনিস। এসব নিয়ে তর্ক জ'মে উঠতে পারতো— আনন্দর ইচ্ছে হয়নি। কিন্তু কী আশ্চর্য! এখানকার নবীন কবিদের মধ্যে রণেশ বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কলেজ হস্টেলের এক অনুষ্ঠানে সে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিল। 'সারস্বত সমাজ'-এর হলঘরে গীতা-জয়ন্তীতে তো এক হৈ-চৈ কাণ্ড বেঁধেছিল তাকে ঘিরে— খুকুর উজ্জ্বল মুখখানা মনে পড়লো, খুকু বলছে, 'রণেশদাদা কবিতা পড়ছে, দীর্ঘ কবিতা— হঠাৎ কে যেন ব'লে উঠলো— ও মশায়, ও মশায়! হলভর্তি মানুষ। দাদা বোধহয় খেয়াল ক'রেও করেনি— কেউ কাউকে ডাকছে বোধহয়— এমনই মনে ক'রে কবিতা প'ড়ে যাচ্ছে। আবারও সেই ডাক। দাদা এবার পেছন ফিরে তাকালো। তখন আমরাও দেখলাম, সভাপতি গণেশবাবু বলছেন,— এটা রাজনীতির সভা নয়। পড়া বন্ধ করুন! দাদা, কবিতা না-প'ড়ে নেমে এলো। হলও ফাঁকা হয়ে গেল।'

আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'রণেশের সাংগঠনিক ক্ষমতা দুর্দান্ত।' এখানকার মার্ক্সবাদী গ্রুপের পেছনে অন্যতম হাত রণেশের। হাতে লেখা 'জাগরণী' পত্রিকার সঙ্গে বুলু-খুকুকে কী সহজে যুক্ত ক'রে নিয়েছিল।

বুলু-খুকুর হৃদয় কি একটুও পরিবর্তিত হয়নি তাতে? কিংবা রণেশের হৃদয় তো হয়েছে খানিকটা— একটা পথ খুঁজছে, খুঁজছে তো তবু—

কিন্তু সংবাদপত্রে উত্তেজনা ছড়িয়ে হোক, কী মঞ্চে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রেই হোক— মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের উপায় কমিউনিজম কি গণতন্ত্র— কেউ কি মানুষের মনকে ছুঁতে পারছে? হৃদয়কে? কবিতা কি পারে তা? পারবে?

আকাশের ওই সন্ধ্যাতারাটি কি আজ একটু আগে প্রকাশিত হলো!

আনন্দর মনে হলো এ যেন বৈকালিক কোনো জাদুমায়া— এমন জাদুমায়ায় যদি মানুষের হৃদয়াকাশে অমন সন্ধ্যাতারা জ্ব'লে উঠতো!

আনন্দ আর হাঁটছে না। স্থির দেখছে সন্ধ্যাতারাটিকে। তারাটি মিটিমিটি হাসছে। যেন বলছে,— উদ্যম-আবেগ সবই ছিল তবে! আছে!

—তবু নেই মনে হয় কেন?

—হৃদয় শীতার্ত হয় ব'লে।

—পৃথিবীতে শীত আসে। শিশির-কুয়াশা, পাতারা হলুদ হয়ে যায়। মাঘরাতে কোকিল তবু ডেকে ওঠে— বসন্ত আসবে ব'লেই তো, অপেক্ষা— কেন মৃত্যুর কথা ভাবো এত! তুমি কি ভুলে যাও তোমার সেই ঘোষণা— তুমি পুরোহিত?

এ পৃথিবীর কোনো কিছুই স্থির শাশ্বত নয়, তুমি তো জানো নক্ষত্রেরও মৃত্যু আছে!

যাকে সত্য ব'লে জেনেছো, সিদ্ধির মুহূর্তেও তা মিথ্যে হয়ে যায়, যাচ্ছে— বীজেরই নিয়ম তাই।

শীতের রাত্রে জলে ডুবে যদি তুমি ম'রে যেতে সেদিন— আজকের এই সংযোগের আনন্দ তো অধরা থেকে যেতো জীবনে! —আনন্দ মাথা নাড়লো।

এরকম এক ভয়ঙ্কর সংযোগ আমার জীবনকে এলোমেলো ক'রে দিয়ে গেছে— কোনো এক মানুষীর জন্য যে প্রেম জ্বালিয়েছিলাম—

তার বুকে। নিভে গেছে। তো?

আর জ্বালানো গেল না। প্রভা-তে ইন্ধন নেই। প্রেমহীন একটা সম্পর্ক। কেবল নিজেই পুড়ে মরছি।

তবু স্বপ্নে কারা যেন আসে।

বাস্তবেও। দু'-একটা মুখ দেখে মনে হয় কিংবা আমিই সৃষ্টি করি সেইসব মুখের রূপ— যেন রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়— সেইসব দীপ্তিমুখ তবু মুখ তুলে দ্যাখেনি আমাকে।

আয়নায় তারা দেখেছে— রক্তমাংসে-মেদ-লাবণ্যে কী ভীষণ সুন্দরী! দেখেছে আর মুগ্ধ হয়েছে।

এইসব সুন্দরীদের আমি ম'রে যেতে দেখেছি, যুদ্ধবাজ জন্ম দিয়ে-দিয়ে তারা ম'রে গেছে।

কীভাবে যুদ্ধবাজের জন্ম হয়— তুমি কি জানো?

জানি— মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গমে—

বাঃ! এই তো, চিন্তা ফিরে এসেছে, ফিরে আসবে স্বপ্ন— আর কে না জানে, মৃত্যুর হাত ধ'রে কেবল স্বপ্নই বাঁচতে পারে, বাঁচাতে পারে!

নক্ষত্রে-নক্ষত্রে ভ'রে উঠছে আকাশ— ওই যে সপ্তর্ষিমণ্ডল— অতীত ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাবো— বার বার আওড়ালো লাইনটা— একটা পক্ষীরাজ ঘোড়ার অস্পষ্ট অবয়ব, দেখা দিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল...

একটা ঘোরের মধ্যে আনন্দ বাড়ি ফিরছে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি
একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে;
আরেকটি পৃথিবীর দাবি
স্থির করে নিতে হলে লাগে
সকালের আকাশের মতন বয়স;

ব্রজমোহনে একজন নতুন অধ্যাপিকা এসেছেন। এই শহরেরই মেয়ে। আনন্দ তাকে চেহারায় চিনতো না। কিন্তু নামটা পরিচিত— শান্তিসুধা। রণেশের মুখেও এই নামটা সপ্রশংস শুনেছে সে। ছাত্রী-সঙ্ঘ করা মেয়ে। এর আগে কোলকাতায় ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে অধ্যাপনা করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে— সর্বদল সমন্বয়ের প্রচেষ্টা ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের চেয়েও ব্যাপক আরও একটি সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করছিলেন, একদিন কলেজ চলাকালীন সময়ে গ্রেপ্তার হন... মাঝেমধ্যে আনন্দ কেমন এক গভীর বিস্ময়ে শান্তিসুধার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে।

সহকর্মীদের সঙ্গে স্টাফ রুমে যেসব কথাবার্তা শান্তিসুধার হয় তা থেকে আনন্দ জেনেছে— এই মেয়েটির আদর্শ অরবিন্দ ঘোষ, শ্রী অরবিন্দ; অরবিন্দের সশস্ত্র বিপ্লব আর আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব মিশ্রণের মধ্যে কোথায় যেন রবীন্দ্রনাথ-কথিত সেই 'উত্তেজনার আগুন' রয়েছে, সেই আগুন পোহাতে-পোহাতে ইন্ধনের অভাবে তা নিভে যাওয়ার যেমন প্রবল সম্ভাবনা, তেমনই রয়েছে অসাবধানে দুর্ঘটনার আশঙ্কা— তার চেয়েও বড় কথা, কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল; আছে— সেই ফাঁক আজ প্রবল ফাটল। এইসব নিয়ে মেয়েটির সঙ্গে তার আলোচনা করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু এত কম জানে আনন্দ যে, কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে তার মনে হয়,— এই বুঝি খেই হারিয়ে গেল।

তবু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু শান্তি পাওয়া যায়, বিস্মিত হবার মতো জিনিস আছে মেয়েটির মধ্যে— প্রভা যদি রাজনীতিটা করতো, কে জানে, তেমন বিস্ময়ের জিনিস হয়ে উঠতো হয়তো-বা।

একদিন, সাম্প্রতিক রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আনন্দ শুনছিল। মন দিয়েই শুনছিল। প্রদেশে-প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার কাজ এবং স্বাধীনতা ছিল মূল আলোচনার বিষয়। কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি 'স্বরাজ' থেকে কংগ্রেস বিচ্যুত হচ্ছে— এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

—'কিন্তু সরকার জনপ্রিয় হ'তে চাইছে, এটা একটা ভালো দিক।'

—'হ্যাঁ, ভোটের রাজনীতিতে তা লাভজনক।'

—'গুপ্ত মশায়ের কথায় সবসময় একটা খোঁচা থাকে। —আচ্ছা, মন্ত্রীদের মাইনে যে দু'হাজার টাকা থেকে কমিয়ে পাঁচশত টাকা করা হলো— এটা একটা দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নয় কি?'

—'অবশ্যই। কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার আর দুর্নীতি? জহরলাল-গান্ধী প্রকাশ্যেই দুর্নীতির কথা বলছেন— 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধী লিখছেনও।'

—'এবার তাহলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গ'ড়ে তুলবেন গান্ধী?'

আনন্দ অবাক হচ্ছিল, শান্তিসুধা কোনো কথা বলছিলেন না। তিনিও চুপ ক'রে শুনছিলেন। এবার তিনি বললেন, 'দেখুন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সময় এটা নয়— গান্ধীর নেতৃত্বে এক-একটা আন্দোলন চূড়ান্ত আকার ধারণ করবার আগেই কেমন স্তিমিত হয়ে পড়ছে— কেন? সত্যিই যদি আপনারা রাজনীতি আলোচনা করতে চান, এ বিষয়ে ভাবা উচিত— আর যদি কেবল টাইমপাস হয়, বলার কিছু নেই।'

—'মিস ঘোষ আপনার কী মনে হয়?'

—'আমার তেমন কোনো স্টাডি নেহ, তব, মনে হয়— সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নীতি হিসাবে 'অহিংসা' অচল, কেননা, রাষ্ট্র তার হিংসাকে জারি রেখেছে; তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ— মাদ্রাজ। মাদ্রাজ সরকারও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে ব্যবহার করছে।' আনন্দ ভাবলো, মাদ্রাজেও তো কংগ্রেস সরকার— কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য স্বরাজ বা স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্রীদেরও তো একই লক্ষ্য— লক্ষ্য যখন এক, পথ ভিন্ন হ'লেও বৃটিশদের বিরুদ্ধে একটা ঐক্য তো হওয়া সম্ভব, জরুরিও বটে। তা যদি না-হয়— হিন্দু-মুসলমান-শিখ ভেদ যেমন তৈরি করেছিল ইংরেজরা, তেমনই আর এক ভেদ তৈরি হয়েছে, হিঁদুদের মধ্যে অস্পৃশ্য-অনুন্নত হিঁদু আর বর্ণহিন্দু— নিম্নবর্গের হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে— এত ভাগ হ'লে কি আর স্বাধীনতা থাকে? আচমকা আনন্দ ব'লে উঠলো, 'লক্ষ্য এক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে ঐক্য নেই কেন?'

—'বিভেদটা সত্য ব'লে।' বললেন শান্তিসুধা।

আনন্দ উদ্দীপিত হয়ে উঠলো। সে ভাবলো, তার মতো শান্তিসুধাও রবীন্দ্রনাথ-অনুসারী; বললো, 'কিন্তু ঐক্যটাই তো সত্য।' ব'লে আরও না-বলা কথা যেন আনন্দ ফুটিয়ে তুলতে চাইলো তার দৃষ্টি সঞ্চরণে— সমস্ত ঘর থেকে তার দৃষ্টি বাইরে জানলা-পথে উধাও হয়ে যেন বিশ্বভ্রমণ সেরে ফিরে এলো ঘরের মধ্যে।

শান্তিসুধা বললেন, 'হ্যাঁ, রাশিয়া ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথেরও তেমনই উপলব্ধি, তিনি বিভেদকে মায়া বলেছেন।'

—'আমারও তা-ই মনে হয়। জানেন তো, আমিও বিশ্বাস করি, সম্যক চিন্তা সম্যক চেষ্টা দ্বারা যে মুহূর্তে আমি তাকে অস্বীকার করবো, সেই মুহূর্তেই ওই মায়া স্বপ্নের মতো লোপ পাবে।'

সবাই যেন মুগ্ধ কিংবা অবাক। আনন্দ বললো, 'কিন্তু দেখুন, ঐক্যের চেষ্টাটাই আমাদের রাজনীতিতে আর নেই। একটা চেষ্টা অবশ্য করেছিলেন সি. আর. দাশ।' ভাব-বিহ্বলতায় আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'সি. আর. দাশ— দ্য সাইক্লোন।' তার চোখের সামনে ভেসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠলো এক ঝাঁক ক্লান্ত গাঙশালিক। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ কোনো কথা বললো না। সবাই কি ভুলে গেছে— মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে! অবাক দৃষ্টিতে সে শান্তিসুধার দিকে তাকালো। একে-একে সব ক্লাসের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে। শান্তিসুধাও যাচ্ছেন। এখন আনন্দর ক্লাস নেই। প্রায় নির্জন ঘরে একা ব'সে থাকলো সে। কার সঙ্গে কথা বলবো?

আরও একবার যেন প্রমাণ হয়ে গেল— আমি কথা বলতে পারি না। একটা চেষ্টা অবশ্য করেছিলেন সি. আর. দাশ— এর পরে কি কিছুই বলার ছিল না কারও?

কেন? আমার কথাটা কি খুবই ইডিয়োটিক? আচ্ছা, কথাটা যদি অন্য কেউ বলতো, আর আমি একজন শ্রোতা— সবাই নীরব। আমি ব'লে উঠতাম,— হ্যাঁ, পৃথিবীব্যাপী একটা ঐক্য বা মৈত্রীর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, মহাযুদ্ধ-উত্তর সময়ে— লীগ অব নেশন্‌স।

তখন হয়তো কেউ বলতো— হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর সেই মহাসমর পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাব ও চিন্তার বিনিময়ের একটা উপযোগিতা সৃষ্টি করেছিল— যুদ্ধ-মৃত্যু-মন্বন্তরের বিরুদ্ধে।

আনন্দ বলতো, ঠিক তাই— তব, ছাব্বিশের দাঙ্গায় যে মৃত্যু-রক্তপাত, যে শোক-বিয়োগব্যথা— তা কি ওই যুদ্ধের থেকে কোনো অংশে কম ছিল? হিন্দু-মুসলমানের যে ঐক্য গ'ড়ে উঠেছিল,— সি. আর.-এর মৃত্যুর পর-পরই তা ধ্বংস হয়ে গেল। গেল তো!

এরপর প্রতিকথা যে কী হ'তে পারে, কল্পনাও করতে পারলো না আনন্দ। কিন্তু ভাবনাটাকে সে জিইয়ে রাখলো। এবং তার খুব আশ্চর্য মনে হলো— যানশিল্পে দ্রুতগতির ফলে দেশে-দেশে সম্পর্ক আজ নিকট প্রতিবেশির মতো, কিন্তু ভিন্নধর্মী প্রতিবেশির মধ্যে যেন দূরত্ব বাড়ছে খুব— সাম্প্রদায়িক রূঢ়তা আর মনের রুগ্নতা বড় বেশি ছড়িয়ে পড়ছে।

সূর্যের মতো এমন কোনো শুভমণ্ডল যদি থাকতো, যা থেকে জ্যোতিষ্ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারতো সব মানুষের মধ্যে, রূঢ়তা মিলিয়ে যেতো; থাকতো না মনের অসুখ—

আনন্দ টেবিলের ওপর মাথা রেখে কী এক বিষণ্ণতায় মাথাটাকে চিন্তাশূন্য ক'রে দিতে চাইলো। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো, এই গতিই বুঝি-বা যত অশান্তির মূলে— ইমোশন-মোশনে ভারসাম্য রাখা যাচ্ছে না। একটা বাঁধাধরা গতির জীবন চাই— চাইছি, কিন্তু একঘেয়ে, বৈচিত্র্য নেই ব'লেই কেমন এক ক্লান্তি— কোলকাতায় গেলে— ট্রামগুলোকেও কেমন ক্লান্ত মনে হয়।

তবু কোলকাতা ডাকে তোমাকে। —কোলকাতা না গতি? কে জানে!

ডাকে তো তব; ডাকে ব'লেই এই কলেজ তুমি ছাড়তে চাও— চাওয়াটা কি তোমার অব্‌সেসিভ হয়ে উঠছে? নইলে রিপন কলেজে ইংরেজির স্টাফে জায়গা পাওয়ার জন্য প্রমথবাবুকে সুপারিশ করতে অনুরোধ জানাতে না।

তবু হলো না কিছু।

তবু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো— ধরো একদিন পেয়ে গেলে, পেয়ে গেলে ট্রামলাইনের মতো বাঁধাধরা পথ, তুমি হাঁটছো... চারপাশে নাগরিক কোলাহল, ধরো অন্ধকার রাত— রাস্তায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলো জ্বলেনি। আকাশে চাঁদ নেই। অন্ধকার একখানা দৃশ্য হয়ে উঠবে কি, যদি জোনাকি না-থাকে? ধরো, নিস্তব্ধ দুপুর, কেবল কাক আর চড়ুইয়ের ডাক— তোমার কি মনে পড়বে না তখন সেই ঘুঘুটির কথা, যার ডাক নিস্তব্ধতার ওপর আঁচড় না-কেটে কেমন ভেসে আসতো তোমার ঘরে? কিংবা হেমন্তে শিশির ঝরার শব্দ শোনার ইচ্ছে কি হবে না তোমার? আচ্ছা তোমার কি মনে হবে তখন, এই পৃথিবী মৃত দেয়ালি পোকার মতো— কিংবা এই জীবন?

আঃ! পেঁচার সুর, শিশিরের সুর— আনন্দ দেখতে পাচ্ছে নক্ষত্রের আকাশ, টুপটাপ ঝ'রে পড়ছে নক্ষত্র...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের হাড়ে এক নির্ধূম আনন্দ আছে জেনে
পঙ্কিল সময়স্রোতে চলিতেছি ভেসে;
তা না হলে সকলই হারায়ে যেত ক্ষমাহীন রক্তে— নিরুদ্দেশে।

আনন্দ ভেবে দেখেছে, সে সবথেকে ভালো থাকে কবিতা লিখবার সময়; তার পরও ভালো থাকার রেশ থেকে যায় মনের মধ্যে। সেই মন নিয়ে সে প্রভার কাছে যায়। কেমন একটা দৃষ্টিতে প্রভা আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন আজব কোনো জন্তু দেখছে। তাকে কবিতা লেখার বার্তাটি শোনাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু শোনানো হয় না। একটা কবিতা লিখতে পারার যে আনন্দ তা প্রভা-তে সঞ্চারিত হবে না— এটা আনন্দ জেনে গেছে; তবু কেন যে ইচ্ছে হয়! তখন বনির কথাও মনে পড়ে।

কিন্তু ইদানিং কবিতা লিখে খুব বেশি আনন্দ পাওয়া যাচ্ছে না। 'কবিতা' পত্রিকায় কারও-কারও লেখা যেন আনন্দকে মনে রেখে লেখা হয়েছে। এটা ঠিক, আনন্দ বিশুদ্ধ কবিতা লিখতে চায়— বিশুদ্ধ কবিতার ওপর তার আস্থা আছে।

কিন্তু তা ব'লে আমি কুমারী মেরীর দৈবগর্ভে বিশ্বাস করি না। কিন্তু অন্তঃপ্রেরণায় বিশ্বাস করি। কিন্তু তা-ই একমাত্র নয়— তাকে ইতিহাসচেতনা ধারণ করতে হবে।

—না, এও একমাত্র নয়। যেন সমরের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে আনন্দ, যদি অন্তঃপ্রেরণা আর ইতিহাসচেতনা কবিতার মূল ও একমাত্র উৎস হতো তাহলে কবিতা রচিত হবার পথে তো কোনো অন্তরায় থাকতো না— তা যদি না-থাকে, এক-একটা সময় কেন আসে যখন একটি লাইনও লেখা হয় না!

আনন্দ চিন্তিত।

—কোথাও কি মহৎ কবিতার পরিপন্থী কিছু আছে?

সমরের লেখা থেকেই আনন্দ উত্তর করলো— আছে; এই রেডিয়ো-পীড়িত, সিনেমা-জর্জরিত, ফুটবল-উৎকণ্ঠিত জীবনযাত্রা; এমন-কী ক্রিকেট-রাজনীতিও—

—তাহলে বুঝতে পারছো— রিয়েলিটি; রিয়েলিটি থেকে কীভাবে তুমি নিষ্কৃতি পাবে? প্রকৃতির স্বপ্নলোক— সে তো ক্লীবের অলীক স্বর্গ।

আনন্দর মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো। বিড়বিড় করলো, 'রিয়েলিটি কী?'

আর তখনই প্রভা সমরকে তার টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে গেল। প্রভা সংসারের কাজে ব্যস্ত। সমর টেবিল থেকে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আনন্দ ভেবে পেলো না— তিন বছরের ছেলেকে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে যাবার মানে কী— অবশ্য এটাই প্রভার ধরন, অভ্যাস; এভাবেই সে আনন্দকে মনে করিয়ে দেয়— তুমি কেবল কবিতার নও, এরাও তোমাকে জড়িয়ে রয়েছে।

—'কোথায় যাচ্ছিস, এখানে বোসো!'

—'না।' অভিমান আর বিক্ষোভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'মা মারবে কিন্তু!'

একটু যেন দ'মে গেল সমর।

—'খোকা, তোর নাম কী?'

—'সমল।'

আনন্দর মুখটা কেমন ম্লান হয়ে গেল। বললো, 'সমর মানে কী?'

—'যুদ্‌দ।'

আনন্দ তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ভাবলো, ক্রমে এ-ছেলে যখন বড় হবে, নিশ্চয়ই শিখে যাবে যদ্ধের মানে। আর আনন্দ তাকে চেঙ্গিসের গল্প শোনাবে; আলেকজাণ্ডার, অশোক, নেপোলিয়ন— হাল আমলের হিটলার কি স্তালিন, সে তার আদর্শ খুঁজে নেবে।

কিন্তু যদি জিগ্যেস করে,— বাবা, কে হবে আমার অনুসরণযোগ্য? আনন্দ বলবে,— কেউ না। সবার কাছ থেকে তুমি শিখে নেবে কীভাবে সাজাতে হয় ফ্রন্টলাইন, তারপর, নিজের মতো ক'রে সাজাবে।

এইসব ভাবনার ভিতর কখন তার শিথিল বাহুপাশ গ'লে সমর পালিয়েছে, এটা বুঝতেই আনন্দ আর এক অনর্থের আশঙ্কায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বার-কয়েক তার দৃষ্টি এদিক-ওদিক ঘুরে খুঁজে পেলো সমরকে— দিদির সঙ্গে খেলছে সে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে আনন্দ আকাশের দিকে তাকালো— নরম নীল। ক'দিন থেকে কেমন একটা ধোঁয়াটে মেঘের সর জমেছিল— যেন গোলা-বারুদের ধোঁয়াশা। এরকম কথা বলছিল কেউ-কেউ— ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়েছে, হিটলার অপ্রতিরোধ্য— অনিবার্য মৃত্যুর মতো যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো দেশে উপস্থিত হ'তে পারে। হ্যাঁ, এদেশেও— কেননা ইংরেজ তার প্রতিপক্ষ।

কলেজে স্টাফ রুম ছাড়া আর কোথাও এরকম আলোচনা শোনার সুযোগ হয় না আনন্দর। এক সময় বাবার সঙ্গে একটু-আধটু কথা হবার সুযোগ ছিল। এখনও-যে নেই তা নয় কিন্তু এসব কথা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার মানেই তাঁকে বিরক্ত করা— এটা বুঝেছে সে। কাল রাতে প্রভার সঙ্গে আলোচনা তুলতে চেয়েছিল, 'আমরা বোধহয় যুদ্ধের হাত থেকে রেহাই পাবো না।' যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে প্রভা যেমন নীরব থাকে, এক্ষেত্রেও সে নীরব ছিল। যদি প্রভা জিগ্যেস করতো,— কেন, এরকম মনে হচ্ছে কেন? আনন্দ বলতো,— আমরা যে ইংরেজের কলোনি।

হয়তো এভাবে কথা এগিয়ে যেতো।

আনন্দ উঠোন পেরিয়ে মাধবীলতার তোরণের নিচে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ালো। এখন রোদ্দুরে কোনো তাপ নেহ, কেবল আলো, নিরুজ্জ্বল। রাস্তায় এসে দেখলো ধুলোমলিন রাঙা গোল সূর্য, পুব আকাশে হলদেটে পঞ্চদশীর চাঁদ— এখন পৃথিবীর কোথাও সূর্য উঠছে, ভোরের স্ফটিক রোদ্দুর কারও ঘুম ভাঙাচ্ছে, কোথাও সন্তানের জন্ম হচ্ছে— মৃত্যু এসেছে কারও সম্মুখে।

সূর্য-নিরপেক্ষ এই সময়ে কোথাও সমৃদ্ধ নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে, পরিত্যক্ত—

তব, এই আকাশ— পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সর্বত্র। এই নিসর্গ—

আকাশের দিকে মুখ তুলে আনন্দ যেন পাথর হয়ে গেছে। আসলে তার চোখের সামনে আশ্চর্য এক মূর্তি, তার হাতে তুলাদণ্ড, তুলে ধরেছে— তার মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে মুগ্ধ হয়ে দেখবার মতো কী যেন রয়েছে— আনন্দ দেখছিল সেই মেয়ের মুখ, আকাঙ্ক্ষিত অভিভাবিকার মুখ যেন, তার কপালে জ্বলজ্বল করছে একটি নক্ষত্র টিপ।...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় সমাবৃত হয়ে আছি কোন্ এক ঘরে—
দেয়ালের কার্নিশে মক্ষিকারা স্থিরভাবে জানেঃ
এইসব মানুষেরা নিশ্চয়তা হারায়েছে নক্ষত্রের দোষে;
পাঁচফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে রেখেছে আপসে।

অনৈক্য প্রকট হয়ে উঠছে দেশীয় রাজনীতিতে। কংগ্রেসের মধ্যেই নানা দল-উপদল। সমাজতন্ত্রী, বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী— স্বাধীনতাও মিছরির সুতোর মতো কোনো ঐক্যসূত্র হ'তে পারছে না। যাঁরা রাজনীতি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন, তাঁরা হতাশ; হতাশ সাধারণ মানুষও। আনন্দ যেন এই সাধারণ মানুষদের মধ্যেও পড়ে না। এসব নিয়ে তাকে সেভাবে কখনও আলোচনা করতে দ্যাখেনি— অন্তত ব্রজমোহনের অধ্যাপকেরা, কেবল ব্যতিক্রম সেদিনের সেই চিত্তরঞ্জন প্রসঙ্গের উত্থাপন। এবছর মে মাসে, যখন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে নতুন দল গড়লেন, সেদিনও তেমন কোনো আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেননি সুভাষচন্দ্র; কিন্তু আনন্দর কেমন যেন একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল— আলোচনা হোক, হওয়া উচিত। তার কেবলই মনে হচ্ছিল— একটা মানবিক ভিত্ ধ্বংসে গেল হয়তো-বা প্রতিভার প্রকম্পনে, হয়তো ভুল রয়েছে কোথাও— সুভাষচন্দ্র নতুন দল গড়েছেন বটে, কিন্তু আনন্দর তবু কেন যেন মনে হচ্ছিল, তিনি পরাজিত,— কিন্তু গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে। যেমন ছিলেন চিত্তরঞ্জন। বিবেকানন্দের সমাজবীক্ষা, তাঁর আদর্শ— সুভাষকে প্রভাবিত করেছিল; তাঁর উপর চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক প্রভাবও রয়েছে— এরকম বিশ্লেষণ আনন্দর জানা, হয়তো এ-কারণে স্বাধীনতার প্রশ্নে শুধুমাত্র বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অবসান নয়, একইসঙ্গে অভ্যন্তরীণ সামন্ততন্ত্রেরও অবসান অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা— সুভাষের এই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে তার নিজের।

অনেক দিন পর বিষয়টা উত্থাপনের একটা সুযোগ এসে গেল আজ। একটু আগে, পি.সি. বলছিল, 'স্বাধীনতা— এই বিষয়টাকেই আমরা প্রাদেশিক ক্ষমতায় থাকার কারণে ভুলতে বসেছি; স্বাধীনতা অর্জন করতে না-পারলে কোনো তন্ত্রের দিকে আমরা এগোতে পারবো না— তন্ত্র মানে কিন্তু একটা অর্থনীতিক সেট্আপ— এটা মনে রাখতে হবে।' তা সে বলতেই পারে, অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে তার বলারও কথা এভাবে।

সকলেই যেন কথাটা মেনে নিয়েছিল। আনন্দ তখন অনৈক্য ভাবছিল। এবার সে ব'লে উঠলো, 'স্যার, এই অর্থকাঠামোর মধ্যে ঢুকেই যদি স্বাধীনতা ভুলে যায় নেতারা, তাহলে এই কাঠামোর মধ্যে স্বাধীনতা এলে, কী হাল হবে তার?— সুভাষচন্দ্র এটা বুঝেছিলেন, জহরলালও— লাহোর অধিবেশনেই তো তার ইঙ্গিত ছিল।' অনেকদিন পর এক ঝলক সুধীরের মুখ মনে পড়লো আনন্দর, 'জহরলাল খুব স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন— দ্য ট্রু সিভিল আইডিয়াল ইজ দ্য সোসালিস্ট আইডিয়াল, দ্য কমিউনিস্ট আইডিয়াল।'

—'কিন্তু কী এমন হলো— সমাজতন্ত্রী-বামপন্থীতে ঝগড়াঝাঁটি, দক্ষিণপন্থী-বামপন্থীতে বেশ মিলমিশ—'

কে একজন টিপ্পনী কাটলো, 'সবই শ্রেণীস্বার্থের বিষয়।'

কথাটাকে লুফে নিলো সমাজতন্ত্রী ব'লে পরিচিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডি.জি., বললো 'কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক তো ব'লেই দিয়েছেন— দ্য গ্রেটেস্ট ক্লাস স্ট্রাগল টুডে ইজ আওয়ার ন্যাশনাল স্ট্রাগল— সেই সংগ্রামে কংগ্রেসই প্রধান শক্তি— শ্রেণীস্বার্থ আর কাকে বলে!'

তাকে সমর্থন ক'রে ইতিহাসের বি.ডি. বললো, 'আরও দেখার আছে— কাগজে দেখেছি গান্ধিজী মিত্রপক্ষকে সমর্থন জানিয়েছেন। জহরলাল নিরপেক্ষ থাকতে চাইছেন— স্বাধীনতার প্রশ্নে অবশ্য শর্ত-সাপেক্ষে ইংল্যাণ্ডকে সমর্থন করা যেতে পারে।'

—'তার মানে স্বাধীনতার জন্য দর কষাকষি?'

—'তাছাড়া কী।'

আনন্দ ভাবলো, ডি.জি. নিশ্চয়ই সমাজতন্ত্রীদের অবস্থানের কথা বলবে, বললে সুভাষচন্দ্রের কথা আসবে। কিন্তু তাকে অন্যমনস্ক দেখে আনন্দ ব'লে উঠলো, 'সুভাষচন্দ্র বা সমাজতন্ত্রীদের অবস্থান কী— কিছু জানা গেল?'

বি.ডি. বললো, 'কেন কাগজ দেখেননি?'

—'বোধহয় নজর এড়িয়ে গেছে।'

—'অবস্থান বেশ আশাব্যঞ্জক। তাঁরা চাইছেন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সুযোগ নিতে— অবিলম্বে জোরালো আন্দোলন গ'ড়ে তুলে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার কথা ভাবছেন।'

পি.সি. বললো, 'কিন্তু তাঁদের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্ব কোথায়?'

এতক্ষণে শান্তিসুধা বললেন, 'গান্ধিজীরই একমাত্র সর্বভারতীয় গ্রহণযোগ্যতা আছে। কেন যে তিনি আগ বাড়িয়ে চিঠি লিখতে গেলেন!'

—'কিন্তু এক মাস হ'তে গেল— ইংল্যাণ্ড থেকে কোনো জবাব আসেনি।'

বিরক্তির সুরে ডি.জি. বললো, 'কী জবাব আশা করেন বলুন তো— ইংরেজ রাজ্যপাট ছেড়ে চ'লে যাবে?'

বি.ডি. বললো, 'তা কি দেয় কেউ?'

—'আমরা দিয়েছি।' বললো আনন্দ, 'দিইনি কি?'

বি.ডি. সায়-ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো, 'ভারতের ইতিহাস অবশ্য তা-ই বলে।'

ডি.জি. বললো, 'দালাল— দালাল। দালালি-রাজনীতির পাঁকে প'ড়ে আছি আমরা।'

আনন্দ মিচ্‌কি হাসছিল। তখনই টিফিন আওয়ার শেষের ঘণ্টা বাজলো...

আজ আবার সন্ধ্যাতারাকে আনন্দ জিগ্যেস করলো, 'কোন্ পথে যাবো আমি?'

AMARBOI.COM

কোনো উত্তর পেলো না। তারাটির মুখ যেন ভার। তারারও কি মন খারাপ হয়?

ক'দিন আগে হেরম্ব জিগ্যেস করেছিল, 'তাহলে আপনি সমাজতন্ত্রী?'

আনন্দ বুঝতে পারছিল, সেদিনকার কথার রেশ ধ'রে হেরম্বর মনে এই প্রশ্ন জেগেছে। সে কেবল মুখ টিপে হেসেছিল। কী ভেবে নিয়েছিল হেরম্ব— কে জানে! বলেছিল 'শুনেছেন তো, গান্ধীর চিঠির জবাব এসেছে!'

—'না।'

—'সেদিন ডি.জি. যা বলেছিল— তা-ই ঘটেছে, স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো কথা নেই।'

—'আপনি এসব জানলেন কোথা থেকে?'

—'অবনী বলছিল। আরও একটা খারাপ খবর আছে— মুসলিম লীগ আর দেশীয় রাজাদের কাছে বড়লাট সাহায্য চেয়েছে। শুধু কি তাই! অবনীর কাছেই শুনলাম, সেক্রেটারি জেটল্যাণ্ড লর্ডসভায় কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান ব'লে চিহ্নিত করেছে।'

—'তাহলে সমাজতন্ত্রীদের আশা আছে বলছেন? সাম্যবাদীদের।'

—'কী জানি— আমি রাজনীতির সমীকরণ বুঝি না।'

—'তাহলে আলোচনা করছেন যে!'

—'এম্নি। মনে হলো আপনাকে এসব কথা বলা যায়।'

—'এমন মনে হলো কেন আপনার— অদ্ভুত তো!'

—'মনে হওয়ার একটা কারণ অবশ্য আছে— আমি নিজে সমাজতন্ত্রী, আর সেদিন টিফিন আওয়ারে— আপনার কথা শুনে আপনাকেও আমি তা-ই ভেবেছি।'

আনন্দ অদ্ভুত দৃষ্টিতে হেরম্বর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এক সময় সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে সশব্দে হেসে উঠেছিল, হাসি সম্বরণ ক'রে বলেছিল, 'আমি ঐক্যপন্থী।'

আনন্দ আবারও তারাটির দিকে তাকালো। তারা যেন বললো, তুমি জানো না কোন্ পথ তোমার? আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'জানি। কবিতার পথ।'

রাজনীতি-যে তার পথ নয়— এটা আনন্দ ভালো ক'রেই জানে। রাজনীতি আলোচনায়, বেশিরভাগ সময় সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, এমন-কী নিজে ভাবতে গেলেও— কোথাকার কোথাকার লুপ্ত জনপদ চোখের সামনে ভেসে ওঠে— গ্রীস, রোম, হরপ্পার ভগ্নস্তূপ— খিলান গম্বুজ, পিরামিড... নারী, অপ্সরা-উর্বশী, সেইসব দার্শনিক— এসব ছিল, নেই, রাজনীতি আর যুদ্ধ কি ধ্বংস করেনি তাদের?

আর এই যুদ্ধ, রাজনীতি— এও তো ছিঁড়ে ফেলছে জীবনের সব সৌন্দর্য।

তবু ফুল ফোটে, পাখি ডাকে— প্রজাপতি-ফড়িঙের পাখায় রঙ— শিহরণ জাগে, যদিও যুদ্ধে মরে ঢের, ধূসর কুয়াশা ছিঁড়ে সূর্য জাগে ফের— আমিও তো থাকি তোমার প্রতীক্ষায়, প্রতীক্ষায় আছে তোমার স্বজন।

এতক্ষণে সন্ধ্যাতারাটিকে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখলো আনন্দ।

প্রেম— স্বপ্ন— পৃথিবীর স্বপ্ন, প্রেম তোমার হৃদয়ে।
হে স্থবির, কী চাও বলো তো—
শাদা ডানা কোনো-এক সারসের মতো?

দ্রুত বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। কেমন যেন তাল সামলানো যাচ্ছে না। মাঝেমধ্যে আনন্দর সংশয় জাগে, বদলে যাচ্ছে— না ভেঙে যাচ্ছে! কলেজের কয়েকজন ব্রাহ্ম অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মিশনের দিকে ঝুঁকেছে। ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে জাপান। ভারী অদ্ভুত লাগছে সব। বার্মায় ঢুকে পড়েছে জাপবাহিনী। একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে যুদ্ধ। যে-কোনো মুহূর্তে কোলকাতায় বোমা পড়তে পারে। আতঙ্কে নাকি শহর ছাড়ছে সব। খুকু কোলকাতায়। নলিনীরা?

খুকুর মুখটা মনে পড়লো আনন্দর। কেমন অবাক চেয়ে-চেয়ে দেখছে আনন্দর মুখ।

—'কী হলো তোর!'

—'দাঁড়া না, দেখি।'

প্রভা এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে ফিরে খুকু বললো, 'সত্যি বউদি, আমার দাদাটা যে এত বিখ্যাত, কোলকাতায় না-গেলে বুঝতেই পারতাম না।'

যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেললো প্রভা। সে ভেবেছিল কী-না-কী মজার ব্যাপারস্যাপার। তবু বললো, 'কীরকম?'

—'বলা ভালো, দাদার জন্য আমিও বিখ্যাত হয়ে গেছি।'

প্রভার চোখ-মুখে আবারও আগ্রহ ফুটে উঠলো।

—'বুঝলে বউদি, সেদিন ক্যাম্পাসে ব'সে আছি— কয়েকজন মেয়ে এলো, তাদের একজন জিগ্যেস করলো,— আপনি সুচরিতা? আমি মাথা নাড়লাম। মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। যেন কিছু একটা অনুমান করতে চাইছিল, কেমন এক বিস্ময়ের ঘোরে সে বললো,— জীবনানন্দ দাশ আপনার দাদা! আমি এবার বললাম, হ্যাঁ। কেন বলুন তো!— কী এক আবেগ সামলে সে বললো,— আপনার দাদা আমার কবি— প্রিয় কবি। আমি নলিনী। ব'লে সে হাত বাড়ালো। আমি তার হাত ধরতেই বললো, নলিনী চক্রবর্তী।

বুঝলি দাদা, নলিনীরা একটা কাগজ বের করে— 'মেয়েদের কথা'; তোকে দিয়েছে একটা— মতামত জানাতে বলেছে।'

আনন্দ জানতে চেয়েছিল, 'তোরা এক ক্লাসে পড়িস না?'

—'না। নিনি— নলিনীর ডাক নাম, নিনি দর্শন।'

আনন্দ বিড়বিড় করেছিল, 'ইতিহাসে-দর্শনে বন্ধুত্ব— ব্যাপারটা বেশ আশাব্যঞ্জক।'

কিন্তু যুদ্ধ— যুদ্ধ যেন আকাশে, আকাশ দেখে সে বুঝতে চাইলো এই যুদ্ধের আবহাওয়ায় ওই আশা কীভাবে টিকে থাকবে? অবশ্য এ আকাশ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। ইন্দোচিন, ইন্দোনেশিয়া; মালয়— বড়-বড় শহর বিধ্বস্ত জাপানি বোমায়।

কেন-যে শহরগুলো আক্রমণের লক্ষ্য হয়! শহর তো সভ্যতার কেন্দ্র— প্রান্তিক মানুষেরা তো সেখানে যায়— সভ্য হ'তে, শিক্ষিত হ'তে— শহর ধ্বংস হ'লে কোথায় যাবে তারা?

জ্যোতির্ময়ীরা কি কোলকাতায় গেছে? যাবে বলেছিল— সে তো অনেকদিন আগে, হয়তো গিয়ে ফিরেও এসেছে আবার, কিংবা ফেরেনি এখনও— একটা উদ্বেগ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল।

জ্যোতির্ময়ী আনন্দর ছাত্রী ছিল।

জ্যোতির্ময়ী সেই মুখের মেয়ে যার মুখের রূপ— রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়— কেমন এক দীপ্তি যেন, সেই মেয়ে একদিন আনন্দর পথ আগলে দাঁড়ালো, 'স্যার, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবো।'

রেলিঙের দিকে স'রে গিয়ে আনন্দ বললো, 'বলো!'

—'স্যার, ওই মিথোলজি পড়ানোর সময় গ্রীক মিথোলজির যেসব রেফারেন্স, স্যার, আপনি দিচ্ছেন— আমি কিছুই জানি না, যদি একটু ডিটেলে বলেন।'

—'আচ্ছা।'

পরদিন জ্যোতির্ময়ীকে একখানা মিথোলজির বই দিয়েছিল আনন্দ। একদিন কথায় কথায় জ্যোতির্ময়ী বলেছিল, 'মিথিক ক্যারেক্টারের সঙ্গে আধুনিক মানুষেরও কী মিল, না?' তার বলার ভঙ্গিতে ছিল আবিষ্কারের আনন্দ।

আনন্দর তখন বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, কারও সঙ্গে আমার কি মিল খুঁজে পাও? মনে-মনে আনন্দ সেদিন দারুণ রোমাণ্টিক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাকে নিরস্ত করেছিল বয়স— পদমর্যাদা। গম্ভীরভাবে সে বলেছিল, 'হ্যাঁ। দেব-দৈবের মোড়কে পুরাণকাহিনী আসলে আবহমান মনুষ্যচরিত্রের ভাষ্য।' বলতে-বলতে তবু জ্যোতির্ময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দর মনে হয়েছিল, যদি সে জানতে চায় কার সঙ্গে আমার মিল দেখতে পান? তখন আনন্দ বলবে, এথেনা।

তার সেই তাকিয়ে থাকার মধ্যে নিশ্চয় মুগ্ধতা ফুটে উঠেছিল, নইলে জ্যোতির্ময়ীর চোখের পাতা আনত হয়েছিল কেন? তারপর থেকে মেয়েটি স্বপ্নে আসতে শুরু করলো। দারুণ রোমাণ্টিক সেই স্বপ্ন— সেইসব স্বপ্নের স্মৃতির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে আনন্দ:

—তুমি কে? —আমার প্রফেসর, না কবি?

—তুমি আমার কবিতা পড়েছো?(!)

—হুঁ-উ-উ।

—বলোনি তো আগে!

—আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝবে।

—বুঝিনি বুঝি একটুও!

আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তার দু'চোখে চোখ রেখেছে সে— চোখের গভীরে কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন খুঁজছে জ্যোতির্ময়ী, তার নাকের পাটা ফুলে-ফুলে উঠছে। ঠোঁটের মিহি ভাঁজগুলো কেমন ফুটে উঠছে—

—তুমি কি কিউপিডকে দেখতে পাচ্ছো?

—না, অনুভব করছি— সোনার তীর নিক্ষেপ করেছে সে।

—তুমি কি দেখছো তাকে?

—না। অনুভব করছি।

জ্যোতির্ময়ীর দু'চোখের পাতা দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করেছে— আনন্দর ওষ্ঠ-অধর নেমে আসছে আঁখিপল্লবের ওপর...

স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার পর তখন যেমন এক গভীর দুঃখ, গ্লানি বোধে আচ্ছন্ন হতো, আজও তেমন এক বিষাদ অনুভব করছে আনন্দ— সেই সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস।

আরও কত স্বপ্ন, একদা স্মৃতি— স্বপ্নে শরীর পেয়েছে, মনিয়া কখনও জ্যোতির্ময়ী হয়ে গেছে, কখনও-বা জ্যোতির্ময়ীতে ডিসল্‌ভ হয়েছে বনি।

একদিন জ্যোতির্ময়ী জানতে চাইলো, 'বনিদিদিকে চেনেন তো আপনি?'

—'চিনতাম। অনেকদিন যোগাযোগ নেই।'

—'অবাক হচ্ছেন?'

—'কৌতূহল হচ্ছে।'

—'বনিদিদিরা একসময় আমাদের প্রতিবেশি ছিল। এবার কোলকাতায় গিয়ে, কথায়-কথায় আপনার কথা বললাম— আমি আপনার ছাত্রী শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল বনিদিদি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল— আমার কথা বলিস তোর স্যারকে।'

—'আমার খুড়তুতো বোন বুলুর সঙ্গে পড়তো বনি— সেই সূত্রে আলাপ।' যেন আর কিছু না, এমন বোঝাতে চাইলো।

—'আপনার কবিতার খুব ভক্ত শুনলাম!'

—'তাই নাকি!'

—'বলছিল তো!'

একটু চুপ থেকে আনন্দ বললো, 'আর কিছু বলেনি?'

তার ওই কৌতূহল প্রকাশ হওয়ায় জ্যোতির্ময়ীর ভ্রূ যেন একটু কুঁচকে গেছিল। আনন্দ বলেছিল, 'মানে আমার দ্বিতীয় বইটা সম্পর্কে?'

—'না।'

সত্যিই কি আজও সে আমার কবিতার ভক্ত কিংবা যদি প'ড়ে থাকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', বুঝেছে কি আমার মর্মবেদনা? তার প্রতি আমার প্রেমানুভব?

বোঝা মুশকিল হয়তো-বা। বুদ্ধদেব, এত বড় প্রেমিক মানুষ, রোমাণ্টিক— সেও বুঝতে পারেনি— একটি কবিতাকেও তার প্রেমের কবিতা ব'লে মনে হয়নি! আমি কি ঠিকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুই বলতে পারিনে— সত্যিই কি আমার মাথার দোষ— সজনীকান্ত তেমনই প্রতিপন্ন করতে চাইছে আমার কবিতা ধ'রে ধ'রে— যে ভয়াবহ অন্ধকারে আমাদের ভবিষ্যৎ সমাচ্ছন্ন-আসন্ন, গোধূলিসন্ধি-তে আমি তো তা-ই বিবৃত করেছি, তাকে প্রলাপ মনে হচ্ছে কেন?

এই তো যুদ্ধ— আমাদের দোরগোড়ায়— কার্ফু চলছে, উড়োজাহাজ দেখলেই বিস্ফারিত চোখ, হৃৎপিণ্ডের দপ্‌দপানি— সাইরেনও বাজছে... বোমা তো ফাটছে কোথাও— ধ'সে যাচ্ছে, জ্ব'লে যাচ্ছে জীবন, ছিন্নভিন্ন, সময় তো চলছে তবু— সময় মেপে কি বোমা পড়ে?

কোলকাতায় যদি বোমা পড়ে— বনিরা কি শহর ছাড়বে, জ্যোতির্ময়ীরা কোথায় এখন? খুকু? কেমন এক অসহায়-উৎকণ্ঠায় আনন্দ বাইরের দিকে তাকালো। আর তখন সে আশ্চর্য এক দৃশ্যের মধ্যে ঢুকে পড়লো: সমর একটা ফড়িং ধরার চেষ্টা করছে।

সে যেন তার শৈশবকে দেখতে পাচ্ছে— কত রকমের ফড়িঙের ওড়াউড়ি, প্রজাপতি ঝিঁঝি— পাকা ধানি লঙ্কার মতো লাল ফড়িঙের পেছনে ছুটছে মিল, পুঁতিদানা চোখ, প্রজাপতি লাল, নীল, ধূসর-খয়েরি, কালো-সাদা ছোপ-ছোপ— একটা ছেড়ে আর একটার পেছনে—

একটাও প্রজাপতি আনন্দ ধরতে পারেনি, ইহজীবনে— জীবন থেকে যেন ওরা হারিয়ে যেতে বসেছে— হারিয়ে ফেলার গাঢ় বেদনা অনুভব ক'রে আনন্দ যেন নিজেকে প্রবোধ দিতেই বললো, 'কী দেয় ওরা, দিতে পারে?'

তবু আনন্দ অবাক হলো, দেয়নি কি কিছুই? নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা আর স্বপ্ন তো দিয়েছিল। ভুলে গেছ।

সমর একটা ঝিঁঝি ধরবে ব'লে হাতের দুটো আঙুল পাখির ঠোঁটের মতো ক'রে তয়-তয় এগিয়ে দিচ্ছে হাতটা— রুদ্ধশ্বাস, স্পন্দনহীন বিশ্বচরাচর— মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে উড়ে গেল ঝিঁঝিটা—

তার উড়ে যাওয়া-পথে তেলাকুচো লতাঝোপ, চালতা তলা, বাঁশবাগান— কোথায় থিতু হয় ঝিঁঝিটা নজর রাখছে মিলু— দেখতে দেখতে একটা বড় প্রজাপতির রঙ ছড়ানো দেখলো, তার ওড়ার ছন্দে যেন এই কথা: আয়! ধর্‌ আমাকে!

ঝিঁঝিটা যেন বসেছে বাঁশের উঁচু ডগায়— সমর ধরতে পারলো না।

আনন্দর মনে পড়লো ব্যর্থ হবার পর তার মনে হতো বাবা তো ধ'রে দিতে পারতো— বাবারা তো সব পারে।

অতএব, আনন্দ পারবে। আনন্দ উঠে দাঁড়ালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরণ কেবলই বিপন্ন হয়ে চলে
তারপর যে বিপদ আসে
জানি
হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস;
এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

পৃথিবী ভাগ হয়ে গেছে— দক্ষিণ-বামে, মিত্র-অক্ষে; অধিকাংশ মানুষ কোনো-না-কোনো পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কবিতাও। আনন্দর কবিতাও বদলে যাচ্ছে। কিন্তু প্রগতিপন্থীদের দৃষ্টিতে তা উপেক্ষার বিষয়। বুদ্ধদেবও তার কবিতা প'ড়ে খুশি নয়। হয়তো সে-কারণে তার পত্রিকায় আনন্দর কবিতা আর আগের মতো প্রকাশ পাচ্ছে না। নানান জনের কাছে বুদ্ধদেব আফশোস ক'রে বলছে: 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পর আনন্দ বহু ভালো কবিতা লিখেছে। কী যে লিখছে এখন!

বুদ্ধদেব আনন্দকে 'নির্জনতার কবি' আখ্যা দিয়েছিল। সেই তখন 'নির্জনতার কবি' শব্দ-দু'টির দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার ঠোঁটের কোণ-দু'টি চাপা হাসিতে স্ফূরিত হয়ে উঠতো। অনেকদিন পর সেই হাসিটাই খেলছে তার ঠোঁটের কোণে।

তুমি স্বপ্নময়তার কবি।

সেই হাসি একটু যেন প্রসারিত হলো।

তুমি বিষণ্ণতার কবি।

সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে সেই হাসি শব্দময় হয়ে উঠলো।

মঞ্জু বাবার মুখের দিকে অবাক তাকিয়ে আছে। হাসি থামলে সে জিগ্যেস করলো, 'কী হলো?'

—'একটা কথা মনে প'ড়ে গেল— হাসির কথা।'

—'কী কথা?'

আনন্দ এবার মঞ্জুর মুখের দিকে তাকালো। একটা কথা খুঁজলো, যা শুনলে হাসি পাবে। কিন্তু তেমন যুতসই কথা না-পেয়ে, অন্ধের হস্তিদর্শন গল্পটার কথা সে ভাবলো। মঞ্জুকে বললোও গল্পটা। কিন্তু তার মুখ দেখে আনন্দর মনে হলো, মঞ্জু যেন গল্পের মধ্যে হাসিটাকে খুঁজছে। এখনই ব'লে উঠবে, এর মধ্যে হাসি কোথায়?

কিন্তু তুমি হাসলে কেন— সমস্ত অভিধাকে নস্যাৎ ক'রে দেবার জন্য? নাকি স্বাগত জানালে?

আনন্দ গম্ভীর। একটু যেন অন্যমনস্ক। তারপর দৃষ্টি তার ঊর্ধ্বমুখো— চাল ভেদ ক'রে কোন্ মহাবিশ্বের ইশারায় তা উধাও হয়ে গেছে। দৃষ্টি গুটিয়ে ফের সে সম্মুখে তাকালো। যেন সামনে সমবেত হয়ে আছে তার ভক্তবৃন্দ আর বিপক্ষীয় মান্যজন— সকলকে উদ্দেশ ক'রে বললো, সময়-প্রসূতির পটভূমিকা, দেখুন, দৃশ্যমান। স্মৃতি, স্বপ্ন একমাত্র বিষয় নয়

জীবনের— ওই পটভূমিতে জীবনের সম্ভাবনা— আমি দেখছি। আপনারা কি দেখছেন না?

বুদ্ধদেব, আপনি প্রেমিক মানুষ— প্রেম-প্রতিভায় আপনি সফল, স্থির, নিষ্কম্প— আমি সেভাবে সার্থক প্রেমের কবিতা লিখতে পারিনি; হয়তো যতটা প্রেমিক, ততখানি পুরুষ নই ব'লে; প্রেম তাই আমার কাছে মোহ, যেন তার হাত থেকে নিস্তার নেই— আলোর প্রতীক প্রেম, না প্রেমের প্রতীক আলো— বড় ধন্ধে আছি; বরং বলা ভালো,— ছিলাম; ইয়েট্স্-এর মতো বলতে ইচ্ছে করে: আই হ্যাভ নো স্পীচ বাট সিম্বল— যে-কবিতা নিয়ে আপনি, আপনারা খুব উচ্ছ্বসিত— একবারও কি ভেবে দেখেছেন, আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রেমানুভব কি মোহ, যা-ই বলুন, প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে— ওই কবিতায়।

—'বাবা, দ্যাখো!' মঞ্জু খাতাটা আনন্দর দিকে ঠেলে দিলো। খাতাটা টেনে নিয়ে আনন্দ দেখে রাইট চিহ্ন দিয়ে বললো, 'পাঁচ মানে কী— একটা সংখ্যা— উত্তর কিন্তু ঠিক হয়নি।'

—'তুমি যে রাইট দিলে!'

—'অঙ্কটা তো হয়েছে— শুধু উত্তরটা হয়নি।'

—'কেন?'

—'গুড্! কী বলছিলাম— পাঁচ একটা সংখ্যা। আচ্ছা তুমি লেখো।' খাতাটা মঞ্জুর দিকে এগিয়ে দিলো।

—'কী লিখবো?'

—'আচ্ছা, ওর নিচে পর-পর আরও চারটে পাঁচ লেখো।'

লিখে মুখ তুলে তাকালো মঞ্জু।

—'এবার— পাঁচের পরে-পরে এক-এক ক'রে লেখো— টি, মানে পাঁচটি; লেখো— জন, সের, টাকা, ফুট— লিখেছো?' মঞ্জু মাথা কাত্ করলো।

—'তাহলে বুঝতে পারছো— তুমি উত্তরে লিখেছো শুধু পাঁচ—'

মঞ্জু জিভ কাটলো। খাতায় লিখলো কিছু। আনন্দ দেখে বললো, 'এবার হলো, তবু সম্পূর্ণ হলো না।'

মঞ্জু ভ্রূ কুঁচকে তাকালো।

—'পাঁচটি— কী?'

—'পাখি।'

—'তাহলে সম্পূর্ণ উত্তর হবে— পাঁচটি পাখি।'

মঞ্জু উত্তরটা সম্পূর্ণ ক'রে কেমন এক তৃপ্তির চোখে আনন্দর মুখের দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'একটা কবিতা লিখেছি।'

—'দেখি!'

মঞ্জু আর-একটা খাতা বের ক'রে দেখালো। দেখতে-দেখতে আনন্দর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মঞ্জুর মুখের দিকে তাকালো। মঞ্জুর মুখটাতে কেমন যেন কুসুমকুমারীর আদল ফুটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠলো— যেন কুসুমকুমারী ব'সে আছে তার সামনে।

—'হয়নি?'

ছবিটা মিলিয়ে গেল। হয়েছে ভঙ্গিতে আনন্দর মাথা কাত্‌ হলো, নেচে উঠলো ভ্রূ, নাচলো বার-কয়েক।

মঞ্জু বইপত্র গুছিয়ে রেখে উঠে গেল। আনন্দ ভাবছিল, হৃদয়ের উত্তরাধিকার যদি মেয়েটিতে সত্যিই ব'র্তে থাকে,— কারুবাসনা, প্রেমানুভূতি তাকে যেমন নষ্ট ক'রে দিয়েছে; মঞ্জুকেও তো দেবে! কষ্ট পাবে!

না। তার কোনো মানে নেই— প্রতিভা কি কষ্ট পাচ্ছেন? তেমন তো মনে হয় না! কিংবা নিনি?

এখন পাচ্ছে না। কিন্তু পরে তো পেতে পারে। না, না-পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ভেবলুর রক্তেও কবিতা আছে। কিন্তু সত্যিই কি ভেবলুর সঙ্গে নিনির— খুকু অবশ্য তেমনই আভাস দিয়েছে। সেদিন আনন্দ কথায়-কথায় জিগ্যেস করেছিল, 'তা আমার খুকুদিদির খবর কী?'

—'কীসের?'

—'এই যেরকম বললি, কথা বলতে-বলতে হঠাৎ ভেবলু আর নিনি দু'জনে একা হয়ে গেল—'

খুকু হেসে বললো, 'সে সম্ভাবনা নেই—'

—'কেন?'

—'আমার ইচ্ছে করে না।'

—'সে কী রে!'

—'হ্যাঁ দাদা— সংসারে তো তোমাদেরও দেখছি আর ছোটপিসি-ছোটকাকাকেও দেখছি, ভুবনমামাকেও দেখলাম।

আনন্দর বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, ওঁরা সবাই অ্যাব্‌নর্মাল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়েছিল, কেন, অ্যাব্‌নর্মাল বলছি কেন? ভাবতে গিয়ে আনন্দ এই সিদ্ধান্তে এসেছিল: ওঁদের অ্যানিম্যালিটি কম ব'লেই আমরা অ্যাব্‌নর্মাল ব'লে দূরে সরিয়ে রাখি— হয়তো অনেক বেশি মানবিক ওঁরা— হয়তো কেন, সত্যই; পিসি-ছোটকাকা-ভুবনমামা— এঁদের কখনও রাগতে দ্যাখেনি আনন্দ; ঈর্ষা-অসূয়া চোখে পড়েনি— কথার মধ্যে দাঁত-নখ বেরিয়ে পড়ছে, এমনও কি দেখেছি কখনও?

আচমকা সমস্ত চিন্তাস্রোতকে অবরুদ্ধ ক'রে আনন্দ চুপচাপ ব'সে থাকলো অন্ধকারের দিকে চেয়ে। একটা দুটো জোনাকি। যেন অন্ধকারের অলঙ্কার। দৃষ্টি ফিরিয়ে সে হ্যারিকেনের আলোর দিকে তাকালো। আলোটা যদি মোমের আলো হতো! আরও নরম, সাদা, স্নিগ্ধ— আনন্দ যেন একটা মোমের আলো দেখতে পাচ্ছে, তবু ভোরবেলা— বাবার কণ্ঠের সেই

অপূর্ব সূর্য-আবাহন আর নেহ, তবু এক-একদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেলে জানলার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দেয় সে— ওই হাতে কিছু ধরতে চাওয়ার বাসনা নেহ, কেমন যেন মাধুকরী মুদ্রা— কিছুই আসে না, শূন্য হাত— ভোরের আকাশের রঙ তবু ভোরের আলোর নয়— কোথাও যেন সৌরচেতনা নেহ; আলো আছে তবু বিকেলের বিষণ্ন রোদ্দুরের মতো, যেন সূর্যাস্ত থমকে গেছে, অনন্ত বিকেল— ক্লান্তিকর; কোথাও শান্তি নেহ, শান্তির কথা নেই— যুদ্ধই একমাত্র শান্তির উপায়; জয় এলে শান্তি স্থাপিত হবে, পরাজয় যে কী ভয়ঙ্কর প্রতিঘাত নিয়ে আসতে পারে,— হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে মিত্রশক্তি। মৈত্রী আছে, প্রেম নেই—

অথচ প্রেমের কবিতা লেখা হচ্ছে ঢের।

আশ্চর্য! কোথাও কোনো প্রতিশ্রুতি নেই!

কোথাও কোনো প্রশ্ন নেই— যমই একমাত্র সম্রাট; এত প্রজ্ঞা— তবু নচিকেতা নেই।

পৃথিবীর সব চৈত্য যেন আজ ধ্বংসস্তূপ— অহিংসা ধ'সে গেছে মানুষের মন থেকে।

ক্রুশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা মানুষ, দুটো মানুষ— বধ্যভূমি জুড়ে যন্ত্রণা আর মৃত্যুদৃশ্যের মজা উপভোগ করতে আসা মুখের ভিড়...

আনন্দ দেখতে পাচ্ছে ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে... বধ্যভূমি পরিব্যাপ্ত আজ— কোথাও ক্ষমা নেহ, প্রেম নেই...

তবু সোভিয়েত শ্রুতি, মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, প্রতিশ্রুতি— হিটলার-স্তালিন মুখোমুখি...

সত্যানন্দ মৃত্যুর মুখোমুখি— 'পৃথিবীতে ঢের দিন বাঁচা হলো, এবার মৃত্যুর শব্দ শুনতে পাচ্ছি।' —ক'দিন আগে বলছিলেন তিনি।

আনন্দ বলেছিল, 'সমস্ত পৃথিবী শুনছে— আশা রাখো।'

নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে সত্যানন্দের মাথা নাড়ানো স্পষ্ট দেখতে পেলো আনন্দ, তিনি বলছেন, 'যা সঞ্চিত ছিল, সব পাওয়া হয়ে গেছে।' তারপর সামনে তাঁর ঘোলাটে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। কেমন নিজের মনে বলতে থাকলেন, 'সর্বানন্দ ভবন নির্মাণ করেছি— তবু ভবনে থাকলো না কেউ— কেমন যেন হতশ্রী, নিস্তব্ধ মনে হয়—' এই স্মৃতি আনন্দকে অন্য একটা দৃশ্যের মধ্যে নিয়ে গেল: আনন্দ হাঁটছে, রাজপথ— যেন একটা লক্ষ্য খুঁজছে... যেন আনন্দ নয়— অন্য কেউ, একজন নয়— অনেকে... কল্পনা থেকে ফের স্মৃতিতে, সত্যানন্দের চারপাশে বই ছড়ানো। বইগুলো স্পর্শ ক'রে তিনি বললেন, 'এসব পড়েছি। বিশ্বাস ক'রেই পড়েছি। সংশয় যে ছিল না, তা নয়। বিশ্বাসভ্রষ্টও হয়েছি। কিন্তু—' সত্যানন্দ আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে, চোখ ফিরিয়ে নিলেন, কেমন যেন একটা দ্বিধা, সঙ্কোচ— কাটিয়ে উঠে ফের তাকালেন, বললেন, 'কিন্তু যৌন একাগ্রতা হারাইনি।' একটু অন্যমনস্ক হলেন। যেন ফিরে দেখছেন জীবনটাকে— বললেন, 'তব, এতদিন পর কেন জানি না, মনে হচ্ছে কোথাও কোনো প্রীতি নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যানন্দ কেমন নিঃস্ব চেয়ে আছেন, তাঁর জীর্ন-শীর্ণ চোখে-মুখে যেন বিকেলের হেমন্ত সূর্যের আভা।

এই দৃশ্য সেদিন আনন্দকে নিয়ে গেছিল ধানকাটা হয়ে যাওয়া এক মাঠের মধ্যে, দেখছিল নিজেকে— একা দাঁড়িয়ে। আজ তার মনে হলো, এ পৃথিবীর সব জীর্ণ নরনারী ফসলহীন মাঠের দিকে চেয়ে আছে, কোথাও সবুজ নেহ, ধূ-ধূ বালিরঙ— প্রেমহীন জীবনের আর এক রূপ যেন এই!

তব, মঞ্জু কবিতা লিখছে; রঞ্জু ঝিঁঝি-প্রজাপতির পিছনে তবু তো ছুটছে, প্রেমের কথা ভাবছে তো কেউ, নিনি-ভেবল; অপরূপ কোনো আস্বাদ পাবে ব'লে খুকু পুরুষ থেকে দূরে থাকতে চাইছে— প্রভার মতো তাকে বলতে হবে না কাউকে 'তুমি আমার জীবনটাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছো।'

তবু তো প্রভা আমাকে জড়িয়ে ধ'রে ঘুমিয়েছে ঢের— শবের মতো।

আনন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা ছবি কিংবা দৃশ্য— একটি মৃতের হাত জড়িয়ে আছে আর-একটি শবকে, যেন ভীত-সন্ত্রস্ত; যেন আরও এক মৃত্যু থেকে তারা বাঁচতে চাইছে!

—'সামনে তো বইখাতা কিছু নেই— আলো জ্বালিয়ে ঝিমুচ্ছো কেন?' প্রভার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি। আলোটা ডিম্ ক'রে দিয়ে বললো, 'কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না— এ খবর রাখো?'

—'অনেক কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, শুনেছি।'

—'আচ্ছা এই যে আলো জ্বালানো বারণ— আমাদের এখানেও বোমা পড়তে পারে?'

—'যে-কোনো জায়গায়।'

—'কোলকাতা নাকি বিদেশি সৈন্যে ভ'রে গেছে।'

—'হ্যাঁ, খবরের কাগজে তো তেমনই লিখছে।'

—'তমি কোলকাতা যাবে বলছিলে?'

—'গরমের ছুটিতে। কেন?'

—'না— এম্নি।'

—'বোসো। রান্না হয়ে গেছে?'

—'এই হলো। শোনো না, কাল আমাদের আকাশের ওপর দিয়ে এরোপ্লেন চ'লে গেছে— দেখেছিলে তুমি?'

—'কখন?'

—'বিকেলের দিকে।'

—'না। তখন বোধহয় আমি ক্লাসে ছিলাম। তবে দেখেছি মাঝে মাঝে দু'-চারটে।'

অনেকদিন আগে, তখন রঞ্জুর জন্মসম্ভাবনা জেগে উঠেছে, এক আবেগঘন মুহূর্তে আনন্দ প্রভাকে বলেছিল, 'এর থেকে পাখি হ'লে ভালো হতো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কী পাখি?'

—'এই— ধরো, বুনোহাঁস।'

—'তা হঠাৎ পাখি হ'তে ইচ্ছে হলো কেন?'

—'সংসারের এই ঝামেলা থাকতো না— তোমাকে তো সেভাবে পাই না আমি, তখন পেতাম— সারাদিন একসঙ্গে কোনো জলাভূমিতে ভেসে বেড়াতাম, আর আকাশে—'

আনন্দর চোখের সামনে দুটো পাখি, ডানায় দুরন্ত গতি— তখন প্রভা বলেছিল, 'তাতে কি আর সুখ হতো ভেবেছো, সাহেবদের বুনোহাঁস শিকার করা দেখেছো?' ব'লে শিউরে উঠেছিল প্রভা।

—'তব, পাখি হওয়া ভালো—'

—'গুলিতে মৃত্যু হবে জেনেও!'

—'হ্যাঁ জেনেও— আচ্ছা প্রভা, এই যে কত সাধ আমাদের মিটলো না, কত ব্যর্থতা আমাদের জীবনে— এসবই তো মৃত্যুর মতো, ছোট-ছোট মৃত্যু— তাই না?'

প্রভা যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল।

—'এইসব মৃত্যু তো থাকতো না আর।'

তবু কী ভেবে যেন প্রভা বলেছিল, 'না বাবা, তুমি পাখি হও, আমি ওর মধ্যে নেই— দেখেছি তো, শিকারির কুকুর কীভাবে আহত পাখিকে মুখে ক'রে নিয়ে আসে।'

আনন্দর মুখে অদ্ভুত এক হাসি ফুটে উঠলো। আলো পর্যাপ্ত থাকলে হয়তো প্রভা দেখতে পেতো এই হাসি। কিংবা চোখে পড়তো না। তবু হাসির রেশ মাখিয়ে আনন্দ বললো, 'বোমা যদি পড়ে, আমরা কাছাকাছি থাকলেই যেন পড়ে— আমরা ছিন্নভিন্ন তবু পরস্পরকে জড়িয়ে থাকবো, ঘুমের মধ্যে তোমার হাত যেমন আমাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকে।'

—'ওরকম অলক্ষুণে কথা বোলো না তো!'

এই মেয়েটি একসময় মৃত্যুর কথা ভাবতো! বেঁচে থাকা তবে কি একটা মোহ— মোহের মতো কিছু?

—'আলো জ্বালিয়ে ব'সে থেকো না!' প্রভা বেরিয়ে যাচ্ছে। আনন্দ আলোটাকে আরও ডিম্ ক'রে একটা বিন্দুর মতো আকার দিলো। চেয়ে থাকলো সেই বিন্দুর দিকে। বিন্দুটা ক্রমে অস্তসূর্যের মতো— চারদিক থেকে অন্ধকার ক্রমশ গ্রাস করছে তাকে।

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।
হৃদয়কে চোখঠার দিয়ে ঘুমে রেখে
হয়তো দুর্যোগে তৃপ্তি পেতে পারে কান;

কোথাও একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্টাফ রুমে ঢুকতে-ঢুকতে যেসব কথা আনন্দ শুনেছে তাতে তার মনে হচ্ছে ঘটনাটা সাংঘাতিক কিছু। সে বোঝার চেষ্টা করছিল। কিন্তু নানা কথায় ক্রমশ তাকে যে-দৃশ্যের সম্মুখীন হ'তে হচ্ছিল, দৃশ্যটা দেখবে না ব'লেই যেন সে দু'চোখ বন্ধ করলো। কিন্তু তাতে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো দৃশ্যটা— একুশোর্ধ এক যুবককে প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করা হচ্ছে— ভোজালি-ছোরা চলছে এলোপাথারি... যেন রক্ত ছিট্‌কে এখনই আনন্দর গায়ে লাগবে। ছিট্‌কে স'রে যাওয়ার মতো সে চোখ মেলে তাকালো।

আনন্দর মাথা ঝিমঝিম করছে। এখান থেকে কি উঠে যাবে সে? সেটা বোধহয় ভালো দেখাবে না। কথা শুনতে হবে। যেমন শুনেছিল কয়েক বছর আগে। তখন সমরের বয়স দু'বছরের একটু বেশি। একদিন খেলতে-খেলতে প'ড়ে গিয়ে মাথা ফেটে গেল সমরের। রক্তে কপাল-মুখ ভেসে যাচ্ছে। ডাক্তার এলো। সেলাই করতে হবে। ডাক্তার তাকে সমরকে কোলে নিয়ে বসতে বলেছিল— তখন ভীষণ নার্ভাস লাগছিল নিজেকে, সেই রক্তদৃশ্য থেকে আনন্দ কীভাবে যেন পালিয়ে গেছিল। এখন সে আর পালানোর কথা ভাবলো না। দৃশ্যটা আরও বীভৎস হয়ে উঠলো: যুবকের চোখ তুলে নেওয়া হচ্ছে। নিথর রক্তাক্ত বিকৃত দেহের উপর দাঁড়িয়ে উল্লাস করছে কেউ-কেউ।

শান্তিসুধা বললেন, 'এই হচ্ছে ফ্যাসিবাদ।'

ফ্যাসিজ্‌ম সম্পর্কে একটু-আধটু ধারণা আছে আনন্দর। ওই ধারণার ভিত্তি রবীন্দ্রনাথের একটা লেখা। বছর-পাঁচেক আগে রবীন্দ্রনাথ স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় একটা লেখা লিখেছিলেন। তখন স্পেন আক্রান্ত— স্পেনের গণফ্রন্টের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন ছিল সেই লেখায়। চীন আক্রান্ত হবার সময় কে যেন বলছিল, ফ্যাসিবাদ আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন করেছে।... বার্মা আক্রান্ত। তবে কি এই বাংলাও! আনন্দ ঘটনার মধ্যে ঢুকতে পারছে না। কারও-কারও মুখ বেশ গম্ভীর। ডি.জি. কেমন মাথা নিচু ক'রে আছে। অন্যদের কথায় বাধা না-পড়ে এমনভাবে আনন্দ হেরম্বকে জিগ্যেস করলো, 'কী ব্যাপার?'

—'কাগজ পাড়েননি?'

আনন্দ মাথা নাড়লো।

—'সোমেন চন্দ নামে একজন লেখক, কমিউনিস্ট— খুন হয়েছেন।'

—'কারা করলো?'

—'জাতীয়তাবাদী বামপন্থীরা।' যেন কেউ না-শুনে ফ্যালে এমন ভঙ্গিতে কথাটা ব'লেও হেরম্ব— কেউ বুঝতে পেরেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করলো।

আনন্দ যেন বুঝলো,— এখানেও ফ্যাসিস্টরা আছে।

তাহলে এখানে কমিউনিস্টও আছে!

কংগ্রেস তো আছেই।

আনন্দ ভাবছিল ফ্যাসিস্টরা কাকে খুন করলো— একজন লেখককে? সোমেন চন্দ— নামটা শোনা মনে হচ্ছে। ঢাকার ছেলে। তবে কি রণেশ বলেছিল? রণেশ এখন ঢাকায়। বছর-কয়েক আগে কবি কিরণশঙ্করকে সঙ্গে ক'রে রণেশ একবার এসেছিল এখানে। উদ্দেশ্য ছিল আনন্দকে দিয়ে কিরণশঙ্করের কবিতাগ্রন্থের ভূমিকা লেখানো। তখন কথায়-কথায় আনন্দ জেনেছিল, ঢাকায় রণেশরা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের পত্তন ঘটিয়েছে। তখনই হয়তো সোমেনের নাম শুনে থাকবে আনন্দ। কিন্তু নাম শোনা-না-শোনা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো লেখক— একজন লেখককে হত্যা— লেখককে কি? লেখককেই— নইলে ওইভাবে চোখ উপড়ে নিতো না দুষ্কৃতীরা।

কিংবা কমিউনিস্টকেই— কমিউনিস্ট ব'লেই অমন নৃশংসভাবে হত্যা করেছে... এরকম ভাবনার মধ্য দিয়ে এগুতে গিয়ে আনন্দ পথ হারিয়ে ফেললো...

দু'দিন পর খবরের কাগজে প্রকাশিত বিভিন্ন সংগঠনের এক যৌথ বিবৃতি থেকে আনন্দ জানতে পারলো: সোমেন ঢাকার ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ে শ্রমিক সঙ্ঘের সেক্রেটারি ছিলেন। আনন্দ অবাক হচ্ছিল। একজন লেখক— সেও তো কারুশিল্পী, আর কারুবাসনা না-থাকলে শিল্পী হওয়া যায় না— এ যদি সত্য হয়, তাহলে সোমেনও কারুশিল্পী— তাঁরও কারুবাসনা ছিল— কারুবাসনা, রাজনীতি, আর সংগঠন একই আধারে!

আনন্দ চমৎকৃত।

একদিন, কারুবাসনা আমাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে— এমন মনে হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই ঠিক ছিল না— অন্য কিছু আমাকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছিল।

কারুবাসনা তো রবীন্দ্রনাথের ছিল, অনেক বেশি পরিমাণেই ছিল, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর মতো আর কে দাঁড়িয়েছেন?

গতবছর বাইশে শ্রাবণের পর, বিভিন্ন লেখা থেকে আনন্দ জানতে পেরেছে সেই উনিশশ' ছাব্বিশ থেকেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কলম অক্লান্ত ছিল, মৃত্যুর সপ্তাখানেক আগেও রাশিয়া সম্পর্কে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন, অপারেশনের আধঘণ্টা আগে— ফ্যাসিস্টদের প্রতিহত করছে রাশিয়া— এই খবর শুনে তাঁর মুখ নাকি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তিনি বলেছিলেন, 'পারবে পারবে, ওরাই পারবে।'

রাশিয়া রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তীর্থক্ষেত্র, আনন্দ জানতো; তবু রাশিয়া আক্রান্ত হয়েছে জেনেও সে গভীর কোনো আলোড়ন অনুভব করেনি। মনে হয়েছে স্বাভাবিক, আবহমানের একটা পর্যায় মাত্র। রণ-রক্ত-সফলতা— এই তো ইতিহাসের চালিকাশক্তি, সত্য; তবে তা একমাত্র সত্য হ'তে পারে না, ইতিহাসে বলরামেরা আছেন, বুদ্ধ আছেন, অশোক—

মহামতি অশোক আছেন। এইসব স্বাভাবিকতায় সে নিরুদ্বেগ ছিল; সবই স্বাভাবিক। কেবল কোনোটা ভয়াবহ স্বাভাবিক, এই যুদ্ধ তেমনই; তার জীবন থেকে বনির চ'লে যাওয়া এমন-কী মনিয়ার মৃত্যুও— এই ভয়াবহ যুদ্ধের আবহাওয়ায় যখন আচ্ছন্ন মাছির মতো লোক মারা যাচ্ছে, ভয়ঙ্কর সম্ভাবনায় তাদের বেঁচে থাকা, তা নিয়ে যখন প্রভার সঙ্গে কথাও হয়েছে, তখন আনন্দ স্বপ্নে দেখেছে— মনিয়া জলের ভিতর শুয়ে আছে আর রোদ্দুর তাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে— এসবই স্বভাবদোষ কিংবা ঘোর— গভীর হৃদয়ের ঘোর, অলীক যেন-বা। কিন্তু অলীক কেন, শান্তিসুধা কি তেমন কোনো নারী নন? শান্তিসুধাকে তেমনই তো মনে হয়েছে। কী নিবিড়!

কে নাকি শান্তিসুধাকে জিগ্যেস করেছিল, তাঁর কোনো প্রেমিক আছে কিনা। শান্তিসুধা হেসে বলেছিলেন, 'না। খুঁজছি।' একথা জেনেই হয়তো আনন্দর আজও শান্তিসুধাকে দেখে মনে হয়— এই মেয়ে কত ধূসর যুগ রক্তাক্ত যুগ পেরিয়ে এসেছে তার জ্ঞানময় প্রেমিককে খুঁজতে গিয়ে!

নলিনী কি তেমন কেউ? নইলে কেন সে বার বার আবৃত্তি করে: হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে?

ভেবলু নিশ্চয়ই তার জ্ঞানময় প্রেমিক হয়ে উঠেছে।

জ্ঞানময় প্রেমিক আর গভীর হৃদয়ের নারী মিলিত হ'লে কি এ-পৃথিবী বুদ্ধ, যিশু, কবীর, লালনের মতো মানুষকে পায়? কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতো কাউকে? আর যদি বিপরীতটা ঘটে— গভীর হৃদয়ের পুরুষ আর জ্ঞানময়ী যদি মিলিত হয়? তাহলে কি পৃথিবীতে মহামানবীদের জন্ম হবে? হয়তো। কিন্তু আমার কোনো আশা নেই। তাহলে এ-যুদ্ধের বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবো আমি?

একটা অস্থিরতা, কিছু করতে না-পারার গ্লানি আনন্দর চৈতন্যকে একেবারে ঘোলাটে ক'রে ফেলেছিল। তাতে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হলো— কোলকাতার কবি-লেখকেরা সোমেন চন্দর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন; শুরুতে প্রমথ চৌধুরি, শেষ নামটি বিষ্ণু দে; —কোলকাতায় থাকলে, চব্বিশতম নামটি তার হ'তে পারতো। বুদ্ধদেব আপাতত একুশে আছে। আমি নেই কোথাও।

ইদানিং আনন্দর মনে হচ্ছে— কারুবাসনা, ইতিহাসচেতনা ছাড়াও বাস্তববোধও খুব জরুরি। শিল্পকৃতির জন্য তো বটেই, সম্পর্কের জন্যেও। আমি স্মৃতি আর স্বপ্ন নিয়ে এত মশগুল ছিলাম যে, আমার একদা চেনা পৃথিবীতে, আমার কোনো জায়গা নেই। সেই কতকাল আগের হেমন্তের প্রান্তর যেন— সময়টা কেবল আলাদা। ভোর, নরম আলোয় ভ'রে আছে চরাচর। কিন্তু আনন্দ দিকশূন্য। দিগন্তে সে শুকতারা খুঁজলো। নেই। থাকলে তাকে শুধানো যেতো। একজন চাষি। তাকেই জিগ্যেস করলো। চাষি তাকে দিক চেনালো। তবু চিনলো না যেন। কোন্দিকে যাবো? ডানদিকে। ডান দিকই

প্রশস্ত যেন। কিন্তু চলতে-চলতে অনেকটাই তো বাঁ-দিকে চ'লে এসেছি।

আনন্দ ডানহাতি পথ নির্দেশমতো বেছে নিয়েছে— যে পথ ক্রমে নগরমুখী—

আনন্দ হাঁটছে...

কেমন যেন তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। যেন জলশূন্য কোনো এক দেশ অথচ এখানে একদিন যেন সমুদ্র ছিল, তেমনই ধূ-ধূ— বিভ্রম, ওই নীল জলধি দিগন্ত বিস্তৃত; এই আবার একদা জলচিহ্ন— প্রস্তরীভূত; সহসা আনন্দর মনে পড়লো সগর রাজার উপাখ্যান, অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটছে, ছুটে আসছে— পররাজ্যলোভী সগরের মতো কি এই হিটলার...

কপিল তবে কে?

মা-সে-তুং? স্তালিন?

আনন্দ স্বপ্ন দেখছিল, নাকি ভাবছিল— ঠিক বুঝতে পারলো না। দুপুরে খেয়েদেয়ে একটু শুয়েছিল, চোখ বুজে ভাবছিল— এটাও ঠিক। স্বপ্নের মধ্যেও ভাবনা চলে? সত্যি-সত্যি গলা কিন্তু শুকিয়ে গেছে। এখন এক গ্লাস জল পেলে ভালো হতো। সবাই হয়তো একটু গড়িয়ে নিচ্ছে। হয়তো তন্দ্রাচ্ছন্ন। আনন্দ উঠলো। জল খেলো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে মানুষ— যেই দেশ টিকে থাকে সে-ই
ব্যক্তি হয়, রাজ্য গড়ে— সাম্রাজ্যের মতো কোনো ভূমা
চায়। ব্যক্তির দাবিতে তাই সাম্রাজ্য কেবলই ভেঙে গিয়ে
তারই পিপাসায়
গড়ে ওঠে।

সত্যানন্দ আরও জীর্ণ-শীর্ণ। ন্যুব্জ। মুখমণ্ডল থেকে ঋষি-লাবণ্য ঝ'রে গেছে সেই কবে। দু'চোখে তাঁর 'কী চেয়েছিলাম আর কী হলো', তার সঙ্গে 'আরও কী যে হবে!'— এমন একটা ভাব, একটু বিস্ময়ের আভাস থাকলেও তাঁর ভাবখানা হালভাঙা নাবিকের মতো।

উঠোনে পায়চারী করতে-করতে বাবাকে দেখছিল আনন্দ। কিছুদিন আগে বৃষ্টি হওয়ায় উঠোনের ঘাসেরা এখন খুবই সবুজ। ওপাশটায়, কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে আরও নিবিড় ঘন— যেন সবুজ কার্পেট; তার ওপর ঝ'রে পড়া কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি। সবুজের ওপর লাল আলপনা হয়ে আছে। এসব নিবিষ্ট দেখবার জিনিস। কিন্তু আজ ওই মানুষটি হঠাৎ যেন দেখবার জিনিস হয়ে উঠেছেন।

আনন্দ ভাবছিল। সত্যানন্দ ভাবাচ্ছিলেন তাকে। হালভাঙা নাবিক— না-ভঙ্গিতে মাথা নড়ছে আনন্দর, উপমাটা যেন সত্যানন্দের ক্ষেত্রে একেবারেই অবাস্তব।

আনন্দ স্থির। বাবাকে দেখছে। নিবিষ্ট মনেই দেখছে।

সত্যানন্দের পৃথিবী এখন ধূসর, মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন।

যুদ্ধের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে যে যুবক, তারও পৃথিবী ধূসর, মৃত্যুও সত্য সেখানে। কিন্তু লক্ষ করেছো— সত্যানন্দের মুখে কোথাও আতঙ্কের ছায়া নেই! কেমন একটা প্রশান্তি— সন্ধ্যায় পাখিদের কাকলি যেভাবে নিঃস্বর হয়ে যায়, তেমন— একটা ঘুমের আয়োজন যেন, যে ঘুম থেকে বাবা আর জেগে উঠবেন না কোনোদিন— ভিতর আর বাইরের কী আশ্চর্য সমন্বয়! যদি কোনো এক দিক ট'লে যেতো, তাহলে একটা বিকৃতি এসে যেতো, কথায় যাপনে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো আনন্দ।

বাবা তেমন সাংসারিক সফলতা পাননি— অথচ পাওয়ার মতো ক্ষমতা যে তাঁর ছিল না, এমন নয়। শিক্ষকতার প্রতি দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে পারলেই তিনি সফল হতেন, আমার কাকারা যেমন হয়েছেন। কিংবা, অত ধর্মনিষ্ঠ না-হ'লেই পারতেন।

আনন্দ পায়ে-পায়ে সত্যানন্দের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সত্যানন্দ মুখ তুলে চাইলেন। পুরু কাচের মধ্য দিয়ে তাঁর ফ্যাকাসে ঝাপসা চোখ-দুটো কেমন বেঢপ দেখলো আনন্দ।

—'কে? মিলু!'

—'হ্যাঁ বাবা।'

হাতের ইশারায় বসতে বললেন।

আনন্দ বসলো।

—'কিছু বলবে?'

—'না। তেমন কিছু বলার নেই।'

—'জানতে চাও না কিছু?'

আনন্দ চমকে উঠলো।

—'ইচ্ছে করে না বুঝি?'

আনন্দ কিছু বলতে পারছে না।

—'আচ্ছা, আমিই তোমাকে একটা প্রশ্ন করি—' ব'লে তিনি অভ্যাস বশত সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। তারপর উর্দ্ধপানে মুখ তুলে, ফের মাথাটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে ব'সে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আনন্দর মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে বললেন, 'এই অনন্ত দেশ-কালে তুমি কে, কোথা থেকে এসেছো, তোমার কাজ কী?'

—'বাবা, এ তো দর্শনের প্রশ্ন; পড়েছি। নিজেকে যে এ প্রশ্নটা করিনি কখনও— এমন নয়।'

—'উত্তর পেয়েছো?'

—'নতুন কোনো উত্তর পাইনি—'

—'পুরনো উত্তরে তুমি কি তৃপ্ত?'

আনন্দ উত্তরগুলোকে মনে মনে সাজালো— আমি পবব্রহ্মের অংশ; ব্রহ্ম থেকে এসেছি; আমার কাজ নিজেকে জানা। আনন্দ বললো, 'না।'

—'কেন?'

—'আমার মনে হয় আমি এই বিশ্বপ্রকৃতির অংশ।'

সত্যানন্দের কুঁচকে যাওয়া ঠোঁটে হাসির ফুটি-ফুটি আভা।

—'আমি এসেছি জীব-প্রকৃতি থেকে।'

সত্যানন্দের ঠোঁট-দুটো যেন বাঃ-ভঙ্গিতে কেঁপে উঠলো।

আনন্দ শেষ প্রশ্নটার উত্তর যেন দিতে পারছে না।

সে চুপ। সত্যানন্দ বললেন, 'তোমার কাজ?'

—'এক সময় মনে হতো— কবিতা লেখা।'

—'কেন কবিতা লেখো তুমি?'

আনন্দ নীরব।

—'এ প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে না— ভেবো! আসলে, সব মানুষের কাজ হচ্ছে— সত্যকে জানা। এবং জানানো।' ব'লে তিনি গোঁফে তা দিলেন।

নিদাঘের শেষ বিকেলের আলো, নিস্তরঙ্গ হাওয়া কেমন বদলে হয়ে গেল সূর্যচেতনার ভোর। আশ্চর্য সেই ভোর। আনন্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সত্যানন্দের ভাবগম্ভীর কণ্ঠস্বর:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

স্বপ্ন-স্মৃতি-কল্পনা— একটা আবর্ত তৈরি হচ্ছে, ক্রমে একটা বলয়, সেই বলয়ের মধ্যে শিল্পকৃতির মতো সত্যানন্দ ব'সে আছেন।

তিনি বললেন, 'কিন্তু অন্ধকার— এমন অন্ধকার আগে দেখিনি, অদ্ভুত।' তারপর কোন্ এক ধূসর জগৎ পরিভ্রমণ ক'রে বললেন, 'এমন অন্ধকারের মধ্যে থেকেই বোধহয় উপনিষদের ঋষি আলোর কথা ভেবেছিলেন।' সত্যানন্দের ঠোঁট নড়ছে, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়— কিন্তু—' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'তবু আলো যেন এক মরীচিকা—' একটু নীরব থেকে বললেন, 'কোলকাতায় নাকি আমেরিকার সৈন্য ঢুকেছে?'

একেবারে অন্য প্রসঙ্গ, নাকি আগের কথার সঙ্গে কোনো সংযোগ রয়েছে— ঠিক বুঝলো না আনন্দ, বললো, 'হ্যাঁ। অস্ট্রেলিয়ার সৈন্যও আছে। আর ব্রিটিশরা তো ছিলই।' কেমন এক হতাশভঙ্গিতে সত্যানন্দের মাথাটা নড়লো মৃদ, 'ক্রিপ্‌স মিশনের ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত কী দাঁড়ালো— জানো কিছু?' রাজনীতি বিষয়ে এভাবে কৌতূহল প্রকাশ করতে এর আগে আনন্দ দেখেছে ব'লে মনে করতে পারলো না। হয়তো খবরের কাগজ পড়তেন ব'লে দরকার হয়নি— এমন ভাবনাতে আনন্দর অবাক হওয়াটা ফিকে হয়ে গেল। বললো, 'কাগজ তো লিখছে— কংগ্রেস ক্রিপ্‌সের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।'

—'কেন?'

—'স্বাধীনতা বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তাছাড়া ফজলুল হকের সেই প্রস্তাব,— মুসলিমপ্রধান অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র— ক্রিপ্‌স সাহেব মেনে নিয়েছে।'

—'এই আশঙ্কাই করছিলাম। পুবের এই অংশে যদি কোনো রাষ্ট্র গঠন হয়— আমাদের বোধহয় চ'লে যেতে হবে।'

সত্যানন্দ, মাটিতে ভর দিয়ে হাঁটতে শেখা শিশু প'ড়ে গিয়ে যেভাবে উঠে দাঁড়ায়, দাঁড়ালেন— ঝুলিয়ে রাখা লাঠিটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেমে এলেন উঠোনে। আনন্দ তার পাশে। সত্যানন্দ চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'জন্মভমি ছেড়ে মন কোথাও যেতে চায়নি—'।

আসন্ন বিচ্ছেদভাবনায় তাঁর মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। তাঁকে অসহায় বিপন্ন দেখাচ্ছে। আনন্দ বললো, 'এমনও হ'তে পারে, রাজনীতি অন্যদিকে মোড় নিলো। আর, তাছাড়া কংগ্রেস তো চাইছে না।' সত্যানন্দ বললেন, 'সঙ্ঘ নয়, ব্যক্তি— নেহেরু বনাম জিন্না। সবই শেষপর্যন্ত ব্যক্তির দাবি—'

একটু চুপ থেকে বললেন, 'রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও, হয়তো সে-কারণে এই উপলব্ধি হয়েছে— ব্যক্তির কণ্ঠস্বরকে কিছু লোকের মনে হয় তাদেরই কণ্ঠস্বর, আর তাকেই মনে করা হয় সমষ্টির প্রশ্ন, দাবি; ব্যক্তিকে তখন আমাদের মনে হয় নচিকেতার মতো কেউ।'

অস্তসূর্যের আভা সত্যানন্দের জীর্ণ মুখমণ্ডলে। নচিকেতা বাবার আদর্শ— কতবার এই নাম তাঁর মুখে উপমা-অনুষঙ্গ হয়ে এসেছে।

—'কিন্তু মরীচিকা।'

সময় সম্পর্কে হঠাৎ তাঁর সম্বিৎ ফিরলো যেন। বললেন, 'সমাজে যেতে হবে।' ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন।

আনন্দ বাড়ির সামনের রাস্তা ধ'রে নদীর দিকে হাঁটছে...

বাবা উপসনায় বসবেন। পবব্রহ্মের প্রতি তাঁর প্রীতিজ্ঞাপন করবেন। অনুভব করবেন হৃদয়ের গভীরে তাঁর উপস্থিতি, বিশ্বচরাচরের প্রতিটি বস্তুকণায় তাঁর প্রকাশ, তাঁর কল্যাণকর স্পর্শ। তব, হয়তো প্রার্থনা জানাবেন: মানুষের শুভবুদ্ধি হোক!

এ যুদ্ধ থেমে যাক!

একটু পরেই এ পৃথিবীর সব গির্জায়-চৈত্যে, মঠ-মন্দিরে-মসজিদে জ্ব'লে উঠবে মঙ্গলদীপ, মঙ্গলধ্বনি...

তব, নিষ্প্রদীপ হয়ে থাকবে শহর, নগর, গ্রাম— তিমির রাত্রি— এই রীতি।

কোথাও গভীর রাত্রি এখন, ঘুম নেই বিধ্বস্ত জনপদে, কোথাও বোমারু বিমান, সাইরেন; অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট গান, বিস্ফোরণ, বিদীর্ণ...

অলিভ রঙের লরি, কনভয় বোঝাই হিংস্র মানবিক মুখ— অলিভ পাতা তবু শান্তির প্রতীক।

এই ভাবনার মধ্যে ঢুকে পড়লো সে, কবে একদিন স্টাফ রুমে যুদ্ধ-বিষয়ক কথাবার্তার টুকরো-টুকরো কথা:

—'যুদ্ধ অনিবার্য। শান্তির জন্যই যুদ্ধ।'

—'যুদ্ধ বীভৎস— ঠিকহ, তবু যুদ্ধ না-হ'লে সভ্যতার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যেতো।'

—'প্রেম আর ঈর্ষার মতো জৈবিক এই যুদ্ধ প্রবণতা।'

আনন্দ সেদিন কোনো কথা বলেনি। কেবল মেনে নিতে না-পারার ভঙ্গিতে তার মাথাটা নড়েছিল মৃদ, কেউ খেয়ালও করেনি; কিংবা, ভেতরে আলোড়নটা যত তীব্র ছিল, বাইরে তার প্রকাশ ততটাই ছিল মৃদু। কিন্তু আজ সে বললো, 'যুদ্ধ অদিম-হিংস্র প্রবৃত্তির প্রকাশ ঠিকই কিন্তু প্রেম তার উপমা কখনোই নয়— প্রেম মানে আলো, যুদ্ধ মানে অন্ধকার— নিষ্প্রদীপ অন্ধকার—' যেন সকলকে উদ্দেশ ক'রে বললো সে। সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করার উপায় খুঁজতে গিয়ে আনন্দর মনে পড়লো অগ্নির উপাখ্যান— প্রমিথিউস; বুদ্ধর মুখ সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তাঁর চোখে জল; বেদনার্ত হয়ে উঠলো সে যিশুর মুখচ্ছবি মনে ক'রে; তবু অন্ধকার, অদ্ভুত অন্ধকার— সহসা আনন্দর মনে হলো, কোন্ এক আলোর যুগে জন্মেছিল সে, তারপর অন্ধকারে পুনর্জন্ম হয়েছে বার বার— এই পথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁটছে যে আনন্দ, যেন আড়াই হাজার বছরের প্রবীণ সে বুদ্ধকায়ার সেই গাছটির মতো— এখনও আলো অনুভব করি। যদিও যুদ্ধের কথকতা ঢের পছন্দ আমাদের— ট্রয়-কুরুক্ষেত্র...

আনন্দ হাঁটছে...

তবু গণিকালয়— কুরুক্ষেত্রের প্রান্তে গণিকাদের তাঁব, নাকি দিল্লির সেই ব্রথেল! সেই মেয়েটির কথা মনে পড়লো। আশ্চর্য সুন্দর চোখের সেই মেয়ে— রক্তের ভিতর অনাদি সৃষ্টির গুঞ্জরণ— অলৌকিক এক ইতিহাস-যানের সওয়ারী আনন্দ... পৌঁছে গেছে সেই তাঁবুতে— মাতাল সেনাপতিদের হাতে ব্যবহৃত হচ্ছে নারী।...

অন্ধকার ব্যাপ্ত চরাচর— কোথাও নগর-বন্দর নেই যেন আর, এই অন্ধকার-শেষে কোথাও যেন মানবিক ভোর আসবে না আর।

উল্লাস-লালসার মশলামেয়েটির মদির-ছেনালি চাহনি-পারে এক পলক করুণ-আর্ত চাহনি দেখতে পেলো আনন্দ— যদি রোশবহ্নি, প্রজ্ঞাদীপ্তির অবশেষটুকও যদি দেখতে পেতাম, শান্তিসুধার চোখে দেখেছি যেমন—

আনন্দর মনে হয়, অমন মেয়েরা কবে যে আমেরিকার কংগ্রেস ভবনে মানবজাতির প্রতিনিধিত্ব করবে। মনে হয় স্বাধীন ভারতে শান্তিসুধাকে অমন কোনো ভূমিকায় দেখতে পাবে সে।

ক্রেম্‌লিনে কি অমন বেতসতন্বী কেউ আছেন?

আনন্দ হাঁটছে...

অন্ধকার, লেলিহান শিখায় যেন অন্ধকার জ্বলছে, সেই অগ্নিপরিধির মাঝে আনন্দ নিজেকে দেখতে পাচ্ছে, সে যেন খুঁজছে কাউকে, সহসা দেখতে পেলো এক নারী, সে নারী মনিয়া নয়, বনি নয়, জ্যোতির্ময়ী নয়। কে তুমি?

বিশাল ডানার সাদা এক পাখি ডানা ঝাপটালো।

মেয়েটি হাসছে, যেন বলছে, উত্তর পেলে?

আগুনের শিখায় সুরের পরশ লাগলো।

আনন্দ বললো, সুজাতা?

—ভুলে গেলে, আড়াই হাজার বছর পেরিয়ে এসেছো— আমি সুচেতনা।

আনন্দ স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

তার সম্মুখে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার এ জীবনের ভোর বেলা থেকে—
যে সব ভূখণ্ড ছিল চিরদিন কণ্ঠস্থ আমার;
একদিন অবশেষে টের পাওয়া গেল
আমাদের দুজনার মতো দাঁড়াবার
তিল ধারণের স্থান তাহাদের বুকে
আমার পরিচিত পৃথিবীতে নেই

নানা কারণে আনন্দর মন ভালো থাকছে না।

বাড়িতে থাকলে, এক অদ্ভুত ধরনের অশান্তি— প্রভার নানান বায়না, দাবি— সঙ্গত কিন্তু অবুঝের মতো; কখনও আনন্দ প্রতিশ্রুতি দেয়— রাখতে পারবে না জেনেও; কখনও নীরব থাকে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে হু-হু। প্রভা এসব বুঝতে চায় না। বাবার প্রতি তার কেমন যেন বিরাগ জন্মাচ্ছে। বাবার জন্য একটা উদ্বেগ টের পাচ্ছে আনন্দ। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে একেবারে। পড়াশুনো আর করতে পারছেন না। মৃত্যুর ছায়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি। তা প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর নানান কথায়। আনন্দ স্বপ্নে দেখেছে সত্যানন্দ শ্বেতপাথরের মূর্তি হয়ে ব'সে আছেন তাঁর পরিচিত ভঙ্গিতে।

কলেজে— যতক্ষণ ক্লাসে থাকে, কাটে মন্দ না। তবে ছাত্রসংখ্যা ক'মে গেছে। স্টাফ রুমটাকে কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। মন খুলে কেউ কথা বলছে না। পাছে প্রকাশ পেয়ে যায় সে কোন্ পক্ষে। রাশিয়া আক্রান্ত হবার পর-পরই কমিউনিস্টরা ইংরেজদের সমর্থক হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসরা চটেছে খুব। ওদিকে সমাজতন্ত্রীরা কমিউনিস্টদের সহ্য করতে পারছে না। আনন্দ অবাক হয়— এরা সবাই নাকি স্বাধীনতা চায়!

গত মাসের আট তারিখে গান্ধিজী স্লোগান তুলেছেন, কুইট্ ইণ্ডিয়া! ডু অর ডাই!

অনেকদিন ঝিমিয়ে থাকার পর ফের দারুণ ডানা ঝাপ্টানি! ধরপাকড় চলছে খুব। এ কলেজের প্রফুল্ল চক্রবর্তী, শান্তিসুধা গ্রেফতার হয়েছেন।

আর কবিতার পৃথিবীতেও কীসের এক ছায়া পড়েছে যেন। তার নতুন কবিতার প্রতি বুদ্ধদেবের আগ্রহ ক'মে যাচ্ছে। তবে পাঁচ-সাত বছর আগেকার কবিতার প্রতি তাঁর আগ্রহ যে অমলিন, গত চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে দেওয়া বিজ্ঞাপনে তা প্রকাশ পেয়েছে। 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছে বুদ্ধদেব, সেই সিরিজে আনন্দ আছে— এটাই একটা ভালো খবর,— অন্তত বুদ্ধদেবের শেষ চিঠিটা পাওয়ার আগে পর্যন্ত। সিরিজ গ্রন্থে তার যে বারোটি কবিতা নির্বাচিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি কবিতা 'কবিতা'য় প্রকাশিত এবং সময়ের পরম্পরা থাকায় ওই নির্বাচন আনন্দর মেনে নিতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এই সংখ্যার 'কবিতা'য় বিজ্ঞাপন দেখে আনন্দ জানতে পারলো— গ্রন্থের নাম: বনলতা সেন। এ ধরনের নাম তার পছন্দ নয়— নামের মধ্যে একটা তাৎপর্য থাকবে, থাকবে কাব্যভাবনার নির্যাস— নামটা মন খারাপের একটা কারণ হয়ে ছিলই, তার ওপর নতুন মাত্রা— এই চিঠি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক বাংলা কবিতার একটি ইংরেজি সঙ্কলনগ্রন্থ প্রস্তুতির পথে। সেই সঙ্কলনের জন্য— নির্দিষ্ট কতকগুলি কবিতা অনুবাদ ক'রে পাঠাতে বলেছে বুদ্ধদেব। সব কবিতাই ওই 'বনলতা সেন' পর্যায়ের; ওই পর্যায় আনন্দর জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ব'লে তার মনে হয়— পরবর্তী পর্যায়ের দু'-একটি কবিতা না-থাকলে অ্যান্থোলজিতে সে কোনো ক্রমেই রিপ্রেজেণ্ট করতে পারবে না— এমন ভাবনায় আনন্দ চিঠি লেখার কথা ভেবেছে। তার আগে অনুবাদ করা দরকার।

একটা অস্থিরতা কাজ করছে, উৎস যে কোথায়— ঠিক বুঝতে পারছে না। একটা ভাবনা থেকে তাকে অন্য বিষয়ে ঢুকে পড়তে হচ্ছে। কোনোটাই সম্পূর্ণ হ'তে পারছে না। এই এখন যেমন, বনলতা সেন-এর প্রথম স্তবকের শেষ পংক্তির দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে সে মনে মনে ইংরেজি শব্দ সাজাচ্ছিল— আই হ্যাড বনলতা সেন অব নাটোর অ্যাণ্ড হার উইজ্ডম্— বাক্যটা লেখার পর উইজ্ডম্ শব্দটার ওপর পেন্সিল বোলাতে-বোলাতে ভাবলো, বনলতা আমাকে নিঃসন্দেহে খ্যাতি দিয়েছে।

তাহলে নাম হিসাবে তাকে অপছন্দ করছো কেন? লক্ষ করেছো, নামটার মধ্যে কেমন একটা তুক্ ব্যাপার আছে!

আনন্দ কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়লো। একটা গভীর শ্বাস বুকের মধ্যে ঘূর্ণি তুললো।

আই হ্যাড হার উইজ্ডম্— বাট... আমি তাকে হারায়ে ফেলেছি।

তবু তো খুঁজেছো!

আনন্দর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, যেন আগুনের শিখা থেকে ছড়ানো আভা নাচছে তার মুখমণ্ডলে। অগ্নিপরিধির গান শুনতে পাচ্ছে আনন্দ; দেখছে— শরীরে এক ক্ষেত কাশফুল জড়ানো মেয়েটিকে, উজ্জ্বল সাদা ডানার আন্দোলন...

বুদ্ধদেব, যে নির্জন, নির্জনতার পথে একদিন আমি হেঁটেছি, সে-পথে অশ্বখুরের শব্দ ছিল না, যুদ্ধ ছিল না, ছিল প্রকৃতির নিবিড় সুর; ঠিকহ; কিন্তু সে-পথ আজ যুদ্ধ-পীড়িত, বুভুক্ষ— আমাকে উৎসর্গ করা তোমার সেই কবিতার মতো আমি আর থাকতে পারলাম না ব'লে আমাকে ক্ষমা কোরো! হয়তো এ আমার অক্ষমতা!

কে যেন তার কাঁধে হাত রেখেছে, আবেগ রুদ্ধ গাঢ় স্বর সে শুনতে পেলো, যে যা-ই বলুক তুমি সময়চেতনার কবি!

সত্যি-সত্যিই তার কাঁধে হাত— প্রভা, প্রভাকে আন্তরিক হ'তে দেখে আনন্দ খানিকটা বিমূঢ় যেন, কথাটা কি প্রভা বললো?

—'তুমি কি কিছু বললে?'

—'না। বলবো।'

—'বলো।'

—'আমার ভালো লাগছে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কী?'

—'এই— এইভাবে থাকতে।'

—'আমরা সবাই তো আছি— এভাবেই থাকতে হবে। নিস্তার আছে ব'লে তো মনে হচ্ছে না।'

প্রভার হাত কাঁধ থেকে স'রে গেছে।

—'কোথাও কি ভালো অবস্থায় থাকার মতো জায়গা আর আছে এ পৃথিবীতে? বরং এখানে আমরা ভালো আছি— জাপানি বোমার ভয় ততটা নেই।' আনন্দ মুখ তুলে প্রভাকে দেখলো।

এই মেয়েটাতে উইট্-উইজ্ডম্ তো ছিল— কীভাবে যে নষ্ট হয়ে যায় সব! এ-ই তো হ'তে পারতো শান্তিসুধার মতো কেউ! সম্ভাবনা ছিল।

—'সত্যি বলতে আমারও ভালো লাগছে না— মাঝে-মাঝে ভাবি কলেজ ছেড়ে একটা স্কুল তৈরি করি যেখানে তুমি আমি— আমরা পড়াবো। ভাবি, কিন্তু—'

—'তুমি শুধু ভাবতেই পারো। আর কিছু পারো না— সে উদ্যম তোমার নেই—'

আনন্দ আশঙ্কা করছিল এখনই কয়েকজনকে উদাহরণ হিসেবে টানবে। তখন তার বলতে ইচ্ছে করবে, হয়তো ব'লেও ফেলতে পারে,— তারা কেউ কবিতা লেখে না।

কিন্তু না, প্রভা আর কিছু বললো না। তবে প্রভার মূল্যায়ন যথার্থ। আনন্দ বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছো। কিন্তু প্রভা, নতুন স্কুল তৈরির ব্যাপারটা— তোমার কি ঠিক মনে হচ্ছে?'

—'বেঠিকের কী আছে— স্কুল তো তোমাদের রক্তে রয়েছে, তুমিও করতে পারো!'

—'তুমি পারো না?'

—'মানে?'

—'উদ্যোগ নিতে।'

প্রভা ভাবছে।

—'আমার ভাবনা তোমার উদ্যোগ—' আনন্দকে কেমন যেন উদ্দীপিত, উজ্জীবিত দেখালো, 'ভাবো— আমরা দু'জনে মিলে কিছু একটা করছি।'

প্রভা ভাবছে...

আনন্দ সম্মোহকের ভঙ্গিতে বললো, 'হয়তো তার মধ্যে নিস্তার রয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা অশ্বত্থ কি বট ছিল, নেই— স্মৃতি-বশত কিংবা অভ্যাস-বশত যে শূন্যতা অনুভূত হয় তেমনই এক শূন্যতার দৃশ্য হঠাৎ-হঠাৎ আনন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। গত বছর বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ চ'লে গেলেন— যে শূন্যতাবোধ তাকে গ্রাস করেছিল, এবছর বাইশে নভেম্বরে সত্যানন্দ চ'লে যাবার পর আরও তীব্র হয়ে ফিরে এসেছে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাবার স্মৃতিকথা লিখতে-লিখতে আনন্দর মনে হয়েছিল, তীব্রতা ক'মে আসবে, যেমন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে— তাঁর স্মরণে কয়েকটি কবিতা লেখার পর। কিন্তু বাবার ক্ষেত্রে তা হলো না।

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাওয়ার কয়েকদিন পর থেকেই সব কেমন স্বাভাবিক হ'তে থাকলো— ভেবলু চ'লে গেছে। যাবার সময় সবাই তাকে ব'লে গেল চিন্তা না-করতে, মায়ের দিকে লক্ষ রাখতে। তাদের আশ্বস্ত করতে আনন্দ মাথা কাত্ করেছে প্রতি ক্ষেত্রে।

এই শূন্যতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে 'বনলতা'— সেবার 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশের সময় সর্বানন্দ ভবনে একটি জন্মের ঘটনা ঘটেছিল, এবার মৃত্যু— মৃত্যুর পনেরো-কুড়ি দিন আগেও আনন্দর মনে হয়নি এত তাড়াতাড়ি সত্যানন্দের দিন ফুরিয়ে যাবে, বরং তাঁকে খুব প্রগলভ মনে হচ্ছিল, স্মৃতি-স্বপ্ন বিষয়ে কত কথা! তার মধ্যে একটা দিনের স্মৃতি বার বার ফিরে আসছে:

—'জানিস তো মিল, সব মানুষই বুঝতে পারে তার মৃত্যুর আগমন— তোর ঠাকুর্দার তখন মৃত্যুর বয়স হয়নি, মাত্র সাতচল্লিশে চ'লে গেলেন তিনি; তোর জেঠামশাই-আমি তখন কোলকাতায়— মৃত্যুর সময় তাঁর পাশে থাকতে পারিনি— একটা দুঃসহ দুঃখবোধ বয়ে বেড়াচ্ছিলাম, কতদিন পর, একদিন আশ্চর্য এক স্বপ্ন দেখলাম— বাবা মৃত্যুশয্যায়, তিনি বলছেন: পিতা যেসব কর্তব্যকর্ম নিজে সম্পন্ন করতেন, মৃত্যুর সময়ে সেইসবের ভার তিনি পুত্রতে অর্পণ করেন— ব'লে তিনি বললেন,— ত্বম্ ব্রহ্ম!

কোনো নির্দেশ ছিল না, তব, আমি ব'লে উঠলাম,— অহম্ ব্রহ্ম!

তিনি বললেন,— ত্বম্ যজ্ঞঃ!

আমি বললাম,— অহম্ যজ্ঞঃ!

তিনি বললেন,— ত্বম্ লোকঃ!

আমি বললাম,— অহম্ লোকঃ!

তাঁর দু'হাতের মধ্যে আমার হাত— পরমশান্তিতে তাঁর আঁখিপল্লব মুদিত হলো।'

ওই স্বপ্নের পর সত্যানন্দ একদিন অনুভব করেছিলেন তাঁর সেই দুঃখবোধ আর নেই।

সত্যানন্দের শেষ সময়ে তাঁর পাশেই ছিল আনন্দ। তাঁর হাতটা একটু-একটু ন'ড়ে উঠছিল। তিনি কি পুত্রের হাত ধরতে চাইছিলেন— তাঁর ঠোঁট নড়ছিল— তবে কি তিনি

সর্বানন্দের মতো বাস্তবত তাঁর কর্তব্যকর্ম সব আনন্দতে অর্পণ করতে চাইছিলেন? —এরকম ভাবনায় আনন্দর চোখের সামনে ভেসে ওঠে সর্বানন্দের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর তাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডল, 'যেন গভীর ঘুমের আস্বাদে বিভোর— এমন প্রশান্তি!' তখন সর্বানন্দের মৃত্যু-মুহূর্তের বিবরণ মনে পড়ে আনন্দর, স্পষ্টত শুনতে পায় সত্যানন্দের কণ্ঠস্বর 'পরম শান্তিতে তাঁর আঁখিপল্লব মুদিত হলো।' আর আনন্দর মনে হয় সেদিন সত্যানন্দ মনে মনে তার হাত ধ'রেই ছিলেন আর বিড়বিড় করছিলেন, বলো পুত্র, আমিই ব্রহ্ম।

আনন্দরও বলতে ইচ্ছে করে, আমিই ব্রহ্ম! কিন্তু তার নিজের মধ্যে আজ আর সে ব্রহ্মকে অনুভব করে না।

কিন্তু তিনি যদি বলতেন! কেন বলতে পারেননি? তবে কি দ্বিধা ছিল?

আনন্দ ভাবছিল। তার মনে পড়লো, একদিন সে উঠোনে পায়চারী করছিল। সত্যানন্দ কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, কখন সে সেইসব কথার প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়েছিল—

—'সমাজ টিকবে ব'লে মনে হচ্ছে না।'

—'হ্যাঁ, সমাজগৃহে লোকজনের যাতায়াতও ক'মে গেছে।'

—'মাঘোৎসবেও-বা কত লোক আসছে আর! অথচ বছর-কুড়ি আগেও— কী জমায়েত!'

—'এখন বোঝা যাচ্ছে— সার্মন শোনার জন্য ভিড় হতো কিন্তু সমাজ তো একটা ধর্মক্ষেত্র, গানের আখড়া নয়।'

—'ঠিকই। কিন্তু গান— উপাসনার অংশ।'

—'আসলে কী জানো— ব্রাহ্মধর্ম একটা আন্দোলন— সমাজ জানাতে চেয়েছিল— ধর্ম কী; বুঝাতে চেয়েছিল— পুতুলপুজোয় ধর্ম নেই। আজও চায়, কিন্তু সাধারণ মানুষ জানতে-বুঝতে চাইলে তবে না!'

—'এই যে কমিউনিস্টরা, তারা বুঝাতে চাইছে সাধারণ মানুষের অধিকার কী— বুঝতে হবে! রবীন্দ্রনাথ বুঝেছেন। লিখছেন।'

—'কমিউনিস্টরা তো ধর্মকে আফিংতুল্য মনে করে।'

—'কেন, সেটাও বুঝতে হবে। ধর্ম স্বার্থপরতার নয়— ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলন সেটাই বুঝাতে চেয়েছে, তার মধ্যে মানুষকে ভালোবাসার কথা আছে।'

—'মুশকিল হয়েছে এইখানে— দুনিয়ার সব ভোগসুখের জিনিসের প্রতি মানুষের মনের ঝোঁক, স্বার্থপর না-হ'লে তা পাওয়া যায় না— ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলন এই জন্যেই স্তিমিত হয়ে পড়েছে।'

—'তা না-হ'লে বিহার-ইউপি, যেখানেই বাঙালি— বাঙালিটোলা গ'ড়ে উঠেছে; প্রায় সর্বত্র গ'ড়ে উঠছে কালীবাড়ি 'মুভমেন্ট'— এটা হতো না।'

শুনতে-শুনতে আনন্দ তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, শুনছিল। ওই কথার পর সে বলেছিল, 'স্বদেশি আন্দোলনেও তো কালী-কাল্ট ছিল! এখনও হয়তো আছে।'

তার কথা শুনে সত্যানন্দের চোখ তুলে তাকানোটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আনন্দ— তবে কি মিলুও কালীভক্ত— যেন এরকম একটা দৃষ্টিপাঠ তাঁর চাহনিতে। প্রভার ঘরে দক্ষিণেশ্বরের কালীর একখানা ছাপাই ছোট্ট ছবি কাচের ফ্রেমে বাঁধানো ছিল, হয়তো এখনও আছে, তার খবর কুসুমকুমারীর মাধ্যমে সত্যানন্দ নিশ্চয়ই জেনেছিলেন— সেই অনুষঙ্গে এমনই মনোভাব আনন্দর— হয়তো এরকমই ভেবেছিলেন সত্যানন্দ, আর তাকে লালন করেছেন,— মৃত্যুর সময়েও ওই ভাবনাকে তিনি অতিক্রম করতে পারেননি।

সেদিন আনন্দর দিকে তাকিয়ে থাকার পর সত্যানন্দ যেন তার কথাটা মেনে নিয়েছেন— এমন বোঝাতে তাঁর মাথাটা একটু নাড়িয়ে বলেছিলেন, 'এ-কারণেই তো জাতীয় আন্দোলন হিন্দু-মুসলমানে ভাগ হয়ে গেছে। স্বাধীনতা আমরা কোনোদিনই অর্জন করতে পারবো না।'

—'মিলু!' কুসুমকুমারীর কণ্ঠস্বর।

আনন্দ চমকে তাকালো।

—'অন্ধকারে ব'সে আছিস যে!'

—'এম্‌নি। বাবার কথা ভাবছিলাম— একটা পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেল।'

কুসুমকুমারী আনন্দর মাথায় হাত রাখলেন।

—'কেমন যেন ফাঁকা লাগছে!'

কুসুমকুমারী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—'তুমি কি কিছু বলবে, মা?'

—'তেমন কিছু না। বলছিলাম, ভেবলুর বিয়ের ব্যাপারে একটু চিন্তাভাবনা করা দরকার।'

—'চিন্তাভাবনার কী আছে— পাত্রী তো ঠিক হয়েই আছে।'

—'তব, পাত্রীপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা তো বলতে হবে।'

—'সে তো তোমরা আছো— কাকা, তুমি, ভুবনমামা।'

—'তবু। তুই বড়ভাই।'

বাইরে প্রভার গলা পেয়ে একটু গলা চড়িয়ে আনন্দ বললো, 'তাছাড়া প্রভা আছে! আর তোমরা তো জানো— সংসারের কোন্ কাজটা হয় আমার দ্বারা?' প্রভা বাইরে থেকে টিপ্পনী কাটলো, 'এবার হবে।' আনন্দ বললো, 'মা, একেবারেই ভুলে গেছি— খুকু রয়েছে তো! বরিশাল-কোলকাতা করা আমাদের পক্ষে মুশকিল, খুকুই কথাবার্তা চালাক!'

—'আচ্ছা— খুকুর ব্যাপারটা কী, বুঝতে পারছি না তো!'

—'আমিও; ওকে জিগ্যেস করেছিলাম— বিয়ে করবে না ব'লে ঠিক করেছে— ওর আদর্শ পিসিমা, ছোটকাকা, ভুবনমামাও।'

কয়েক মুহূর্ত পর কুসুমকুমারী গম্ভীরভাবে বললেন, 'শোনো মিল, তুমি ভেবলু-খুকুর দাদা, পিতার দায় কিন্তু তোমাতে বর্তেছে। মনে রেখো!'

কুসুমকুমারী বেরিয়ে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আন?

—'স্যার আছেন?'

চেনা গলা। সম্ভবত প্রভাকে জিগ্যেস করেছে। মঞ্জুও হ'তে পারে। যে-ই হোক, উত্তর দেওয়ার আগেই আনন্দ ব'লে উঠলো, 'হ্যাঁ আছি। আছি।' বাইরে এসে সে দেখলো প্রভা অবাক হয়ে দেখছে ছেলে-দু'টিকে, তাকে বললো, 'আমার ছাত্র।' তাদের ডাকলো, 'এসো! এসো!' এমন প্রাণখোলা আপ্যায়ন! আগে দ্যাখেনি প্রভা। ছেলে-দু'টিও কেমন অবাক দেখছে তাদের স্যারকে। তাদের দু'জনের কাঁধে দু'হাত রাখা আনন্দকে সত্যিই প্রভার অচেনা মনে হচ্ছে। চেহারায় চাপানো রাশভার যেন খ'সে পড়েছে। আনন্দ বললো, 'চলো, ওই ঘাসের ওপর গিয়ে বসি।'

কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় বসলো তিনজন। দু'জন সঙ্কোচবশত নীরব। তৃতীয়জন কীভাবে কথা শুরু করবে— এই ভাবনায়। ছেলে দু'জনই কবিতাভক্ত। একজন কবিতা লেখে। আনন্দ বললো, 'বলো আবুল। কবিতা এনেছো?'

—'হ্যাঁ স্যার!'

—'নির্মল, তুমি?'

—'আমি স্যার কবিতা পড়ি শুধু!'

—'তা কী নতুন কবিতা পড়লে?'

—'এখন স্যার আপনাকে পড়ছি।'

আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে গেল।

আবুল বললো, 'বনলতা সেন

আনন্দ বললো, 'তোমরা তো সব প্রগতিপন্থী— কেমন লাগছে?'

নির্মল বললো, 'নামকবিতাটি তো অসাধারণ।'

—'আর?'

নির্মলের চোখে-মুখে যে মুগ্ধতা তা যেন প্রকাশ করতে না-পেরে সে নীরব।

আবুল বললো, 'স্যার, নির্মল বলতে পারছে না— ও আমাকে যা বলেছে, সেটা বলি— ছবির পর ছবি, মুগ্ধ হয়ে দেখার— সত্যি-সত্যি একটা বেড়ালের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, পায়ে-পায়ে ঘোরে— এই পরিচিত দৃশ্য কিংবা আকাশে ভেসে থাকা একলা চিল, কান্নার মতো ডাক— আমরা শুনেছি, তা, কিন্তু— এই কিন্তুতে এসে থেমেছে নির্মল। এহ্, তুই বল্!'

নির্মল বললো, 'স্যার, কবিতার মধ্যে কি কোনোকিছু বলার কথা থাকে?'

আনন্দ মাথা কাত্ করলো।

—'সেটাই বুঝতে পারছি না।'

AMARBOI.COM

—'প্রগতির কবিতা বুঝতে পারছো?'

নির্মলকে আবুলের দিকে তাকাতে দেখে আনন্দ বললো, 'আমি কিন্তু ঠাট্টা বা ব্যঙ্গ করছি না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বুঝতে পারছো তো?'

আবুল বললো, 'হ্যাঁ স্যার।'

আনন্দর মুখে এক চিলতে হাসি।

নির্মল বললো, 'আমি যদি হতাম বনহংস— বুঝতে অসুবিধে হয়নি।'

আনন্দর মুখের হাসিটা একটু যেন প্রসারিত হলো। একইসঙ্গে তাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। তারপর সে বললো, 'সত্যিই তোমরা বুঝতে পারছো না?'

দু'জনেরই মাথা নিচু হলো।

—'আচ্ছা, শুধুই কি ছবি পাও তোমরা— সুর; সুর পাও না?'

দু'জনেই ব'লে উঠলো, 'হ্যাঁ স্যার।'

আনন্দ এবার হাসতে-হাসতে বললো, 'সুর কি বোঝবার বিষয়?' যেন সায় খুঁজতে আবুল-নির্মলের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললো, 'নিজের কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে আমার ভালো লাগে না— চৈত্র সংখ্যা 'কবিতা'য় বুদ্ধদেবের লেখাটা প'ড়ে দেখো!'

আবুল বললো, 'পড়েছি।'

—'একটা ভালো মন্তব্য করেছেন আবুল হোসেন— ছন্দের ব্যাপারে, পয়ারকে উনি কৃষিযুগের ছন্দ বলেছেন— চতুরঙ্গে; আচ্ছা তোমাদের মনে হয় না— প্রগতির মধ্যে গ্রাম পতনের শব্দ আছে— আর্তনাদ?'

আবুলের চোখ একবার নির্মলের চোখ ছুঁয়ে গেল।

—'প্রকৃতির ধ্বংস আছে না?' ব'লে মুহূর্ত-কয়েক যেন উত্তরের অপেক্ষায় থেকে বললো, 'পড়ো আবুল, কবিতা শুনি।'

পরপর তিনটে কবিতা পড়লো আবুল। কবিতা বিষয়ে আনন্দ কিছু বললো না। আবুল নিশ্চয়ই আশা করছিল। এটা বুঝেও আনন্দ অনেকক্ষণ পর বললো, 'প্রিয় কবির একটা প্রভাব, কবির 'পরে পড়ে, পড়াটা স্বাভাবিক। তোমাকে বলার, প্রিয় কবিকে অস্বীকার করতে শেখো!'

—'স্যার, উপমা ব্যবহার বিষয়ে যদি কিছু বলেন!'

—'বুদ্ধদেবের আলোচনাটা তো তুমি পড়েছো বললে—'

—'হ্যাঁ স্যার।'

—'বুদ্ধদেব যা বলেছেন— আরও একবার মন দিয়ে প'ড়ে নিও!'

নির্মল বললো, 'স্যার, পাখির নীড়ের মতো চোখ— এই উপমাটা— একটু যদি বলেন!'

আনন্দ ভাবছে। অন্যমনস্ক। একটা মুখ মনে করার চেষ্টা করলো। মনে পড়লো না। তারপর কয়েক মুহূর্ত চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকলো। ভেসে উঠলো দুটো চোখ, আশ্চর্য

জীবন্ত! চোখ-দুটোকে একটা মুখের ওপর বসাতে চাইলো— পাথর-পাথর একটা আভাস, শ্রাবস্তীর কারুকার্যই যেন, কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে তলিয়ে যেতে-যেতে ভেসে উঠলো আনন্দ। বললো, 'ডোণ্ট টেক ইট অ্যাজ বিউটি, বাট এসেন্স।'

নারকেল-মুড়ি খেতে-খেতে আরও কত কথা হলো। সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে আনন্দ একবার খুব শব্দ ক'রে হেসে উঠেছে। অবাক হয়েছে আবুল-নির্মল। উঠোনে শুয়ে থাকা কুকুরটা পর্যন্ত চমকে উঠেছে।

নির্মল জিগ্যেস করেছে, 'স্যার হাসলেন যে!'

ও কিছু না ভঙ্গিতে হাসি-হাসি মুখে মাথা নেড়েছে আনন্দ।

তারপর একসময় বলেছে, 'তোমাদের সেই বন্ধুর খবর কী?'

—'কার কথা বলছেন স্যার?'

—'সেই যে, জনগণের কবিতা লেখে যে ছেলেটি!' আনন্দর মুখে মুচ্‌কি হাসি।

আনন্দ এখন ওদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়াস রয়ে গেছে;
তুচ্ছ নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে
রয়ে গেছে মাইন, ম্যাগনেটিক মাইন, অনন্ত কনভয়—
মানবকদের ক্লান্ত সাঁকো;
এর চেয়ে মহীয়ান আজ কিছু নেই জেনে
আমাদের প্রাণে উত্তরণ আসে নাকো।

অশোকের মুখের দিকে কেমন এক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল আনন্দ। একটু আগে নলিনী এখান থেকে উঠে গেছে। কেউ একজন আসবে। তার অপেক্ষায় অস্থির সে। হয়তো গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অশোক একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। তাকে দেখতে-দেখতে আনন্দর মানসপটে ভেসে উঠলো: দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ-প্রান্তর, ধূ-ধূ নির্জন, আকাশ, ভাসন্ত মেঘ— মিলু দেখছে দু'চোখ ভ'রে মেঘেদের উড়ে যাওয়া; ভেবলু তার পাশে দাঁড়িয়ে, সেও মুগ্ধ দেখছে কিছু। আকাশে চোখ রেখে ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখলো মিলু। ভাই তাকালে ইশারায় তাকে আকাশ দেখতে বললো।

ভেবলু দেখছে। আকাশ। মেঘ। মেঘেদের ভেসে যাওয়া। মিলু বললো, 'বড় হয়ে আমি এমন একটা নৌকা তৈরি করবো— আকাশে ভাসবে।' স্বপ্ন-স্বপ্ন চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে, দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বললো, 'তুই সেই নৌকায় ক'রে ভেসে বেড়াবি।'

—'তার মানে নৌকাটা তুই আমারে দিয়ে দিবি!'

মিলু খুশিতে মাথা নাড়লো।

সেণ্টার টেবিলের ওপর পত্রিকাটা সশব্দে পড়তেই আনন্দ টের পেলো একটা বয়েস পর্যন্ত অশোককে কিছু দিতে না-পারার বেদনা। কেবল নিয়েছে সে, বিয়ের পর বেকার জীবনে আরও প্রত্যাশা করেছে— তার কবি-জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে আরও কিছু টাকার যোগান ভেবলু নিশ্চয় দেবে; কখনও ভেবেছে— দেওয়া উচিত প্রত্যাশা মতো ঘটনা ঘটেনি ব'লে তার গল্পের পৃথিবীতে ভাই মৃত ভাগ্যিস গল্পের মতো ক'রে অশোকের জীবনে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। ঘটেনি ব'লেই আজ আমি নলিনীকে পেয়েছি।

গত পরশু নলিনীদের লাইব্রেরি দেখে এসেছে। গত অক্টোবরের শেষ দিকে আনন্দ নলিনীকে চিঠিতে জানিয়েছিল, কোলকাতায় গেলে সে তাদের লাইব্রেরিটা দেখবে। কোলকাতায় এসেছিল, তাদের বাড়িতেই এসেছিল বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে, কিন্তু লাইব্রেরি দেখা হয়নি; এবার দেখা তো হলোই, কেমন যেন একটা অধিকারও পেয়ে গেছে লাইব্রেরিটার ওপর। আপ্লুত হয়ে আনন্দ বলেছে, 'আমার পড়াশুনো খুবই কম— বাবার একটা লাইব্রেরি ছিল বটে— জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনাদের চেয়ে অনেক পিছে প'ড়ে আছি।'

নলিনী বলেছে, 'এবার এগিয়ে যাবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হ্যাঁ। সেরকমই মনে হচ্ছে— আপনি আছেন।'

—'আচ্ছা ভাইয়ের বউকে আপনি বলতে ভালো লাগছে আপনার?'

তখনকার মতো এই স্মৃতিচারণেও আনন্দ সঙ্কোচিত হলো। আর পরক্ষণেই যেমন তার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু বলা হয়নি, আজ সে নলিনীকে উদ্দেশ ক'রে বললো, 'তুমি জ্ঞানময়ী, তাই; শ্রদ্ধেয়া—'

—'কী রে দাদা, কী মনে পড়লো?'

—'তেমন কিছু না—'

—'তব, শুনি—'

একটু ভেবে নিয়ে আনন্দ বললো, 'আমার এক কবি-ছাত্রর কথা মনে পড়ছিল—' অশোকের চোখে শোনার আগ্রহ।

—'একদিন সে জানতে চাইলো আমি জনগণের কবিতা কেন লিখি না। উত্তর না-দিয়ে আমি জিগ্যেস করলাম, তুমি বুঝি প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছো? সে বললো, হ্যাঁ স্যার। এই সমাজ বদলে যাক আমি চাহ, শোষণহীন একটা সমাজ— যেখানে কোনো ভিখিরি জন্মাবে না।'

নলিনী এসে বসলো।

—'তারপর?'

—'ওর কথাটা শুনে আমার মনে হলো, ও যেন আমাকে খোঁচা দিতে চাইছে।'

—'কেন— এরকম মনে হলো কেন?'

—'আমার একটা কবিতায় আমি ভিখিরিদের জীবনযাপন তুলে ধরেছি।'

নলিনী বললো, 'লঘু মুহূর্ত?'

আনন্দ সম্মতিজ্ঞাপক মাথা নেড়ে বললো, 'রবীন্দ্রনাথের মতো আমি অবশ্য ভিক্ষাকর্মটিকে মহৎ ক'রে দেখাইনি, তাদের জীবনে নারীসঙ্গের অভাব— ইয়েট্‌স্‌-এর মতো ক'রে ভাবিনি— আমার আর এক ছাত্র-কবি, প্রগতিপন্থী, কবিতাটি তার ভালো লেগেছে, তবু— সে বলেছিল, মানুষ-যে ভিখিরি হয়ে জন্মায় না— এই ভাবনাটা জাগানোর মতো কোনো অবকাশ আমার কবিতায় নাকি নেই।— এটা মনে পড়েছিল— আর আমাকে খোঁচা দিচ্ছে মনে হ'তেই বললাম, তুমি মার্ক্স পড়েছো? ডাস ক্যাপিটাল?— তার সমস্ত আত্মবিশ্বাস, প্রত্যয়, আকাঙ্ক্ষা— সব কেমন যেন চুপ্‌সে গেল। সে বললো, না।'

—'কিন্তু দাদা, এবার দেশ থেকে ফেরার পথে ট্রেনে এত বেশি ভিখারি দেখেছি— ভাবা যায় না! ভিখারি-মুক্ত একটা সমাজের কথা, মার্ক্স না-পড়লেও, যে-কেউ ভাবতে পারে।'

আনন্দ প্রতিকথা পাড়লো না।

নলিনী বললো, 'আচ্ছা কবিতাটিতে আপনি কী বলতে চেয়েছেন, একটু বলুন তো— বুঝলে, 'সংবাদ-সাহিত্য' বিভাগে সজনীবাবু তো কবিতাটিকে মনোবিকলনের চূড়ান্ত ব'লে আখ্যা দিয়েছেন— দাদা! বলুন!'

—'তুচ্ছ ঘিনঘিনে বেঁচে থাকার মধ্যেও-যে আনন্দ আছে এটাই বলতে চেয়েছি।'

দরজায় একটি মেয়ে। এক পলক দেখেই আনন্দ চোখ সরিয়ে নিয়েছে। নলিনীর বয়েসী।

—'আসতে পারি?'

নলিনী ব'লে উঠলো, 'আয়! আয়! তোর অপেক্ষাতেই আছি আমরা—'

অশোক বললো, 'নিনির কী-যে টেনশন— বুঝতে পারছি না।'

মেয়েটি বললো, 'তা-ই!'

নলিনী বললো, 'বোস্।'

মেয়েটি বসলো। নলিনী বললো, 'আলাপ করিয়ে দিহ, আমার ভাসুর, কবি জীবনানন্দ দাশ।'

মেয়েটি ব'লে উঠলো, 'আমি বাণী— বাণী রায়।' একইসঙ্গে তার দু'হাত নমস্কার জানালো।

বাণীর আপদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে আনন্দ বললো, 'আপনি বাণী রায়?'

—'হ্যাঁ।'

—'লুক্রেশিয়া আপনার লেখা?'

—'হ্যাঁ।'

আনন্দর চোখে-মুখে আশ্চর্য এক মুগ্ধতা। সে নমস্কার জানালো, 'গল্পটা আমার খুব ভালো লেগেছে।'

নলিনী বললো, 'এতটাই যে, তুই আমার বন্ধু জেনে— খুকুর কাছে তোর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে জানিয়েছিল!'

আনন্দ যেন লজ্জা পেলো। বললো, 'চারপাশে এত মোটাদাগের মেয়েমানুষ— তার মধ্যে, বিশেষ ক'রে ভাষাশিল্পের মাধ্যমে কারও গভীর হৃদয়ের সন্ধান পেলে, তাকে দেখতে ইচ্ছে করে— আপনার গল্প প'ড়ে তেমনই হয়েছিল—' হঠাৎ থেমে গিয়ে কী যেন ভেবে বললো, 'আপনি, কল্যাণী, প্রতিভা— আপনারা সবাই আমার শ্রদ্ধেয়!'

কথার ভঙ্গিতে, স্বরপ্রক্ষেপণে ঘরের আবহাওয়া কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। অশোক উঠে রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে দিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানেই যাও চলে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর;
এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর!

প্রভা বললো, ‘কলেজে যাবে না?’

আনন্দ বললো, ‘না।’

—‘কালও তো যাওনি।’

—‘হ্যাঁ, যেতে ইচ্ছে করছে না।’

—‘এ আবার কী কথা!’

—‘কেন যাবো?’

—‘কেন যাবে না— সেটা বলো!’

—‘আমি ঠিক করেছি— মাইনে না-বাড়ালে আমি আর যাবো না।’

—‘কিন্তু না-গেলে, যা পাচ্ছো তা-ও কি তুমি পাবে?’

যেভাবে কথা চলছিল, তাতে ছেদ পড়লো। আনন্দ প্রভার মুখের দিকে তাকালো। বললো, ‘না-গেলে আমার মাইনে আটকে দিতে পারে, না!— এটা আমি একদম ভাবিনি।’ ব’লে এমন ভাব দেখালো— যেন এখনই চান করতে যাবে। প্রভা বেরিয়ে যেতেই আনন্দ আবারও চেয়ারটাতে ব’সে পড়লো।

কিছুদিন আগে সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলেছিল আনন্দ। খুব জোর দিয়ে কোনো দাবি আজ পর্যন্ত সে কোথাও জানাতে পারেনি, তবু সেদিন বলেছিল, ‘মাইনে বাড়ানোর জন্য এটাকে কেবল আমার অনুরোধ ব’লে বিবেচনা করবেন না— এটা আমার দাবিও!’

সেক্রেটারির চোয়াল ঝুলে পড়েছিল, ‘ফিনান্স কমিটিতে আপনার দাবির কথা জানাবো।’

—‘সেই সঙ্গে আপনার সুপারিশ— আশা করছি। সবই তো আপনার হাতে স্যার!’

ফাণ্ডের অবস্থা যথেষ্ট ভালো। ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে বৈ কমেনি। আনন্দ যতটুকু জানে তাতে ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। সেখানে তার সম্পর্কে কোনো কথাই হয়নি। সেক্রেটারি ছাড়াও আরও একজনকে আনন্দ জানিয়েছিল, যাতে সে তার বিষয়টা মিটিঙে উত্থাপন করে।

কেন করবে? তোমাকে দিয়ে তাদের কোন্ কাজটা হবে?

ঠিক। আমি একটা গুড ফর নাথিং— কারও কাজে লাগলাম না। কেউ পাত্তা দেয় না। না ঘরে, না বাইরে।

আর তখনই কতকগুলো মুখ তার মানসপটে ভেসে উঠলো, সব মুখই কবিতা-পাগলের মুখ, সেইসব মুখের মধ্যে কয়েকটি মানবীমুখ...

এবার গরমের ছুটিটা দারুণ কেটেছে তার। কোলকাতায় এমন সুন্দর দিন তার জীবনে আগে আর আসেনি। কী-সব সম্ভাবনার ইশারা— আনন্দকে প্রায় একটা ঘোরের মধ্যে

রেখেছে। আর, সব মিলিয়ে কোলকাতার প্রতি আগেকার সেই টানটা আবার ফিরে এসেছে। মাতভূমি যেন তার টান আলগা ক'রে দিচ্ছে। কোথাও মন বসছে না। মন মজছে না— এমন-কী চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রকৃতির নানা রঙ-স্বরকেও সে উপেক্ষা করতে পারছে। হয়তো তা-ও নয়— রঙের মায়ায়, স্বরের জাদুতে মুগ্ধ হওয়ার মতো যে মনটা ছিল এতদিন, তার খুব অসুখ। হয়তো অসুখও নয়— মন বসানোর জায়গার অভাব। এখানকার বুদ্ধিজীবী মহলে নিজের মুদ্রাদোষেই আনন্দ ব্রাত্য। তাদের মিলিত হবার জায়গাগুলোই তার পছন্দ নয়— যে উদ্দেশ্যে তাদের মিলিত হওয়া, সেই উদ্দেশ্য কেমন গৌণ হয়ে যায়; আনন্দ তাদের স্টাফ রুমেও তার ব্যত্যয় দ্যাখেনি— সেখানে পঠন-পাঠন ছাড়া আর সব বিষয়ে আলোচনা হ'তে দেখেছে। কেউ অথবা কোনো বিষয় আর আনন্দকে টানছে না এখানে— কোথাও কোনো রূপ নেই যেন আর, কোনো রূপসী—

অথচ একদিন, এরকমই তো মনে হয়েছিল তোমার— যার যেখানে সাধ, চ'লে যাক সবাই, তুমি এখানেই থেকে যাবে আকাশ দেখবে ব'লে, ঘাসের ওপর বসবে ব'লে!

সফলতা-শক্তির ভিতর পৃথিবী ব্যস্ত যেখানে, তুমি কি সেই দেশে যেতে চাইছো আনন্দ?

বঁইচির বনে তবু তো জোনাকির রূপ— কে দেখবে তাকে আর!

দশ-বারো বছর আগের অনুভব ফিরে আসতে চাইছে, কিন্তু কৈ, কবিতা হয়ে উঠছে না তো! ক্লান্তির পুনরাবৃত্তিও হ'তে পারতো— হচ্ছে না তা-ও। কেবল ফিরে দেখার একটা ইচ্ছে-যে এখনও আছে, এটা টের পাচ্ছে আনন্দ। সেই ইচ্ছাবশে আনন্দ বাক্স থেকে একটা খাতা বের করলো— দশ-বারো বছর আগেকার ভাবাবেগ লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এইখানে— পড়তে-পড়তে আনন্দ ভাবলো— জাম-বট-কাঁঠাল-হিজল-অশ্বত্থ, দোয়েল-শ্যামা-ফিঙে-লক্ষ্মীপেঁচা-চিল, চাঁদ-নক্ষত্র— সব, সবই আছে, থাকবে, হয়তো চিরকাল থাকবে কিছু-কিছু, আজ তবু তারা দৃশ্য নয়, ছবি নয়— কেবল গাছ-পাখি; সূর্য-চাঁদের অন্য কোনো মানে নেই, বড়জোর চাঁদমামা কি সূর্যমামা— তবু ভোরবেলা পাখিদের গানে কিন্তু কোনো ভ্রান্তি নেই! তবু কোথাও শান্তির কথা নেই।

তবুও সূর্যালোক মনোরম মনে হ'লে হাসি তো পায়! পায় না কি?

হেসে উঠি বেদনাহীন— অন্তহীন বেদনার পথে তবু। সেই কবে এক ভোরবেলা, এই শতকের শুরুতে জেনেছিলাম সূর্যের মানে, জীবনের শুভ অর্থ— এসবই ছিল স্মরণীয় উত্তরাধিকার, কোথাও গ্লানি আছে ব'লে মনে হয়নি— সনাতন সত্যে তবু অন্ধত্ব জন্মেছে; প্রেম নেই, প্রেমবাসনার দিনও শেষ, তবু নগরীর পথ আমাকে টানছে। কাক ছাড়া পাখি নেই, তবু কাকের মুখে খড়কুটো বস্তুত নান্দনিক দৃশ্য হয়ে ওঠে। সাঁজোয়া গাড়ি, ফৌজি ট্রাক— লঙ মার্চ— এসবের প্রেক্ষাপটে খুবই স্বাভাবিক মনে হয় কা-কা, শকুনের ছায়া... এইসব দৃশ্যে জীবনকে আরও সহজ স্বাভাবিকভাবে অনুভব করা যায়— এমনই মনে

হয়েছে এবার কোলকাতার রাস্তায়, ফুটপাথে, মেয়েমানুষের বাজারের পথে— একদিন যে-সব পথে হেঁটেছি আমি।

কিন্তু কাকের ডাকেও তো আলো আসে— এমন উপলব্ধি তো এই দেশ তোমাকে দিয়েছিল, তবু অন্ধকারে কেন যেতে চাও? কোন্ রূপ খুঁজতে?

আনন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠলো সজনে ফুল, আকন্দ ফুলের ওপর কালো ভীমরুল, কোকিলের ডাকও শুনতে পেলো; মনে পড়লো, ধনপতি সওদাগরের কাহিনী; চণ্ডীমঙ্গল— আজ কোথাও মঙ্গল নেই তবু কোলকাতায় গরমের ছুটির দিনগুলো দারুণ কেটেছে।

নিষ্প্রদীপ— তবু গান ছিল। মৃত্যুর ছায়া ছিল, তবু প্রাণস্পন্দন অনুভব করা গেছে— যা এখানে নেই— ছিল না কখনও, কেমন এক মোহ— প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থেকে গভীর হৃদয়ের নারীর খোঁজে বেঁচে থাকার এক নির্বোধ প্রচেষ্টা।

কী বলছো তুমি! মরার পরেও কিন্তু তুমি এখানে ফিরে আসতে চেয়েছো!

জীবনের ওই পর্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে, যদি না-হবে তাহলে বুদ্ধদেবের পছন্দমাফিক কবিতা লিখতে পারতাম!

তুমি নাগরিক কবি হ'তে চাইছো?

আমি কখনোই কিছু হ'তে চাইনি— কেবল লিখতে চেয়েছি। লিখতে চাই। এখানে থাকলে আর লেখা হবে না। কিন্তু, কীভাবে? ভেবলুর সঙ্গে একটু কথা বলতে হবে। নিনির সঙ্গেও।

আনন্দ একটা চিঠি লেখার কথা ভাবলো। ভেবেছে এর আগেও। লেখা হয়ে ওঠেনি। খাতাটা রেখে সে চিঠি লিখতে বসলো। কাকে লিখবে? অশোককে, না নলিনীকে— একটু ভেবে সে 'কল্যাণীয়াসু' শব্দটি লিখলো, তারপর 'নিনি' শব্দটা লিখে শব্দ-দুটো মনে মনে আওড়ালো।

...চিঠিতে সে স্পষ্টভাবে জানালো— বরাবরই তার আত্মবৃত্তি ও জীবিকা নিয়ে কোলকাতায় থাকবার ইচ্ছা। এবার সে-ইচ্ছা আরও জোর পেয়েছে। ভাবলো, লিখবে: তোমাদের সহযোগিতা পেলে হয়তো ইচ্ছা পূরণ হ'তে পারে— কথাটা কি লেখা উচিত হবে?... শেষপর্যন্ত লিখলো না। লিখলো— 'কিন্তু পথ কেটে নেবার জন্য সাধনার দরকার।' তারপরে অন্য প্রসঙ্গে চ'লে গেল। কোলকাতা থেকে ফেরার সময় নলিনীর কাছ থেকে কিছু বই এনেছিল, তার কথা উল্লেখ ক'রে জানালো— পুজোর সময় বইগুলো ফিরিয়ে দেবে। বাংলা বইয়ের একটা লিস্ট দিতে বলেছিল নলিনী। সে-বিষয়েও লিখলো যে, খুব শিগগিরই সে একটা লিস্ট পাঠাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটকাকার দিকে তাকিয়ে আনন্দ ভাবছিল, একটা অদ্ভুত মানুষ, অনেকটা ভুবনমামার মতো, না, ভুবনমামার সঙ্গে তার তুলনা চলে না। একমাত্র অবিবাহিত থাকাতেই মিল। সর্বানন্দ ভবনের টুকটাক কাজ ছাড়া আর যা করেন, ব্রাহ্মসমাজের কাজ। অন্য কাকাদের বাসা-বাংলোয় কিছুদিন কাটিয়ে ফিরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বলেন, আমার এই দ্যাশই ভালো।

একথা আনন্দও বলেছে। এ জায়গা ছেড়ে তার কোথাও যেতে ইচ্ছে করতো না। এখন ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠছে। আর কোথাও না। কেবল কোলকাতায়। কোলকাতার মানুষজনের তুলনায় বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ে সে-যে পিছিয়ে থাকা মানুষ, এ-বিষয়ে তার কোনো সংশয় নেই। অকপটে সেকথা সে স্বীকারও করেছে নিনির কাছে। তাছাড়া আনন্দর মনে হয় তাদের সান্নিধ্য-সাহচর্যে সে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবে। নিনি-সঞ্জয়-বুদ্ধ-প্রতিভা— এরা তো বেশ পছন্দই করে তাকে। গত আষাঢ় সংখ্যায় 'নিরুক্ত'তে তার নামকে শিরোনাম ক'রে দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখেছে সঞ্জয়। যদি কেউ তাকে প্রশ্ন করে, তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম বন্ধুর নাম কী? আনন্দ নির্দ্বিধায় বলবে, সঞ্জয়। সেই সঞ্জয়ের সঙ্গে এবার সশরীরে দেখা হয়েছে।

আনন্দ নিজের মনে হেসে উঠলো সেই দেখা হওয়ার মুহূর্তটিকে ভেবে।

সেদিন ভেবলুর বাসা থেকে আনন্দ যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, সদর দরজা থেকে একটু দূরে দু'জন ভদ্রলোককে সে পাশ কাটিয়েছিল। কিছুটা দূর গিয়ে তার মনে হলো, ভেবলুর ফ্ল্যাটের সামনে যখন, তাহলে কি আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলো! আনন্দ এখন যে কোলকাতায়— এই খবর এবং তার ঠিকানা কেউ-কেউ জানে,— এসময়ে ভেবলু বা নিনির সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসবে না, এটাই স্বাভাবিক, নিতান্ত দেখা করার দরকার থাকলে তারা ভেবলুর অফিসে যাবে কিংবা নিনির কলেজে।

আনন্দ ফিরে এলো। ভদ্রলোক-দু'জন তখন দরজার সামনে। হয়তো কড়া নেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দ তাদের কাছে এসে দাঁড়াতেই একজন তাকে জরিপ ক'রে বললো, 'আনন্দবাবু আছেন?'

আনন্দর বলতে ইচ্ছে হলো, না। কিন্তু তাদের মুখ ম্লান করতেও ইচ্ছে হলো না তার। বললো, 'আমিই আনন্দ। বলুন!'

তবু তাদের মুখ ম্লান হলো। একে অন্যের দিকে তাকালো। তাদের চোখের ভাষা ঠিক পড়তে পারলো না আনন্দ। যে-জন কথা শুরু করেছিল সে-ই বললো, 'আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

আনন্দ ঠোঁট টিপে হাসলো। বললো, 'যাওয়ার সময় আপনাদের দেখে আমার সেরকমই মনে হলো, তাই ফিরে এলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কড়া নাড়লো সে। দরজা খুলে গেল, আনন্দ বললো, 'আসুন!'

ড্রয়িং রুমে ব'সেই একজন বললো, 'আমি অমিয়।' অন্যজন বললো, 'সঞ্জয়।'

আনন্দ বললো, 'সঞ্জয়— ভট্টাচার্য?'

সঞ্জয় মাথা নাড়িয়ে সায় দিলো।

আনন্দর চোখে-মুখে সামান্য একটু মুগ্ধতার আলো ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। বললো, 'বলুন!'

সঞ্জয় বললো, 'একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আপনি আমার প্রিয় কবি।'

আনন্দ নিরুত্তর।

—'আপনার কাছে আমার দুটো আর্জি।'

আনন্দর দেহভাষায় ফুটে উঠলো,— বলুন।

—'যুদ্ধের কারণে পূর্ব্বাশার প্রকাশ বন্ধ ছিল, শুরু করেছি আবার। আপনার কবিতা চাই।'

—'চৈত্র সংখ্যায় লিখেছি তো।'

—'নিয়মিত লিখবেন— রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌-এর যে রূপান্তর আপনার কবিতায় আমরা লক্ষ করছি, তা ইউনিক— আমার মনে হয় বাংলা কবিতা আপনার পথে যদি চলে, তা হবে তার নবযাত্রা—' আনন্দ খানিকটা বিপন্ন বোধ করছিল। নিজের পশংসা শুনতে-যে ভালো লাগে না, তা নয়; তবে সেদিন তার অস্বস্তি হচ্ছিল। এবং বিষয়টিকে সে প্রতর্কের দিকে নিয়ে গেছিল 'কিন্তু রোমাণ্টিক ব্যাপারটা তো গালাগাল পর্যায়ে চ'লে যাচ্ছে।'

—'এটা একপেশে বিজ্ঞানমনস্কতার কারণে— আমার মনে হয় বিজ্ঞান-বোধ আর রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌-এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং এদের মধ্যে সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী— রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌কে আমি বলি কাব্য-দেহী বিজ্ঞান কিংবা বলা যায়— বিজ্ঞানের কাব্যরূপ রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌।'

আনন্দ মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। বললো, 'আপনার সঙ্গে আমি একমত তবু সংযোজন করবো, ইতিহাসচেতনা অপরিহার্য।'

—'আপনি ঠিকই বলেছেন, ইতিহাসচেতনা উল্লেখ না-করলে, যদি কেউ বিজ্ঞানকে সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করে তবে মুশকিল। যা-ই হোক, আমার দ্বিতীয় আর্জি— পূর্ব্বাশা লিমিটেড আপনার একটা নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে চায়!'

আনন্দর মনে হয়েছিল সে যেন স্বপ্ন দেখছে, অথচ স্বপ্ন নয় বাস্তব, কিন্তু আজও যেন একটা স্বপ্নের ঘোর— তার কবিতাচর্চা এতদিনে যেন একটা ব্যবসায়িক পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে— কোলকাতা কি সেই সূত্রে স্বপ্ননগরী হয়ে উঠছে? একটা অপ্রতিরোধ্য টান অনুভূত হচ্ছে।

এখনও পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়নি। কবিতাগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। তার থেকে বাছাই করতে হবে। 'বনলতা'র বারোটি কবিতা এই সঙ্কলনে থাকবে এরকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কথা হয়েছে সঞ্জয়ের সঙ্গে। তিন ফর্মার সঙ্কলন— আরও অন্তত পঁচিশ-ত্রিশটা কবিতা দরকার— সময় চ'লে যাচ্ছে। টেস্ট পরীক্ষার মরসুম এগিয়ে আসছে। কিছুতেই আর সময় বের করা যাবে না। ছুটি নিয়ে-যে কাজগুলোকে গুছিয়ে নেবে সে উপায় নেই।

ছোটকাকা শেষ অঘ্রাণের রোদ্দুরে ব'সে বই পড়ছেন— ধর্মগ্রন্থ নিশ্চয় কিংবা ধর্ম-সম্পর্কিত। মানুষ কেন বাঁচে— এ-বিষয়ে গবেষণার বিষয় হ'তে পারেন ছোটকাকা। ছোটকাকাকে নিয়ে তেমন ক'রে ভাবা হয়নি। সফলতা, ব্যর্থতা কোনো কিছুর বোধ যেন নেই ওই মানুষটার— বাবাকে যেমন কখনও গম্ভীর, বিষণ্ন দেখাতো, তেমন কোনো ছাপ ছোটকাকার মুখে দেখেছে ব'লেও মনে করতে পারলো না। এমন নিরুপদ্রব সরল-সহজ বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করতে গিয়ে আনন্দ দেখলো, অসম্ভব; কেননা তার ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের মা আছেন— দায়িত্ব-কর্তব্যের ভারকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

তার জন্য তোমাকে কোলকাতায় যেতে হবে!

না। তার জন্য নয়। তার জন্য নয়।

আনন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর হাঁটতে থাকলো। সে বুঝতে পারছিল, নদী ডাকছে তাকে। নইলে সে কেন বিপরীত দিকে যেতে পারলো না। গেলে তো অঘ্রাণের ফসল কাটা মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটা যেতো।

নদীর পাড়-বরাবব পরিচিত পথ। সুরকি বিছানো নীলচে লাল রাস্তা— মনিয়া এ-রাস্তায় কতবার হেঁটেছে, কয়েকবার একসঙ্গে দু'জন— এটুকুই মনে পড়লো, মনে পড়লো বনির কথা, মনেই পড়লো শুধ; দুর্বল একটু ঘূর্ণিও উঠলো যেন বুকের প্রান্তরে— পথটা আছে কেবল, আর সে— একবার পেছন ফিরে তাকালো, জেটিঘাট তেমনই আছে। আর সে স্পষ্টভাবে টের পেলো স্মৃতিঘরে বিবর্ণ এক ফোটোগ্রাফ— কী যে বিস্ময়! এ পৃথিবীতে নেই তা— সত্যি কি নেই? না-ই থাকবে যদি তাহলে তার আকাঙ্ক্ষা কেন জাগে? কেন মনে হয়, ওই আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু হ'লে জীবনের প্রতি অনুরাগ নষ্ট হয়ে যাবে, জীবন নষ্ট হয়ে যাবে— নষ্ট হয়ে যায়। কী অদ্ভুত! যে-প্রেমের জন্য জীবনের এত স্বাদ সে-প্রেম স্বাভাবিকভাবেই জীবনের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল— কী দারুণ স্টাডি সঞ্জয়ের, সঞ্জয় লিখেছে: প্রাণের উপর প্রেমের শত অত্যাচার, তবু প্রাণ বেঁচে থাকে প্রেমকেই আবার খুঁজে নেবে ব'লে— জীবনকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়ে গেলেও প্রেমকে জীবন ভোলে না।

কিন্তু তার তীব্রতা নষ্ট হয়ে যায় কিংবা বলা ভালো, নানা নিষেধ প্রেমকে ঘিরে ফ্যালে— এক ঝলক জোতির্ময়ীর মুখ মনে পড়লো।

প্রেমের কথায় আজও তবে মন নরম হয়, কেমন এক মায়া জেগে ওঠে, প্রাণ আকুল হয়, হচ্ছে— আনন্দ দাঁড়িয়ে পড়লো। ঝাউগাছের আকাশ-ছোঁয়া শীর্ষের দিকে তাকিয়ে থাকলো কয়েক মুহূর্ত। বিড়বিড় করলো, সবকিছুর জন্য একটা বয়েস লাগে। আঃ! নিজেকে রক্তাক্ত করবার মতো একটা বয়েস যদি পাওয়া যেতো আবার!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস তার বুক কাঁপিয়ে উঠে এলো।

ফেরার পথে জেটিতে গিয়ে দাঁড়ালো কয়েক মুহূর্ত, মানুষজনের যাওয়া-আসা, ব্যস্ততা লক্ষ করলো— জীবনের কোলাহল শুনতে-শুনতে বহুকাল আগে দেখা এক কিশোরকে মনে পড়লো, সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো তার বিস্ময় ভরা চোখ-দু'টি— জীবন থেকে সব বিস্ময়বোধই হারিয়ে গেল! চারদিকে কেবল অর্থহীন দৃশ্য। হাড় জিরজিরে মানুষ। এক পেট খিদে। তবু মাংস কেনা-বেচা। জীবন কি তবে সত্যিই টির‍্যানি অব্ সেক্স?

আনন্দ কলেজের পথ ধরলো।... পুকুরপাড় ধ'রে যেমন সে কলেজ থেকে ফেরে তেমনই হাঁটতে থাকলো। একটা সহজ জীবন চেয়েছিলাম আমি; ফড়িঙের জীবন কিংবা দোয়েল, স্বাভাবিক বেঁচে থাকা— প্রেমের আকাঙ্ক্ষাই কি জীবনকে এত জটিল ক'রে তুললো! ফের মনে পড়লো ছোটকাকার কথা, ছোটকাকার নারীবর্জিত সাদাসিধে বেঁচে থাকা কিংবা স্নেহপিসির জীবন তার ওই ভাবনাকে যেন যথার্থতা দিলো।

একটা শীর্ণ লতার ডগা আনন্দকে যেন আঁকড়ে ধরতে চাইলো, ভ্রূক্ষেপই করলো না সে। একটা টুনটুনি তাকে গান শোনালো, নাচ দেখালো— যেন খেয়ালই করলো না সে। আকাশে সন্ধ্যাতারাটিতে পর্যাপ্ত আলোর ইশারা— তবু চোখ তুলে তাকালো না সে।

বাড়ি ফিরে নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হলো। টেবিলে মাথা রেখে ব'সে থাকতে-থাকতে মনে হলো, কে যেন তার মাথায় হাত রেখেছে। বিলি কেটে দিচ্ছে। এ স্পর্শ প্রভার নয়। অনেকটা যেন মায়ের মতো। খুকু? খুকি? তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে এক সময় আনন্দ শুনতে পেলো, এত অভিমান কেন?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে।

একটা অবসাদ পেয়ে বসেছে আনন্দকে— তাকে অতিক্রম করার মতো মনের জোর যেন নিঃশেষ, কাউকে বলাও যাচ্ছে না। আর্থিক অবস্থা খুব-যে বিপর্যস্ত তা নয়। সচ্ছল বলাই যায়। খুকুর টাকা ঢুকছে এ সংসারে। মঞ্জুর দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে সে। তবু, তার নিজের মাইনে বাড়লে একটু সুবিধে হতো। প্রভার টুকিটাকি চাহিদা পূরণ হ'লে হয়তো জীবনটাকে আর টির‍্যানি অব্ সেক্স মনে হতো না, প্রবল নীল অত্যাচারের খপ্পরে পড়তে হতো না। কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যরা এসব বোঝে না। বুঝলে হয়তো কলেজের প্রতি টানটা থেকে যেতো। ইদানিং ক্লাস রুমও আর তাকে টানছে না। স্টাফ রুম তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। প্রফুল্ল-সুধীরের সঙ্গে শান্তিসুধাও আর কলেজে ঢুকতে পারলেন না। তাঁদের জন্য সরকারের কার্যচ্যুতির নির্দেশকে কলেজ-কর্তৃপক্ষ যেন মহানন্দে পালন করেছে। সবাই কেমন বিস্ময়ের ভান ক'রে নিশ্চুপ হয়ে আছে। একটা আন্দোলন সংগঠিত হ'তে পারতো। কিন্তু হয়নি। আইনগতভাবেও কি হ'তে পারতো না! কলেজ-কমিটির অধিকাংশ সদস্য আইন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত— দেশ, দেশের রাজনীতি চালাচ্ছে তো বেশিরভাগ উকিলেরাই— তারা একটা উপায় নিশ্চয়ই বের করতে পারতো, অন্তত তার মাইনেটা বিশ-পঁচিশ টাকা বাড়ানোর জন্য তো কোনো সরকারি নির্দেশ অমান্য করতে হতো না। কেন-যে আনন্দর প্রতি এই বিমাতৃসুলভ আচরণ! প্রিন্সিপালের মাইনে বাড়ছে। স্বজন পোষণ চলছে। তাহলে কি— সমাজতন্ত্রী কিংবা কমিউনিস্ট ভেবে তাকে এভাবে ভাতে মারছে এরা?

তাহলে সত্যিকারে আমি কী?— এ প্রশ্নটা মাঝেমধ্যে সে নিজেকে করে, যদিও অনেকদিন ধ'রে আনন্দ ভাবছে তার ঘরে বুদ্ধের ধ্যানগম্ভীর ছবি, আর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছবি টাঙাবে— তবু তুমি সংখ্যালঘুর দলে প'ড়ে যাবে। সেখানেও অনুকম্পা, করুণা। কলেজ-কমিটিতে একজনও খ্রিস্টান নেই। মুসলিম আছে। কমিটির মধ্যেও পার্টিশন-রাজনীতির চোরাস্রোত বইছে। এই এলাকা মুসলিম-প্রধান। এখানে অদ্ভুত এক প্রচেষ্টা— যত বেশি মুসলমানকে লীগ থেকে দূরে রাখা যায়। তারাও নানাভাগে বিভক্ত— কংগ্রেসের মুসলিম, লীগ মুসলিম, উলেমা মুসলিম, কমিউনিস্ট মুসলিম। যে যেমন পারছে তোষণ ক'রে নিজেদের পকেটে রাখার চেষ্টায় আছে। একটু যদি শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে এদের চিন্তা থাকতো তাহলে হয়তো এভাবে টানশূন্য হয়ে যেতো না আনন্দর মন। অন্তত কলেজের ভালো লাইব্রেরিটার জন্যই সে থেকে যেতে পারতো। প্রিন্সিপালও তার প্রতি কেমন যেন বিরক্ত। গতবার টেস্টের খাতা দেখে জমা দিতে দিন-দুই দেরি হয়েছিল ব'লে প্রিন্সিপাল তাকে কথা শুনিয়েছে, 'নিজের কাজকর্মে একটু যত্নবান হোন মিস্টার দাশ!'

আনন্দ মুখ বুজে শুনেছে। আরও কিছু শোনার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু প্রিন্সিপাল হাতের ইশারায় চ'লে যেতে বলেছিল। অপমানবোধটাকে খুব সহজে ঝেড়ে ফেলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছিল আনন্দ। নির্দিষ্ট দিনে খাতা জমা দিতে না-পারার পেছনে কারণ,— যথার্থ মন দিয়ে করার মতো একটা কাজ ছিল হাতে। কোলকাতার ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে তাকে চিঠি পাঠিয়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রগতিপন্থার প্রধান কবি হয়ে উঠছে ছেলেটি— চিঠিটা পেয়েছিল সে বাড়িতে— কলেজ তো খোলাই ছিল, অবশ্য দু'দিন সে যায়নি, হয়তো জরুরি বুঝে কেউ পিওনকে অনুরোধ করেছিল চিঠিটা বাড়ি পৌঁছে দিতে। এখন এই মুহূর্তে, আনন্দ সেই ব্যক্তিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করলো।

তো চিঠিতে ছিল আশ্চর্য অনুরোধ— 'কেন লিখি'— এ-বিষয়ে সবিস্তারে লিখতে হবে। কিন্তু সময় খুব কম। জানুয়ারি মাসেই সঙ্কলন বেরিয়ে যাবে। তখন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। খাতা দেখা চলছে। কিন্তু এই অনুরোধ তাকে রাখতে হবে। প্রগতিপন্থীদের সঙ্গে যে বন্ধুত্বের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে তা সজীব রাখার জন্যই খাতা দেখা বন্ধ রেখে তাকে লিখতে হয়েছিল। প্রিন্সিপালের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে সেদিন আনন্দর মনে হয়েছিল, চাকরি আর সাহিত্য দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না। কিছুতেই পারে না।

অন্তত ইদানিং তা আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। 'পূর্ব্বাশা'য় পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিয়েছে; একটু সামলে উঠতে-না-উঠতেই শুরু হয়েছে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ। তার মধ্যে আরও একটা আনন্দের খবর। সিগনেট প্রেস ইংরেজি তর্জমায় আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্কলন প্রকাশ করবার উদ্যোগ নিয়েছে। সম্পাদনা করছে দেবীপ্রসাদ— গতবছর গরমের ছুটিতে অল্পক্ষণের জন্য আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে— স্বয়ং সম্পাদক তাকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছে কিছু কবিতার অনুবাদ পাঠাতে।

অনুবাদের কাজ একটু সময় নিয়ে করা দরকার। কিন্তু খাতা দেখা না-হ'লে সেই সময় বের করা সম্ভব নয়। তখন প্রয়োজনে ছুটি নেওয়া যেতে পারে। ছুটি মঞ্জুর না-হ'লেও। কিন্তু এখন কোনো উপায় নেই। নির্দিষ্ট সময়ে খাতা দেখা শেষ করতেই হবে।

বছর-দুই আগে কিছু কবিতা অনুবাদ ক'রে বুদ্ধদেবকে পাঠিয়েছিল আনন্দ। সেও একটি সঙ্কলন হবে এমন লক্ষ্যে। আপাতত দেবীপ্রসাদকে একটা চিঠি লেখার কথা ভাবলো সে।

সেই অনুবাদের কথা আর তার পছন্দের কতকগুলি কবিতার নাম উল্লেখ ক'রে, অনুবাদক হিসেবে অমিয়বাবু আর বুদ্ধদেববাবু যে সত্যিই 'তর্জমায় ওস্তাদ' এভাবে প্রশস্তি ক'রে আনন্দ লিখলো: তাঁদের পছন্দমতো আমার আধুনিকতর 'সমাজ চেতন' কয়েকটি কবিতা যদি তাঁরা অনুবাদ করেন তাহলে আনন্দিত হবো।

ইতিমধ্যে আমার নিজের, তর্জমার পাণ্ডুলিপি খোঁজ ক'রে পেলে— একটু দেরি হবে— আপনাকে পাঠিয়ে দেবো।

তবু নিশ্চিন্ত থাকতে পারলো না আনন্দ। খাতা দেখার ফাঁকে একটু সময় বের ক'রে সে আরও কয়েকটি কবিতা অনুবাদ ক'রে ফেললো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার সাহিত্যিক-সম্ভাবনা যত বাস্তব হয়ে উঠছিল ততই এই জনপদ থেকে যেন উঠে যাচ্ছিল তার বসতি। একদিন কুসুমকুমারীকে সে বললো, 'মা, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট তো থিতিয়ে গেল। আজাদ হিন্দ বাহিনী ছিন্নভিন্ন— স্বাধীনতা এবার আসবে দর-কষাকষির মাধ্যমে— তা যদি হয়— দেশ ভাগ হচ্ছেহ, মুসলমানরা হিন্দুশাসনে থাকবে না— জিন্নার ঘোষণা অধিকাংশ মুসলমানের পছন্দ— কী ভাবছো, অনেকেই তো কোলকাতার দিকে যাচ্ছে!' মা কিছু বলতেন হয়তো, কিন্তু তাঁকে বলার সুযোগ না-দিয়ে প্রভা বললো, 'ভাবনার কী আছে? মা তো বেশিরভাগ সময় এখন কোলকাতাতেই থাকছে, সুচরিতাও বাইরে, তমলুক থেকে এখানে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে— তুমি ভাবো, কোলকাতায় গেলে চাকরিবাকরি জোগাড় করতে পারবে কিনা।'

আনন্দ কিছু বললো না। বিষয়টা সত্যিই ভাবনার, কিন্তু এ-বিষয় নিয়ে সে কখনোই যুক্তি সাজাতে পারেনি। কেবল মনে হয়েছে কিছু একটা করা যাবে। কিন্তু তা-ও করতে পারেনি। পারলে তার বিবাহিত জীবন ধ্বংস হতো না। এই ইতিহাস, তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও বিষয়টিকে সে গুরুত্ব দিচ্ছে না। কবি হিসাবে তার যতটুক পরিচিতি তাতে খবরের কাগজে একটা কাজ নিশ্চয় জুটে যাবে। তাছাড়া সেই তখনকার মতো এখন সে নির্বান্ধব নয়। এখন তার অনেক বন্ধু। নিশ্চয়ই বেঁচে থাকার জন্য তাদের সহযোগিতা পাবে সে। শুধু বন্ধু নয় কিছু ভক্তপাঠকের সন্ধানও পেয়েছে আনন্দ।

ভক্তের উপর কতখানি ভরসা করা যায়— এ সংশয়ও জেগেছে আনন্দর মনে। বুদ্ধ তো তার ভক্তই ছিল— নির্জনতার কবি প্রকৃতির কবি হিসাবে তার যে পরিচিতি, তা তো বুদ্ধদেব সচেতনভাবে নির্মাণ করেছে। বলা যায় প্রতিষ্ঠাও দিয়েছে। সেই বুদ্ধদেবের সঙ্গে তার দূরত্ব বেড়েছে!

তবু একটা মুখ ভেসে ওঠে, বুদ্ধিদীপ্তির সঙ্গে কেমন এক স্বপ্নমাখা মুখ। পুরু কাচের চশমার আড়ালে চোখ-দুটো স্বপ্নের রঙ ছড়ায়। তার দৃপ্ত ঘোষণা, 'আপনি এ-সময়ের প্রধানতম কবি।'

ভরসা করা যায়।

যদি কোনো সংশয় থেকেও থাকে, তা লালন করা অনুচিত। কেননা, আনন্দকে সে সেভাবেই নির্মাণ করছে। শুধুমাত্র কবিতাকেই ভালোবেসে তো! গত আষাঢ়ের 'নিরুক্ত'তে 'কবিতায় আধুনিকতা' নিবন্ধে সেই নির্মিতিতে অন্যমাত্রা দিয়েছে সঞ্জয়। কিছু একটা করা যাবে। নিশ্চয় যাবে।

কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ;
বহুদিন থেকে শান্তি নেই।
নীড় নেই
পাখিরও মতন কোনো হৃদয়ের তরে!

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যেন শীতের রাত নেমে এসেছে। আগস্ট আন্দোলন শেষ হয়ে যাবার পর এরকমই একটা অবস্থা চারপাশে। কোথাও কোনো আন্দোলন নেই। কেবল টুকরো টুকরো বিদ্রোহের খবর। শ্রমিক অসন্তোষ। ধর্মঘট। হরতাল।

রাজনীতি সম্পর্কে যারা খোঁজখবর রাখে, স্টাফ রুমে তাদের কথায় আর খবরের কাগজ প'ড়ে আনন্দ যতটুক বুঝেছে— তাতে স্বাধীনতার জন্য আর আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। ইংরেজরা বুঝেছে বল প্রয়োগ ক'রে ভারতকে আর ধ'রে রাখা যাবে না। আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা আপস-রফায় আসতে চাইছে সবাই— কংগ্রেস, লীগ; এমন-কী হিন্দু মহাসভা, আর.এস.এস.-ও প্রভাব বিস্তার করছে।

এসব আলোচনা আর সংবাদে আনন্দ কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। সামাজিক অসাম্য, অভাব-অনটনের কথা কেউ ভাবছে না আর— অসময়ে তার শীত করে, মাঝরাতে একবুক তৃষ্ণা নিয়ে জেগে ওঠে, অন্ধকার— হিম অন্ধকার, তার কেমন ভয় করে। শুনতে পায়, কে যেন তাকে নির্ভয় করতে চাইছে: তুমি তো জানো অমাময়ী নিশিই সৃজনের শেষ কথা আর মানব-হৃদয় তার প্রতিবিম্ব।

আনন্দ বিড়বিড় করে, কী জানি।

এখন তেমনই অন্ধকার। গভীর পবিত্র। এখন তো আমাদের প্রার্থনা করার সময়: হে আকাশ, হে কালশিল্পী, তুমি আর সূর্যকে জাগিয়ো না!

আনন্দ অন্ধকারে বিছানার উপর ব'সে আছে। মাথার মধ্যে জেগে উঠছে স্টাফ রুম:

—ইতিহাসের ধারা— এরকমই।

—যারা হত্যা করে প্রত্যক্ষে-প্রচ্ছন্নে, তারাই ধন্য। একথা আমরা সবাই জানি।

—সভ্যতা এগোচ্ছে। কলের যুগ— মেশিন, গতি। মেশিনের দেবতার কাছে নিজেদের নিবেদন করছি। এর নাম স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা আমরা পেতে চলেছি। দেবতারা দেবেন আমাদের।

—গত ত্রিশ বছরের রাজনীতি তো দেখলাম, মানুষের হৃদয় জাগলো না, কথা ফুটলো না— কেবলই হত্যার আয়োজন; নির্মল কোনো জননীতি নিতে পারলো আমাদের সমাজ, সরকার?

—অবতার-মাসিহার অপেক্ষায় থাকা জনগণ আছে ব'লেই আমাদের রাজনীতি এত ব্যক্তিনির্ভর— ব্যক্তির অহংকার— জিন্না-জহর— দেশটার টুকরো-টুকরো হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ব্যক্তির দাবি— জহর কিংবা জিন্না— আমাদের ত্রাণকর্তা! আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'যদি অমল কোনো রাজনীতি পেতে চায়, এই সময়, এই সমাজ?'

পাশের কোঠায় প্রভাকে কি জাগাবে সে, জিগ্যেস করবে— অনেক সময় তো এরকম মিরাকেল ঘ'টে যায়— হয়তো প্রভা জানে, এক এক সময় তো মনে হয়েছে, আবেগঘন কোনো নিবিড়-গভীর মুহূর্তে প্রভার শরীর থেকে উঠে এসেছে অন্যনারীর কণ্ঠস্বর; হয়তো ইল্যুশন, তবুও তো অন্যরকম শুনেছে; তেমন সম্ভাবনায় আনন্দ প্রভার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো।

তখন কোথাও একটা পাখি ডেকে উঠলো। ঘুমঘোরে কি?— বোঝার চেষ্টা করতেই আরও একবার ডাক শুনলো।

তার মানে ভোর— ভোরের আলো ফুটছে, অথচ অন্ধকার গভীর মনে হচ্ছে। আসলে মনে হওয়া নয়, আমি দেখছি। চোখ-দুটো এবার যেন দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রকৃতভাবে দেখবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ টের পাই, কত দৃশ্যের জন্ম হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। যেমন টের পাই বনি আছে,— কিংবা বনি নয়, অন্য কেউ— এই তো ক'দিন আগে সে আমার মাথায় হাত রেখেছিল। এটাই সান্ত্বনা, শান্তি। বস্তুত কোথাও তা নেই। এই দরজার ওপারে, যদি ডাকি, ডেকে নিতে চাই আমার ঘরে—

সমস্ত সর্বানন্দ ভবনের গাছ থেকে নানান পাখি ডাকছে, সেই পাখি-ডাকের মধ্যে ডুবে যেতে-যেতে আনন্দ কল্পনা করলো বিকট এক চিৎকার, এই ভোরবেলা তোমার বেগ চাপলো, দিলে ঘুমটা মাটি ক'রে!

আনন্দ নিজের মনে— নেই-ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। তারপর বিড়বিড় করলো, 'নীড় নেই।'

তার পাখি-হৃদয়কে রক্তাক্ত করার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই যেন সে দরজার সামনে থেকে দ্রুত উঠোনে নেমে এলো।

তবু পাখি আছে এ পৃথিবীতে ঢের। হালকা কুয়াশা বিছানো বসন্তের এই ভোরের আলো-হাওয়ায় যেন বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো আনন্দ: উজ্জ্বল সময়স্রোতে অবগাহন করো! তেন তক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম।

—শোনো মিলু, যতদিন পৃথিবীতে জীবন রয়েছে, মনে হবে বঞ্চনা আর মৃত্যু সত্য— সত্য বটে তা কুয়াশার মতো। সূর্যশক্তিকে সে আচ্ছন্ন করে বটে, রোধ করতে পারে না।

—কিন্তু বাবা, এই হত্যা, বঞ্চনা— এ তো মানুষই করছে!

—মানুষ না ব্যক্তি— মনুষ্যত্বের ক্ষয়; ব্যক্তির ক্ষয়ে মানব কি ক্ষয়িত হ'তে পারে কখনও?

—না।

—তবে আশা রাখো! সত্য-সেবা-শান্তি ও যুক্তির নির্দেশ মেনে চলো! এ অন্ধকার শাশ্বত নয়। মানবিকতার ভোর আসবে! আসবেই!

—কিন্তু বাবা, জ্ঞানচর্চায় আমরা আজ চমৎকৃত, প্লেন— হিরোসিমা— গ্যাসচেম্বার— ধনের অদেয় কিছু নেই, যেন ঈশ্বর কিংবা নেক্সট্ টু গড— এখানেও তো প্রেম রয়েছে!

—তবুও তো তোমার মনে হচ্ছে অন্ধকার!

—হ্যাঁ।

—তাহলে? আমি বলি— এই অন্ধকারে সবচে' ভালো সেই প্রেম, যে-প্রেম গভীরভাবে আলো পেয়েছে জ্ঞানের থেকে।

ডুমুরের একটা বড় পাতা আনন্দর মাথা ছুঁয়ে ছিল। যেন বাবার হাত। সেই হাতটা ছুঁতে গিয়ে টের পেলো পাতা— পাতাটাকে সে হাতের তালুতে রেখে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলো।

তারপর ঘরে ফিরে সে কবিতার খাতা নিয়ে বসলো। ইদানিং লিখতে বসলে বুদ্ধদেবের মুখটা মাঝেমধ্যে মনে পড়ে। কেমন শাসকের মতো সে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। 'কবিতা'য় অনেকদিন তার কোনো কবিতা প্রকাশ হয়নি। বুদ্ধদেব চায়ওনি। 'মহাপৃথিবী'— তার চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ, 'পূর্ব্বাশা লিমিটেড' যেটা প্রকাশ করেছে গত বছর শ্রাবণ মাসে, তার একটা আলোচনা চৈত্রের 'কবিতা'য় বুদ্ধদেব স্বয়ং করেছে— 'মহাপৃথিবী' তাকে নিরাশ করেছে। এই নিরাশার কথা বুদ্ধদেব খুব স্পষ্ট ক'রে লিখেছে। —সত্যিই কি আমি অফুরন্তভাবে নিজের পুনরুক্তি ক'রে ক'রে গেছি? কিংবা নিজেকে অনুকরণ করছি। এর অর্থ তো ফুরিয়ে যাওয়া!— বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে তার মুদ্রাদোষ ধরা পড়েছে; 'বনলতা'র কবিতাগুলো ছাড়া আর যে চব্বিশটা কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে তার দু'-একটি বাদে আর কোথাও তার অনন্যতা খুঁজে পায়নি বুদ্ধদেব— এসবই তার কবিতা লেখার সময় মনে পড়ে, তার তন্ময়তা নষ্ট হয়ে যায়। মন ভালো করার জন্য সে 'পূর্ব্বাশা'র কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত কথাগুলোকে মনে করার চেষ্টা করে— রবীন্দ্রনাথের পর তাকেই একমাত্র বাঙালি কবি ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আলোচকের নাম নেই, অনেকেই বলছে— বিজ্ঞাপনের নতুন কৌশল। যদি ধ'রেই নিই— লেখাটা সঞ্জয়ের, এবং বিজ্ঞাপনই— তবু তার মধ্যে কি একটুও সত্য নেই?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাতাটা বন্ধ ক'রে চুপচাপ ব'সে থাকলো আনন্দ। মাথাটাকে হালকা করতে চাইলো। কিন্তু তা হলো না। নিনির কথা মনে পড়লো। নিনি বলেছিল, 'বুদ্ধদেববাবু এভাবে না-লিখলেই পারতেন।' বাণী নাকি নিনিকে বলেছে, 'সজনীদা যত না আনন্দবাবুর ক্ষতি করেছেন তার চেয়ে বেশি দিয়েছেন প্রচার— বুদ্ধদেববাবু এটা কী করলেন! কবির প্রতি আগ্রহটাই কমিয়ে দিলেন।'

আনন্দ নিনিকে জিগ্যেস করেছিল, 'মহাপৃথিবী তোমার কেমন লেগেছে?' নিনি তার ভীষণ ভালোলাগার কথা জানিয়ে বলেছিল, 'এই দিশাশূন্য বিপন্ন সময়ের আর্তি তোমার কবিতায় ফুটে উঠেছে, বলা ভালো জীবনের— একটা পথের খোঁজ আছে, জীবনের

নির্দিষ্ট কোনো রূপ পেতে চাইছো—' এসব মনে ক'রে আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'বিপন্ন মানুষের বিলাপ শুনেছো বুদ্ধ, সেখানে সংলাপ তৈরি হয় না— একই কথা বার বার, আসলে উদ্ধারের ভাষা— পুনরুক্তি কীভাবে এড়াবো?'

অথচ কী পরিহাস— প্রগতিপন্থীরাও তার 'কেন লিখি'তে সন্তুষ্ট নয়। কেমন নাকি মিস্টিক হয়ে উঠেছে তার লেখা। গতির ব্যসন-যে আনন্দর অপছন্দে, তার বেঁচে থাকায় তা প্রকট— আর আমার বেঁচে থাকা আর কবিতা-যে অভিন্ন, প্রগতির বন্ধু— তোমরা বুঝলে না! কেউ বুঝলো না! নবীন কবিদের কেউ-কেউ আমার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে আত্মঘাতী ক্লান্তি।

আত্মঘাতী ক্লান্তি আমার কবিতার প্রধান আবহাওয়া নয়। কোনোদিন ছিল ব'লে তো মনে পড়ে না। তা ব'লে নিজে কখনও-যে আত্মহত্যার কথা ভাবিনি, তা নয়!

তাহলে লাসকাটা ঘরের কবিতা তো সাব্জেক্টিভ?

না। ড্রামাটিক রিপ্রেজেন্টেশন মাত্র। কিন্তু অস্বীকার করবো না— সাব্জেক্টিভ নোট শেষের দিকে ফুটেছে, কিন্তু তা লাসকাটা ঘরের ক্লান্তির বাইরে— সাব্জেক্টিভ নোট— কিন্তু কবিতার 'আমি' কি আমারই ব্যক্তিগত সত্তা নয়?

আনন্দর মাথা না-ভঙ্গিতে নড়ছে— তাহলে হ্যামলেট বা ম্যাকবেথ-এর আত্মঘাতী ক্লান্তির সঙ্গে শেক্সপীয়ারকে অভিন্ন রূপে দেখতে হয়। তা কি সম্ভব?

তাহলে 'আমি' কে?

সমাজ ও কালের সঙ্গে এই 'আমি'র সম্পর্ক কী— বলতে পারো?

প্রভা ঝাঁট দেওয়া থামিয়ে জিগ্যেস করলো, 'কিছু বললে? আনন্দ বললো, 'হুঁ— না, কিছু বলিনি তো!'

—'মনে হলো— তুমি কিছু বললে।'

—'এরকম আমারও হয়— কেউ যেন কিছু বলছে আমাকে, খেয়াল ক'রে শুনতে গেলে— কেবল নিস্তব্ধতা।'

তারপর ফের ডুবে গেল ভাবনায়। ভাবলো, এ বিষয়ে একটা লেখা লিখতে হবে। সঞ্জয়ও বলছিল, 'আত্মঘাতী ক্লান্তি-কে বিষয় ক'রে একটা লেখা লিখুন—'

ঘর ঝাঁট দিতে-দিতে একসময়ে প্রভা জিগ্যেস করলো, 'কোলকাতায় যাবার কী ভাবলে!'

প্রভা কি আনন্দ এরকমই। সারাদিন কথা নেই— এমন দু'-একটি কাজের কথায় তারা যেন ঘোষণা করে— আমরা একে অন্যের পরিচিত, আমরা একই বাড়িতে থাকি।

আনন্দ বললো, 'না, সেভাবে ভাবা হয়নি।' ব'লে সে প্রভার দিকে তাকালো। সকালের নরম আলোর মায়ায় কিনা কে জানে— প্রভাকে বেশ মায়াবী মনে হলো, আনন্দ ভাবলো, এ-মেয়েটির এখনও সম্ভাবনা আছে। কোলকাতার জলহাওয়ায় প্রভা হয়তো এখনও জীবনকে নতুনভাবে মেলে ধরার স্বপ্ন দ্যাখে। আনন্দ বললো, 'তবে ভাবছি।'

সময় কেবলই নিজ নিয়মের মতো— তবু কেউ
সময় স্রোতের 'পরে সাঁকো
বেঁধে দিতে চায়;

অনেকদিন পর স্টিমারঘাটের পথে একদিন আনন্দর সঙ্গে জ্যোতির্ময়ীর দেখা হয়েছিল। আনন্দ খেয়াল করেনি। আজকাল সে মেয়েদের দিকে খুব-একটা তাকায় না, অনেকটাই চোখের কারণে, খানিকটা সংশয়ে, এখন আর সেভাবে মনে হয় না— গভীর হৃদয়ের সেই মেয়ের দেখা সে পেয়ে যাবে একদিন— পাশ দিয়ে শুধু মেয়েমানুষ চ'লে যায়, তবু কখনও মনে হয় পাশে-পাশে কে যেন হাঁটছে তার, কে যেন ডাকলো তাকে— ডেকেছিল কেউ, 'স্যার!' ফিরে তাকিয়েছিল আনন্দ, চেনা মুখ। নতুন। সিঁথিতে সিঁদুর। কপালে টিপ। সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়ে জ্যোতির্ময়ী তার সামনে এসে বলেছিল 'ওঃ! কতদিন পর দেখলাম আপনাকে! কেমন আছেন?'

—'ভালো।'

—'স্যার, আপনার নতুন কবিতার বই— শুনেছি বেরিয়েছে, আমাকে কিন্তু এক কপি দিতে হবে সই ক'রে! আমি যাবো আপনার বাড়িতে।'

—'আচ্ছা।' ব'লে আনন্দ পা বাড়িয়েছিল।

—'স্যার একটু দাঁড়ান, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' ব'লে সে জেটিঘাটের দিকে তাকালো, সেই ফাঁকে আনন্দ— 'পরে হবে। তাড়া আছে' —ব'লে হন-হন ক'রে হাঁটতে শুরু করেছিল।

কিন্তু জ্যোতির্ময়ীর মুখটা তার চোখের সামনে ভাসতে থাকলো! দীপ্তিমুখ। স্বপ্নে তাকে কবে একদিন এথেনা মনে হয়েছিল। আজ কেমন কামনা জাগালো! নিশ্চয় বিস্ময় জেগেছে জ্যোতির্ময়ীর মনে, স্যার এভাবে চ'লে যেতে পারলেন!

—পারলাম। তোমার কাছ থেকে দূরে যাওয়াই ভালো।

—দূরে তো ছিলাম! সময়স্রোতে কোথায় ভেসেই গেলাম— দূরে।

—তবু সময়স্রোতের ওপর সাঁকো তো বাঁধা যায়!

—তবুও তো ভেঙে দিলেন।

—আমরা কেউ কারুর নই।

—আমরা জীবন তবু।

—তবুও মানুষী হয়ে পুরুষের সন্ধান পেয়েছো। তোমার মুখের রূপ আজ রক্ত-মাংস-কামনার রঙে লেলিহান! আমি ঝল্‌সে যাবো আর আমার ঝল্‌সানো অস্তিত্ব ইন্ধন হয়ে তোমাকে আরও জ্বালাবে।

আচমকা আনন্দর মনে পড়লো, এমনই তো রূপ ছিল একদিন প্রভার, পুড়তে-পুড়তে আমি দীপ্তি খুঁজেছি; কখনও মরুতৃষ্ণায় ভেবেছি, প্রভা যদি বৃষ্টি হতো! কিংবা নদী!

নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে আনন্দ নদীর বয়ে যাওয়া দেখছিল— সময় এভাবে বয়ে যায়; জীবন, পৃথিবীর সব নদী— জলসিঁড়ি নীপার রাইন কাবেরী রেবা— আমরা; তবু সব জীবন নদী নয়— বাবা বলেছিলেন, জীবনটা মাইগ্রেটরি পাখির মতো— উষ্ণতার খোঁজে বেরিয়ে পড়া— কে যে কোথায় চ'লে যায়— এরকমই কী-সব ভেবেছিল সেদিন।

আজ জ্যোতির্ময়ী আর তার স্বামী এসেছিল, তারা চ'লে যাবার পর, মনে পড়লো এইসব। সেবার জ্যোতির্ময়ীর আসা হয়নি। কী যেন বললো কারণটা— মনে করতে পারলো না। ওদের সঙ্গে কথা বলছিল ঠিকই, বরং বলা ভালো ওরাই বলছিল বেশি আনন্দ শুনছিল, কিন্তু মাঝেমধ্যেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। জ্যোতির্ময়ীকে দেখে মনে হলো— সে মা হবে। সমস্ত শরীরে জীবনোৎসব— যৌনমত্ততার চেয়ে ঢের মহীয়ান ব'লে মনে হলো আনন্দর, মনে হলো যেমন লিখেছিল একদিন, দীপ্তি রয়ে গেছে কোথাও।

জ্যোতির্ময়ীরা চ'লে যাবার পর, আজকের ডাকে আসা কোলকাতার চিঠির খাম ছিঁড়লো আনন্দ। চিঠিটা মেলে ধরলো চোখের সামনে।

মানিকতলা রোডের কোনো এক প্রভাকর সেন চিঠিটা লিখেছে। ভারী সুন্দর চিঠি। এরকম চিঠি এর আগে কেউ লিখেছে ব'লে মনে হলো না। কী পাগল ছেলে! সদ্য সে অর্থশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেছে। কিন্তু কবিতার প্রতি তার সহজ ও তীব্র ভালোবাসার কথা জানিয়ে, সে লিখেছে তার সাহিত্যিক জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ।

সমস্ত চিঠিটা পড়তে-পড়তে আনন্দর একবারও তা মনে হয়নি। বরং তার মনে হয়েছে— সদ্য-সদ্য এম.এ. পাশ করবার পর, এমন গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা তার আয়ত্তে এসেছিল কিনা সন্দেহ। এবং আনন্দ আরও একটা ব্যাপারে ভাবলো, প্রভাকরের মতো বয়সে তার প্রিয় কবির রচনা-পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো ধারণা সে করতে শেখেনি। আনন্দ চমৎকৃত হলো। তার প্রতি প্রভাকরের যে-ধারণা, সেসব যাচাই করতে এই চিঠি সে লিখেছে।

চিঠিটা বার-কয়েক পড়তে-পড়তে তার মনে হলো, কোলকাতায় গেলে কি আমি এই অনুভব আর পাবো? 'মকর সংক্রান্তির রাতে' প'ড়ে প্রভাকর অনুপ্রাণিত হয়েছে এই চিঠি লিখতে— আবহমান ইতিহাসচেতনার এমন রূপক— ভাব-বিহ্বল কান পাতলো আনন্দ— দিনান্তের কাকলি-কূজন ভিড় করছে তার মাথার চারপাশে, নাকি জেগে উঠছে মাথারই মধ্যে— সর্বানন্দ ভবনের এই পরিবেশ-পটভূমিই তো দিয়েছে! এখানকার আকাশের দিকে চেয়ে থেকেই তো একদিন মনে হয়েছিল, এক-একটা নক্ষত্রের নিজের মুখ দেখাবার জন্য চাই বিশাল এক আকাশ— আকাশের ব্যাপ্তি।

এক-একজন মানুষেরও— মুখ দেখাবার জন্য চাই আলো, আলো মানে প্রেম...

এই মফঃস্বল শহরের জল-হাওয়া-আলো-বাতাস, ওই আকাশ, নদী— ক্ষেতখামারই

তো আমাকে ভাবাক্রান্ত করেছে, তার প্রকাশেই তো মুগ্ধ হয়েছে প্রভাকর, অন্তত আরও একজন— তাহলে কেন এখানকার বাস তুলে আমি যেতে চাইছি কোলকাতায়?

আনন্দ আবারও চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে শেষের দিকটা মন দিয়ে পড়তে থাকলো:

> ...যেহেতু আপনি কালের উড়ে যাওয়া সম্বন্ধে এত সচেতন, কোনো বিশেষ যুগকে বা বিশেষ ব্যবস্থাকে, এমনকি স্বয়ং মানুষকেও, আপনার পক্ষে চরম ভেবে আঁকড়ে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। আঁকড়ে থাকতে চান, কিন্তু বোধ হয় পারেন না।

একটা জ'মে ওঠা দীর্ঘশ্বাস তার পাঠে বিঘ্ন ঘটালো। একইসঙ্গে আশ্চর্য হলো। কবিতার মধ্যে তো কবিকে না-খোঁজা, না-পাওয়ারই কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, আনন্দর কবিতার মধ্যে তাহলে কীভাবে তাকে উপলব্ধি করলো পাঠক— উপলব্ধি-যে ভুল, তাও বলা যাচ্ছে না। এবং এটাও তো ঠিক, খুব স্থূলভাবেই যদি বলা যায়— যাকে সে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে, সেই তার বন্ধন ছিঁড়ে চ'লে গেছে; এত পল্‌কা সে বন্ধন! কিংবা অন্য কোনো অন্তর্গত ত্রুটির জন্য?

> তবু আপনি নিজে রক্তে মাংসে সৃষ্ট, মানুষী চেতনায় আপনি পরিপূর্ণ, সেজন্যই বোধ হয় মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করতে আপনার ভালো লাগে, ইচ্ছা হয়। আমার এ-ধারণা কি সত্যি?

আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'সত্যি। তবু কথা আছে— কোনোকিছুকে চরম ভেবে আঁকড়ে থাকার মধ্যে নির্বাণের সমন্বয়-স্বপ্ন আছে। অনির্বাণেরও। শান্তি, মাত্রা চেতনা, এমন-কী উত্তেজনাও আছে; কিন্তু তা নিরিখের সান্ত্বনায় ফিরে আসে। জীবনের জন্য, সাহিত্যের তাগিদে, কখনও-কখনও কোনো জিনিসকে আমি চরম মনে ক'রে নিয়েছি। অবশ্যই তা সাময়িকভাবে। এখনও পর্যন্ত যে জিনিসকে আঁকড়ে আছি, তা ওই মানুষী চেতনা— মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।'

AMARBOI.COM

নক্ষত্র সরিয়া যায়— তবু কেন আমার এ-পায়ে
হারায়ে ফেলেছি পথ-চলার পিপাসা!
একবার ভালোবেসে কেন আমি ভালোবাসি সেই ভালোবাসা!

গরমের ছুটিতে এবার আনন্দর কোলকাতায় যাওয়া হয়নি। অনেকগুলো কাজ জ'মে ছিল। তার মধ্যে জরুরি ছিল পরের বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা। দ্বিতীয় আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাজির হলো ছুটির শেষের দিকে— প্রভাকর আনন্দর সমস্ত কাব্যগ্রন্থগুলো চেয়ে পাঠিয়েছে। জানতে চেয়েছে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরিচয়— ব্যাপারটা ছুটির মধ্যেই মিটিয়ে ফেলতে পারলে ভালো। তাহলে নিশ্চিন্তে ছুটিতে যাওয়া যাবে।

আত্মজীবনীর খসড়া সে শুরু করেছে। লিখতে-লিখতে মনে হচ্ছে— এ তার কবি-জীবনকে ফিরে দেখা; তার হয়ে-ওঠা, পড়াশুনো, ইত্যাদি কথা লিখতে গিয়ে নিজের 'অহং' সম্পর্কে খুব সাবলীলভাবে লিখেছে:

> আমি খুব সম্ভবত জাত সাহিত্যপ্রেমিক। যে আবহাওয়ায় ছিলাম তাতে উত্তরকালে ভালো সাহিত্যরসিক হয়েই মুক্তিলাভ করা যায় না, নিজের তরফ থেকে কিছু সৃষ্টি করবারও সাধ হয়।

বুদ্ধদেবের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা ও অভিমান সে অকপটে লিখতে পেরেছে:

> ব্যক্তিগতভাবে প্রগতি ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ...আমার কবিতার জন্য বেশ বড় স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতি'তে এবং পরে 'কবিতা'য় প্রথম দিকে। তারপরে— 'বনলতা সেন'-এর পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চ'লে গেছি ব'লে মনে করেন তিনি।

সমাজ ইতিহাস ও কবিতা— এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে লিখতে গিয়ে খসড়াতেও কাটাকুটি হয়েছে খুব। সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে আনন্দর কবিতা চেতনা দেখিয়েছে— একথা সে বিশ্বাস করে। তার আকাঙ্ক্ষা: আরও বড় চেতনায় ভত্তরপ্রবেশ। কিন্তু আমি কি সেই জ্ঞানদৃষ্টি পেয়েছি, যা সমাজকে নতুন পথ দেখাতে পারে? কেউ কি পারে— সে অর্থশাস্ত্রী, ধর্মবেত্তা, কিংবা যে-কোনো বিষয়ালোকিত সেবক ও সাধক? যদি পারতো, তাহলে একটা যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আর এক যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতো না—

কয়েকদিনের চেষ্টায় খসড়াটা দাঁড় করিয়েছে আনন্দ। এখন আরও একটি ঝামেলা রয়েছে। এই ছুটিতে খুকু যদি আসতো তাহলে তাকে দিয়ে ঝামেলাটা মেটানো যেতো। খুকু একটা বাক্স-ক্যামেরা কিনেছে। কেনার পর-পর আত্মীয়-পরিজনদের ছবি তুলেছিল খুব। আনন্দর ছবি তুলতে চাইলে সে বলেছিল, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে!'

—'মাথা খারাপের কী হলো আবার?'

—'এ মুখ কি আর ফোটো তোলার মুখ—'

—'তুমি দাঁড়াও তো—'

আনন্দ ছিট্‌কে স'রে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'তোর বৌদি আর আমার বিয়ের ছবিটা দেখেছিস তো— প্রভার মুখখানা কী ফোটোজিনিক!' সেদিন যদি আনন্দ পালিয়ে না-যেতো তাহলে সেদিনের তোলা ছবিটাই প্রভাকরকে পাঠিয়ে দিতে পারতো। আত্মপরিচয়ের সঙ্গে প্রভাকর তার একটা ফোটোগ্রাফ চেয়েছে। কিন্তু স্টুডিয়োতে গিয়ে ছবি তোলানোর মতো কাজটা একটা বাজে কাজ হয়ে ঝুলে আছে।

তার মধ্যে সংসারের দায়-দায়িত্ব— মেজাজটাও খিঁচড়ে গেছে। সবচে' বড় সমস্যা, বাইরে তা প্রকাশ করা যাবে না— সে শিক্ষক, সে কবি, বুদ্ধি-বিবেক অন্যদের চেয়ে বেশি; তবু প্রভার কাছে সে একটা নিকৃষ্ট জীব, তাকে দেখলে প্রভা কেমন কুঁকড়ে যায়, কখনও ক্ষেপে যায়— আগে কপাল চাপড়াতো, কেমন একটা সুরে কাঁদতো, মরা কান্নার মতো— এখন মাঝেমধ্যে দারুণ সংলাপ বলে, একদিন বলেছিল, 'এই খাঁচার জীবন— অপমানকেও চিনি না।'

—'কে তোমাকে অপমান করলো?'

—'কেউ না।'

—'বললে যে!'

—'এম্নি। মনে হলো তাই। মাঝে মাঝে ভাবি, জীবনের কি কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না! হয়তো ছিল— কোন্ সুদূরের আলোর আয়োজনের মধ্যে— ছিল!'

এইসব সংলাপে আনন্দ অবাক হয়েছে। নির্বাক থেকেছে। নিজেকে ভীষণ অযোগ্য মনে করেছে। একইসঙ্গে প্রভার জন্য মায়া জন্মেছে। কিন্তু সবই নিষ্ফল।

আর একদিন প্রভা বলেছিল, 'কোথায় যেন হারিয়ে গেছি আমি!' কেমন উদাস, দূর-মনস্ক দেখাচ্ছিল তাকে, 'কেউ কি খোঁজে আমাকে?'

আনন্দ জিগ্যেস করেছিল, 'কোনো প্রেমিকের হৃদয় কি জয় করেছিলে?'

প্রভা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আনন্দর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'সে-সৌভাগ্য সকলের জীবনে হয় না।' কথাটার মধ্যে কি দীর্ঘশ্বাস মাখানো ছিল?

প্রভার জন্য আবারও একটা কষ্ট টের পাচ্ছে আনন্দ। মেয়েটির রূপ ছিল। হৃদয় ছিল। তাকে ভালোবেসে হয়তো অনেকেই তৃপ্তি পেয়েছে। হয়তো তৃপ্তি দিতেও চেয়েছিল কেউ— সেই ফিরিয়ে দেওয়ার স্মৃতি কি সেদিন প্রভাকে অমন উদাস ক'রে দিয়েছিল? তার সেই প্রেমিক কি কোলকাতায় থাকে— এখন তাই কি প্রভা কোলকাতায় যাওয়ার জন্য এত ব্যাকুল?

অনেকদিন পর আনন্দ একটা গল্পের কথা ভাবলো— একটা নতুন গল্প, ফিরে দেখা নয়, জীবন যেমন হ'তে পারে তার একটা আভাস— গল্পটা প্রভার— খাঁচা ভাঙার গল্প, একটা আকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে আনন্দ, ভাবছে— প্রেম কি শুধু মিলন নিয়ে? তা নয়। তা নয়। দীর্ঘ বিচ্ছেদ, ব্যথা, শূন্যতা; সৃষ্টির অবিচার অন্ধতা—

নক্ষত্রের আকাশ আনন্দর চোখের সামনে, সন্ধ্যাতারা ভোরের আকাশে— শুকতারা, দীপ্তিমুখ— দীপ্তি; ভাবনাটা কেমন রূপ থেকে অরূপের দিকে চ'লে যাচ্ছে— আঁকাবাঁকা রহস্যময় এক সিঁড়ি— নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আনন্দ, সে বিড়বিড় করলো, 'তবু প্রেম অপরূপ রূপ পায়!'

তুমি কি এখনও বিশ্বাস করো আনন্দ— সূর্যের চেয়ে প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি?

সংশয় রয়েছে কোথাও, একটু বিপন্নবোধ যেন জেগে উঠছে আর তখনই প্রভাকর তার সামনে এসে দাঁড়ালো। আশ্চর্য! যাকে সে কখনোই দ্যাখেনি, কেবল চিঠিতে আলাপ পরিচয়, সে-ই এমন অবয়ব ধ'রে তার সামনে! আনন্দ শান্ত-গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ। আমি আজও অনুভব করি প্রেমের প্রাণের শক্তি সূর্যের অধিক।'

আর তখনই সে স্টুডিয়োতে যাবার কথা ভাবলো।...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার বুকের থেকে একদিন চলে যাবে তোমার সন্তান
বাংলার বুক ছেড়ে চলে যাবে; যে ইঙ্গিতে নক্ষত্র ঝরে,
আকাশের নীলাভ বুক ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে
ডুবে যায়— কুয়াশায় ঝ'রে পড়ে দিকে দিকে রূপশালি ধান

শেষপর্যন্ত আবারও দেশভাগের আশঙ্কা করছে অনেকেই। খবরের কাগজ আর নানাজনের কথায় আনন্দ বুঝতে পারছে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব কংগ্রেসের মনঃপুত হয়নি— ওই প্রস্তাবের মধ্যেই দেশ ভাগের বীজ রয়েছে— রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা এরকমই আশঙ্কা করছেন, যদিও তৃতীয়ভাগের বাংলা ও আসামকে মুসলিমপ্রধান অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি— যেমন হয়েছে দ্বিতীয়ভাগে; তবু বাংলা-আসামের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুসলিম-প্রধান— এই অঞ্চলকে মুসলিম লীগ আলাদা ক'রে চাইতে পারে— আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান, পাকিস্তান ফর মহামেডান। হিন্দুদের সেখানে কোনো স্থান হবে না। হিন্দুস্তান পাকিস্তান।

আমি কি হিন্দু?

এক ব্রাহ্ম পরিবারে আমার জন্ম। ব্রাহ্ম-হিন্দুর বিরোধ তো আজ সকলেরই জানা। আমরা পুতুল পুজোয় বিশ্বাসী নই। ইসলামও পুতুল পুজোয় বিশ্বাস করে না। ব্রাহ্মরা এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক। মুসলমানও— আল্লা এক, অদ্বিতীয়; তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই— বিশ্বাস করে। তাহলে ব্রাহ্ম ইক্যুয়াল টু ইসলাম— তাছাড়া— শিশ্নমনস্ক হয়ে পড়লো আনন্দ আর যে-আশঙ্কার বাতাবরণ এই আকাশ-মাঠ-নদী-ঘাট, ঘর-দোর, জারুল-হিজল-শিমুলের ছায়ায়, বট-অশ্বত্থের হাওয়ায় ছড়িয়ে ছিল, আছে,— তা কেমন ম্লান হয়ে পড়লো ওই ভাবনায়, আর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ঝাউ-বাঁশের মাথার ওপর বিবর্ণ চাঁদ। তবু—

—'একটা কথা— বাঙালি মুসলমানের শিরায়, এটা ভাবা যায়, বাঙালি হিঁদুর রক্ত বইচে, মিলেমিশে আচিও ঢের দিন। কিন্তু বিহারি মুসলমান যদি আসে— হিঁদুদের কী হবে বলা মুশকিল।'

—'তার মানে বলতে চাচ্চ, আমরা এ দ্যাশে থাকবার কথা ভাববো না। বাপ-ঠাকুদ্দার মাটি ছেড়ে—'

—'না সতীশ, আমি তা বলিনি— বলছি না।'

—'আসলে গোলাম চাচা বলতে চাচ্চে— বিহার বা অন্য প্রদেশ থেকে, এমন-কী, এ-বাংলার পশ্চিম অংশ থেকে আসা মুসলমানরা ভাববে— এটা তাদের হকের দেশ, এখানে বিধর্মীরা থাকবে কেন?'

—'কিন্তু আমরা তো হিন্দুস্তান চাচ্চি না।'

—'তোমরা চাচ্চ না, আমরা চাচ্চি।'

—'না, আমরা সবাই চাচ্চি না— আমরা কেউ-কি রাজা-উজির হবো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তাহলে কি এম্‌নিই ভাঙার কথা ভাবছি?'

স্টিমারঘাটে, কলেজ-স্টাফরুমে, চা-দোকানে কিংবা অন্য কোথাও শোনা কথাগুলোকে কী অদ্ভুত পরম্পরায় মনে প'ড়ে গেল কিংবা সে নিজেই বানালো আর আনন্দ যেন সকলকে উদ্দেশ ক'রে বললো, 'কেউ তো চেয়েছে— কেউ তো চায়— দাবি করে। আমরা কেউ-কেউ তাকে সমর্থন করছি মাত্র। রাজনীতি। মারামারি করছি।'

আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে— সংঘর্ষ-রত গরিব মানুষজন— চিৎকার করতে করতে আহত হচ্ছে কিংবা মরছে। তারপর স্তব্ধতা। অথবা উল্লাস। কিংবা বিলাপ। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো— কুরুক্ষেত্র, বিম্বিসারের ধূসর জগৎ। আনন্দ স্পষ্ট টের পেলো তার চেতনায় কীসের যেন একটা অস্পষ্ট ছায়া, যেভাবে পাখির ডানার ছায়া পড়ে ভূমিতে— আবহমানের বহমানতায় সে দেখতে পেলো কেবল নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য প্রবলের হাতে শব হয়ে যাওয়া মানুষের মিছিল, গলিত শবের স্তূপ— স্তব্ধ; জয়প্রশস্তি, বীরগাঁথা— স্তালিন-টম্যান, জহরলাল-জিন্না— ব্যক্তি; অস্তিমান— কিয়ের্কেগার্দ, নীৎশে— হিটলার; ব্যক্তির দাবি— সাম্রাজ্য ভাঙে, দেশ গড়ে-ভাঙে অথচ— ওই চাঁদ—

আনন্দ চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকলো। না, তেমন অনুজ্জ্বল মনে হলো না। ঠিক এভাবেই চাঁদ উঠবে ওই তল্‌তা বাঁশের ডগার উপর— একটা দৃশ্য হয়ে থাকবে কয়েকটা মুহূর্ত। লক্ষ্মীপেঁচা উড়ে যাবে চাঁদের দিকে, হাওয়া বয়ে যাবে, বেজে উঠবে পাতা তরঙ্গের বাজনা।

এই আকাশ-বাতাস, মাঠ-বন-বনান্তর সব থাকবে, কেবল আমরা থাকবো না, আমাদের চ'লে যেতে হবে— পাতায়-পাতায় ঢাকা প'ড়ে যাবে আমার পদচিহ্ন, আমি আর শুনতে পাবো না অন্যের কাছে অশ্রুত 'মিলু' ডাক— কে ডাকে? তেমনভাবে ভাবিনি কখনও— ওই কাঁঠাল-আম-জাম, ওই জারুল-জামরুল, দোয়েল-শালিক, প্রজাপতি-ফড়িং— ওরা আমাকে না-দেখতে পেলে কি বিষণ্ণ সুর ছড়াবে, বিষণ্ণ রঙ?

চাঁদ এখন মধ্য আকাশের দিকে। কিছুক্ষণ আগে নদীর বুকে টুকরো-টুকরো চাঁদের যে ঝিলিমিলি ছিল এখন তা নেই। এখন, চান্দ্র-সোহাগে নদী স্ফীত, মৃদু হাওয়ার স্পর্শে উচ্ছল। স্টিমারের ভোঁ আর জেলেনৌকার সিল্যুট ভেসে আছে নদীর বুকে। ঝাউপাতায় জোছনা আর অন্ধকারের আশ্চর্য কারুকাজ। মাটিতে তার আলপনা।

আনন্দ হাঁটছিল...

জোছনার মায়ার মধ্যে দু'-একটা নক্ষত্র— সপ্তর্ষি কালপুরুষ কোথায়? ওই নক্ষত্রটির কী যেন নাম— কুয়াশার সময় নয়, তবু কেমন কুয়াশা-কুয়াশা— কুয়াশা মাখা জোছনার মধ্যে জোনাকি তবু উজ্জ্বল— দীপ্তপ্রাণের মণিকা, আমার স্বপ্ন-জোনাকি— রবীন্দ্রনাথের মুখটা এক ঝলক মনে পড়লো আনন্দর। সে আকাশের দিকে তাকালো। একটি নক্ষত্রকে তার বেশ উজ্জ্বল মনে হলো। কে যেন বলেছিল কবে— সবচে' উজ্জ্বল যে তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-ই তোমার সদ্য-মরণের-পারে-যাওয়া প্রিয়জন— ও-ই কি আমার বাবা? আমাকে দেখছেন, নজর রাখছেন!

বাবা! তোমার সাজানো সংসার-সমাজ— সব কেমন ভেঙে যাচ্ছে, আমি সামাল দিতে পারছি না।

তাকিয়ে থাকলো আনন্দ নক্ষত্রের দিকে, অপলক। অপার্থিব একটা সুর যেন শুনতে পাচ্ছে সে। আন্দোলিত ডানার মধ্য থেকে যেন ছড়িয়ে পড়ছে সেই সুর— যৌবনের একটা সময় সে প্রায়ই শুনতো— বহুশ্রুত, বিভ্রম, তবু সত্য যেন, তবে কি পরী নেমে আসছে?

আনন্দ চোখ বন্ধ করলো। কিন্তু মুখটা তোলা আকাশের দিকে। শব্দটাকে গভীরভাবে অনুভব করতে চাইছে সে, শব্দটা তাব হচ্ছে না— আবার মিলিয়েও যাচ্ছে না। যেন থমকে আছে। আনন্দর মনে হলো পরী তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, স্পষ্ট একটা মুখ ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে— দীপ্তিমুখ, অপলক চেয়ে আছে— জোছনার মায়ায় এ প্রৌঢ় মুখ তবে কি অপরূপ হয়ে উঠেছে অথবা ততটা সুন্দর নয় ব'লেই কি নামতে-নামতে থমকে গেছে পরী— যেমন প্রভা, বনি— এরা পরী হ'তে পারতো কিন্তু তাদের রূপের যোগ্য ছিলাম না আমি— আনন্দ চোখ মেলে তাকালো, শূন্যতা জুড়ে কেবল জোছনা আর নক্ষত্রদ্যুতি। কেমন, একটা হাহাকার জেগে উঠলো বুকের ভিতর। এমন কুৎসিত দর্শন সে কার পাপে— গুপ্ত বংশের প্রত্যেকটি মানুষ ছিলেন অপরূপ সুন্দর— সে কতকাল আগে যখন পরীরা নেমে আসতো এ পৃথিবীর ফসলভরা মাঠে, জোছনা রাতে— এরকমই জোছনা রাতে, আমারই মতো কেউ— যাঁর রক্তের প্রবাহ এই দেহের শিরা-উপশিরায়, এরকমই দাঁড়িয়ে ছিলেন, হয়তো আমার মতো আকাঙ্ক্ষায় নয়, এম্নি জোছনা বিলাসে— আর তখন পরীরা নেমেছিল— জোছনা-ভেজা অনুপম অবয়বে প্রজ্জ্বলিত রূপের বিভায় কোনো এক পরী মুগ্ধ— তখন সোনালি ধানে ভ'রে ছিল মাঠ... সেই আগের মতো আনন্দ স্পষ্ট কল্পনা করতে পারলো: পরীর বক্ষলগ্ন সেই অনিন্দ্যকান্তি পুরুষ; পরম মমতায়, আশ্লেষে পরীর দু'বাহু লতার মতো জড়িয়ে ধরেছে তাকে, সেও— ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে ডানা ঝাপ্‌টে পরী উড়ে যাচ্ছে...

আনন্দ দেখছে...

অমন বিজড়িত হওয়া যদি যেতো! পরী নয়, অন্তত প্রভার সঙ্গে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ শুধু দেহ— আর দেহের পীড়নে
সাধ মোর— চোখে ঠোঁটে চুলে
শুধু পীড়া, শুধু পীড়া!—

লতার মতো দু'বাহু দিয়ে পরস্পর তীব্র আশ্লেষে বিজড়িত— পরীর ডানা আন্দোলিত হচ্ছে, পরীর বুকের মাঝে সুগন্ধ আঘ্রাণের মুদ্রায় পুরুষটির মুখমণ্ডল— আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, পুরুষ-মুখটি কেমন বদলে যাচ্ছে, পরীর মুখও— ডানা উধাও— চোখ মেলে তাকালো আনন্দ, সমস্ত দৃশ্যটাকে সে মুছে দিলো। নিজেকে ধিক্কার জানালো বটে কিন্তু যৌনতাড়না রয়ে গেল। ক্রমশ একটা যন্ত্রণা, খুব মিহি— তলপেটে নাকি লিঙ্গমূলে কিংবা অন্য কোথাও, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সব মানুষেরই একটা বিবাহিত-জীবন থাকা দরকার— কাগজে-কলমে বিবাহিত সে, প্রভা; কিন্তু জীবন নেই। কেন-যে যৌনতার প্রতি এত বিরাগ প্রভার? আর কেনই-বা আনন্দর এত তীব্র— সে বিড়বিড় করলো, 'সুন্নৎ-সুন্নৎ—'

—সত্যিই তুমি বিশ্বাস করো— সারক্যামসিশন ইন্টেসিফাইজ সেক্সুয়াল প্যাশন অ্যাণ্ড প্লেজার?

—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার না— এটা ফ্যাক্ট— ইহুদিদের গ্রেট কণ্ট্রিবিউশন টু সিভিলাইজেশন।

—কাকতালীয়ভাবে তুমি তা উপভোগ করছো?

—যন্ত্রণা—

এই যন্ত্রণার কথা সে প্রভাকে কখনও বলেনি। জান্তব প্রয়োজন, তবু কোথাও যেন হৃদয় জেগে থাকে। তবু হৃদয়কে আজ চট্‌কে দিয়ে আনন্দ বললো, 'আজকাল উত্তেজনা হ'লে কেমন একটা টাটানি অনুভব হয়।'

—'এখন টাটাচ্ছে নাকি?'

কথাটার মধ্যে কেমন একটা শ্লেষ। আহা! যদি প্রশ্রয় থাকতো! তবু আনন্দ বললো, 'আমাদের বংশে একটা পরীর উপাখ্যান আছে— শুনেছো?

প্রভা বললে, 'হ্যাঁ শুনেছি।'

—'তোমার বিশ্বাস হয়?'

—'তা হয়— আগে কত সব কাণ্ড ঘটতো।' কেমন উদাস হয়ে গেল প্রভা, এখনও যদি ঘটতো তেমন— হয়তো প্রভার জীবনে কোনো রূপকথা তৈরি হ'তে পারতো।

—'আচ্ছা, পরী তো নিয়ে যেতো তাকে— পরদিন ধানক্ষেতের আলে তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা যেতো— পরী তাকে নিয়ে গিয়ে কী করতো?'

—'ন্যাকা, যেন কিছুই বোঝে না!'

এসময় মেয়েমানুষের শরীর যে নোনা গন্ধ ছড়ায়, একটু যেন ছড়ালো— সেই গন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়িয়ে পড়লো আনন্দর রক্তের ভিতর, জননকোষে-কোষে সৃষ্টির উল্লাস, তার চোখে ফুটে উঠলো কামদৃষ্টি, ডাক পাঠালো প্রভার চোখে, বললো, 'আমি যা বুঝি, তা তো ঠিক হয় না সবসময়— কী আশ্চর্য! তোমার সঙ্গে মিলে গেল! পরীর ক্রীড়াকর্ম কল্পনা করছিলাম—'

তাদের দু'জনের মাঝখানে হ্যারিকেনের লালাভ আলো। আলো আশ্চর্য প্রসাধন হয়ে প্রভার মুখমণ্ডলে, যেন কামদীপ্তি ছড়াচ্ছে। প্রভা তাকিয়ে আছে আনন্দর মুখের দিকে। আনন্দ বললো, 'কাল তো কোলকাতায় চ'লে যাবো, আজ একবার তুমি পরী হ'তে পারবে প্রভা?' কাঙাল দেখলে যেমন করুণা জেগে ওঠে, তেমনই করুণার ম্লান আভা যেন জেগে উঠলো প্রভার চোখেমুখে। তারপর সে খিলখিল হেসে উঠলো। হাসির বেগ কমলে বললো, 'শরীর খারাপ।'

যেন খারাপ না-হ'লে প্রভার আজ পরী হ'তে আপত্তি ছিল না। এমনই একটা আভাস রয়েছে তার কণ্ঠস্বরে উচ্চারণের ভঙ্গিতে। এরকম আন্দাজ ক'রে আনন্দ বললো, 'তবু, আজ রাতটা আমার সঙ্গে থাকবে— একটু সময়ের জন্য অন্তত?'

—'ধ্যেৎ— এই অবস্থায় কাছে থাকতে নেই।'

কোথাও যেন একটা আশ্বাস রয়েছে— দু'-একদিন পরে গেলে প্রভার পরী হওয়াটা অন্তত উপভোগ করা যায়— আনন্দ বললো, 'ক'দিন?'

—'আজ সকাল থেকে—'

আনন্দ বাইরের দিকে তাকালো। প্রাক-পূর্ণিমার মেঘলা জোছনা ঢুকে পড়লো তার মাথার মধ্যে। আনন্দ উঠলো। অনেকক্ষণ ধ'রে চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দিয়ে সে উঠোনে পায়চারী করলো কিছুসময়। যৌন-উন্মত্ততাকে শান্ত করবার জন্য সে সুন্দর-কিছু ভাবতে চাইছিল। আকাশের দিকে তাকিয়েছিল— উজ্জ্বল সেই নক্ষত্রটাকে দেখবার জন্য, দেখতে পেলো না— আকাশে যেন কোথাও আর নক্ষত্র নেই। মিহি চিন্‌চিন্ একটা ব্যথা। ব্যাঙ ডাকছে। ঝিঁঝি ডাকছে। আনন্দ অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করলো— সমস্ত অন্য-তে যৌনচেতনা, এমন-কী অসুস্থ মায়ের কথা ভাবতে গিয়েও সে যৌনভাবনাকে এড়াতে পারলো না। তার মনে হলো সব সুন্দরের মধ্যে সৃষ্টির প্ররোচনা রয়েছে... অতএব নিস্তার নেই— স্ফীত জননেন্দ্রিয়কে সে মুঠিবদ্ধ করলো। যেন তাকে নিকেষ ক'রে দিতে চাইছিল। পরক্ষণেই পরম মমতায় তাকে আদর করলো।

ফিরে এলো তার অন্ধকার ঘরে। স্মৃতি-স্বপ্ন-কল্পনার মিশ্রণে কবেকার বনি, প্রভা, জ্যোতির্ময়ীরা আশ্চর্য এক রমণীর জন্ম দিচ্ছে— অঙ্গবিহীন অবয়ব ঝাঁপিয়ে পড়ছে আনন্দর শরীরের ওপর, তীব্র সুখানুভূতিতে আনন্দর আঁখিপল্লব নিমীলিত— প্রতিবারের মতো এবারও তার ব্যাসদেবের উপাখ্যান মনে পড়লো... তার হস্তমধ্যে স্খলিত প্রাণবীজ— সেও কবি, তবু তাকে শুনতে হচ্ছে প্রাণবীজের মৃত্যুকান্না; আর ভয়ঙ্কর এক অবসাদ তাকে গ্রাস ক'রে ফেলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি আছো জেনে আমি অন্ধকার ভালো ভেবে যে অতীত আর
যেই শীত ক্লান্তিহীন কাটায়েছিলাম,
শুধু তাই কাটায়েছি।
কাটায়ে জেনেছি এই-ই শূন্য, তবু হৃদয়ের কাছে ছিল অন্য-কোনো নাম।

কখন কী হয়— এরকম একটা আশঙ্কা সবার মধ্যে। খবরের কাগজ ও রেডিয়োর সংবাদভাষ্যে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে— দেশ স্বাধীনতা পাওয়ার দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে যে চিড় ধরেছিল তা ভয়ঙ্কর ফাটলের রূপ নিয়েছে। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব ওই ফাটলকে গভীর খাদে রূপান্তরিত করতে পারে। তা যদি হয়, 'সর্বানন্দ ভবন' পড়বে পাকিস্তানের মধ্যে— এরকম ভাবনায় সবারই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু 'মন খারাপের কোনো মানে নেই—' ভেবলুর কথাই ঠিক, 'বসতি তুলতে হয়—' যেমন হয়েছিল সর্বানন্দের, তারপর তাঁর অন্যান্য পুত্রদের, এই তো ভেবলু কতদিন দেশ ছাড়া, দেশে আর ফেরা হবে ব'লে মনে হয় না— সঞ্জয়, সত্যপ্রসন্ন— ওই দুই নামে আনন্দর বুকের মধ্যে কেমন এক আবেগ উথলে ওঠে। কী দারুণ বন্ধুত্ব দু'জনের মধ্যে!

একটা পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে এমন বন্ধুত্ব, সত্যিই আর কোনো নজির আছে ব'লে মনে হয় না আনন্দর। দু'জনই এখনও পর্যন্ত অকৃতদার। সঞ্জয় সম্পাদক। সত্যপ্রসন্ন কর্মাধ্যক্ষ। কোলকাতা থেকে দূরে ব'সে ভালোভাবে পত্রিকা করা সম্ভব নয়— এটা উপলব্ধি ক'রেই তো কুমিল্লা থেকে প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর-পরই তারা দেশ ছেড়েছে, দশ বছর আগে— 'ভালো কিছু করতে হ'লে কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে।' সঞ্জয় বলেছিল কথাটা।

—'দাদা, এত কী ভাবছেন বলুন তো!'

আনন্দ একটু চমকে নলিনীর মুখের দিকে তাকালো। কণ্ঠস্বরে কী আশ্চর্য সহানুভূতির প্রকাশ। প্রভার স্বরতন্ত্রীতে এ-সুর কখনও জাগবে না! আনন্দ বললো, 'দেশের কথা।'

নলিনী বললো, 'জানি তো—'

—'মাকে কথায়-কথায় বলেছিলাম, ভাবছি কোলকাতায় চ'লে আসবো। মা চাইছেন না আমি বরিশাল ছাড়ি। এমন-কী বি.এম. কলেজের চাকরিটাকেও ধ'রে রাখতে বলছেন।'

নলিনী একটু ভেবে বললো, 'আসলে মা ভাবছেন— নিশ্চিত আয়ের পথটা বন্ধ হয়ে গেলে, আবার কী দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হয় আপনাকে!'

—'আমার কিন্তু বি.এম. কলেজে থাকতে একটুও ইচ্ছে নেই।'

নলিনী কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

আনন্দ বললো, 'শুধু বি.এম. কলেজই-বা বলছি কেন— পড়াতে আর ভালো লাগছে না। যে-জিনিস যাদের যেভাবে শেখানো হচ্ছে— সবই অসার।' একটু ভেবে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললো, 'সঞ্জয়বাবু-সত্যবাবু বলছিলেন— একটা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ হবে, আলাপ-আলোচনা চলছে— আমি সেখানে একটা কাজ পেতে পারি।'

—'বাঃ! এত ভালো খবরটা চেপে রেখেছিলেন!'

অশোক ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে জিগ্যেস করলো, 'কী খবর রে দাদা?'

—'সঞ্জয়বাবুরা একটা নতুন খবরের কাগজ বের করবেন, সেখানে আমার একটা কাজ হ'তে পারে।'

খবরটাকে তেমন গুরুত্ব দিলো না অশোক। বললো, 'খবর শুনেছো? কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করছে।'

—'লীগ?'

—'লীগ তো আগেই 'না' ক'রে দিয়েছে।'

আনন্দ অন্যমনস্কভাবে বললো, 'কিন্তু এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেস-যে হিন্দুদের দল— এটা প্রমাণ হয়ে গেছে, আর লীগ— মুসলমানদের; ইন্‌টারিম গভর্ণমেন্টে লীগ পার্টিসিপেট না-করা মানে— বিপদ!'

পলিটিক্‌স্‌ নিয়ে এরকম সরাসরি মন্তব্য আনন্দর মুখ থেকে এর আগে শোনেনি নলিনী, তার বেশ মজা লাগলো, বললো, 'বিপদ মানে?'

হঠাৎ যেন আনন্দ কুঁকড়ে গেল। এই বিপদের স্বরূপ সে আন্দাজ করতে পারলেও ব্যক্ত করা মুশকিল। একটু ভেবে নিয়ে আনন্দ বললো, 'ঠিক বলতে পারবো না।' তারপর স্বগতোক্তির মতো ক'রে বললো, 'সি আর দাশের মতো আর কোনো নেতা জন্মালেন না— এটা আমাদের দুর্ভাগ্য!' একটু চুপ থেকে ব'লে উঠলো, 'পরাধীনতার কারণ কী— আমরা কি জানি নিনি?'

—'সে তো অনেক কারণ— আমি দাদা পলিটিক্‌স্‌ বুঝি না।'

—'সে কি আর আমিও বুঝি— তবে সব কারণের কারণ একটাই— সি. আর. বুঝেছিলেন—'

—'কী?'

—'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।' তারপর কেমন আবেগতাড়িতের মতো বলতে থাকলো, 'তাঁর একটা কথা আজও মাথার মধ্যে গিঁথে আছে, কোথায় পড়েছিলাম, আজ আর মনে নেই— তিনি বলছেন: হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান সমাসে নয়, সন্ধিতে; সংযোগে নয়, সংসর্গে; ঐক্যে নয়, সাম্যে; মিশ্রণে নয়, যোগে; মিলনে নয়, মিলে; ফিউশনে নয়, ফেডারেশনে—' বলতে-বলতে নিশ্চুপ, তখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল ক্লান্ত গাঙশালিকের এক ভিড়— যার ওপর আছড়ে পড়বে উন্মত্ত ঝড়। আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'দেশবন্ধু আসিয়াছে খরধার পদ্মায় এবাব/কালীদহে ক্লান্ত গাঙশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়—' ঝড়ে ভাসতে থাকা পাখির ডানা, সিনেমায় যেমন হয়, মিলিয়ে

যেতে-যেতে ভেসে উঠলো, বিশাল রুক্ষ রঙের ডানা; যেন ডানায়-ডানায় ছেয়ে আছে আকাশ, সূর্য ঢাকা পড়েছে, নেমে আসছে ডানারা—

আনন্দ অসহায়ভাবে চারপাশে তাকালো। কেউ নেই। সবাই চ'লে গেছে। তার এই হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়াকে সকলেই ভাবে আনন্দ ভাবাক্রান্ত হয়েছে, তাকে কেউ বিব্রত করে না; একটা পরিবেশ তৈরি ক'রে দিতে চায়— এ-বিষয়ে নিনির মধ্যে সচেতন প্রয়াস লক্ষ করেছে আনন্দ, কিন্তু আজ নিনি না-চ'লে গেলেই পারতো— বিপদের স্বরূপ অন্তত আনন্দ প্রতীকে প্রকাশ করতে পারবে— নিনিকে ডেকে বলা কি ঠিক হবে এখন? না থাক্। কিন্তু আর বলা হবে না— আনন্দ নিশ্চিত জানে তা, সে ভুলে যাবে। কিংবা ফের যখন মনে পড়বে তখন তার প্রসঙ্গক্রম হারিয়ে যাবে। বলার ইচ্ছে হবে না। এরকম ঘটেছে তার জীবনে বহুবার, এমনই ঘটে। যদি সময়মতো বলতে পারতো সেইসব কথা তাহলে জীবনের ভার এত দুর্বিষহ হতো না।

বিকেলবেলা লেকের পাশ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আনন্দর মনে হচ্ছিল, এই লেক, যদি সে কোলকাতায় চ'লে আসে, কীর্তনখোলার বিকল্প হ'তে পারে, অন্তত এইখানে হেঁটে দাঁড়িয়ে ব'সে কিছুটা সময় কাটানো যাবে। এখানে অনেক পাখি আছে। হাঁস। কাক-শকুনই বেশি— তবু আচমকা তার মনে হয়েছিল, এখানে এই ঘাস-পাতায়, আকাশ-জলে, জারুলের ফুলে, এখনও দু'-একটা কুঁড়ি যা ফুটছে কৃষ্ণচূড়ায়, বট-অশ্বত্থে— কোথাও তো 'কখন কী হয়'— এমন ভাব নেই। ঠিক এমনই মনে হয়েছিল বছর-তিনেক আগে— রাজপথে কঙ্কালের মিছিল, করুণ ফ্যান দাও প্রার্থনা, ফুটপাথে মৃত মানুষ— অথচ এখানে ফুল ফুটেছে, প্রজাপতির পাখনার রঙ তো ম্লান হয়নি সেদিন!

অতএব, কখন কী হয়— আমি জানি, কোথায় হয় তা-ও জানি— একটা বটগাছ ভেসে উঠলো চোখের সামনে, এ কি দেশের সেই প্রান্তরের গাছ? নাকি বোটানিক্যাল গার্ডেনের গাছটা? হ'তে পারে লেকের গাছও— সেই ঝুরিস্তম্ভের মধ্যে আনন্দ যেন নিজেকে দেখতে পেলো... কাউকে কিছু বলার আছে— এমন একটা ভাবনায় সে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু কী ভেবে ব'সে পড়লো ফের।

খাবার টেবিলে ব'সে আনন্দ বিড়বিড় করছিল, 'যেখানেই যাও, জীবনের কোনো রূপান্তর নেই।'

—'দাদা!'

আনন্দ চোখ তুলে তাকালো। নিনি ভাতের থালা এগিয়ে দিতে দিতে ডেকেছে, 'আপনার কি শরীর ভালো নেই?'

—'এত যত্নআত্তি, শরীর খারাপ হবার ফুরসৎ কোথায়?' একটু উচ্ছ্বাস দেখালো আনন্দ।

—'কেমন একটা ঝিমুনি ভাব।'

—'ও কিছু না। আজকে অনেকটা পথ হেঁটেছি— একটু ক্লান্তি অবশ্য লাগছে। লাগে।'

নিনি চোখের কোণে একবার অশোকের চোখ ছুঁতে চেষ্টা করলো। আনন্দ ব'লে উঠলো, 'না। আমি তো ভাবছিলাম। ভাবছিলাম— এই সপ্তাটা থেকে চ'লে যাবো।'

—'কেন?'

—'যা বৃষ্টি! আমার বইপত্রগুলোর কী অবস্থা কে জানে, উইয়ের উপদ্রব খুব— তাছাড়া একটা-দুটো খাতা, মনে হচ্ছে, বাক্সের মধ্যে ঢোকাতে ভুলে গেছি। সেগুলো নির্ঘাৎ ভিজেছে।'

—'ঠিক আছে দিদিকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

আনন্দ যেন লাফিয়ে উঠলো, 'না, না। ও কম্মটি করতে যেও না। এমনিতে সংসার সামলাতে তার নাভিশ্বাস— আচ্ছা আমি দেখছি—'

শুয়ে-শুয়ে আনন্দ ভাবছিল। এখানে থাকতে তার খারাপ লাগছে না। সময় মন্থর আর অলস— এই যা। খাওয়াটা বেশ ভালোই জুটছে। বইপত্র পড়ার অবকাশ যথেষ্ট। সুযোগও। নিনি তার পছন্দের কিছু বই এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছে। তার অধিকাংশ অবশ্য আনন্দর পড়া। কিন্তু পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে নিস্তব্ধ ব'সে থাকার ব্যবস্থা এখানে নেই। অবশ্য এখানে একটা নিমগাছ আছে। এখানে আলো খুব উজ্জ্বল। এ আলো যদি নেভে কখনও, উড়ে যাওয়া পাখির পাখনার হাওয়ায় নিভলো ব'লে মনে হবে না একবারও। যদি পাণ্ডুলিপি থাকেও, সেই আকাঙ্ক্ষিত অন্ধকার এখানে আসবে না কখনও, আর সেই অন্ধকার যদি না-আসে. সেই মুখও আসবে না—

—কার মুখ?

—আমলকি শাখার পিছনে একদিন শিঙের মতো বাঁকা নীল চাঁদ দেখেছিল যে মুখ!

—কার মুখ?

—ধূসর পাণ্ডুলিপিরা জানে।

—তুমি জানো না?

—সে-মুখ ধূসরতম।

একটা দীর্ঘশ্বাস প্রবল ঘূর্ণি তুলে আনন্দর বুকের মাঠ-প্রান্তর ছেয়ে ফেললো। তার ঠোঁট নড়ছে, 'তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে/পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন/মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন: সেই মুখ আর আমি রবো সেই স্বপ্নের ভিতরে।'

—এখনও স্বপ্ন আছে তোমার?

আনন্দ সত্যিই যেন সন্দিগ্ধ। দশ বছর আগে লেখা কবিতায় যে স্বপ্ন ভাস্বর ছিল সত্যিই কি আছে তা? বিছানায় উঠে বসলো। ঘর অন্ধকার। তবু নিজেকে আবছা দেখা যায়। মেডিটেশন-ভঙ্গিতে নিজেকে বসালো। বন্ধ দু'চোখের মাঝ-বরাবর সে একটা দীপশিখা

কল্পনা করলো। যেন কোথাও প্রবল হাওয়া বইছে, নিভু-নিভু শিখা, নিভে গেল— সবচে' প্রিয় মুখ কল্পনা করতে গিয়ে অবাক হলো আনন্দ, ভেসে উঠছে জ্যোতির্ময়ীর কবেকার মুখ— দীপ্তিমুখ, শ্রীপঞ্চমীর চাঁদ ওই মুখে তাকিয়েছিল, এলোচুলের মাঝে মুখখানা দেখছিল আনন্দ— কী রঙের পাড় ছিল শাড়িটার? যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী।

বিহারীলালের সারদার মতো তুমি কি তবে আমার মহাশ্বেতা! রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার মতো কেউ তবে হয়ে উঠবে তুমি? একদিন স্বপ্নে— এই মেয়েটিকে আমার এথেনা মনে হয়েছিল— প্রমেথিউসকে পথ দেখিয়েছিল এথেনা। প্রমেথিউস— বাউণ্ড, আনবাউণ্ড—

একটা শ্লেষাত্মক শব্দ উগরে দিলো তার স্বরতন্ত্রী। তার পর বিড়বিড় করলো, 'হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের মধ্যে সূর্যকে ডুবিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা এক জন্তু আমি— কোনোদিন মানুষ ছিলাম না।'

—তুমি তো অন্ধকার বিনাশ করতে চাও।

—বুঝি না— বিলাসী না বিনাশী।

—বিনাশী-ই। যদি বিলাসী-ই হবে, তাহলে কবিতাটি প্রকাশ হলো না কেন?

—সম্ভবত পাণ্ডুলিপি হারিয়ে ফেলেছিল সম্পাদক।

—বিলাসী হ'লে তো আবারও লিখতে পারতে! তাই না?

মুগ্ধ দেখছে মেয়েটিকে।

—ও কে আনন্দ?

—আমার পদ্মপাতা।

ঘুম ভাঙতেই ভোরের আলো দারুণ উজ্জ্বল মনে হলো। নাকি এই জীবনটাই টলটল করছে, ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দুর মতো! ঠিক ভেবে পেলো না আনন্দ। যা-ই হোক, রক্তমাংসের জ্যোতির্ময়ীকে একবার দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে আনন্দর।

AMARBOI.COM

ইতিহাস ঢের দিন প্রমাণ করেছে
মানুষের নিরন্তর প্রয়াণের মানে
হয়তো-বা অন্ধকার সময়ের থেকে
বিশৃঙ্খল সমাজের পানে
চলে যাওয়া;

তবু দেশে ফেরার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছিল। সেটা প্রকাশ হ'তেই অশোক বলেছিল, 'যদি যেতে চাও ষোলো তারিখের পর যেও।'

—'আমি তো ভাবছি পনেরো তারিখে রওনা দেবো।'

—'না। ষোলো তারিখ— লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন— এক কথায় হরতালের চেহারা নেবে সর্বত্র— অন্তত মুসলিম-প্রধান এলাকায় তার চেষ্টা হবে।'

আনন্দর মনে পড়ছিল— খবরের কাগজ প'ড়ে তার মনে হয়েছে বৃটিশ সরকার আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জিন্নাসাহেব এক প্রকার যুদ্ধই ঘোষণা করেছেন। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান— এ বাংলায় এখন মুসলিম লীগ সরকার চালাচ্ছে— সুরাবর্দী ঘোষণা ক'রেই রেখেছেন কংগ্রেস ক্ষমতায় বসলে বাংলা পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। আবার গত পরশু দেশপ্রিয় পার্কের জনসভায় লীগের বিরুদ্ধে কংগ্রেস যেসব কথা বলেছে— আনন্দ ভয় পেয়েছে। ষোলো তারিখের পরেই যাবার কথা ভেবেছে। তবু 'কখন কী হয়'-বোধে আক্রান্ত হয়ে এক-একবার সে লেকের ধারে গাছপালার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। গতকাল সে সারাদিন ঘর থেকেই বের হয়নি। রেডিয়োর সামনে বসেছিল।

সুরাবর্দীর সরকার আজকের দিনটাকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেছে। জিন্নাসাহেব কন্‌সটিটিউশনাল মেথডকে গুড বাই জানানোর কথা বলেছেন— তার মানে কি আইন অমান্য? শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে রুদ্ধ করা? সরকার কীভাবে পারে তা? আনন্দ ভাবছিল।

নিনি, ভেবলু— দু'জনই আজ কীরকম চুপচাপ যেন! একটু আগে রেকর্ড চালিয়েছিল নিনি। একটা গান শেষ না-হ'তেই বন্ধ ক'রে দিয়েছে। ভেবলু খবরের কাগজটার ওপর চোখ বুলাতে-বুলাতে রেখে দিলো একসময়। আর তখনই আনন্দ বললো, 'কোথাও কি কোনো খারাপ কিছু ঘটেছে?'

অশোক মাথা নাড়লো, 'ঘটবে। লীগের ডিরেক্ট অ্যাক্‌শন— কিছু আন্দাজ করতে পারছো দাদা?'

আনন্দ বেবোধের মতো মাথা নাড়লো।

নিনি বললো, 'কার বিরুদ্ধে?'

—'হিন্দুদের বিরুদ্ধে— পাকিস্তানের জন্য।'

নিনি বললো, 'ভাবতে পারছি না— মুসলিম লীগ হিন্দুদের বিরুদ্ধে! এই কোলকাতায় কংগ্রেস-মুসলিম লীগের ছাত্রসংগঠন একসঙ্গে আন্দোলন করেছে আজাদ হিন্দ বাহিনীর

বন্দি সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে— এই তো সেদিন, ফেব্রুয়ারি মাসে, বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশের গুলিতে যাঁরা শহিদ হলেন—' কেমন এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় নিনি যেন নির্বাক। আনন্দ চমৎকৃত হলো 'শহিদ' শব্দটা ব্যবহারের কারণে। কয়েক মুহূর্ত পর নিনি ব'লে উঠলো, 'কী এমন ঘটলো এই ছ'মাসে?'

এ-প্রশ্ন যেন সবারই। কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। বরং আরও তা গভীর হলো। আনন্দ বললো, 'গত মাসের ঊনত্রিশ তারিখে ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘট উপলক্ষে কোলকাতায় যে হরতাল হলো— হিন্দু-মুসলমানে কোনো ভেদ ছিল না তো!'

তবু ভোরবেলা পাখিদের গানে কোনো ভুল ছিল ব'লে আনন্দর মনে হলো না। রোদ্দুরে শরতের রঙ, বেশ উজ্জ্বল।

সরকারি ছুটির দিন। শহরে যেন কোনো ব্যস্ততা নেই। একটা ফাঁকা ট্রাম চ'লে গেল বালিগঞ্জের দিকে। একটা পুলিশের গাড়ি ল্যান্সডাউন ধ'রে চ'লে গেল উত্তরে। বাড়ির সামনে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দৈনন্দিন স্বাভাবিকতা লক্ষ করছিল আনন্দ। এখানে-ওখানে ছোট-ছোট জটলা। দোকানপাট খুলেছে তবু খোলেনি যেন— সবার মুখে আতঙ্কের ছায়া, সেই ছায়া সরাতে ঢাকতে কেমন যেন এক প্রস্তুতি আনন্দ লক্ষ করছিল— আতঙ্ক-আশঙ্কায় অধিকাংশ মুখগুলো থেকে প্রেম-করুণা-বিশ্বাসের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

আচমকা সময়টা কেমন বদলে গেল— বছর-কুড়ি আগে দেখা মুখগুলোকে যেন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তখন সে কলেজ স্ট্রিট এলাকায় একটা মেসে থাকতো। তখন বসন্ত। ট্রামে-রাস্তায়-ফুটপাথে-বাসে— এরকমই জটলা, মুখগুলো যেন একই— এখন শরৎ— তখন ছিল পাখিদের প্রজনন ঋতু, এখন কুকুরদের— শেয়ালদেরও কি? আর মানুষ এখন হত্যার জন্য, হত হওয়ার জন্য— প্রস্তুতি নিচ্ছে— আনন্দ চিৎকার ক'রে বলতে চাইলো, নরহত্যা কোরো না! কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। কেবল তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো ধূসর এক জগৎ, সে এই 'সময়' থেকে পিছিয়ে গেল প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর, তখন দাসযুগ— রুক্ষ পর্বতের পাদদেশ থেকে তিনদিকে ব্যাপ্ত বালুভূমি, যেন প্রসারমান। মিশর থেকে মুক্ত ক্লান্ত-ধস্ত নরনারীর মধ্যে আনন্দ নিজেকে দেখতে পাচ্ছে। সিনাই পর্বতশীর্ষের দিকে সে তাকিয়ে আছে বিস্ময়ে, শীর্ষ আবৃত নিবিড় ঘন মেঘে, আড়ালে ঈশ্বর— তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তাদের দলপতি— তিনি ফিরে এসে নির্দেশ জানালেন— কর্তব্য ও নিষেধ মন দিয়ে শুনছিলাম আমি, যেই তিনি বললেন, 'নরহত্যা করবে না।' কী এক আবেগে আমি ব'লে উঠলাম, শুনছো তোমরা? নরহত্যা করবে না! নরহত্যা কোরো না!

সেই সিনাইশিবির থেকে আজকের এই কোলকাতার ফুটপাথে এসে পৌঁছুতে আমি কতবার হত হয়েছি, হত্যাও করেছি বহুবার... হঠাৎ জিতেনের কথা মনে পড়লো, কুড়ি

বছর আগে, সেই বসন্তে, দাঙ্গা-বিষয়ক কথাবার্তায় জিতেন বলেছিল, ‘এটাই নিয়ম। বেঁচে থাকার। মারো আর বাঁচো। ট্রেডিশন। সেই ঋক্‌বেদের যুগ থেকে—’

ল্যান্সডাউন রোডের ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আনন্দর মুখ আকাশমুখো— সকালের এই আকাশ দারুণ নীল। আনন্দর আঁখিপল্লব নিমীলিত হলো— অগ্নিময় অশ্বের রূপকে সে আগুনকে দেখতে পচ্ছে— আনন্দ বিড়বিড় করছে, ‘হে সর্বত্রগামী অগ্নি! তুমি দূরে ও আসন্ন দেশে পাপাচারী মানুষ হ'তে আমাদের সর্বদা রক্ষা করো। হে শত্রু-পরাজয়ী অগ্নি, হে প্রজাপালক অগ্নি—’ যেন দাউদাউ ছুটে আসছে অগ্নি। আনন্দ চোখ মেলে তাকালো। তবু তার কল্পনায় আসতে চাইছে জ্বলন্ত ঘরবাড়ি, এমন-কী মানুষ— অগ্নিপরিধি ছোট হ'তে হ'তে লেলিহান হয়ে উঠছে; অগ্নি— বিচিত্রবর্ণ অগ্নিজিহ্বা— স্তম্ভের সঙ্গে বাঁধা মানুষটাকে স্পর্শ করেছে— মানুষটা জ্বলছে— চার্বাক, ব্রুনো, জোয়ান অব্ আর্ক— এখনও মানুষ মানুষকে পোড়াচ্ছে, পুড়ছে মানুষ— প্রকাশ্য রাজপথে— হে অগ্নি! ‘আমরা আগুনের ব্যবহার শিখিনি!’ আনন্দ বিড়বিড় করতে-করতে ফিরে এলো ঘরে। ভাবলো, কাব্যময়তা তবে হিংসাকেও আড়াল করতে পারে! কিংবা হিংসাকে ঘৃণাকে মহিমা দিতে পারে কাব্য! আশ্চর্য এক বিপন্নতা আনন্দকে গ্রাস ক'রে ফেলছিল।

AMARBOI.COM

পৃথিবী আমাকে দেখে ভেবে যায়: 'এর প্রাণে, আহা,
লাখেরাজ হয়ে পড়ে রয়েছে সততা;

আনন্দর মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না। একটা চিন্তার ঘাড়ে অন্য ভাবনা চেপে বসছে। কোনো একটা ভাব ঠিকমতো জেগে ওঠার আগেই কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। সকালে ভেবেছিল বইপত্র রোদ্দুরে দেবে। এখন দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। আকাশও মেঘলা। বইগুলোর পরিণতির কথা ভেবে তার মন কেমন বিষাদে ভ'রে উঠেছে। আবারও প্রভাকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করছে। প্রভা যখন দেখবে তখন আনন্দ বলবে,— দেখেছো প্রভা, বইগুলোর কী শীত করছে! উইয়ে কুরে-কুরে খেয়েছে— কী যন্ত্রণা পাচ্ছে বলো! এদের দিকে যদি একবার নজর দিতে!

প্রভা হয়তো ব'লে উঠবে,— তোমার অত ভাবের কথা আমি বুঝি না— নজর দেওয়ার সময় হয়নি। বলা ভালো,— মনে হয়নি।

তখন আনন্দ বলবে,— বইপত্রও সংসারের জিনিস, মনে রাখার জিনিস।

তারপরের সংলাপটা আন্দাজ করতে পারলো না। তবু সে প্রভাকে ডাকলো। প্রভা এলো। আনন্দ তাকে ইশারায় বসতে বললো। বসলো সে। আনন্দ বইগুলো দেখছে। কিন্তু বলতে পারছে না কিছু। কেমন একটা ভয়। অশান্তির ভয়। অথচ দাঙ্গার সময় আনন্দ কোলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। প্রভা অধৈর্যভাবে বললো, 'ডাকলে কেন?'

—'শোনো না, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি— ওই দাঙ্গার সময়ের কথা। তখন রাস্তাঘাট ফাঁকা। পুলিশের জীপ মাঝেমধ্যে। আমি হাঁটছিলাম। তুমি তো জানো হাঁটা আমার একটা রোগ। অথবা এই জানলে। —তো হাঁটছি। আগুন আর ধোঁয়া দেখছি দূর থেকে— কেউ যেন কোথাও নেহ, হয়তো ছিল, ছুপে; আমার চোখটাও গেছে— বাবার মতো, মা'র মতো— জানো তো মা'র চোখের অবস্থা খুব খারাপ— তো একটা চিৎকার, সে-চিৎকার ডুবে গেল বোমের শব্দে— ধোঁয়া— আমি বোধহয় দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, কেউ একজন এসে আমাকে পাকড়াও করলো— পুলিশ। আমাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। আমার কী-যে দোষ আমি বুঝতে পারছিলাম না। থানার বেঞ্চে ব'সে আছি। বুঝতে পারছিলাম, ঝামেলায় পড়েছি। তখন কেউ একজন আমার সামনে এসে বললো, স্যার আপনি? আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। চেনা-চেনা মনে হলো বটে চিনতে পারলাম না। সে বললো, আমি স্যার বি.এম. কলেজে পড়তাম। তারপর সে নাম বললো, কী যেন নামটা বলেছিল। তো আমি বললাম, তা আমাকে এখানে ধ'রে আনলে কেন? সে বললো, কী বলছেন স্যার, ওরা আপনাকে রেস্কিউ করেছে— যে-কোনো মুহূর্তে আপনি আক্রান্ত হ'তে পারতেন— মুসলিম এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। তারপর ওরা আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল।'

প্রভা শুনলো শুধু। এটা-যে কেন শোনালো তাকে— প্রভা হয়তো ভাবছে। আনন্দ নিজেও ভাবলো, এটা কাউকে শোনানোর মতো ব্যাপার নয়। তব, প্রভা তো এই প্রশ্নটা করতে পারতো, পুলিশ না-হয়ে যদি দাঙ্গাকারীরা তোমাকে পাকড়াও করতো? যদি প্রশ্নটা

করতো, আমি বলতাম, তারা নিশ্চয় আমাকে জিগ্যেস করতো— হিন্দু না মুসলিম? তখন বলতাম, মুসলিম। তারা বলতো, নুনু দেখা। আমি তাদের নুনু দেখিয়ে দিতাম।

প্রভা নিশ্চয়ই অবাক হতো। আমি তখন বলতাম, তোমাকে কখনও বলিনি— মুসলমানদের মতো আমারও চামড়া কাটা!

অনেকক্ষণ পর প্রভা ব'লে উঠলো, 'এটা একটা গল্পের মতো— গল্পে এরকম পড়েছি, কোথাকার মানুষের সঙ্গে কোথায় দেখা হয়ে যায়! সত্যিও হয়?' কেমন এক আলো ছড়ালো প্রভার চোখে-মুখে। কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় কেমন স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে প্রভা। প্রভাকে আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে আনন্দ মনে মনে বললো, একদিন অপরূপ খুঁজে পাবে তুমি!

তুমি খুঁজে পাবে— আন্তরিক কামনা, তবু কেমন এক ব্যথা টের পাচ্ছে আনন্দ। আন্তরিক, তবু সন্দেহের ছায়াপাত— না-ভঙ্গিতে আনন্দর মাথা মৃদু ন'ড়ে উঠলো, মনে মনে বললো, কেবল কি সন্দেহ? সম্ভাবনাও তো!

পরমুহূর্তে সে ব'লে উঠলো, 'আর ক'দিন— এক তারিখ থেকে পুজোর ছুটি শুরু হচ্ছে, এক তারিখের ভোরের লঞ্চ ধরতে পারি আমরা— তার আগে, বইগুলো একটু রোদে দিতে হবে— কাল একটু মনে করিয়ে দিও তো!'

—'এক তারিখ— সত্যিই আমরা কোলকাতায় যাবো!'

—'হ্যাঁ— যাচ্ছি তো।'

—'পুজোর ছুটি কাটাতে, নাকি একেবারে?'

—'প্রভা তোমার গিরিডির কথা মনে পড়ে?'

কিশোরীর মতো একদিকে ঘাড় বেঁকিয়ে প্রভা বললো, 'হুঁ-উ—'

—'সেখানকার প্রিয় স্মৃতি কী তোমার?'

—'উশ্রী— পা ডুবিয়ে পাথরের উপর ব'সে থাকা।'

—'যখন কোলকাতায় থাকবে, তখন যদি কেউ জিগ্যেস করে বরিশালের প্রিয় স্মৃতি কী?'

একটু ভেবে প্রভা বললো, 'সত্যি বলবো? কিছু মনে করতে পারবে না কিন্তু!'

—'সত্যিই তো বলবে— বলো!'

—'বলবো, কোনো স্মৃতি নেই— বরিশাল আমার ভালো লাগেনি।' অনেকদিন আগে লেখা একটা কবিতার লাইন মনে পড়ছিল আনন্দর— আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে— বললো, 'না, তোমাকে আর ফিরে আসতে হবে না। বলেছিলাম না, সুযোগ এলেই আমরা বরিশালের বাইরে চ'লে যাবো— আর আমার প্রথম কর্তব্য হবে তোমাকে স্বাধীন হওয়ার সুযোগ ক'রে দেওয়া! এ-সুযোগ নষ্ট করা ঠিক হবে না।'

আনন্দ বুঝতে পারছিল তার নিজের মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে উপভোগ করছিল প্রভার মুখের উজ্জ্বলতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত— ক্লান্ত করে;

এক-একটা দিন খুব দীর্ঘ মনে হচ্ছে আনন্দর। হেঁটে বেড়ানোয় তেমন আনন্দ নেই। এখন কাজের জন্য হেঁটে বেড়ানো। দেশ-'সমাজ'-এর পরিচিত, অল্প পরিচিত, বন্ধু, আত্মীয়স্বজনদের কাছে যাওয়া; কেবল ছুটতে থাকা। কোথাও কোনো সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হচ্ছে না। এক-একদিন খুব ক্লান্ত লাগে। নিজেকে ক্লান্ত মনে হ'লেই নীরেনের কথা মনে পড়ে। সে তার কবিতায় 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' আবিষ্কার করেছে— আত্মপক্ষ সমর্থনে আনন্দ একটি রচনাও লিখেছে পূর্ব্বাশায়। তব, কখনও-কখনও এমন ক্লান্তিতে তার উদ্ভট কিছু করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু তা-যে খুব অস্বাভাবিক— তা নয়। এই যেমন এখন, তার আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। খুব পিপাসা পেয়েছে। শরতের মিঠে রোদ্দুরেও কেমন যেন চৈত্রের ঝাঁঝ। ফুটপাথ ধ'রে হাঁটছিল। একটা গাছের ছায়ায় সে দাঁড়ালো। মুহূর্ত-কয়েক দাঁড়িয়ে থাকার পর তার মনে হলো, শুয়ে পড়তে পারলে ভালো হয়— শুয়ে পড়তে তার কোনো আপত্তি নেই— সে একটা দৃশ্য হয়ে উঠবে— কিন্তু সে ভিখিরি নয়, সময়টাও বছর-তিনেক আগের দুর্ভিক্ষের সময় নয়, ফলে তার শুয়ে থাকা কৌতূহল-উদ্দীপক দৃশ্য হয়ে উঠবে, আর ভিড় জমবে তাকে ঘিরে। এতখানি ভাবনার পর আনন্দর মনে একটু স্বস্তি এলো।

কলেজ স্কোয়ারে এসে বসলো। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মানুষজন— সবাই কেমন যেন ক্লান্ত, ঝিমুচ্ছে। অথচ শরৎ এখন। দেশ স্বাধীন হচ্ছে— আমি, এইসব মানুষেরা— আমরা সবাই স্বাধীন হবো! রাইটার্স বিল্ডিঙের মাথা থেকে ইউনিয়ন জ্যাক নেমে গেলে, আমি স্বাধীন হয়ে যাবো! হাওয়ায় উড়বে ত্রিবর্ণশোভিত অশোকচক্র— আমি স্বাধীন মানে আমি কাজ পাবো! আমরা সবাই! কিন্তু এইসব ক্লান্ত-ঘুমে-পাওয়া মানুষেরা বাতিল হয়ে যেতে পারে, যেমন হয়েছিল হিটলার-জমানায়— আনন্দর ইচ্ছে হলো, এইসব লোকগুলোকে জাগিয়ে দিতে, মনে হলো, তাদের সতর্ক ক'রে দেওয়া উচিত।

কিন্তু সে জলের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকলো। ...আবারও অন্যের অনুগ্রহ-অনুকম্পায় বেঁচে থাকতে হবে। বেঁচে থাকার গ্লানি-অবসাদ— জলে যেন একটা ঢেউ উঠছে, সমুদ্র যেন, আছড়ে পড়বে তার ওপর, ধুয়ে-মুছে তাকে টেনে নেবে তার হৃদয়ের গভীরে— আনন্দর ঘুম পাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়তে পারলে ভালো হতো, রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসে না। জেগে থাকার ক্লান্তিতে ভোর-রাতের দিকে প্রায়ই দুঃস্বপ্নে ভরা ঘুম আসে।

কোলকাতায় আসার সিদ্ধান্ত— ভুলই হলো বোধহয়, কোথাও কোনো রোমাণ্টিকতা নেহ, অন্তত যদি ব্ল্যাক রোমাণ্টিকতাটুকুও থাকতো— সেই বিয়ের পর যেমন ছিল,

বনি— উপেক্ষা-অনাদর, বিরক্তি-বিদ্রূপ— তবু সেই বেদনাকে উপভোগ করবার মতো মনটাও ছিল; নিজের প্রতি একটা নিষ্ঠুরতা ছিল বটে, প্রতিবার তার সামনে গিয়ে বসলে কেমন যেন মৃত্যু হতো আমার— আর লাস বয়ে নিয়ে ফিরতে-ফিরতে ফের বেঁচে উঠতাম। আসলে কিছুতেই ভুলতে পারতাম না আজও পারিনি— প্রকৃত প্রেমের অনুভব-আস্বাদ বনিই আমাকে দিয়েছে, প্রথম ভালোবেসেছে। আনন্দ, উঠে জলের কাছে গেল— নিস্তরঙ্গ জলে স্পষ্ট নিজের মুখ দেখলো— কয়েকদিনের না-কামানো দাড়ি-গোঁফ সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তাঁর চোখ কি এতটাই ভালো হয়ে গেছে, নাকি কল্পনায়— ঠিক বুঝতে পারলো না আনন্দ, কিন্তু নিজের মুখটাকে সে ভীষণ কুচ্ছিত আর পোড়া-পোড়া দেখলো।

আনন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। উঠে এলো আবার নিজের জায়গায়। বনিকে ভাবতে ভালো লাগছে। বনি আকাশ থেকে পালক ঝ'রে পড়তে দেখেছিল। বলেছিল 'সত্যিই তো, চারিদিক ঘিরে শীতের কুহেলি, শ্মশানপথের ছাই— আমার প্রাণের কথাটি বলেছেন, ঝড়ের বাতাস চাই!' বনি, আমার জীবনে এত বড় বিস্ময় আর কিছু নেই। বিস্ময়ের বিপন্নতায় আমি বার বার তোমার সম্মুখে গিয়ে বসেছি। আর রবীন্দ্রনাথ আমার হৃদয়ে হাত রেখেছেন, নিজেকে মনে করেছি ধূপ, কখনও-বা দীপ।

বলতে দ্বিধা নেহ, বিস্ময়ের বিপন্নতা আমাকে ক্লান্ত করেছে; তব, লাসকাটা ঘর সাব্‌জেক্‌টিভ নয়— আমি এখনও বেঁচে আছি, এই-যে বনি— তোমাকে ভাবছি, আজও লালন করছি তোমার সেই হাসি। তোমার প্রতি একটুও ঘৃণা নেই। আহা! যদি ঘৃণাকে জন্ম দিতে পারতে! কিংবা আর যদি কেউ ভালোবাসতো আমাকে, হয়তো নতুন কোনো পথরেখা— কেবল ইদানিং মনে হয়— তুমি, জ্যোতির্ময়ী— তোমরা সব হেরোডিয়াসের কন্যা— কিন্তু এই মনে হওয়ার কোনো মানে নেই।

—কেন? ভাবছো যখন নিশ্চয়ই তার মানে আছে!

যেন জ্যোতির্ময়ী বললো কথাটা।

—একদিন আমাকে এথেনা মনে হয়েছিল না তোমার? তার তো একটা মানে ছিল?

—হ্যাঁ।

—এখন আমাকে সালোম মনে হচ্ছে তো? নিশ্চয় কোনো মানে আছে। এথেনা-প্রমিথিউস। সালোম-সাধু জন।

—কিন্তু আমি তো সাধু নই। তাছাড়া তোমার মা-বাবার দাম্পত্য জীবনে আমার কোনো ভূমিকা ছিল না, বিরোধের প্রশ্ন নেই। তবু তোমরা কেন আসো? বনি আসে স্বপ্নে, তুমি আসো— বাস্তবেই তো আসো, এই তো এবার বিজয়ার পণাম করতে এসেছিলে! সঙ্গে তোমার স্বামী-পুত্র।

কেন তুমি, বনি কেমন আছে— আমার কাছে জানতে চাও? চেয়েছিলে সবার অলক্ষ্যে? কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ— জ্যোতির্ময়ীর মুখে যে-হাসিটি একদিন দেখেছিল, কল্পনা করলো, তেমন হাসিই হেরোডিয়াস-কন্যা সালোম হেসেছিল, মুগ্ধ হয়েছিল জন, সাধু জন— এমন মনোমুগ্ধকর হাসিতেই, অনুমান করতে পারে আনন্দ— কবি ব্যাসদেব কামার্ত হয়ে পড়েছিল, সেই হাসিটি ফের সেদিন মধ্যরাতে, তখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল, সোফায় ব'সে আনন্দ জন স্টেনবেক পড়ছিল, কোথা থেকে উঠে এলো জ্যোতির্ময়ী ওরফে সালোম, সে তখন সাধু জন— সালোম নাচছে তার সামনে... জন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, হেরোড— সালোমের সৎবাবা লুকিয়ে আছে কোথাও, জন-কে হত্যা করা হবে— হত্যার আয়োজন চলছে; তবু...

কবি ব্যাসদেব কিংবা কবি আনন্দ কিংবা সাধু জন— হত হচ্ছে,... আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন তার মাথা একটি সোনার থালার উপর...

কী-একটা আনন্দর গায়ে পড়লো। বিষ্ঠা। ওপরের দিকে তাকালো সে। একটা কাক। তাকে দেখছে। আনন্দ উঠে পড়লো।

আনন্দ হাঁটছিল। যেন তার কোনো মস্তিষ্ক নেই। নিজেকে সে কবন্ধ মনে করলো। একটা মানুষ হেঁটে যাচ্ছে মুণ্ডুহীন। আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল নিজেকে।

একসময় সে টের পেলো তার মাথাটা আবার ফিরে এসেছে। এবং নিজেকে সে দেখতে পেলো গণেশ অ্যাভেন্যুতে, ক্রমে 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকার অফিস কাম সঞ্জয়ের বাসার দরজায়; যেন অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা আনন্দকে দেখেই সঞ্জয় ব'লে উঠলো, 'আসুন আনন্দবাবু!'

আনন্দ ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসলো। জানলা-ঘেঁষা খাটের ওপর ব'সে সঞ্জয়। প্রুফ দেখছিল। সেগুলো গুছিয়ে রেখে সঞ্জয় বললো, 'অসময়ে?'

আনন্দ মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করলো। কয়েক মুহূর্ত পর বললো, 'আমার এক বন্ধু ছিল বরিশালের ছেলে, সম্পর্কে আমার ভগ্নিপতি। কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল দিল্লিতে, আমি সেবার প্রথম দিল্লি গেছি— জানেন সঞ্জয়, কোনো-কোনো মানুষের চোখ দেখেই বোঝা যায় মানুষটাকে ভরসা করা যায়— সুধীরকে প্ল্যাটফর্মে দেখে সেই প্রথম আমি আশ্রয় আর নিশ্চয়তা বুঝতে পাখির নীড়কে ভেবেছিলাম—' ব'লে সে সঞ্জয়ের চোখের দিকে তাকালো। পুরু কাচের আড়ালে সঞ্জয়ের চোখ-দু'টি সত্যিই যেন পাখির নীড়ের বিমূর্ত ছবি হয়ে আছে। —'আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই সঞ্জয়বাব, আপনি কাজ করুন— আমি ডিস্টার্ব করবো না, তবু একটু ব'সে থাকি।'

ব'লে সে চোখ বন্ধ করলো। চোখ-দুটো খুব জ্বালা করছে। সঞ্জয় বললো, 'বন্ধুর কথা তো শেষ করলেন না?'

—'সুধীর নেই। টি.বি. হয়েছিল, মারা গেছে।'

—'তার গল্পটা তো আছে— সেটাই বলুন। শুনি।'

সুধীরের জীবনের গল্পটা ভালোভাবে জানা হয়নি। তবু যতটুক সে জেনেছিল, সে-সব ব'লে আনন্দ বললো, 'কত অভিমান নিয়ে-যে মানুষ বেঁচে থাকে কেবল মরবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব'লে!' আনন্দর চোখের সামনে তখন ভেসে উঠছিল এক মিথুন-দৃশ্য— আর সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল সুধীরের কণ্ঠস্বর, 'ব্রথেলে মেয়ে দেখে বেড়ানো সেই লোকটা পারুলের ভাঙাচোরা মুখ তার দু'হাতের মধ্যে তুলে নিলো, চোখে চোখ রাখলো— পারুলের চোখে বিস্ময়, একটু যেন আতঙ্ক— আমার মুখ নেমে এলো তার অধরের ওপর—'

ভাবাক্রান্ত আনন্দ যে ঠিক কোন্ দিকে তাকিয়ে আছে— বুঝতে পারছিল না সঞ্জয়। সে অকারণে প্রুফগুলো নাড়াচাড়া করলো। একসময় আনন্দ বললো, 'সুধীর আত্মহত্যা করেছিল।'

—'এই যে বললেন টি.বি.-তে মারা গেছে!'

—'হ্যাঁ। স্লো পয়জনিং যেমন হত্যার উপায় তেমন আত্মহত্যারও তো! পারুলের তখন লাস্ট স্টেজ, তার রক্তশূন্য ঠোঁটের কোণে কামনা আর লজ্জার অদ্ভুত এক মায়াবী রঙ নাকি দেখেছিল সুধীর— সেই ঠোঁটে চুমু দিয়েছিল সে—'

একটু ভেবে নিয়ে সঞ্জয় বললো, 'এটাকে কিন্তু খুব রোমান্টিকভাবে দেখা যায়—'

নীরবে চেয়ে থেকে আনন্দ যেন বলছে, কীরকম?

—'লাস্ট স্টেজ— মানে মৃত্যু দখল নিয়ে নিয়েছে; নিজেকে উজাড় ক'রে জীবনের রঙ ছড়াতে চেয়েছিল আপনার বন্ধু কিংবা উষ্ণতা!'

আনন্দ খুব শব্দ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বললো, 'সুধীর ব্রাহ্ম ছিল, কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল— কিন্তু কোথাও ছিল না যেন!' তারপর সে বিড়বিড় করলো, 'হয়তো নির্বাসনের ছদ্মবেশ—' একটু পরে সঞ্জয়কে বললো, 'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় সঞ্জয়বাবু— উই আর বাউণ্ড টু লিভ ইন এক্সাইল অ্যাংগুইশ অ্যাণ্ড ইগনোমিনি?

—'হ্যাঁ, যেহেতু পৃথিবীটা— আমরা যেমন চাই তেমন নয়।'

—'তবু তো দিব্যি বেঁচে আছে মানুষ— মারছে-মরছে, বেঁচে থাকার এই-ই রীতি!'

সঞ্জয় যেন আনন্দকে বোঝবার চেষ্টা করছে। আনন্দ যেন নির্বাক হয়ে গেছে। সঞ্জয় বললো, 'আসলে সভ্যতা যে পোয়েটিক জাস্টিস আবিষ্কার করেছিল, তা-ই আক্রান্ত।'

—'ঠিক বলেছেন— স্বপ্নের পৃথিবীটাই আক্রান্ত— ব্যবসাবুদ্ধি এত প্রবল! কিন্তু—' কী-একটা ভেবে ফের বললো, 'কতবার ভেবেছি— ব্যবসা করবো, আমাকে দিয়ে হলো না। সঞ্জয়বাবু, আমি কিন্তু আরও ছ'মাসের জন্য ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছি।'

—'ঠিক আছে। জানুয়ারিতেই আপনি বহাল হ'তে পারবেন ব'লে আশা করছি। প্রথম প্রকাশের দিনও ঠিক হয়ে গেছে। ছাব্বিশে জানুয়ারি।'

—'বাঃ। স্বাধীনতা দিবসে স্বরাজ প্রকাশ পাবে—'

—'আপনি কাজ শুরু ক'রে দিন— সাহিত্য বিভাগের দায়িত্ব যদ্দুর জানি— আপনাকেই দেওয়া হচ্ছে।'

পুরু কাচের সঙ্গে যেন লেপটে থাকা চোখ-দুটো আনন্দর মুখের দিকে চেয়ে আছে।

প্রতিটি মানুষ তার নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে
অন্ধকারে হারায়েছে;
তবু তারা আজকের আলোর ভিতরে
সঞ্চারিত হয়ে উঠে আজকের মানুষের সুরে
যখন প্রেমের কথা বলে
অথবা জ্ঞানের কথা—
অনন্ত যাত্রার কথা মনে হয় সে-সময়
দীপংকর শ্রীজ্ঞানের;

আপাত স্থিরতা। জীবন যেন খানিকটা সুবিধাজনক অবস্থানে এসেছে। খবরের কাগজের অফিসে চাকরি। পূর্ব অভিজ্ঞতা বলতে যা বোঝায় তা আনন্দর ছিল না। একটু অসুবিধে হচ্ছে। রবিবাসরীয়র দায়িত্ব পেয়েছে সে। বিভাগীয় সম্পাদক। সময় কাটছে মন্দ না! যাকে বলে জব স্যাটিস্‌ফেকশন, তাও পাবে ব'লে মনে হচ্ছে তার। অন্তত ছাত্র পড়ানোর চেয়ে ভালো। মনোটোনাস নয়। কিন্তু মনের মতো পড়াশুনো করার অবকাশ কম। এমন-কী চিন্তারও। পরিকল্পনার ছক মাথায় ক'রে ফিরতে হয়। আরও একটা অসুবিধা— যাকে সে পেশাগত ঝামেলা রূপে দেখতে অভ্যস্ত হচ্ছে, প্রভাকরের পরামর্শ মতো— 'আপনি কে?' প্রভাকরের ওই প্রশ্নে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল আনন্দ। সে বুঝতে পারছিল, পশ্নটা আইডেন্টিটি বিষয়ক। কিন্তু মানুষের আত্মপরিচয় তো বহুবিধ, বহুমাত্রিক— আনন্দ বলেছিল, 'আমি কবি।'

—'না! ওই চেয়ারটা কবির নয়, একজন সম্পাদকেব— যিনি 'স্বরাজ' দৈনিকের রবিবারের সাহিত্যের পাতা দেখেন— ওই চেয়ারের সামনে যারা এসে দাঁড়ায়, যেমন আমি— একজন প্রার্থী। আমি লেখাটা দিতে এসেছি। এরকম অনেকেই আসবে। আপনি সম্পাদক। এদেরকে ফেস করতেই হবে। বিরক্ত হবেন না। বিব্রত হবেন না। মনে রাখবেন, কত ভালো মানুষের সঙ্গে আপনার আলাপ হচ্ছে।'

—'তা আমি বুঝেছি। আপনার সঙ্গে প্রথম দেখা— হয়তো আরও দেরিতে হতো, এখানে আছি ব'লেই-না হলো!'

—'সত্যি। কতবার আপনার বাসায় আমাদের দেখা হবার কথা ছিল। কোনো-না-কোনো কারণে তা ভেস্তে গেছে।'

—দু'-দু'বার সময় মতো পৌঁছুতে পারেননি। অথচ কী আশ্চর্য জানেন, কান্তি— কান্তি বল— ছবি আঁকে ছেলেটা— সে আমার বাসা পর্যন্ত ধাওয়া করছে, তার সময়জ্ঞান নেহ, সকাল-দুপুর এমন-কী রাত্রেও— আমাকে পেয়েও যাচ্ছে। এক্কেবারে বিরক্তিকর! কিন্তু ছেলেটাকে দেখলে মায়া হয়। কী রুগ্ন করুণ মুখখানা— যেন দুর্ভিক্ষের খিদে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার কণ্ঠস্বরও তেমন। আশ্চর্যের বিষয় কী জানেন— ছেলেটাকে দেখলেই

আমার ছেলের মুখটা মনে পড়ে।' ব'লে কয়েক মুহূর্ত প্রভাকরের মুখের দিকে তাকিয়েছিল আনন্দ। প্রভাকর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়েও কমিউনিস্টদের সঙ্গে ছিল— কথায়-কথায় একদিন বলেছিল সে, কমিউনিস্টরা দারিদ্রের উৎস নিয়ে কথা বলতে চায়— সমর— সমরের মতো অনেক বাচ্চাদের শরীরে দারিদ্রের চিহ্ন ফুটে উঠছে, এটা লক্ষ করেছে আনন্দ এবং যৌবনকালে তারা সব কান্তির মতো হয়ে যাবে— একে কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, যাবে? এরকম ভাবনা থেকে আনন্দ বলেছিল, 'প্রভাকর, মনমর্মরের জন্য একটা নিবন্ধ তৈরি করুন তো— অন পোভার্টি!'

'মনমর্মর' বিভাগটি চালু হওয়ায় রবিবারের বিক্রি বেড়েছে। এবং তার উদ্যোগ প্রসংশিত হয়েছে। তবু প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে আনন্দর সম্পর্ক আন্তরিক হচ্ছে না। আজ প্রভাকরের সঙ্গে দেখা হ'তেই কথায়-কথায় বিষয়টা তুললো সে। প্রভাকর বললো, 'পেশাগত ঔদাসীন্য— গায়ে মাখবেন না। আই মিন ডোণ্ট টেক ইট অ্যাজ অ্যা প্রেস্টিজ ইস্যু!'

—'আপনাকে বলতে আমার দ্বিধা নেই— আপনি আমার ব্যক্তিগত অনেক কথাই জেনেছেন, আত্মসম্মান ব'লে আমার কিছুই নেই। সুপারিশ ছাড়া জীবনে কিছুই হয়নি আমার, এখানকার কাজটাও, জানেন বোধহয় আপনি, সঞ্জয় আর সত্যবাবুর সুপারিশে হয়েছে— হয়তো কারও-কারও অপছন্দের বিরুদ্ধেই হয়েছে।'

—'আনন্দবাব, চেনা-জানা সুপারিশ ছাড়া জীবনে কি কিছু হয়? এই যে আমরা স্বাধীনতা পাচ্ছি, তাও তো সুপারিশে পাচ্ছি, তাই না?'

—'কী জানি! যদি তা-ই হয়ও— স্বাধীনতা সত্যিই যদি 'স্বাধীন' হ'তে চায়, তখন?'

—'কনফ্লিক্ট অনিবার্য!'

—'আমার ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে, এখানেও-যে তা ঘটবে না— কে বলতে পারে?'

—'আচ্ছা আনন্দবাবু, আপনার কি মনে হয় মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ হ'লে, মানুষের আসল যে সমস্যা দারিদ্র, তা দূর হবে?'

তার কথার পিঠে প্রভাকরের এই কথার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা বুঝতে পারলো না আনন্দ, বললো, 'না, তা মনে হয় না। ব্যক্তির দারিদ্র তার স্ব-অধীনতা বোধের সঙ্গে যুক্ত ব'লে মনে হয় আমার।'

—'একটু খুলে বলুন।'

আনন্দর এই একটা মুশকিল— একটা কথা বলার পর তাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক'রে বোঝাতে গেলে সে অসহায় বোধ করে। একটু ভেবে সে বললো, 'একটা উদাহরণ দিই— বি.এম. কলেজে শিক্ষক হিসাবে ক্রমশ পরাধীন হয়ে পড়ছিলাম, এই বোধটা যদি না-থাকতো তাহলে যা মাইনে পাচ্ছিলাম, এতটা গরিব হ'তে হতো না। ব্যক্তি, কমিউনিটি— মানুষ আর মানব— খুব জটিল, আত্মীয় আততায়ী যখন অভিন্ন— গত বছর ষোলোই আগস্টের দাঙ্গার প্রথম বলি— ছেলেটির কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে— জানেন তো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাকর মাথা নাড়লো।

—'ছেলেটা তো মুসলমান ছিল। তাকে মারলো তো মুসলমানেরাই!'

—'একথাটা এর আগেও বলেছেন আপনি— খুব শক্‌ড্‌ হয়ে আছেন!'

—'ভুলতে পারছি না— এ কী রাজনীতি! এতে কি মানুষের ভালো হয়? বিদ্বেষ কি মানুষকে ভালোভাবে বাঁচতে শেখায়? বড় অসহায় লাগে, বিপন্ন মনে হয়!'

কেমন অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকলো আনন্দ। প্রভাকর কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। একসময় আনন্দ ঘোরের মধ্য থেকে ব'লে উঠলো, 'আমার বাবা বলতেন, মনের স্বাধীনতার জন্য যে আন্দোলন তা হলো— ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন; আর দেশের স্বাধীনতার জন্য— স্বদেশী আন্দোলন—' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'স্বদেশী আন্দোলন স্বাধীনতা আনতে পারলো না, ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনও স্তিমিত— পরাধীন মন, ভিক্ষে পাওয়া স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট— লোভ লালসা—' শেষের দিকের কথাগুলো আপন মনে ব'লে যাওয়ার মতো; প্রভাকর কিছুটা শুনলো, অনেকটা শুনতে পেলো না। কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত আচ্ছন্নতা সরিয়ে আনন্দ বললো, 'তুমি তো কমিউনিস্ট ছিলে একসময়, নিশ্চয়ই খেয়াল রেখেছো— অসংখ্য মানুষকে বঞ্চিত ক'রে দু'-একজন রাজা হ'তে চায়, সম্রাট; তাদের ইচ্ছা— তাদের দাবিতে আমরা সায় দিই, জিগির তুলি— তুলি না কি?'

প্রভাকর আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অপলক। সেটা লক্ষ ক'রে আনন্দ যেন একটু সঙ্কোচিত হলো। বললো, 'খুব বকছি, না!' ব'লে সে একেবোর নিশ্চুপ।

প্রভাকর বললো, 'দাঙ্গায় কিন্তু রাজা-মহারাজারা মরে না— বিধানসভার এক্স স্পীকার নৌশের আলীর বাড়ি লীগ সমর্থকরা আক্রমণ করেছিল, ঠিকই, কিন্তু পুলিশই তাঁকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেছিল।'

আনন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠলো, কবে দেখা পুতুলনাচের বাজীগরের হাত— আঙুলগুলো থেকে নেমে গেছে সুতো— সেইসব সুতোর প্রান্ত পুতুলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে যুক্ত— আঙুলের নাচানিতে পুতুলগুলো নাচে, জীবনের নাচ, মৃত্যুর নাচ— টানশূন্য প'ড়ে থাকে মঞ্চে— তারপর যবনিকা, শব্দহীন অন্ধকার, অন্ধকার মৃত্যুহীন— কোথাও কোনো আলো নেই। আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'কান্তিময় আলোর বড় আকাল।' তারপর সে ব'লে উঠলো, 'জানেন প্রভাকর, আমার কেমন মনে হয়, যে-মানুষরা হত্যা করতে যায় তাদের জীবনে কেবল মেয়েমানুষ আছে, কোনো গভীর হৃদয়ের নারী তাদের হৃদয়ে হাত রাখেনি!'

একটু নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

প্রভাকর বললো, 'এতদিনে আলোর সঙ্গে মানুষীর গভীর হৃদয়ের সম্পর্ক অনুভব করতে পারলাম—' তারপর আবার নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে গিয়ে আবেগঘন কণ্ঠে ব'লে উঠলো, 'বুঝতে পারছি— প্রতিটি মানুষ তার নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে কেন অন্ধকারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারায়—' স্তব্ধতা ঘন হবার আগেই কেমন হতাশ ভঙ্গিতে বললো, 'কিন্তু আনন্দবাব, গভীর হৃদয়ের নারীর ধারণা কি ইউটোপীয় নয়?'

আনন্দ ঠোঁটের কোণে হাসির একটু ঝিলিক তুলে বললো, 'তবু তো ভাবনায় আসে!'

—'একটা ব্যক্তিগত পশ্ন করবো?'

—'করুন!'

—'বনলতা সেন কি তেমন কেউ?'

আনন্দ চোখের ভাষায় সায় জানালো।

কিন্তু পরক্ষণেই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। একসময় বললো, 'কিন্তু মানুষ যেমন তার স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে অন্ধকারে হারায়, মানুষীরাও তাদের স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে হারিয়ে যায়, বিক্রি হয়ে যায়; তাদের হৃদয়ের দীপ্তি ম্লান হয়ে যেতে দেখেছি আমি।' একটু চুপ থেকে, প্রত্যয়ী ঢঙে বললো, 'তবু, তবুও— অম্বাপালী সুজাতারা রয়েছেন কোথাও।'

AMARBOI.COM

একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে
আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে?

অন্ধকার। আলো ভালো লাগছে না। সম্পাদকের মুখোমুখি— দৃশ্যটা ফিরে-ফিরে আসছে। সম্পাদক ডেকে পাঠিয়েছিলেন। গিয়েছিল আনন্দ। বসতেও বলেননি। দাঁড়িয়ে ছিল। রবিবাসরীয় পাতাটা মেলে ধ'রে সম্পাদক বললেন, 'এটা কী ছেপেছেন? এটা একটা ছবি হলো?'

আনন্দ অপরাধীর মতো নির্বাক। ছবিটা তারও পছন্দ হয়নি। তবু কেন-যে গল্পের সঙ্গে গেল— পেজ মেক-আপের জন্য বোধহয়। নাকি কান্তির দুর্ভিক্ষপীড়িত মুখের জন্য— করুণাবশত— ঠিক বুঝলো না।

—'আর এইসব নিম্নমানের ছবির জন্য হাই-পেমেণ্ট দিতে হচ্ছে! শুনুন আনন্দবাব, সম্পাদনার টেবিলটা কিন্তু কবিতা লেখার টেবিল নয়, উদাসীন হ'লে চলবে না।'

যেন অন্ধকার ফুড়ে আনন্দ উঠে দাঁড়ালো। ভূ-কম্প অনুভূত হচ্ছে। 'স্বরাজ' অফিসবাড়িটা ভেঙে পড়লো। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সে চাপা প'ড়ে গেছে। ক্রিক রো বন্ধ। অথচ প্রভাকর আর সে ওই রাস্তা ধ'রে কতদিন চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুয়ের দিকে গেছে। আনন্দ আবার বিছানায় ব'সে পড়লো।

কে যেন বাইরে ডাকছে, 'আনন্দবাবু আছেন?'

আনন্দর বলতে ইচ্ছে হলো, না নেই। নীরব থাকতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু, প্রভা হয়তো শুনতে পাবে না। নিনিরা কি উপরে আছে? হয়তো নিনি বিরক্ত হয়ে তার দরজায় এসে বলবে, দাদা! অর্থাৎ দাদা তোমাকে কেউ ডাকছে। খুব শান্ত নরম মূর্তিরা যখন পাথর-পাথর বিস্ফোরক হয়ে যায় তখন কী-যে অদ্ভুত দেখায়— নিনির সেই মূর্তি যাতে গ'ড়ে না-ওঠে তার জন্যেই আনন্দ ঘর থেকে বের হলো।

কান্তি। তাকে দেখেই আনন্দর মনটা ভার হয়ে গেল। রূঢ় কথাগুলোকে গিলে ফেলে বললো, 'ভদ্রলোকের বাড়িতে আসার একটা সময়-অসময় আছে তো! আপনাকে তো বলেছি, যা কথা অফিসে হবে।'

দু'হাতে গেট আগলে দাঁড়িয়ে আছে আনন্দ। যেন তাকে কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেবে না।

—'মনে ছিল। কিন্তু— এই বিলগুলো, যদি একটু—'

—'না। কাল অফিসে দেখা করবেন।' দরজা বন্ধ ক'রে দিলো।

কুসুমকুমারী পাশের ঘর থেকে ক্লান্তস্বরে জিগ্যেস করলেন, 'কে এসেছিল রে?' যেন বিশেষ কারও আসার কথা, সে-ই কি? এমনই একটা ভাব কুসুমকুমারীর মধ্যে, কেউ এসেছিল কিন্তু তাঁর কাছে যায়নি— এমন ঘটলে, যেন জেগে ওঠেন।

আনন্দ বললো, 'তেমন কেউ না।'

মুখের ওপর দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া ঠিক হয়নি। বরং ওকে ডেকে এনে বলতে পারতাম, তুমি আমাকে কী ভাবো, এ্যাঁ! নিশ্চিত ও আমাকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে দেখতো।

—নির্লজ্জ এক পেটিবুর্জোয়া? তা অবশ্য ভাবতে পারো— যা একখানা প্রলেতারিয়েত মার্কা চেহারা বানিয়েছো! আমার চেহারা-ছবি পাতিবুর্জোয়ার মতোই— তুমি কি জানো কান্তি, কয়েকদিন আগে তোমার জন্য আমাকে কথা শুনতে হয়েছে?

—'যান! মনে রাখবেন, পয়সা দিয়ে লোকে খবরের কাগজ কেনে; সেই পয়সায় আপনার মাইনে হয়—'

এসব কথা বলার মানে কী?

—শুনুন সত্যেনবাব, আপনার চারপাশের নামের কাঙাল মানুষগুলোকে সরান— কান্তির পেছনে কে আছে, তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী— মুখ দেখে গল্প ছাপলে, ছবি ছাপলে— ওরকমই হয়।

মাথা ঝাঁকিয়ে সমস্ত চিন্তা যেন ঝেড়ে ফেলতে চাইলো আনন্দ। কিন্তু আরও একটা বিষয়, আশঙ্কার বিষয় সে পাত্তা দিতে চাইছিল না। কিন্তু এখন তাকে এড়াতে পারলো না।

'স্বরাজ'-এর চাকরি সে করতে পারবে ব'লে মনে হচ্ছে না। বি.এম. কলেজের চাকরিটাও নট্ হয়ে গেছে প্রায়। এই গ্রীষ্মের ছুটি পর্যন্ত তাকে বিনাবেতনে ছুটি মঞ্জুর করেছিল কর্তৃপক্ষ। যদি চাকরিটা না-থাকে, সে যদি ছেড়ে দেয়, কিংবা তাকে যদি ছাড়িয়ে দেওয়া হয়,— কী হবে?

—আবারও বেকার হয়ে যাচ্ছি!

—না, বেকার হওয়া চলবে না।

—কাজটা থাকতে-থাকতে, আর একটা কাজ খুঁজতে হবে।

—কী কাজ?

—কী পারো তুমি?

আনন্দ মাথা নাড়ছে।

—কিছুই পারো না!

—কবিতাটা তো পারি। পারি না কি?

—কিন্তু কবিতা লিখে পেট ভরবে না।

—সত্যি কি লিখে বেঁচে থাকা যায়?

—বেঁচে থাকতে গেলে তো টাকা লাগে।

—গল্প উপন্যাস?

—একসময় তো লেখার চেষ্টা করেছিলে— একটাও তো গল্প হয়েছে ব'লে মনে হয় না।

—তাহলে?

—চলো কোথাও বেড়িয়ে আসি।

—আমার আর বেড়াতে ভালো লাগে না— তবু ঝাউবীথি, সাগরবেলা, অরণ্য আমার ভালো লাগে।

—শুধু নিজের কথা ভাবো কেন? প্রভা, রঞ্জু— এদের নিয়েও তো কোথাও ঘুরে আসতে পারো!

—পারলাম আর কই? এখানে আসার পরপরই একদিন প্রভাকে নিয়ে লেকে গিয়েছিলাম। ঘুরে বেড়ালাম, বসলাম— কিন্তু কীরকম একটা দূরত্ব যেন। কিংবা একা হয়ে গেছি আমি। লেকটা কী অদ্ভুত বদলে গেছে— সাগর— চীনসাগর কিংবা ভূমধ্যসাগর। আমি বলেছি, প্রভা এই লেকটাকে আমরা সাগর ভাবতে পারি! প্রভা বলেছে, কোন্ দুঃখে?

—ঠিকই বলেছে। লেকটাকে লেক ভাবতেই তার ঢের ভালো লাগে।

তবু তো আমরা ইম্পোজ করি— সুপার ইম্পোজ। আচ্ছা, হঠাৎ বেড়ানোর কথা উঠলো কেন?

—কেননা, হাজার-হাজার বছর ধ'রে হাঁটছো তুমি; হঠাৎ থেমে গেছো, তাই।

—প্রাণের উৎসাহ যেন নিভে যাচ্ছে।

—বলো নিস্তেল হয়ে যাচ্ছে জীবন!

—বলা ভালো সবুজ... কতকাল ঘাসফড়িং দেখিনি!

—কিন্তু ভাবো!

ঘরের মধ্যে আলো জ্ব'লে উঠলো। রঞ্জু। সে জানতে চাইলো, 'অন্ধকারে ভূতের মতো ব'সে আছো কেন বাবা!'

সত্যনিষ্ঠ একটা উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখলো, মুশকিল; তবু একটা উত্তর দিতে গিয়ে লক্ষ করলো, রঞ্জু চ'লে গেছে।

আহা! যদি চ'লে না-যেতো। আনন্দ বলতো, ভূতের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

রঞ্জু কি বায়না ধরতো, সে ভূত দেখবে ব'লে?

আনন্দ রঞ্জুকে ডাকলো। রঞ্জু এলো।

—'আয়।'

কাছে আসতেই তাকে কোলে টেনে নিয়ে বললো, 'তোর ভালো নামের মানে জানিস তো খোকা?'

রঞ্জু মাথা কাত্ করলো।

—'যত বড় হবি, তত কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে।'

রঞ্জু তার শরীরের ভার সম্পূর্ণ আনন্দর ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

—'আমার মতো কবিতা লেখার কথা ভাববি না কখনও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তাহলে মা বকবে?'

—'না। তাহলে আমার মতো হয়ে যাবি যে— আমি তো যুদ্ধ করতে পারি না। আর সেজন্যই তোর মা আমাকে বকেন।' তারপর সে বিড়বিড় করলো, 'মদ্দা মানুষের গন্ধ আমার শরীরে নেই!' বাঁধন শিথিল হয়ে যাচ্ছিল, তাকে শক্ত ক'রে আনন্দ বললো, 'জানিস তো খোকা, তোর মা খুব যুদ্ধ ভালোবাসে! এই যে, দেখবি, আসছে মাসের পনেরো তারিখে, ইংরেজরা আমাদের স্বাধীনতা দেবে, আমরা পাবো— এই স্বাধীনতার যুদ্ধে তোর মা নাম লিখিয়েছিল।'

রঞ্জু যেন বাঁধনে কষ্ট পাচ্ছিল, সে তার শরীরে একটা মোচড় দিলো, যেন শিথিল করতে চাইলো। আনন্দ তাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। ভাবলো, এসব কথার কী বোঝে ও!

কান্তির মুখ মনে পড়লো।

সম্পাদকের মুখ।

—'কী ব্যাপার, কী করছো তোমরা?'

দরজায় প্রভা। আনন্দ বললো, 'এই আমরা একটু গল্প করছিলাম।'

—'গল্প!' রঞ্জুর দিকে তাকালো প্রভা।

—'হ্যাঁ। এই স্বাধীনতার গল্প— স্বাধীনতা তো আমরা পাচ্ছি, তোমরা অর্জন করতে চেয়েছিলে— এইসব।'

—'এইসব তুমি রঞ্জুকে শোনাচ্ছিলে! ও বুঝেছে কিছু?'

—'আমিও তাই ভাবছিলাম। না বুঝুক। একদিন তো বুঝবে।'

হতাশ ভঙ্গিতে প্রভা মাথা নাড়লো।

—'ওকে একদিন আমি অভিমন্যুর গল্প বলেছি। কিন্তু সপ্তরথী ঘিরে ধরা পর্যন্ত।'

রঞ্জু বেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ ডাকলো না। আনন্দ বললো, 'বোসো!'

প্রভা বসলো। বললো, 'বাড়ির ব্যাপার নিয়ে কিছু ভাবলে?'

আনন্দ ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করলো। দেশের বাড়ির কথা, না— এ বিষয়ে ভাববার কোনো কথা হয়নি— তাহলে নতুন বাসার কথা বলছে বোধহয়— অশোক একদিন বলেছিল, বাড়ি দেখতে— এ বাড়ির বাড়িঅলার সঙ্গে বিবাদ কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে, যদি বাড়িঅলা জিতে যায়— বিকল্প সন্ধানের কথা মাথায় রেখে ভেবলু বলেছিল। আনন্দ বললো, 'কেন, ভেবলু কিছু বলেছে? নিনি?'

—'না। হঠাৎ যদি এখান থেকে উঠে যেতে হয়?'

—'প্রভা, আমরা বোধহয় ঠিক করিনি এখানে এসে। এখানে বেঁচে থাকা খুব মুশকিল। এখানে সবাই সবাইকে ব্যবহার করে। কোথাও স্বাধীনতা নেই।' প্রভার মুখের দিকে তাকালো, 'কোলকাতায় এলে তোমাকে স্বাধীনতা দেবো বলেছিলাম, কী মুর্খের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা— নিজেই পরাধীন, পরাধীন যে— সে কাকে আর স্বাধীনতা দেবে!' তারপর নিজের মনেই যেন বললো, 'দুই'বেলা খেতে দিতে পারবো কিনা সন্দেহ!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো আনন্দ।

—'এসব কেন বলছো তুমি?'

—'খুব দুর্দিন আসছে। আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি। সেই-যে মনে আছে— বিয়ের পর-পর যেমন; আমরা একে অন্যাকে রক্তাক্ত করেছি— সেইসব দিন ফিরে আসছে আবার। আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

প্রভা যেন অনুধাবন করছিল ব্যাপারটা। বললো, 'ভাবছি, চাকরির চেষ্টা করবো।'

—'চাকরি!'

—'হ্যাঁ।'

—'কী চাকরি করবে তুমি?'

—'খোঁজখবর নিতে হবে। দেখি। নিনিকে বলবো ভাবছি।'

—'তুমি করবে চাকরি!'

—'হ্যাঁ, অবাক হবার কী আছে! নিনি করছে না? কত মেয়ে করছে?'

—'তা করছে—'

—'তোমার আপত্তি আছে নাকি?'

আনন্দ মাথা নাড়লো।

প্রভা বললো, 'হাতে পয়সা না-থাকলে স্বাধীনতার কোনো মানে নেই— এটা বুঝেছি।'

আনন্দর বোধে ছড়িয়ে পড়লো কথাটা, আর পর-পর কতকগুলো দৃশ্য ভেসে উঠলো চোখের সামনে— চারজন আইবুড়ো ভিখিরি, তাদের মধ্যে একজন মেয়ে— কী এক আনন্দঘন দৃশ্য! দিল্লির ব্রথেলে দেখা মেয়েটিকে এত দিন পর মনে পড়লো, আশ্চর্য হলো আনন্দ, দুর্ভিক্ষের বছরে ফুটপাথে দেখা সেই নিবিড় দম্পতি অনেকক্ষণ তার দৃষ্টির ফ্রেমে আটকে থাকলো।

AMARBOI.COM

ইতিহাসের সমস্ত রাত মিশে গিয়ে একটি রাত্রি আজ পৃথিবীর তীরে;
কথা ভাবায়, ভ্রান্তি ভাঙে, ক্রমেই বীতশোক
করে দিতে পারে বুঝি মানবভাবনাকে;

'ভারত স্বাধীনতা আইন' মোতাবেক আজ রাত বারোটার পর ইণ্ডিয়া উইন্‌স্‌ ফ্রিডম— উৎসাহীরা রাত জাগছে। স্বাধীনতাকে স্বাগত জানাবে তারা।

সন্ধে থেকে বাজি ফাটানো শুরু হয়েছে। মাঝেমধ্যে লরি বোঝাই লোকজন 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি তুলে সম্ভবত রাজভবনের দিকে যাচ্ছে। আজ মধ্যরাতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হবে— সেই আনন্দে কোলকাতা 'উৎসবে' মেতেছে— কাল সংবাদপত্রে এই আনন্দের কথা, উৎসবের কথা ফলাও ক'রে ছাপা হবে, সেখানে বিষাদের লেশমাত্র ফুটে উঠতে পারে— এমন কোনো শব্দ থাকবে না। বাজির শব্দ শুনতে-শুনতে এসব ভাবছিল আনন্দ। তার আলো জ্বালতে ভালো লাগছিল না। অফিসে সহকর্মীদের কারও-কারও ব্যবহার তার মন খারাপ ক'রে দিয়েছে। এমন-কী সঞ্জয়ের ব্যবহারও কেমন ঠাণ্ডা মনে হলো আজ। তখন রমেশবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল সঞ্জয়, করিডোরে দেখা। আনন্দ ভেবেছিল তার ঘরে আসবে। কিন্তু কোনো কথা না-ব'লে সত্যেন মজুমদারের ঘরে ঢুকে পড়লো। রমেশবাবু নিশ্চয়ই তার সম্পর্কে সাতকাহন বলেছে।

ভাবতে-ভাবতে কখন সে নিজের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিল—

—এটা ঠিক— জার্নালিজম সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমি জানি, জার্নালিজম সাহিত্য না, প্রফেসরি না— রমেশবাবু বলতেই পারেন, 'জার্নালিজমের কী জানেন!' এবং তিনি অধিকারীও বটে— 'স্বরাজ'-এর স্বত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক ও প্রকাশক; ম্যানেজারও।

—অতএব, আনন্দ,— একজন কর্মচারী হিসেবে তাঁর কথার ওপর তোমার কথা বলা ঠিক হয়নি।

—প্রভু কখনও ভুল করেন না, না?

—কিং ডাজ নো রং— কথাটা ভুলে গেছো?

—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, 'সাহিত্যিকরা প্রস্টিটিউট'— একথাটা কেন বলছেন, আমাকে বললেন কি?

—হ্যাঁ, বললেনই তো।

—কিন্তু আমাকে গালাগাল করতে গিয়ে সব সাহিত্যিককে অপমান করার অধিকার কি তাঁর আছে? এবং তিনি তো নজরুলকেও অপমান করলেন!

—অদ্ভুত ব্যাপার— তিনি কমিউনিস্টদেরও চোর বললেন! নজরুল তো সাম্যবাদীই!

—আশ্চর্য!

নিজের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আনন্দ এবার রমেশ বোসের সামনে— আচ্ছা রমেশবাব, মানুষ কি কেবল হিন্দু-মুসলমানে ভাগ হয়ে আছে? কংগ্রেস, লীগ, সিপিআই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরোয়ার্ড ব্লক— এসবেও তো মানুষ ভাগ হয়ে গেছে— বিভেদবাদী সাম্যবাদী— নজরুলের 'সাম্যবাদী'র কোটেশনে ভর্তি হয়ে আছে আপনার 'নজরুল ইসলাম' বিশেষ সংখ্যা— অথচ আপনি কমিউনিস্টদের গালাগাল করলেন! আপনি কোন্ 'বাদী' স্যার?

শুনুন, নজরুল সম্পর্কে আমি যে আর্টিকেল লিখেছি, তাতে আমি নজরুলকে কবি হিসেবে অস্বীকার করিনি। রেক্টিফাই করার প্রশ্নই ওঠে না। শুধু বলি, নজরুলকে স্বীকার না-করলে আমার কবিজন্মকেই অস্বীকার করতে হয়। আপনারা জার্নালিজম বোঝেন— সাহিত্য বোঝেন না।

রমেশ বোসের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আনন্দ এবার সম্পাদকের চেম্বারে— স্যার, লেখাটা তো ছাপার অযোগ্য ছিল, ছাপলেন না যখন, কেন জনে-জনে পড়াচ্ছেন— যেন একটা ইণ্ডিসেণ্ট ভাল্গার স্টোরি লিখে ফেলেছি আমি— আমাকে একটা জঘন্য লোক হিসাবে প্রচার করতে চাইছেন কেন? আমার কবিতায় 'সাম্যবাদী'র স্পিরিট নেই ব'লে? আমাকে কি আপনার অ্যান্টি-কমিউনিস্ট মনে হয়? রমেশবাবু কি আপনার কমরেড? হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে আপনিও চোর— অবশ্য আপনার কমিউনিজম তাঁর কাছে ভালোও হ'তে পারে!

—এসব যদি বলতে পারতাম!

—আচ্ছা, সত্যেন মজুমদার তোমাকে মুসলিমবিদ্বেষী ভাবেননি তো!

—কেন তা ভাববেন?

—নজরুল ইস্যুর উদ্দেশ্যের সঙ্গে তোমার আর্টিকেল তো এক সুরে কথা বলেনি!

আনন্দর মনে পড়লো সত্যেন মজুমদার বলেছিলেন, 'এ আর্টিকেল মুসলমান-সেন্টিমেণ্টে আঘাত করতে পারে— আপনি কি তা-ই চান?'

আনন্দ সেদিনকার মতো মাথা নাড়লো। সেদিনকার না-বলা কথাটা আজ বিড়বিড় করলো, 'নজরুল মুসলমান— লেখার সময় একথাটা মনে রেখে লিখিনি।'

আবার যেন সে সত্যেন মজুমদারের মুখোমুখি— নজরুল মুসলমান এটা মনে রেখেই আপনারা কাজ করতে চেয়েছেন! কী, না সম্প্রীতি— চমৎকার!

নিত্যদিনকার মতো আজও আনন্দকে জেগে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু আজকের এই জাগরণে, নতুন কোনো তাৎপর্য না-থাকলেও, অল্পবিস্তর 'স্বাধীনতা'-ভাবনা এসে পড়ছে। পৃথিবীতে প্রথম রক্তপাতহীনভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর হ'তে যাচ্ছে— এরকম একটা প্রচার জ'মে উঠেছে খুব। অথচ এক বছর আগে, এই কোলকাতাতেই— কলুটোলায়, পার্কসার্কাস-শ্যামবাজারে, মানিকতলা, গ্যালিফ স্ট্রিটে— যত হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে মেরেছে আর মরেছে, আর সেই ছাব্বিশের দাঙ্গা থেকে গত মার্চ পর্যন্ত যত মানুষ সংঘর্ষে মারা গেছে, সবই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াজাত— এরকম সব অগোছালো ভাবনা আনন্দকে পেয়ে বসেছে— মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে গেলে কীভাবে বাঁচবে

মানুষ— কীভাবে বাঁচবো আমি? সিটি কলেজের চাকরি খোয়ানোর মতো এই চাকরিটাও খোয়াতে হবে। অথচ জীবিকার প্রশ্নে, সাহিত্যিক সম্ভাবনার প্রশ্নে বরিশাল ছেড়েছি বটে কিন্তু ফিরে যাবার পথ রুদ্ধ করিনি— মনটা প'ড়ে থেকেছে সেখানে। যদিও ব্রজমোহনে ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এবং চাকরিটা আর নেই। অথচ একদিন, জীবিকার প্রশ্নে বরিশালের বাইরে কোথাও যেতে মন চায়নি।

আনন্দ আলো জ্বাললো। ট্র্যাঙ্ক খুলে একটা খাতা বের করলো। কবিতার খাতা। বন্ধ করার আগে থরে-থরে সাজানো খাতাগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে থাকলো করুণ। খাতাটার গন্ধ শুঁকলো। পুরনো গন্ধ ধরেছে। বছর-তেরো কি খুব পুরনো? খাতাটা মেলে ধরলো— তখন নিজেকে ফিরে দেখার আয়োজন নিঃশেষ। বিবাহিত হয়েও অকৃতদার জীবন। শিক্ষিত হয়েও বেকার। জীবন-জীবিকার সন্ধানে দেশান্তরি হওয়া বেঁচে থাকার নিয়মের মধ্যে পড়ে— আসাম-উড়িষ্যায় কোথায়-কোথায় তার কাকারা, এই রণেশ কোথা থেকে কোথায় এসেছে; পাঞ্জাব-দিল্লি কোথায়-না আমাদের বংশের মানুষেরা ছড়িয়ে পড়েছে— আনন্দ চুপচাপ শুনেছে সবার কথা আর মনে-মনে বলেছে, 'যাও না, যার যেখানে ইচ্ছা যাও— আমি যাবো না।'

সত্যানন্দ বলেছিলেন, 'প্রবাস-জীবন তোমাকে নতুন রূপের সন্ধান দেবে!'

আনন্দ বলেছিল, 'রূপ খুঁজতে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি কখনও—'

অশোক বলেছিল, 'এই ঘরকুনো স্বভাব তোর কবিতাকে ক্ষতি করতে পারে— এটা জানিস?'

—'মনে হয়নি তো কখনও—'

—'আচ্ছা ধর, তুই শিলঙে গেলি, সেখানকার প্রকৃতি, মানুষ, মিথ, ইতিহাস— বিশেষ ক'রে মিথ—'

—'এখানকার মিথ-ইতিহাসই ভালো ক'রে ব্যবহার করতে পারলাম না, রূপকথা—'

পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে আনন্দ নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল— বরিশালের মাঠ-ঘাট-নদী, বন-প্রান্তরে হেঁটে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন বয়সের মিলু— নাটাফল ধুন্দুলের বীজ, কী সম্পদ আহা! ফড়িং-প্রজাপতি, দোয়েল-শালিক-শ্যামা, ফিঙে-খঞ্জনা— নাচনি পাখি!

রূপকথা শোনাচ্ছেন কুসুমকুমারী— কেমন সেই জগৎ ভেসে উঠতো তার চোখের সামনে, কত কত বছর আগে— যেমন সে এই খাতায় লিখেছে, তেমনই মনে হলো— তিনশো, হয়তো-বা পাঁচশো কি সাতশো বছর আগে, রূপকথার জগতে ছিল সে, শঙ্খবালিকার হাতে হাত— এই কিছুদিন আগেও, হাঁটতে-হাঁটতে বনির কথা মনে পড়লে আনন্দর মনে হয়েছিল, বনিও কোনো এক রূপকথার দেশের মেয়ে— মিলু হাঁটছে... সর্বানন্দ ভবনের পুকুরপাড়ে... কখনও দাঁড়িয়ে প'ড়ে দেখছে আনারস ফুলে ভ্রমর, হলুদ পরাগ মাখা; কখনও সে বাসক ফুল ছিঁড়ে মধু টেনে নিচ্ছে মুখের মধ্যে, মিলু হাঁটছে... ফণীমনসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন... মনসামঙ্গল, ভাসান গান, চাঁদ সদাগর, সপ্তডিঙা মধুকর... অশ্বখুরের শব্দ... ইতিহাস... বল্লাল সেন, সীতারাম...

'সত্যিই পৃথিবী আজ ব্যস্ত সফলতা শক্তির ভিতর' বিড়বিড় করলো আনন্দ, 'আকাশের গায়ে তেরঙ্গা উড়বে।'

তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো খড়কুটো মুখে দাঁড়কাক— আহ্! বাসা বাঁধবার আয়োজন! পাখিটাকে সে উড়িয়ে দিলো— আরও একটা দৃশ্য— কুটো মুখে উড়ে যাচ্ছে পাখি কোন্ সে দূরে; এসব দৃশ্য আর জন্মাবে না— এখানে কেবল পাতিকাক, সুদূর ব্যঞ্জনার ব্যাপ্তি নেই কোনো— বুকের মধ্যে কেমন এক হাহাকার উঠলো।

হেমন্তে ধান পাকবে। আমি আর দেখবো না!

আষাঢ়ের রাতে কালো মেঘ চুঁয়ানো জোছনা বাঁশের পাতায়-পাতায় কী মূর্চ্ছনা জাগাবে— আমি শুনতে পাবো না!

দেখবো না রাঙা মেঘের কোল ঘেঁষে উড়ে যাওয়া বকের সারি। কত কী দেখবো না আর, কত কী শুনবো না—

বাজির আওয়াজ মুহুর্মুহু। বেড়ে গেল রেডিয়োর ভল্যুম। আনন্দ খাতাটা বন্ধ করলো। ভেসে আসছে নেহেরুর ভাষণ। ছিঁড়ে যাচ্ছে মানচিত্র। মানুষ।

রাজপথে রক্তাক্ত মৃতদেহগুলো কেমন উঠে দাঁড়াচ্ছে, যেন এখনই ব'লে উঠবে সমস্বরে,— স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হোক!

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো আনন্দ। বাইরে উজ্জ্বল জোছনা। তবু জানলা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। নিঃশব্দ অন্ধকার এই মুহূর্তে আনন্দর একমাত্র চাওয়া।

খাতাটা বাক্সের মধ্যে ঢোকানো হয়নি। খাতাটাকে বুকের ওপর রাখলো। স্বপ্ন-প্রেম কিছুই আর রইলো না জীবনে— মৃত্যুর পরে ফিরে আসার অঙ্গীকার কি ইচ্ছার আর কোনো মানে রইলো না, ধানসিড়ির দেশ আজ বিদেশ, পাকিস্তান— আমার কেউ নয়, যেমন বনি— তবু আমার মন যেমন বনির স্মৃতিসত্তায় প'ড়ে থেকেছে একটা সময় পর্যন্ত, তেমনই হয়তো ধানসিড়ি থাকবে অনেকদিন পর্যন্ত; আর এই দেশ, এই কোলকাতা আমার স্বদেশ! প্রভা যেমন আমার সহধর্মিনী!

নাঃ, এই কবিতাগুলোরও আর কোনো মানে থাকছে না— একটা ঘোরের মধ্যে তিন-চার দিনে লেখা হয়েছিল কবিতাগুলো, একটা বই করবার ইচ্ছে ছিল। কী-যেন একটা নাম ঠিক করেছিলাম। বাংলার ত্রস্ত নীলিমা। বাংলা নেই! বাংলা আজ থেকে পূর্ব-পাকিস্তান আর পশ্চিমবঙ্গ— এই ভাঙনের উৎসব চলছে— দিল্লিতে, কোলকাতায়...

আনন্দর ঘুম পাচ্ছে।

আমি ক্লান্ত প্রাণ আজ প্রলাপপাণ্ডুর পৃথিবীতে;
হৃদয়ের কাছে ঢের যুক্তি ছুঁড়ে
যখন মস্তিষ্ক গেল জিতে
শরণ নিলাম আমি সূচীমুখ জ্বেলে দিয়ে— স্তব্ধতায়—
বৃশ্চিক-গ্রথিত আঁধারে

—'আনন্দ-দা আছেন?'

ডাকটা শুনলো আনন্দ। অন্য কেউ শুনেছে কি? কয়েক মুহূর্ত কান পেতে থাকলো। দরজা খোলার শব্দ বা কথাবার্তা কিছুই শুনতে পেলো না। ডাকটা আবার এলো। আনন্দ উঠলো।

দরজা খুলতেই আলোর ঝাপটার মতো প্রভাকরের মুখ, 'চলে এলাম। উপন্যাস পড়বো।'

অনেকদিন আগে 'স্বরাজ'-এর অফিস থেকে বেরিয়ে আনন্দ আর প্রভাকর ক্রিক রো ধ'রে হাঁটছিল। তখন কথায় কথায় আনন্দ জানিয়েছিল ১৩-১৪ বছর আগে সে কয়েকটা উপন্যাস লিখেছিল। কাউকে পড়ানো হয়নি। যদি প্রভাকর পড়তে চায় তবে সে পড়াতে পারে। সেদিন প্রভাকর কিছু বলেনি।

আনন্দ মুগ্ধ। —'এসো! এসো!'

ট্রাঙ্ক থেকে কয়েকটা খাতা বের করলো আনন্দ। প্রভাকরের সামনে রেখে বললো, 'দ্যাখো, এইসব লেখা এখন আর হিট হবে ব'লে মনে হয় না। তবু—'

প্রভাকর অনেকক্ষণ ধ'রে খাপছাড়াভাবে খাতাগুলো পড়লো। বললো, 'প্রচলিত উপন্যাস রচনার কৌশলকে আপনি যদি বিস্তৃত না-ও করেন, তবু আমার মনে হয়, প্রচলিত ধারায় মহৎ কিছু সৃষ্টি করা আপনার পক্ষে সম্ভব।'

খাতাগুলো গুছিয়ে ট্রাঙ্কে চালান ক'রে দিয়ে আনন্দ বললো, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এগুলো কী করবো? আবার লিখবো, না— কপি করাবো?'

—'কপি করাতে পারেন।'

—'কে করবে? তলস্তয়ের মতো আমার কিন্তু স্ত্রীভাগ্য নেই!' শেষ শব্দ-দু'টি একটু নিচুস্বরে ব'লে সচকিতভাবে বাইরের দিকে তাকালো। প্রভাকর চুপ ক'রে থাকলো। যেন ভাবছে। তারপর একসময় বললো, 'নতুন কবিতা কিছু হলো?'

—'না। গতবছর আগস্ট থেকে এবছর আগস্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত— এই সময়টাকে আমি কবিতায় ধরতে চাইছি— কিন্তু হচ্ছে না।'

—'আচ্ছা, সেদিন আপনি কফিহাউসে বলছিলেন— উপন্যাস লিখবেন— উপন্যাস লিখতে চাইছেন কেন?'

এ প্রশ্নের উত্তর একটি নয়। টিউশনি আর লেখা ছাড়া অর্থ উপার্জনের আর কোনো পথ খোলা নেই। কবিতা লিখে কম টাকা পাওয়া যায়। গল্প-উপন্যাসে বেশি। একটা গল্পে অন্তত পঞ্চাশ টাকা। একটা উপন্যাসে একশো-দেড়শো।

স্রেফ টাকার জন্য উপন্যাস লিখতে চাওয়া?

নিজের মনে মাথা নাড়লো আনন্দ।

কবিতা হচ্ছে না ব'লে?

একটু অন্যভাবে এই সময়ের কথা বলতে চাই ব'লে?

আনন্দ বললো, 'কারণটা তোমাকে আমি বলেছিলাম— ভুলে গেছো!'

প্রভাকরের কপালে ভাঁজ।

—'মনে পড়ছে না তো! —গতবছর জুলাইতে তোমাকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম— মনে পড়ছে? তাতে লিখেছিলাম— ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচেনি—'

প্রভাকর মাথা নাড়লো।

—'সত্যিই ঘোচেনি এখনও।'

—'নাটকও লিখতে চান— লিখেছেন?'

—'কিচ্ছু হবে না আর— আধিজৈবিক দায়িত্ব মেটানোর পেছনে এত বেশি সময় চ'লে যাচ্ছে— কেমন যেন ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছি। গত বছর, কার্তিক সংখ্যায় পূর্ব্বাশাতে কবিতা সম্পর্কে .একটা নিবন্ধ লিখেছিলাম— পড়েছো?'

—'না।'

—'তোমাকে প্রথম যে চিঠিটা লিখি— তার বয়ান বদলে হুবহু সেই লেখাটাই কপি ক'রে দিয়েছিলাম।'

—'ফাঁকি বলছেন কেন? লেখাটা তো আপনারই!'

প্রভাকরের মুখের দিকে তাকালো আনন্দ। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আজও তার বাদলের মুখ মনে পড়লো। বাদল আনন্দর জ্যেঠতুতো দিদির ছেলে, প্রভাকরের বয়েসী। সাহিত্য সম্পর্কে খোঁজখবর রাখে। আনন্দর কবিতায় সে বিদেশি কবিদের প্রভাব আবিষ্কার করেছে। এবং তার মনে হয়েছে কবি হিসেবে আনন্দ কোনো নতুনত্ব দাবি করতে পারে না।

—'কী ভাবছেন?'

'কিছু না' ভঙ্গিতে আনন্দ মাথা নাড়লো।

প্রভাকর চ'লে যাবার পর প্রভা কাপ-প্লেট নিতে এলে আনন্দ বললো, 'প্রভাকরকে দেখলে— আমাদের বাদলের মতো দেখতে অনেকটা, তাই না?'

—'বাদল?'

—'মহুয়াদিদির ছেলে।'

প্রভা যেন বাদলের মুখ মনে করার চেষ্টা করলো। তারপর বললো, 'মনে পড়ছে না— তোমাদের এত আত্মীয়স্বজন, ডালপালা,— মনে রাখা দুষ্কর।'

—'এই প্রভাকরের সঙ্গেও আমাদের লতায়-পাতায় সম্পর্ক আছে— আমার ছোটমেসো রসরঞ্জন সেনদের কীরকম যেন আত্মীয় হয়— বলছিল একদিন— মনে নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এত আত্মীয়-বন্ধু, কোথাও টিকে থাকতে পারছো না কেন?'

—'স্বভাবদোষে।'

—'আর একটু খুলে বলো— বলো কাব্যদোষে।'

—'তুমি যদি কবিতা ভালোবাসতে, তাহলে হয়তো ওই দোষটাই গুণ হয়ে যেতো।'

—'তুমি যদি সংসারকে ভালোবাসতে, যদি আমাদের কথা ভাবতে! কে জানে হয়তো আমিও কবিতা ভালোবাসতাম।' ব'লে প্রভা কাপ-প্লেট নিয়ে চ'লে গেল।

আনন্দ প্রভাকে ডাকলো। প্রভা এলো। আনন্দ বললো, 'একটু বোসো! এই যে ভালোবাসার কথা বললে— একটা কথা মনে পড়লো, একজনের কথা, আরও একজনের কথা একটু বলি, শোনো তো!'

প্রভা বসলো।

—'আমার খুব পরিচিত এক মানুষ। আমারই মতো অসফল, হতাশ। আত্মীয়স্বজনের অনুকম্পায় তাকে বাঁচতে হয়। বাঁচাতে হয় তার সংসারকে। রাতের বেলায় যতক্ষণ-না তার ঘুম আসে, সে তার জীবনকে ফিরে দ্যাখে আর গভীর হতাশায় ডুবে যায়— নিরাপত্তাহীন অসম্মানের জীবন, কোথাও কোনো আশা আছে ব'লে মনে হয় না। সে আত্মহত্যার কথা ভাবে। কিন্তু মৃত্যুর আগে, পরিবারের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করতে চায়। কিন্তু পরক্ষণেই বোঝে, তা আকাশকুসুম। যে-মানুষ ভিখিরিকে একটা পয়সা দিতে পারে না, এল.আই. করবে কোথা থেকে— সে আরও হতাশ হয়ে পড়ে— এসব কথা সে আমাকে বলে, আমি বলি,— কোথাও সার্থক-কাম কেউ নেই। তবু আমরা বেঁচে থাকি, বেঁচে থাকার নিয়মে। সে বললো,— এই নিয়মটাকেই আমি ভাঙতে চাই। কোথাও কোনো আলো, কান্তিময় আলো নেই।'

—'তোমার বন্ধুও কবিতা লেখে নাকি?'

—'লিখতো। এখন আর লেখে না।'

—'বেঁচে আছে এখনও!'

—'হ্যাঁ। তবে থাকবে ব'লে মনে হয় না। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে— মৃত্যুর আগে সে তার ভালোবাসার মানুষজনকে নিকেষ করতে চায়।'

—'ভালোবাসার মানুষজন মানে?'

—'বউ, ছেলে-মেয়ে। আমি বললাম,— না তুমি তা পারো না— সবারই জীবন আলাদা। সে বললো— মৃত্যু তো জীবনেরই আর এক ফিরতি।'

—'তুমি কী বললে?'

—'আমি কিছু বলতে পারিনি। কেবল ভাবছিলাম— এ কেমন ভালোবাসা? একে কি তুমি ভালোবাসা বলবে?'

—'কী জানি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তুমি কি সেই খবরটা পড়েছিলে— সেই-যে এক স্কুলমাস্টার তাঁর পরিবারের সকলকে কুড়ল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা ক'রে নিজে আত্মঘাতী হন?'

প্রভা অন্যমনস্কভাবে বললো, 'হ্যাঁ— পড়েছি কি? হয়তো শুনেছি।'

—'সেরকমই কিছু ঘটবে। তব, তাকে আমি বলেছি,— তোমার জীবন নিয়ে তুমি যা-খুশি করতে পারো!'

প্রভা ব'লে উঠলো, 'না। যা খুশি করা যায় না— আত্মহত্যা মহাপাপ, দণ্ডনীয়।'

—'ঠিক বলেছো। আমি তাকে বলতে পারতাম— সুদিন আসবে— সকলের জন্য— আশা ক'রে মানুষ কাজ করে, তুমি তো মানুষ, কবিতা লিখতে, এখনও লিখতে পারো, এটাই তোমার কাজ।'

—'না-ব'লে ভালোই করেছো। কবিতা লেখা-যে কোনো কাজ নয়— এটা অন্তত তোমার বন্ধু বুঝে গেছে। আর সুদিনের আশা?' ব'লে মুখটা এমনভাবে সরিয়ে নিলো প্রভা— যাকে বলে নীরব মুখঝামটা।

তব, ভালো লাগলো আনন্দর। জীবনের প্রতি প্রভার এমন নিবিড় মমতা, এমন প্রগাঢ় স্পৃহা! এই যেন প্রথম আবিষ্কার করলো সে, রূঢ় রুক্ষ নিষ্করুণ এই নারীটির মধ্যে ফল্গুর মতো এক প্রাণপ্রবাহ নিরন্তর বয়ে চলেছে।

আনন্দ বললো, 'তবু সুদিনের আশা করে মানুষ। আমিও করি। কিন্তু যাদের সুদিন নষ্ট হয়ে যায়— নষ্ট হয়ে গেল স্বাধীনতার দুর্বিপাকে প'ড়ে?' বলতে-বলতে সে কেমন ভাবাক্রান্ত। কয়েক মুহূর্ত পর বললো, 'জানো তো, স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনে একটা কাপড় কলের চারজন শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছিল— আমি ভাবি তাদের পরিবারের কী দুর্দশা!'

—'আমাদের থেকে আর আলাদা কী!'

—'তবু তাদের হয়তো নিজেদের বাড়িঘর আছে। কী সস্তায় বাড়িঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে!'

—'যদি টাকা থাকতো, আমরাও একটা কিনে নিতে পারতাম।'

আনন্দ কিছু বললো না। প্রভা যেন একটা বাড়ির স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেছে। ডুবে যাওয়া স্বাভাবিক— ভাবলো আনন্দ, এবং কেবল টাকা থাকলেই স্বপ্নটা বাস্তব হয়ে যেতে পারতো, টাকা নেই এটাও বাস্তব; অতএব, টাকা একটা স্বপ্ন হ'তে পারে— প্রভা বললো, 'কিছু একটা করা দরকার।' অনেকটা স্বগত-ভাষণের মতো, তবু আনন্দ বললো, 'কী?'

—'যা কিছু— এ আর ভালো লাগছে না—'

—'তুমি কি চাকরি ছাড়া আর কিছু ভাবছো?'

—'আর কী ভাববো?'

—'না, মানে— 'যা কিছু' বললে কিনা!'

—'তুমি কি কিছু ভাবছো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'দু'-একজনকে তোমার কথা বলেছি, বলেছি তুমি বি.এ. পাশ, সম্মানজনক একটা কাজের সন্ধান যদি তাঁরা দিতে পারেন।'

—'সত্যি?'

—'মিথ্যে বলবো কেন, তোমার ইচ্ছা আছে— একটা সুযোগ যদি পাওয়া যায়— বলেছি।'

কেমন যেন নরম হয়ে এলো প্রভার চোখের দৃষ্টি। আনন্দর মনে হলো, আমরা একসঙ্গে থাকি অথচ কেউ কারও কাছে যাই না, আসি না— তবু আছি— কী মানে ওই দৃষ্টির?

ঠিক পড়তে পারলো না আনন্দ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয় আছে ব'লেই মানুষ দেখ, কেমন বিচলিত হয়ে
বোনভায়েকে খুন ক'রে সেই রক্ত দেখে আঁষটে হৃদয়ে
জেগে উঠে ইতিহাসের অধম স্থূলতাকে
ঘুচিয়ে দিতে জ্ঞানপ্রতিভা আকাশ প্রেম নক্ষত্রকে ডাকে।

কাজ হারিয়ে, কাজের সন্ধানে ঘুরে-ঘুরে আনন্দ একটা জিনিস আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে— সমাজের উঁচু মানুষেরা অনুপম বাচনরীতি আয়ত্ত করতে পারে, মুগ্ধ হয়ে শোনার মতো; কথা একটা শিল্প, কথা বিক্রি ক'রে বস্তুত বেঁচে থাকা যায়— এবং একই সঙ্গে সত্যানন্দের কথা মনে পড়ে,— 'বুঝলে মিল, তুমি যা বলছো তা যদি তোমার অনুভূতির দেশ থেকে আলো না-পায়, তাহলে তা নিছক ক্রিয়া মাত্র— তার মধ্যে কোনো জ্ঞানদীপ্তি নেই।' একথার যথার্থতার উদাহরণ— বনি— তার আচরণে গভীর অনুরক্তি যখন প্রকাশ পেতো, কী দারুণ আলো ছড়াতো তার কথারা! এমন-কী নির্বাক মুহূর্তগুলোও কেমন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, নিস্তব্ধতার অপরূপ আবরণের ওপর ফুটে উঠেছে বনির সুরেলা কণ্ঠস্বর, 'কী-ই-ই-?'

আনন্দ বনির চোখের ওপর চোখ রেখে মুগ্ধ হয়ে 'কিছু না' ভঙ্গিতে মাথা নেড়েছে।

আনন্দ ভাবছিল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিড়বিড় করলো, 'জ্ঞান নেই— এক-একটা মানুষ যে কী ব্যর্থ নাম বয়ে বেড়ায় আমৃত্যু— আমি আনন্দ চিরবিষণ্ন, প্রভা কী গাঢ় অন্ধকার— কোথাও প্রেম নেই—'

তবু কথা বিক্রি হয়।

উপন্যাসের বিক্রি ভালো। প্রভাকর বলছিল 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড'-জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখতে। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ— ওই জীবন সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। অভিজ্ঞতা ছাড়া কি উপন্যাস লেখা উচিত?

বরং ইতর শ্রেণীর মানুষের জীবন নিয়ে লেখা যেতে পারে, আনন্দ নিজেকে ওই শ্রেণীর কাছাকাছি একজন ভাবে— তারও পায়ে ছেঁড়া জুতো, পকেটে ভিখিরিকে দেওয়ার মতো বাড়তি পয়সা নেই— অধিকাংশ সময়েই থাকে না।

প্রভাকর বলেছিল, অন্নদাশঙ্কর পড়তে। কিছুই পড়া হচ্ছে না। সিনেমা দেখা হচ্ছে না।

আনন্দ হাঁটছিল... কফিহাউস থেকে বেরিয়েছে সে। আজ কেউ ছিল না। একা। কেউ আসবে— অপেক্ষায় বসেছিল। কেউ আসেনি। এক কাপ কফি শেষ ক'রে বেরিয়েছে।

ফুটপাথ ধ'রে হাঁটছে...

অন্ধকার। রাস্তায় আলো ম্লান। বাঁদিকে মসজিদটাকে দেখেই সে বুঝতে পারলো, প্রায় দিক হারিয়েছিল। কোলকাতার রাস্তায় প্রায়ই সে দিক্‌ভ্রান্ত হয় বটে, কোনো-না-কোনো একটা জিনিস তবু ধ্রুবনক্ষত্রের মতো হয়ে আছে— এই মসজিদ তেমনই। কিংবা ওই পামগাছগুলো— 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর সময় গাছগুলো শকুনদের আশ্রয় ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ দাঁড়ালো। গাছগুলোর দিকে চেয়ে থাকলো অপলক। শকুনক্রান্তি কি তবে শেষ হয়ে গেছে? শুরু তো হয়েছিল সেই কুরুবর্ষে, বেবিলনে— ট্রয়ে— তারপর? অনেক বিদ্যার উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা কফিহাউস আলো করছি— সভা-সমিতি,— অথচ কেউ কাউকে চিনি না, এমন-কী নিজেকেও!

সেদিন সঞ্জয়ের বলা কথাটা মনে পড়লো, 'মানুষ মানীজ্ঞানী হবার পরও কেমন স্বার্থমগ্ন নিষ্ঠুর, পৃথিবীর এই দুর্দশা কেন, বুঝতে পারি না!'

হেমন্তের আকাশ-ভরা নক্ষত্র, আনন্দ অনুভব করে যত, ততটা সে দেখতে পায় না— দেখার জন্যই যেন অনেকক্ষণ পাম গাছ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকলো। কেমন যেন কুয়াশা-কুয়াশা— সঞ্জয়ের কথাটা ভাবছিল, সেদিন সঞ্জয় কি তার কাছে জানতে চেয়েছিল? সঞ্জয়ের চেয়ে আনন্দ অনেক কম জানে। তার ওপর সে কমিউনিস্ট। যদি সঞ্জয় বলতো, বলুন তো আনন্দবাবু!

এখন প্রশ্নটা তার আত্মজিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়ালো।

আনন্দ হাঁটতে শুরু করলো।

সে তার জীবনের দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা, দুর্দশার কথা ভাবতে-ভাবতে পেঁয়াজের খোসার মতো জীবনটাকে যেন ছাড়িয়ে ফেললো, তারপর সে স্পষ্ট টের পেলো ফ্রয়েড সাহেব তার কাঁধে হাত রেখেছেন, আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'যৌনকুয়াশা।'

ফ্রয়েড সাহেব নিজেরই সাফল্যে হাসছেন।

ওই হাসি তার ভালো লাগলো না। নিজের মনে সে মাথা নাড়তে লাগলো। একসময় বললো, ভালোবাসার যৌনকুয়াশা।

ফ্রয়েড সাহেবের মুখ গম্ভীর।

—ভালোবাসার যৌনকুয়াশা কেটেও হৃদয়ে প্রেম আসে— জ্ঞান ছাড়া সে-প্রেম বাঁচে না!

ফ্রয়েড সাহেব মিলিয়ে যাচ্ছেন।

আনন্দ হাঁটছে।...

দরজা খুলে দিয়েই প্রভা জিগ্যেস করলো, 'এত রাত করলে?'

একটু অবাক হলো আনন্দ। হতবাকও। বিরক্তিভরে দরজা খুলে দিয়ে চ'লে যাওয়া ছাড়া প্রভার অন্য কোনো আচরণ মনে করতে পারলো না। দরজা বন্ধ ক'রে আনন্দ বললো, 'ভুল পথে ঢুকে পড়েছিলাম।'

প্রভা বললো, 'হ্যাঁ। কোলকাতার রাস্তাঘাট গোলকধাঁধা যেন।'

এটাও আনন্দকে অবাক করলো, এবং খুশিও।

—'মা কেমন আছে?'

—'ঘুমুচ্ছে।'

হঠাৎ যেন দক্ষিণ হাওয়া। একটা ফুরফুরে ভাব মনের ওপর। প্রভাকে দারুণ আন্তরিক মনে হলো। হয়তো এসব কারণে একটা প্রগাঢ় যৌনকুয়াশা ঘিরে ফেললো আনন্দকে। কীভাবে যেন একটা অপেক্ষা তৈরি হলো— প্রভা আসবে। তবু ঘুম আসছে, অনেকদিন পর, এমন স্বতস্ফূর্ত ঘুম। কিন্তু প্রভা যদি আসে, তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলে, আহা ঘুমাক— ব'লে ফিরে যেতে পারে। ঘুমকে সে দুরে সরিয়ে দিতে চাইলো। ঘুমকে দূরে সরিয়ে রাখার অভ্যাস তার খুব পুরনো, বলা ভালো আশৈশব। সেই ছোট্টবেলায়, মায়ের বুকের ওমের জন্য, ঘ্রাণের জন্য আনন্দ জেগে থাকতো। কখনও ঘুম-ঘুম ঘোরের মধ্যে সে টের পেতো, তার মায়ের ঘরে আসা, মা-মা গন্ধে তার ঘুম ছুটে পালাতো।

—'কী রে ঘুমোসনি?'

—'ঘুমিয়ে পড়লে তুমি কি জানতে পারতে কী পড়লাম আজ?' মা তার গাল টিপে দিয়ে বলতেন, 'আচ্ছা বল্।'

শুনতে-শুনতে মা ব'লে উঠতেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার ঘুমিয়ে পড়ো!' মা-ও শুয়ে পড়তেন। মায়ের একপাশে ভাই, আর একপাশে সে— তার ঘুম আসতো না। মায়ের শরীর থেকে অদ্ভুত একটা গন্ধ বের হতো। মায়ের ঘরে এখন ওষুধ ফেনাইলের গন্ধ। তাঁর শরীর এখন চামড়ায় মোড়া কঙ্কাল।

আনন্দর ঘুম আসছে। অপেক্ষার তীব্রতা ক'মে এসেছে। এবং সেই কুয়াশাটাও যেন কেটে যাচ্ছে...

একটা স্বপ্ন কিংবা ফিরে এসেছে কোন্ এক জাদুবলে আনন্দর কৈশোরের এক সকাল। ঘুম-ঘুম ঘোরের মধ্যে সে যেমন শুনতে পেতো বাবার সূর্যবন্দনা, মায়ের প্রভাত সঙ্গীত— তেমনই মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে— মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে/তোমার বিশ্বের সভাতে আজি এ মঙ্গল প্রভাতে... তেমনই জেগে উঠলো আনন্দ, কিন্তু কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল... তবু ভোরের আলোর রঙ অবিকল— এই রঙেও যেন বাবার কণ্ঠস্বর মিশে আছে— আনন্দ কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলো।

AMARBOI.COM

হয়তো-বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয়;
হয়তো-বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে;

'পূর্ব্বাশা' থেকে বেরিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুয়ের দিকে হাঁটছিল আনন্দ। মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন। উত্তর খুঁজছে। প্রশ্নটা ঢুকিয়ে দিয়েছে সঞ্জয়। সঞ্জয় মাঝেমধ্যে এমন-সব কথা বলে, কখনও রাগ কখনও বিষাদ জেগে ওঠে। আজকে সেসব কিছু নয়। আনন্দ যখন এসেছিল তখন সঞ্জয় কাজে ব্যস্ত। ব্যস্ত থাকবে জেনেও সে এসেছিল। চুপচাপ বসেছিল। তারপর এবছরের শারদ সংখ্যা 'পরিচয়' উল্টে পাল্টে দেখছিল। একসময় বিষ্ণু দে'র লেখাটার ওপর চোখ বুলাতে-বুলাতে আনন্দ ভাবছিল— সাহিত্যে ভাববাদ আর মার্ক্সবাদ কীভাবে প্রতিফলিত হয়। কিংবা ইজম অনুসারী শিল্পবস্তুটি আসলে কীরকম। বিষ্ণু তো ঠিকই লিখেছে— রুশ সাহিত্যকে স্ট্যাণ্ডার্ড ধ'রে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যকে বিচার করলে শুধু ভুলই নয়, অন্যায় হবে— এরকম ভাবনার মধ্যেই আনন্দ শুনতে পেলো, 'আচ্ছা, চারদিকে এত সমস্যা মীমাংসাহীন— এর মধ্যে বেঁচে থেকে কীভাবে লেখেন বলুন তো!' পত্রিকাটা রেখে আনন্দ মুখ তুলে তাকালো। সঞ্জয় সেই আগের মতো কাজে নিমগ্ন। প্রশ্নটা করেছে মাত্র। যেন উত্তর পাওয়ার কোনো আগ্রহ নেই। কিংবা নিতান্ত বিস্ময়। তবু আনন্দ উত্তর খুঁজছিল। কিন্তু যুতসই কোনো উত্তর পাচ্ছিল না। তারপর সে নীরবে উঠে পড়লো। সঞ্জয় বললো, 'উঠলেন যে!'

—'আর কী— যাই।'

—'আমি যে প্রশ্নটা করলাম।'

—'আমি ভাবলাম কথার কথা।'

হাতের কলম রেখে সঞ্জয় ব'লে উঠলো, 'আপনাকে যদি প্রশ্নটা এভাবে করা হতো: মীমাংসাহীন এই সর্বনাশের মাঝখানে বেঁচে থেকে আপনি সৃষ্টির ইচ্ছাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কীভাবে?'

আনন্দর দু'ভূর মাঝখানে তখন ভাঁজ পড়েছে।

—'যদি প্রশ্নটা উইল ডুরাণ্ট করতেন আপনাকে, যেমন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে গান্ধীকে?'

মুহূর্ত-কয়েক ভেবে আনন্দ বলেছিল, 'সৃষ্টির ইচ্ছা প্রবৃত্তিগত, এটা আছে ব'লেই এই সর্বনাশের মধ্যে এখনও আমরা বেঁচে আছি।' তব, প্রশ্নটা যেন অমীমাংসিত থেকে গেছে— ধ্বংসের ইচ্ছাও তো প্রবৃত্তিগত— সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়— দ্বেষ, তবুও তো মনে হ'তে চায় না— রণ-রক্ত-সফলতা সত্য; তবু যুদ্ধশেষে আর এক যুদ্ধের আয়োজন সত্য; সত্য,— তবু শেষ সত্য নয়—

আচমকা আনন্দর মনে হলো, দুঃসময়ের মধ্যেও মানুষ স্বপ্নে বাঁচে— একথাটা বলা যেতো।

ধর্মতলা মসজিদের কাছাকাছি আসতেই আনন্দ খেয়াল করলো ধোঁয়াশা মাখা রাস্তায় যান চলাচল কম, দোকানপাটের ঝাঁপ বন্ধ— বন্ধ করছে কেউ কেউ। মানুষের চোখে-মুখে কেমন এক আতঙ্কের ছাপ। আনন্দ বালিগঞ্জের ট্রামে উঠে বসলো। যাত্রী কম। কণ্ডাক্টরকে সে জিগ্যেস করলো, 'এত ফাঁকা কেন ট্রাম?'

—'একটা গুজব ছড়িয়েছে— গান্ধিজী নাকি খুন হয়েছেন।'

আনন্দ বসলো। ভাবলো, যেন গুজবই হয়। গুজবের কি এত শক্তি? একটা বাড়ির সামনে জটলা, নিথর, তাদের কান পেতে থাকা লক্ষ ক'রে আনন্দ বুঝতে পারলো, রেডিয়ো শুনছে। মহাত্মা গান্ধী খুন! অততায়ী নিশ্চয় মুসলমান! আবার দাঙ্গা! আনন্দ একটু শিউরে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবতে চাইলো, মহাত্মাজিরও শত্রু থাকতে পারে! কিন্তু তার বিরোধিতা এলো; —না, পারে না।

তব, গুজব নয়, ঘটনা— ট্রাম থেকে নেমেই জানতে পারলো আনন্দ। রাস্তা পেরিয়ে বাড়ির পথে, আবারও শুনলো। তবু অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। অহিংস মানুষটি এভাবে হিংসার বলি! লীগের ডাইরেক্ট অ্যাক্শনের পর থেকে প্রায় একটা বছর যে আগুন আর রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে গেছে কোলকাতা, যে কোলকাতা হিন্দু-মুসলমান এলাকায় ভাগ হয়ে গেছিল, সেই কোলকাতা স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগের দিনে এক নতুন কোলকাতা হয়ে উঠলো, যেন দুঃস্বপ্ন ভরা রাত্রি-শেষে এক আশ্চর্য সকাল— সেই সকাল এনেছিলেন তো মহাত্মাজী!

তব, আনন্দর মনে পড়লো, বেলেঘাটা অঞ্চল তখন সবচেয়ে বিধ্বস্ত এলাকা, অনেক মুসলমান পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে চ'লে গেছে— এরকমই এক পরিত্যক্ত বাড়িতে সুরাবর্দিকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধিজীর অবস্থান। উদ্দেশ্য— শান্তি; তবু অশান্তির আওয়াজ তো উঠেছিল, 'সুরাবর্দি গো ব্যাক!' গান্ধিজীর কাছে তো এই কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়েছিল যে, পার্কসার্কাস-কলুটোলায় অনেক হিন্দুবাড়ি খালি প'ড়ে আছে, সেখানে তিনি থাকছেন না কেন?

তারপর একত্রিশ আগস্ট রাত্রে, হামলা তো হলো— গান্ধিজীকে লক্ষ ক'রে ইট ছোড়া হয়েছিল, এমন-কী লাঠি চালানো পর্যন্ত— খবরের কাগজের রিপোর্ট নিশ্চয় মিথ্যে ছিল না—

তব, আবারও অন্ধকার।

অথচ, পনেরোই আগস্ট— হিন্দু-মুসলমানের কোলাকুলি, গোলাপ জল ছিটানো— এসব দৃশ্য তো সত্য ছিল!

এও তো সত্য ছিল— মুক্তিমাধুরীতে মশগুল যখন পৃথিবী, তখন আর এক আহত পৃথিবীর কল্যাণ-ভাবনায় মহাত্মাজী নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন কেমন এক শান্ত দৃঢ়তায়, ক্লান্তিহীন!

আনন্দ দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। কড়া নাড়তে ভুলে গেছে। মহাত্মাকে মেরে কার কী লাভ! আনন্দর চোখের সামনে ধুতির একপ্রান্ত শরীরে জড়ানো দীর্ঘ ঈষৎ ন্যুব্জ হাড়সর্বস্ব একটা মানুষ লাঠি হাতে যেন নিরন্তর হেঁটে চলেছেন— এরকমই একটা দৃশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনও-কখনও, নির্মল রাজনীতি জননীতি ভাবনায় ভেসে উঠতো, আজও দেখতে পেলো সে, কিন্তু স্থির— স্ট্যাচু যেন, মনে পড়লো, একবার খবরের কাগজে একটা ছবি বেরিয়েছিল, গান্ধিজী চরকা কাটছেন— কী নিমগ্ন, যেন ধ্যানস্থ— এই ছবিটার কথা মনে পড়লে তার ধ্যানগম্ভীর বুদ্ধদেবের কথা মনে হয়,— তবু মহাত্মাজী খুন হলেন!

ক্লান্ত হাতে কড়া নাড়লো সে। দরজা খুলে দিলো সমর। আনন্দ দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে ঢুকলো। আলো জ্বাললো না। প্রভা রান্নাঘরে। মা শুয়ে আছেন। এরা কি শুনেছে খবরটা? রেডিয়ো চালিয়েছিল?

আনন্দ শুয়ে পড়লো। ক্লান্ত লাগছে খুব। একটা অদ্ভুত মন খারাপ। এ-পৃথিবীতে কোথাও কোনো আশা নেই যেন। কোনো উজ্জ্বল সৃষ্টির আকুলতা নেই। থাকলে,— যে মানুষটা রাজা হ'তে চায়নি, চেয়েছে শান্তি, তাও অহিংস পথে— তাঁকে হত্যা করার মতো জান্তব প্রবৃত্তি প্রেরণার উৎস কোথায়? আনন্দ ভেবে পাচ্ছিল না।

—তাহলে অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম উদ্দেশ্য?

আনন্দ না-ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে।

—কিন্তু মানুষ রক্তাক্ত হ'তে ভালোবাসে।

—না, মানুষের জান্তবতা— প্রেমহীন মানুষেরাই রক্তাক্ততা চায়। আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'প্রেম নেহ, রক্তাক্ততা অবিরল।'

রেডিয়োর খবরে,— কে বা কারা হত্যাকারী জানা গেল না। কেবল জানা গেল, টহলদারি গাড়ি থেকে ঘোষণা করার সময়ে— গান্ধিজীর হত্যাকারী একজন হিন্দু!

আনন্দ আশ্বস্ত হয়েছিল, অন্তত দাঙ্গা বাঁধবে না। খবরের কাগজেও তেমন কিছু জানা গেল না। একটি কাগজের ছোট্ট সম্পাদকীয় আনন্দকে মুগ্ধ করলো। কাল রাতে অনেক উষাপুরুষ এসে দাঁড়িয়েছিলেন, যিশুর কথা মনে হয়নি আনন্দর, এমন-কী সত্য অনুসন্ধানের পথে কারণশিল্পী হিসাবে কার্ল মার্ক্সও এসেছিলেন— তার এই মূঢ়তা আর মুগ্ধতার কথা এই মুহূর্তে সে কাকে শোনাতে পারে? মাকে? মা'র চোখ-কান দুটোই ভয়ঙ্করভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার ক'রে বললে খানিকটা শুনতে পান বটে, সেভাবে বললে তার মুগ্ধতার ছবি কি আর অক্ষত থাকবে?... প্রভাকে? বিপ্লববাদীদের সঙ্গে গান্ধিজীর একটা বিরোধ ছিল, হিংসা-অহিংসার বিরোধ— প্রভা নিজে বিপ্লববাদীদের সংস্পর্শে আসার জন্যই বোধহয় গান্ধিজী সম্পর্কে প্রভার আগ্রহ কম। আর-পাঁচটা হত্যার থেকে গান্ধী-হত্যার আলাদা কোনো তাৎপর্য নেই ব'লে কাল কথায়-কথায় জানিয়েছিল প্রভা। তবু আনন্দ প্রভাকেই বললো, 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে গান্ধী-হত্যাকে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।' প্রভা শুধু সায় দিলো, 'তাই!'

—'হ্যাঁ।' তারপর বিড়বিড় করলো, 'মীমাংসাহীন সর্বনাশ—' তবু তো মানুষ সর্বনাশের আশায় ব'সে থাকে, এই তো প্রভা সেদিন গুনগুন ক'রে গাইছিল...

প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই,
ঘৃণা মৃত্যু পাই;

যখন একা বিছানায়, অন্ধকারে চেয়ে থেকে থেকে কিংবা ঘুমের জন্য চোখ বুজে— তখন আনন্দ টের পায়, মাথার মধ্যে অসংখ্য কথার ভিড়। পাখির কাকলির মতো। তখন এক-একদিন শরীর জুড়ে নারী-শরীরের আকাঙ্ক্ষা। তখন তার মনে হয়, জীবনের মূল সমস্যা দাম্পত্য সংকট। ব্যাপক অর্থে যৌনতা। এক-একদিন আনন্দ নিজের মনেই ব'লে ওঠে, 'এ-পৃথিবীতে একটিও নারী কি নেই, যে আমাকে একটু ভালোবাসতে পারে, একটু খাতির-যত্ন?'

এই পৃথিবীর মধ্যেই সে আর-একটা পৃথিবী তৈরি করতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রভা— প্রভাও হয়ে উঠতে পারতো সেই নারী, যাকে আনন্দ ভালোবাসা দিয়ে সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, আহা যদি তেমন হতো— বুদ্ধ-প্রতিভার মতো বেঁচে থাকাটা নিশ্চয় একটা শিল্প হয়ে উঠতো! বুদ্ধ কবিতা নিয়ে আছে। প্রতিভা গল্প-উপন্যাস। লিখে-যে ঢের ভালো উপার্জন করা যায়— প্রতিভা তার উদাহরণ। প্রভা যদি প্রতিভার মতো কেউ হতো, হয়তো এই পৃথিবীটাকেই তারা দু'জনে মিলে বাসযোগ্য ক'রে নিতে পারতো! কিংবা প্রণতির মতো মেধাবিনী— কিংবা আমি যদি সুধীনের মতো হ'তে পারতাম!

—পারতে তুমি প্রভাকে ডিভোর্স করতে? প্রভা তো আর একা নয়, রঞ্জু-মঞ্জুর মা।

—কিংবা ধরো, পারলে— কিন্তু তার আগে, একটি নারী তো চাই, যে তোমাকে ভালোবাসবে!

আনন্দ যেন যুক্তিটাকে মেনে নিলো।

—তাছাড়া, সকালের মতো বয়েস তো আর নেই, দুপুরও গড়িয়ে গেছে!

আনন্দ বিড়বিড় করে, 'তব, ভালোবাসার সাধ—'

—হায়! প্রৌঢ় হৃদয়! এখনও মৃগতৃষ্ণা? ফ্রয়েড তো পড়েছো!

—প্লেটো পাভ্‌লভ্ পড়েছি— চার্বাকও। তব, তত্ত্বের বাইরেও তো কিছু থেকে যায়—

—অন্তর্গত রক্তের ভিতর?

—তা-ই মনে হয়।

—ক্লান্ত হও।

—তবু ঘুম আসে না।

এক-একদিন মাস্টারবেট করবার পরও একরাশ ক্লেদগ্লানি-বোধ তাকে জাগিয়ে রাখে। তখন বনির মুখটাকে সে মনে করার চেষ্টা করে, মনে পড়ে না। জ্যোতির্ময়ীর দীপ্তিমুখটাকে সে কল্পনা করে। পৃথিবীর সব দীপ্তিমুখগুলো কেন-যে কালি প'ড়ে নষ্ট হয়ে যায়! আহা! যদি না-যেতো— একটা মুখের সামনে ব'সে থেকে কত-না রূপ সৃষ্টি করা যায়, যেতো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ ভাবছিল। আচমকা তার মনে হলো, যাকে কালিপড়া মনে হচ্ছে,— আসলে তা ক্যামোফ্লেজ। যখন সে বনির কাছে গেছে কিংবা জ্যোতির্ময়ীর কাছে, তখনকার দু'-একটা দৃশ্য মনে ক'রে সে ভাবলো, সে অবাঞ্ছিত, সে আসুক কেউ-ই চায় না। তাদের ওই মনোভাবের সঙ্গে কালির কোনো পার্থক্য নেই। তব, স্বপ্নে একটি মেয়ে আসে।

যেন সেই মেয়েটি আসবে ব'লে আনন্দ ঘুমের আয়োজন শুরু করলো।... ভোরের দিকে এখনও বেশ হিম পড়ছে। পায়ের কাছে গোটানো কাঁথাটা টেনে নিয়ে জড়োসড়ো শুয়েছিল আনন্দ। যেন মাতৃগর্ভের অন্ধকার আর উষ্ণতার মধ্যে রয়েছে সে। শুনতে পাচ্ছে পিতার কণ্ঠস্বর। জেগে উঠলো নরম আলোর মধ্যে। যেন হেমন্তের আলো-হিম মাখামাখি নিমের পাতায় এখনও কিছুটা অন্ধকার রয়ে গেছে। ওই কণ্ঠস্বর তাকে ধুয়ে দেবে। চোখ বন্ধ ক'রে হাওয়ায় ভাসতে থাকা পিতার কণ্ঠস্বর, তীব্রভাবে স্পর্শ করতে চাইলো আনন্দ। স্পর্শ করতেই সে স্পষ্ট দেখতে পেলো এক সন্ত-মুখ— সাদা লম্বা দাড়ি, আর গোঁফের মাঝে ওষ্ঠপুটের আভাস, ধ্যানগম্ভীর মুখমণ্ডল, প্রশস্ত কপাল প্রসারিত ব্রহ্ম তালু পর্যন্ত। মুখটা বদলে গেল— নক্ষত্র, যেন তার আলো আর ওমে আনন্দ জেগে উঠলো— কিন্তু বরিশালের আলো-হাওয়া থেকে এই ঘরের আলো-হাওয়ায় পৌঁছুতে তার কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো।

অনেকদিন পর বাবা আজ স্বপ্নে দেখা দিলেন।

শরীর আর মন— দুটোই ঝরঝরে। যেন নক্ষত্রের আলো আর ওমে তার গ্লানি আর অবসাদ শরীর ছেড়ে মনন ছেড়ে কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আনন্দ প্রথমে নিমগাছটার দিকে তাকালো। কয়েকদিন আগেও একটিও পাতা ছিল না। এখন কচি পাতায় ভ'রে যাচ্ছে ক্রমশ। একটা কোকিল ডেকে উঠলো কোথাও। কাক-চড়ইয়ের ডাক। কার্নিশে পায়রার বকবকম।

বাজার থেকে ফিরে আনন্দ বালতি নিয়ে জলের লাইনে গিয়ে দাঁড়ালো। এখনও পর্যন্ত প্রভার সঙ্গে একটিও কথা হয়নি। বাজারে বেরুনোর আগে সে যদি বাজারের থলেটা চাইতো। তাহলে একটা কথা হতো, কিন্তু দ্বিতীয় কথাটা যদি এরকম হয়,— নিয়ে নিতে তো পারো। তখন যে মনখারাপ তৈরি হবে তা যাতে না-হয়, সেই যখন নিজেকেই নিতে হবে, কথা বাড়িয়ে লাভ কী! এরকম নীরবে কাজ ক'রে যাওয়া ভালো। রঞ্জু-মঞ্জুকেও কিছু বলার ছিল না। কেবল রঞ্জু তখনও ঘুমিয়ে, মাথায় হাত দিয়ে আলতো ক'রে ডেকেছিল। ওরা বায়না-আবদার করলে কথা হয়।

—'আমাদের সবাই এক-একটা আলাদা পৃথিবী।' বিড়বিড় করলো আনন্দ। ভারী অবাক লাগে। সেভাবে কোনো যোগাযোগ নেই। তবু একই ছাদের তলায়।

—আমি একটা ব্যর্থ বাবা, অসফল স্বামী। তবু কেন বেঁচে আছি? আমার কাছে কারও কোনো প্রত্যাশা নেহ, তবু কেন এই একসঙ্গে থাকা? এই জল তোলবার জন্য?

জল নিয়ে ফিরে এসে ভাবলো, একবার কি নিনিদের ওখানে যাবো এখন? মা'র সঙ্গে দেখা করতে পারেনি কাল। সকালে যাবো যাবো ক'রে যাওয়া হয়নি, ভেবেছিল বিকেলে যাবে, সেটাও হয়নি।

আনন্দ একটু গলা চড়িয়ে বললো, 'আমি একটু ওই বাড়ি যাচ্ছি।'

বোধহয় সবাই শুনলো। কিন্তু কোনো কথা ফিরে এলো না। সবচেয়ে কাছে ছিল প্রভা, সে বলতে পারতো, আচ্ছা। কিংবা, তাড়াতাড়ি ফিরো।

বেরিয়ে যেতে যেতে আনন্দ ভাবলো, যদি আমি আর না-ফিরি!

আঃ! নিস্তার! নিস্তার! কী-যে নিস্তার!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন:
সেই মুখ আর আমি র'ব সেই স্বপ্নের ভিতরে।

আনন্দ হাঁটছিল। হনহনিয়ে। বাঁ-হাতে কোঁচা ধরা। যেন কোথাও পৌঁছুনোর তাড়া রয়েছে। প্রথম চৈত্রের বিকেল ম'রে আসছে মন্থর। নাগরিক আকাশ। তবু হিম ঝরবে। হিমের সঙ্গে মিশে যাবে ধোঁয়া-ধুলো। এখন আনন্দকে কেউ যদি লক্ষ করে, তার মনে হবে, সন্ধের আগে লোকটা কোথাও পৌঁছুতে চায়, কথা আছে। অবশ্য একথাও ভাবা স্বাভাবিক— লোকটা পালাতে চাইছে কোথাও।

একটা ট্রাম। ঘড়ঘড়... ঘটাংঘট্ ঘর্‌র... আনন্দ মন্থর। অবাক দেখছে ট্রামের চ'লে যাওয়া। বাঁধাধরা নির্দিষ্ট পথ। গন্তব্য নির্দিষ্ট। একটা বাঁধাধরা জীবন— কোথায় পৌঁছোয় শেষপর্যন্ত?

কিংবা ওই রড ভেঙে গেলে?

আমি যেন রড ভাঙা এক ট্রাম।

আনন্দ আর হাঁটছে না। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে ট্রাম। তার পাশ দিয়ে এক জোড়া যুবক-যুবতী— যেন বয়ে গেল নিবিড়। বয়ে যাচ্ছে। যেন সেই স্রোতের ধাক্কায় আনন্দ আবার হাঁটতে থাকলো। তার আগে-আগে সেই মিথুন।

আনন্দর মনে হলো কেউ তার পাশে-পাশে চলেছে। ঠিক স্বপ্নে যেমন। নাকি স্বপ্নের স্মৃতিরোমন্থন—

ঘাড় ঘুড়িয়ে আনন্দ দেখতেই সমস্ত চোখ-মুখ হাসিতে ভরিয়ে মেয়েটি বললো, চমকে দিলাম তো!

মৃদু মাথা নাড়লো আনন্দ।

মেয়েটির চোখে-মুখে কপট বিস্ময়।

আনন্দ বললো, আমি তো জানি, এমনই তুমি— এমনই তোমার দেখা দেওয়ার রীতি।

মেয়েটি বিষণ্ণ বললো, কী করবো বলো! তোমার ঘর-সংসার আছে।

আনন্দ অন্যমনস্ক।

—অমনি মন খারাপ হয়ে গেল!

—জানো তো, ছোটবেলায় আমার একটা ঘর ছিল— মায়ের হাতে সাজানো গোছানো— সেরকম একটা ঘর— ব'লে আনন্দ মেয়েটির মুখের ওপর চোখ রাখলো, যেন মায়ের মুখ, যেমন সিনেমায় দেখা যায়, ফুটে উঠলো— উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আনন্দর মুখ, বললো, আমি তোমার কে?

—আমার কবি।

—তুমি?

—তোমার আনন্দ।

প্রতি সাক্ষাতে এভাবেই সম্পর্কের নবীকরণ... তারপর কোথাও গিয়ে বসে। আজ নেমে এলো গড়ের মাঠে। ফাল্গুনের শেষদিকে বৃষ্টি হওয়ায় ঘাসগুলো সবুজ হয়ে উঠেছে। গালিচার মতো। বসলো। যেন সমস্ত চরাচর কুয়াশার আবরণে মোড়া। এরকমই যখনই দেখা হয়, এমনই কুয়াশা নেমে আসে। কিংবা কেবল মেয়েটির মুখ যেন কুয়াশা-কুয়াশা। নাকি চোখের দোষ— বেটোফেন মিল্টনের মতো আমিও কি তবে...

—কী ভাবছো?

ঝাপ্‌সা মুখের দিকে চেয়ে থেকে আনন্দ বললো, হারিয়ে যাবে না তো!

—যদি হারাই, জেনো, সে তোমাকে নতুন ক'রে পাবার জন্য। কিন্তু আমারও একটা ভয়— তোমার সংসার যদি নষ্ট ক'রে ফেলি।

আনন্দ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত এক হাসি ফুটে উঠে তার মুখটাকে বিষণ্ণ ক'রে তুললো। সেদিকে চেয়ে থেকে মেয়েটি বললো, এই দ্যাখো, আমি তোমাকে দুঃখ দিয়ে ফেললাম।

—না। তুমি আমাকে ভাবালে।

—কী?

—আমার থেকে আমার সংসারকে তুমি দেখছি ঢের ভালোবাসো।

একটু চুপ থেকে মেয়েটি বললো, ক'দিন থেকে ভাবছি, তোমাকে একটা কথা বলবো।

—বলো!

—নিজেকে নিয়ে একটা উপন্যাস লেখো!

—তুমি কি ব্যঙ্গ করছো?

—একটুও না! এরকম মনে হলো কেন তোমার?

—আমার আবার জীবন— তা নিয়ে উপন্যাস!

গভীর প্রত্যয়ে মেয়েটি ব'লে উঠলো, হ্যাঁ-আ-আ। আনন্দর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললো, সংশয় কেন?

—প্রত্যয় যে পাবো— এমন সফলতা কোথায়? তাছাড়া উপন্যাস লেখার জন্য যে এক্সপেরিমেণ্ট, যে রিক্যুইজিট ভিশন দরকার তা আমার নেই— আপদমস্তক ব্যর্থ একটা মানুষ আমি।

—আমার তো মনে হয় ব্যর্থ মানুষেরাই শেষপর্যন্ত জয়ী হয়।

অবাক তাকিয়ে থেকে আনন্দ বললো, ভারী অদ্ভুত কথা শোনাও! কিন্তু ইতিহাস তো তা বলে না! ইতিহাস তো বড় প্রেমিক আর মহৎ মানুষদের নিয়ে।

—তার বাইরেও মহান মানুষ কি বড় প্রেমিক আছে; ছিল, থাকবেও—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ছিল! আমি দেখিনি। আছে বলছো— কোথায়, কোন্ মানুষ?

আনন্দর মুখে নিবিষ্ট থেকে মেয়েটি বললো, ফড়িঙের জীবনের সফলতা নিয়ে যে-মানুষ ভাবে, যে-মানুষ নিজের সাফল্যের জন্য অন্যকে বঞ্চিত করে না— তুমি তো তাদেরই একজন।

আনন্দ আপ্লুত। এ এক আশ্চর্য স্বীকৃতি। এমনই স্বীকৃতি তো একদিন বনি তাকে দিয়েছিল! তারপর, প্রবল এক নিঃশব্দ অট্টহাসি— এই স্বীকৃতিকে নস্যাৎ করার জন্য তার বুকের ভিতর গুড়-গুড় ক'রে হাসি উঠে আসতে চাইছে। কিন্তু নিজেকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে তা যদি মেয়েটিকে আহত করে! নিজেকে সংহত ক'রে আনন্দ বললো, হ্যাঁ, ফড়িঙের জীবনের সফলতার কথা আমি বলেছি বটে, সে কেবল আমার ব্যর্থতার গভীরতা, ব্যাপ্তি বোঝাতে— এখানে কোনো মহত্ব নেই। আর ঠকানোর জন্যও যোগ্য হ'তে হয়— অযোগ্যতাকে নিশ্চয় কেউ গ্লোরিফাই করবে না!

—তাহলে আমি আছি কেন?

—এটাই তো আমার কাছে এক মহাবিস্ময়। —ব'লে আনন্দ আকাশের দিকে তাকালো। নীলাভ ধূসরতা। চোখ ফিরিয়ে বললো, আশঙ্কাও। আমার মাকে আমি আনন্দ দিতে পারিনি। একটি মেয়ে ঝড়ের বাতাস চেয়েছিল... কয়েকবার হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললো, প্রভার কাছে আমি এক দুষ্টগ্রহ। তার জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা আমি নষ্ট ক'রে দিয়েছি।

আনন্দ তার ডান হাতের পাতা মেলে ধরলো। করতলে দৃষ্টি রেখে বললো, অনেকদিন আগে একজন আমার হাত দেখে বলেছিল— আমি কোনো প্রিয় নারীকে জীবনে ধ'রে রাখতে পারবো না।

—এসব তুমি বিশ্বাস করো নাকি?

আনন্দ মাথা নাড়লো, —তবু সত্যি হয়েছে, তুমি তো জানো সবই— হৃদয়ের কিনারা থেকে প্রভা বহু দূরে, আর তুমি— নিঃশ্বাস-ছোঁয়া দূরত্বে—

আকাশের দিকে তাকালো, তবু দূরতর—

মেয়েটি বললো, তার মানে তুমি সেই জ্যোতিষীর কথা মনে রেখেছো!

—তার একটা কারণও আবিষ্কার করেছি— আমার চেহারা-ছবি দেখে লোকটা অনুমান করেছিল— আমি কখনোই রমণীমোহন হ'তে পারবো না—

—তুমি কিন্তু আমাকে অপমান করছো।

অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে আনন্দ মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। কুয়াশাগুলো কেমন রঙিন হয়ে উঠছে। মেয়েটি ব'লে উঠলো, কী-ই-ই? যেন বেজে উঠলো জলতরঙ্গ।

—নতুন কী আর সেই বিস্ময়। আচ্ছা, 'যতই দেখি তারে ততই দহি'র মতো আর কোনো গান কি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, যা আমি তোমাকে দেখতে-দেখতে বিস্ময়ঘোরে গেয়ে উঠতে পারি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হুঁ-উ-উ

—সত্যি!

—হুঁ-উ

—শোনাবে?

—তার আগে বলো, কেন বিস্ময়?

—বলেছি তো।

—আবার বলো।

—তুমি বাস্তব। কিন্তু বাস্তব নও। তুমি গল্প হ'তে পারো কিন্তু গল্প নও।

—বুঝলাম না।

একটু ভেবে আনন্দ বললো, পৃথিবীর সব মাস্টারপিস্ যা আমি পড়েছি, দেখেছি— তা সে দ্রৌপদী হোক কি মিরন্দা, ডেসডিমোনা কি শকুন্তলা— সকলেই বীরত্বের ধারণা থেকে তাদের পুরুষ নির্বাচন করেছে— বাস্তবেও কিন্তু তাই, পেশিবহুল চেহারা, ধনী, কথাবার্তায় সপ্রতিভ— এমন পুরুষকেই মেয়েরা পছন্দ করে বেশি। ব'লে সে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

—তো?

—তো, কেন জানি না, তোমার মুখশ্রীতে তোমার মধ্যে এক মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা রয়েছে, মনে হয়—

মেয়েটি হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, তুমি যেসব ক্ল্যাসিক নায়িকাদের কথা বললে, তারা সকলেই পুরুষের মস্তিষ্কপ্রসূত— মানসকন্যা। প্রকৃত মেয়েরা কি তেমন চায়? মেয়েটি আকাশের দিকে তাকালো।

আনন্দ দেখলো দুটো পাখি।

মেয়েটি বললো, ভালো ক'রে দ্যাখো তো,— সত্যিই কি মহাকাব্যিক রূপ রয়েছে আমার মধ্যে?

আনন্দ কিছুতেই সেই কুয়াশা সরিয়ে তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলো না। তার নীরবতাকে সংশয় ভেবে মেয়েটি বললো, তা যদি দেখে থাকো, ভুল— আমি স্বয়ম্বরে নেই, দ্বন্দ্বযুদ্ধেও নেই।

আনন্দ মুগ্ধ দেখছে। কুয়াশা-কুয়াশা এই রূপ শব্দ-অক্ষরে ধরবার ক্ষমতা তার নেই। ধরতে গেলে এ-বিশ্বপ্রকৃতির কেউ-না-কেউ তার উপমা হয়ে আসবে।

—কী ভাবছো?

—যদি আমি ভাস্কর হতাম! আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে পাথরে ফুটে ওঠা মেয়েটির মুখ, তার কারুকাজ। কিংবা যদি ছবি আঁকতে পারতাম! সে স্পষ্ট কল্পনা করতে পারলো জলরঙে আঁকা কুয়াশা-কুয়াশা ওই মুখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কী হলো?

—ভাবছি।

—কী?

—ভাবছি, এত সব না-পারা একটা পুরুষের কাছে তুমি আসো!

মেয়েটি আনন্দর দু'চোখে চোখ রেখে ব'সে ছিল, এবার সে গেয়ে উঠলো, 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে/কোথা হতে এলে তুমি হৃদি মাঝারে—'

একটা রবারের বল এসে লাগলো আনন্দর গায়ে। আনন্দ উঠে দাঁড়ালো। চোখের সামনে যা-কিছু সুন্দর ধ্বংস হওয়া দেখে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ যেমন, আনন্দকে তেমন দেখাচ্ছে। কিংবা খান্-খান্ হয়ে ভেঙে পড়া দেখতে-দেখতে আর্তনাদ ভুলে যাওয়া মানুষ যেন। স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে কতকগুলো বালক— তাদেরও খেলা থমকে গেছে। বলটা গড়িয়ে স্থির এখন। ছেলেগুলো এগিয়ে এসে বলটা তুলে নেবার সাহস পাচ্ছে না। আনন্দ বলটার দিকে দ'-পা এগিয়ে গেল। একবার মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেলো দিগন্তের দিকে নেমে যাওয়া সূর্যটাকে, আরও কয়েক পা এগিয়ে বলটার সামনে। বাচ্চাগুলো যেন পাথর হয়ে গেছে। বলটা তুলে নিলো আনন্দ। চৈতি সূর্যের লাল বর্ণটা দেখলো আর একবার। মনে হলো সূর্যটাই যেন তার হাতের মুঠোর মধ্যে। বেশ কয়েকবার নাড়াচাড়া ক'রে হাসি-হাসি মুখে তাকালো ছেলেগুলোর দিকে। প্রাণের সাড়া প'ড়ে গেল। কেউ কেউ বাড়িয়ে দিলো হাত। বার-কয়েক লোফালুফি খেলে আনন্দ বাঁ-করতলে রাখলো বলটা, তারপর ডানহাতের মধ্যমা রাখলো বলটার ওপর কিংবা সূর্যে— সূর্যটাকে সে টিপের মতো ক'রে ধ'রে রাখলো মধ্যমায়— বাঁ হাতের বলটা ছুড়ে দিলো ছেলেদের দিকে।

কল্পলোকের ভগ্নস্তূপের উপর দিয়ে আনন্দ ফিরে এলো তার ঘরে। এ-ঘর থেকে পাশের ঘরের খানিকটা দেখা যায়—

মঞ্জু কিছু লিখছে। হোমওয়ার্ক। হ'তে পারে কবিতা। এত নিমগ্ন যখন— কবিতাই হবে। আনন্দ মনে মনে বললো, এ-ই আমার নাম রাখবে। মনে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই আনন্দর মনে হলো, মেয়েটা দুঃখও পাবে খুব। প্রেমপত্র লিখছে না তো!

প্রভা রঞ্জুকে পড়াচ্ছে। প্রভা এখন দিদিমণি— কমলা গার্লসে লিভ ভ্যাকান্সিতে এক বছরের জন্য পড়ানোর এই কাজটা বিষ্ণু-প্রণতির জন্য হয়েছে। প্রণতি ওই স্কুলের হেডদিদিমণি— আপাতত স্বস্তি। প্রভাও কেমন যেন নিমগ্ন। আনন্দর এ-ঘরে আসাটা সে টের পায়নি। কিংবা পেয়েছে। নতুন কিছু নয় ব'লে মুখ তুলে চায়নি। কিন্তু প্রভাকে আজ কেমন নতুন ব'লে মনে হচ্ছে। প্রভা ডানাকাটা পরী নয়। কিন্তু প্রথম দেখায় তাকে পরী-পরী মনে হয়েছিল। চোখ-দুটো দারুণ সুন্দর। আকাশ আকাশ। কিংবা আকাশ বুকে ধরা সরোবর। কবে-যে সেই আকাশে বজ্রগর্ভ মেঘ জমতে শুরু করলো— কতবার ঝল্সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছি আমি; কতবার ডুবতে-ডুবতে বেঁচে গেছি। কতদিন পর প্রভাকে আজ ঠিক আগের মতো দেখাচ্ছে।

আনন্দ বসলো রঞ্জুর পাশে। তার মাথায় হাত বুলালো। প্রভা তাকালো মুখ তুলে। রঞ্জু উঠে বাইরের দিকে গেল। তার চ'লে যাওয়া দেখতে-দেখতে প্রভা ব'লে উঠলো, 'কোথায় যাচ্ছিস?' রঞ্জু বললো, 'আসছি।'

প্রভার চোখ দেখছে আনন্দ। স্মৃতিতে ভেসে উঠছে আঠারো বছর আগে দেখা চোখ। যেন অভিন্ন।

আনন্দ বললো, 'প্রভা, মানুষই মানুষকে অসুন্দর ক'রে তোলে।'

প্রভার ভ্রূতে ভাঁজ।

প্রভার ভ্রূ-সন্ধির একটু উপরে আনন্দ মনে মনে টিপটা পরিয়ে দিলো— প্রভার মুখখানা যেন ধ্রুবনক্ষত্র।

আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রভা চাপা গলায় বললো, 'তোমার ভাবসাব ভালো ঠেকছে না! একদম বিরক্ত করবে না ব'লে রাখছি।'

—'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে— তুমি কেমন দেখছো আমাকে?'

কীরকম এক হাসি ফুটে উঠলো প্রভার মুখে, 'ঠিক বলবো?'

আনন্দ মাথা কাত্ করলো।

—'ভাদ্দুরে কুত্তার মতো।'

চকিতে একবার দরজার দিকে আসতে থাকা রঞ্জুর মুখের দিকে, আর একবার মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে আনন্দ মাথা নিচু ক'রে ব'সে থাকলো। কেবল ডানহাতের মধ্যমার ডগা সে মেঝেতে ঘষছিল।

প্রাচীন কথা নতুন ক'রে এই পৃথিবীর অনন্ত বোনভায়ে
ভাবছে একা একা বসে
যুদ্ধরক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে:

আলো জ্বেলে একা ব'সে ছিল আনন্দ। পাখা চলছে। প্রভা এখনও ফেরেনি। কোথায় গেছে আনন্দ জানে না। ব'লে যায়নি। যাওয়ার সময় প্রভা বলেছিল, 'বেরুচ্ছি'। এরকম বলে সে। আনন্দ কখনও জানতে চায়নি— কোথায় সে যাচ্ছে। বলার হ'লে নিশ্চয় বলতো। সবার জীবনেই— কিছু বলা যায় না এমন কথা থাকে। পথ থাকে।

তবে প্রভার পথ— এই ল্যান্সডাউন থেকে রাসবিহারী, অশোকের শ্বশুরবাড়ি। প্রভার শাশুড়ি সেখানে, খোঁজখবর নিতে তাকে যেতেই হয়, হয়তো সেখানে গেছে; কিংবা পণ্ডিতিয়া রোডে— দুই কাকা আর পিসিমা রয়েছেন সেখানে; বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ধ'রে প্রভা হাঁটছে— কল্পনা করলো আনন্দ— হাজার বছর কেবল তুমিই হাঁটতে পারো? ওই দ্যাখো, প্রভা হাঁটছে— একটা টিকটিকি ডেকে উঠলো কোথাও। আনন্দ ডাক অনুসরণ ক'রে দেখলো, একটা হোঁৎকা টিকটিকি একটা পোকাকে তাক্ ক'রে আছে, পোকাটা হাঁটছেও— খপাৎ।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো আনন্দ। কী একটা চিন্তা— বিমূর্ত, তাকে রূপে ধরতে গিয়ে মনে হলো কোথাও একটা দোয়েল ডাকছে, মিষ্টি শিস, এটা-যে বিভ্রম বা স্মৃতি— একইসঙ্গে এটাও সে মনে করতে পারছে! বাস্তব আর কল্পনার সীমারেখায় আটকে গেছে আনন্দ। আবারও সে টিকটিকিটা দেখার জন্য তাকালো। হয়তো স্কাইলাইটের মধ্যে ঢুকে গেছে কিংবা বিবেকানন্দের ওই ছবিটার পেছনে। কেমন এক ক্লান্তিতে আনন্দ শুয়ে পড়লো। চোখ বুজে থাকলো কিছুক্ষণ। মাথাটাকে চিন্তাশূন্য ক'রে ঘুমোনোর কথা ভাবলো। ঘুমের সময় মানুষ ঘুমুতে চায়, অথচ ঘুম আসে না— ঘুম না-আসার কত-যে কারণ— এভাবে ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়ে একসময় সে টের পেলো, ঘরের মধ্যে বাতাস কাটার শব্দও কেমন জমাট বেঁধে নিস্তব্ধতার জন্ম দিয়েছে— আর নিস্তব্ধতার মধ্যে দাগ কাটছে একটা শব্দ; ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখলো, মেঝেতে দুটো নেংটি— বাঃ! দেখবার মতো দৃশ্য একটা! দেখাবার মতোও! কিন্তু পরক্ষণেই তার মন খারাপ হয়ে গেল— এদের গায়ে খুদকুঁড়ো লেগে নেই। কেমন যেন রুগ্ন। কিন্তু ভালোবাসার মনটি এদের ম'রে যায়নি— দৃশ্যটা মুছে গেলে আনন্দর ঘুম-বিষয়ক একটা কথা মনে পড়লো, কথাটা তখন অবাস্তব মনে হয়েছিল কিন্তু আজ সে ভাবলো, এমন ভালোবাসার মন থাকলেই কেবল বিছানায় একজন না-থাকলে অন্যজনের ঘুম ফেঁসে যেতে পারে— বেঁচে থাকাকে কী অদ্ভুত বিশ্লেষণ করেছেন ডারউইন-ফ্রয়েড; প্লেটো— পলিটিক্স্; প্রেম?

আঃ! ঘুরেফিরে সেই প্রেম!

ইঁদুর-দুটো ভয় পেয়ে কোথায় যেন লুকালো। এ-দৃশ্যটাও নষ্ট হয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ উঠলো। প্রভার ঘরে ঢুকলো। আলো জ্বাললো। এ-ঘরে একখানা ড্রেসিং টেবিল আছে। নিনিদের ছিল। নিয়ে যায়নি। এখন প্রভার। বা প্রভাদের।

কেউ বাড়ি না-থাকলে আনন্দ আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নিজেকে দ্যাখে। বনিকে মনে পড়ে। মনিয়াকে। এবং ইদানিংকার জ্যোতির্ময়ীকেও। নিজের মুখ দেখতে-দেখতে ওদের কথা মনে পড়ে কেন? এমন-কী শান্তিসুধাকেও মনে পড়ে।

বি.এম. কলেজের পরিপার্শ্ব, স্টাফ রুম— কম মাইনে পাওয়া অধ্যাপক, লেকচারারদের মুখ, এমন-কী নিজেকেও দেখতে পায় আনন্দ— দেখতে পায় প্রিন্সিপালের নিষ্করুণ মুখ, সেক্রেটারির বিরক্তির আঁক কাটা চোখ-মুখ— কেমন কিম্ভূতকিমাকার; এইসব চরিত্রদের সাপেক্ষে নিজেকে ফিরে দেখার আয়োজন করলে বেশ হয়— এরকম একটা ভাবনা চলছিল। আনন্দ তার প্রতিবিম্বটাকে একটু ঝুঁকে ভালো ক'রে দেখতে চাইলো, কেমন যেন ঝাপ্‌সা— জীবনাশ্রয়ী না-হোক, জীবনের ছায়া তো পড়বে তাতে! স্বপ্ন আর কল্পনার বাইরেও তো আর একটা জীবন রয়েছে, তাকে অস্বীকার করলে স্বপ্নও থাকে না, কল্পনাও নিরুদ্দেশে যায়! গেছে তো— মাস্টারিতেও একটু মর্যাদা, সম্মান, আর একটু ভালো মাইনে যদি থাকতো, তাহলে কে জানে— হয়তো কলেজ লাইব্রেরিতে নতুন বই আসার অপেক্ষায় থেকে মাস্টারিটা আমার ফের ভালো লেগে যেতে পারতো। কিন্তু তা হবার নয়। সমস্ত দেশেই তো আজ শিক্ষকদের চিতা জ্বলছে— ছেলেরা গ্রাহ্য করে না। কে-ই-বা করে— কংগ্রেস বিপ্লবীই হোক আর মার্ক্সিস্ট— কারও নজর শিক্ষকদের দিকে নেই— তাদের নজর কিষাণ-মজদুরদের দিকে। সরকারি চাকুরেদের মতো পে-কমিশন নেহ, যদি থাকতো— জীবনটা বোধহয় একটু অন্যরকম হতো। প্রভার জীবন অন্যরকম হ'তে পারতো, সেই সঙ্গে রঞ্জ-মঞ্জুর— যা হ'তে পারতো সেই সম্ভাবনা লিখবো, না— যা হ'তে পারে তা-ই?

এক-একদিন আনন্দ যখন এই পৃথিবীর কথা ভাবে তখন তার মনে হয় সূর্য নিভে যাচ্ছে, এই-যে সময়— এ ধ্বংস ক'রে ফেলবে পৃথিবীকে— মনুষ্যত্বকে—

এই আশঙ্কার কথা একদিন সে কথায়-কথায় প্রভাকরকে বলেছিল। প্রভাকর জানতে চেয়েছিল, 'এরকম কেন মনে হচ্ছে আপনার?'

আনন্দ বলেছিল, 'চারদিকে এত যুদ্ধ মৃত্যু— অনাহার, দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ— মানুষের মন উন্নত হবে কী ক'রে?'

—'কোথাও আশা নেহ, না?'

—'তা-ই তো মনে হয়।'

—'তবু দেখুন, যে-মানুষটাকে রক্তাক্ত অর্ধমৃত অবস্থায় ম্যানহোলের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা, সেই মানুষটাকেই তো বাঁচানোর জন্য একদল মানুষ চেষ্টা চালিয়েছে—'

আনন্দ সেদিন সত্যকে স্বীকার ক'রে চুপ ছিল। আজ সে মনে মনে বললো, 'আশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে— মানুষের মন উন্নত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু— দু'-পাঁচ— দু'শ-পাঁচশ বছরের মধ্যেও কি তা হবে?

তারপর প্রশ্নের পর পশ্ন,— কে বড়— ব্যক্তি না সংঘ? ব্যক্তি— ব্যক্তিকে তার মনে হয় তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে ফেনার গুঁড়ির মতো, প্রতিটি ফেনার গুঁড়িকে যদি ভেবে দেখবার ক্ষমতা দান করা হয় তাহলে তাদের যে অবস্থা হবে, প্রতিটি মানুষের অবস্থা তো সেরকমই— কে শুনবে আমার কথা? আমার নতুন কোনো কথা নয়— হাজার-হাজার বছর আগে যেসব কথা উচ্চারিত হয়েছিল, তা-ই বলবো আমি— একটা মহৎ উপন্যাসের লক্ষণ কী?

আনন্দ আলোড়িত হচ্ছিল। নিষ্কর্মা দিনগুলোকে সে ব্যর্থ হ'তে দেবে না। আনন্দ বের হলো।

কয়েকটা খাতা কিনে ফিরে এলো। এখনও প্রভা ফিরলো না। রঞ্জ-মঞ্জু নিশ্চয় তাদের মায়ের সঙ্গে আছে। আর না-থাকলেই-বা কী! ফিরবে। মঞ্জুকে নিয়ে একটু আশঙ্কা হয়— কখনও তার হয়ে ওঠে। মেয়েটা কোনো দুষ্ট মানুষের খপ্পরে না-পড়ে। অল্পবয়েসী মেয়েরা হারিয়ে যাচ্ছে— যদি না-ফেরে মঞ্জু, কোথায় খুঁজবো?— এরকম একটা ভাবনা মাঝেমধ্যে আনন্দকে পেয়ে বসে— এইসব অপসম্ভাবনার কথা লিখবে সে— একটা কনট্রাস্টের প্রেক্ষাপটে নিজেকে দেখবে; দেখাতে চাইবে জীবনের কোলাজ, গ'ড়ে উঠবে একটা ধী-কেন্দ্র— সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা, তার ভাঙন... আনন্দ তার পরিচিত এক সফল মানুষকে খুঁজছিল, যার সাপেক্ষে তার ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ওঠে— কিংবা তার ব্যর্থতার রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সেই মানুষটার সাফল্য...

কড়া নাড়ছে। ফিরলো বুঝি। আনন্দ উঠলো।

দরজা খুলে একপাশে স'রে দাঁড়ালো আনন্দ। তিনজনই ফিরেছে। আপাতত স্বস্তি।

দু'-একটা কথা হলো। মাকে নিয়ে। নিনি, নিনির ছেলেকে নিয়ে। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এলো।

খাতার প্রথম পাতায় যখন সে যত্ন ক'রে ইংরাজিতে লিখছিল— নভেল ওয়ান, তার নাম, একশ তিরাশি ল্যান্সডাউন রোড, আর তারিখ, তখন আনন্দ নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল— নির্জন রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে আসছে, হাতে একটা স্যুটকেস— স্ট্রিট লাইটের আলোয় তার চলমান ছায়ার দীর্ঘ হ'তে হ'তে মিলিয়ে যাওয়া— স্পষ্ট সে দেখতে পাচ্ছিল; সেবার গরমের ছুটির পর ছুটি নিয়ে কোলকাতায় এসে অশোকের বাসায় রাতদুপুরে কড়া নাড়া— এখান থেকেই শুরু হ'তে পারে এ লেখা— আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে: সে কড়া নাড়ছে—। শুনতে পাচ্ছে: কে, কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে?

আনন্দ ওই কথাটাই লিখলো...

মানুষ কাউকে চায়— তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।
...আরো আলো: মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

অন্তঃসারে নিহিত বিতৃষ্ণা-যে রূপকে ম্লান ক'রে দেয়, আনন্দ তা প্রথম আবিষ্কার করেছিল বনি-পর্বে, পরে কতবার দেখেছে প্রভার মুখে। ইদানিং প্রভার রূপ, প্রকৃত রূপ মাঝেমধ্যে বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, লক্ষ করেছে আনন্দ। কোলকাতায় আসার পর, তার পূর্বপরিচিত কিছু মানুষজন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছে। মাঝেমধ্যে দু'-একজন আসছে, যাচ্ছে— কী-সব লতায়পাতায় তুতো সম্পর্ক— তাদের কারও-কারও সঙ্গে, এমন-কী আনন্দর পরিচিত কারও সঙ্গে প্রভা কথায়-কথায় তার রূপের সঙ্গে তার রুচি ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য বেশ চোখে পড়ার মতো ক'রে প্রকাশ ক'রে ফেলেছে— এরকমই মনে হয়েছে আনন্দর। কেমন যেন তার মনে হয়, প্রভার অন্তঃসারের গভীরে রূপকথার দৈত্যের প্রাণভোমরার মতো প্রেমের এক আধার রয়েছে, তার হদিস সে আনন্দকে দেয়নি কখনও কিন্তু কাউকে-কাউকে যেন সে দিয়ে দিয়েছে, আর হদিস পাওয়া মানুষটি ডুবুরির দক্ষতায় তা যখন তুলে আনে তখনই আশ্চর্য বিভা ছড়ায় প্রভার মুখে— সে এক দেখবার জিনিস!

রূপ-অপরূপ সৃজনের ক্ষমতা নেই আমার!

কাল আনন্দ ভাবছিল। রাতে সে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে কিংবা কল্পনা হ'তে পারে— কোনো স্মৃতি— বিস্মৃত হওয়ার আগে ফের জেগে উঠেছিল আধো ঘুমের মধ্যে— একটি সঙ্গমদৃশ্য, নির্বসন— তাদের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না, আনন্দ দেখছিল, মেয়েমানুষটা কেমন যেন অসাড়— আনন্দ দেখছিল, না-দেখে উপায় ছিল না— তবু তাদের মুখ দেখতে পায়নি। আনন্দ চশমাটা খুলে কাপড়ের খুটে মুছলো একবার, চোখে দিলো।

দৃশ্যটাকে সে কল্পনা করলো এবার, যিশুর একটা তৈলচিত্র দেওয়ালে, দেওয়াল ঘেঁষে খাট, তার ওপর সঙ্গমরত নারী-পুরুষ— যিশু কেন?

তখনই মনে পড়লো, এটা স্মৃতিই— একটা বিদেশি উপন্যাসে ওই দৃশ্য ছিল, অবৈধ যৌনমিলন অপলকে দেখছিল সঙ্গমরতা মেয়েটির বৃদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্ত পিতা... তাহলে স্বপ্নে আমি কেন? ওই নারী আমার কে?

তোমার বিয়ে-করা মেয়েমানুষ। কিন্তু তোমার কেউ নয়। তুমিও কেউ নও তার।

অনেক বছর আগে লেখা সেই গল্পটা তবে সত্যি হয়ে উঠছে!

সেই গল্পের 'আমি' বিবাহিত ছিল না।

কিন্তু তারই মতো আজ তুমি বিগত-যৌবন, যতটা-না বয়সের কারণে তার চেয়ে বেশি অসুস্থতার জন্য— সেও অসুস্থ ছিল, তার মতো তুমিও দরিদ্র অসমর্থ; তুলনায় প্রভা— কী যেন নাম ছিল গল্পের মেয়েটির— রেবা, রেবার মতো যৌবনবতী প্রভা—

কিন্তু রেবা অনূঢ়া!

এত মিল খুঁজে বের করবার দরকার কী! আসল কথা— টান। তোমার আকর্ষণ করার শক্তি নেই।

তবু প্রেমের আকাঙ্ক্ষা মরে না কেন— কেন-যে কাঙালের মতো এখনও ভাবি, আমাকে যদি একটু ভালোবাসতে দিতো প্রভা! যদি একটু ভালোবাসতো কেউ!

অসম-অবৈধ সম্পর্কের দিকে তবুও তো ঝোঁক রয়েছে তোমার?

তবুও তো রূপ সৃষ্টি হয়!

আনন্দ যেন সেই রূপ দেখতে পাচ্ছে। একটু আড়াল থেকে এই রূপ দেখা যায়— খাবার টেবিলে কতবার সে প্রভার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে, খাওয়া ভুলে গেছে! প্রভা কখনোই তার মুখের দিকে সচেতনভাবে তাকায়নি। একদিন, তখন রঞ্জু-মঞ্জু কেউ ছিল না টেবিলে, প্রভা বলেছিল, 'হাঁ ক'রে দেখবার কী হলো?' খুব গাঢ় স্বরে আনন্দ বলেছিল, 'তুমি তো দেখবার মতো জিনিসই—' একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পাক দিয়ে উঠছিল, তাকে সামলে ফের সে বলেছিল 'ভালো ক'রে দেখার সুযোগ আর পেলাম কই!' আনন্দ তখন আশা করছিল প্রভা কিছু বলবে। কিন্তু প্রভাকে সে আহারে নিবিষ্ট হ'তে দেখে বলেছিল, 'একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।'

প্রভা চোখ তুলে তাকালো।

—'আমার প্রতি তোমার এত বিতৃষ্ণা কেন?'

প্রচণ্ড বিরক্তিতে প্রভার চোখ-মুখ মুহূর্তের জন্য কেমন বদলে গেল, 'শান্তিতে একটু খেতেও দেবে না!'

আনন্দ কুঁকড়ে যেতে গিয়েও কেমন সোজা হয়ে দাঁড়ালো, 'আসলে সেদিন তুমি বেশ্যাপাড়ায় যেতে বললে কিনা— তাতে তুমি স্বস্তি পাবে, সম্পর্কটা অন্তত ভালো থাকবে— থাকুক, এটা তুমি চাও— আমাদের সম্পর্কটা কী প্রভা?'

প্রভার তখন খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আনন্দর চিৎকার ক'রে বলতে ইচ্ছে করছিল, কোন্ সম্পর্কটাকে তুমি ভালো রাখতে চাইছো। কিন্তু কিছু না-ব'লে সে উঠে পড়েছিল।

তব, এই একই ছাদের তলায় থাকা— কথার কথা নিশ্চয় নয়! একেবারে-যে কাছ ঘেঁষতে দেয় না, তাও নয়— ন'মাসে-ছ'মাসে কেমন একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে যায়— যেন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাকে প্রভা রিনিউ ক'রে নেয়— নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে সত্যিই কি কিছু নিগূঢ় রহস্য আছে?

সেদিন বাণীকে এইরকম একটা পশ্ন আনন্দ করেছিল। বাণী বলেছিল, 'সম্পর্কে রহস্য নেহ, রহস্য মনে— এরকমই মনে হয়, এই ধরুন আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক...'

আনন্দ তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, বাণী কথা থামিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ আনন্দ ব'লে উঠেছিল, 'আসলে আমি একটা নাটক পড়লাম, পড়তে হলো— হক্সলীর, গিওকোন্দা স্মাইল— পড়েছেন?'

—'না।'

—'নাটকটা যে খুব একটা মহৎ কিছু তা নয়, কিন্তু যা আমাকে ভাবাচ্ছে, তা ওই সম্পর্ক— আমি আপনাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলি। বলি?'

—'বলুন।'

—'নাটকের প্রধান চরিত্র যে কে— হাটন না জ্যানেট, বলা মুশকিল। —হাটন ধনী, আত্মরতির পথে কোনোরকম বালাই নেই তার, এক কথায় জীবনবিলাসী পুরুষ। হাটনের স্ত্রী এমিলি, এককালে রূপসী ছিল— কঠিন রোগে তার রূপ ঝ'রে গেছে, অকাল জরায় আক্রান্ত। জ্যানেট এমিলির বন্ধু। সে হাটনের প্রেমে পড়েছে। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছরের জ্যানেটকে ভালোবাসে না হাটন, সে কিশোরী ডোরিসকে চায়—'

বাণী ব'লে উঠলো, 'এই জন্যই বলছিলাম, রহস্য মানুষের মনে—'

—'কিন্তু চাওয়ার পথে যদি কোনো বাধা থাকে— চাওয়া যদি খুব অব্‌সেসিভ হ'য়ে ওঠে—'

—'মুশকিল।'

—'জ্যানেট সেই মুশকিলেই পড়লো আর সে এমিলিকে খুন করলো। জানেন, নাটকটা পড়তে-পড়তে একবারও মনে হয়নি জ্যানেট এমন নৃশংস হ'তে পারে! এমন-কী এমিলির মৃত্যুর পরেও!' আনন্দ চুপ ক'রে থাকলো কয়েক মুহূর্ত।

—'তারপর?'

—'পথ পরিষ্কার হয়েছে ভেবে জ্যানেট যখন তৃপ্ত; আর মিলনের কথা ভাবছে— তখনই সে খবর পেলো হাটন ডোরিসকে বিয়ে করেছে। ঘৃণা-বেদনা-মর্মদাহন কিছুই হলো না তার, বরং তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো ক্রূর হাসি—'

আবারও কিছুক্ষণ নীরব থেকে আনন্দ বললো, 'এরপরই আমরা জানতে পারছি এমিলির নার্স— হাটনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনছে, জ্যানেট— হাটনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে— হাটনের ফাঁসি হবে।'

কেমন এক নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে আনন্দ ব'লে উঠলো, 'এ-ই প্রেম!' কেমন যেন বিপন্ন শোনালো কণ্ঠস্বর, 'অথচ প্রেম মানে— আজও, আমি বিশ্বাস করি: আলো— কেবল মানুষীর গভীর হৃদয়ই তা দিতে পারে।' ব'লে আচমকা উঠে দাঁড়িয়েছিল আনন্দ, 'চলি।'

এই বিশ্বাসে স্থিত হয়ে থাকাই কি তার কাল হয়েছে— স্বপ্ন আর কল্পনার পৃথিবী থেকে সে বের হ'তে পারলো না!

যদি পারতে!

তাহলে কী হতো?

জীবনটা অন্তত ছায়াসর্বস্ব হতো না।

অন্তত ব্রথেলের কোনো মেয়েমানুষের রক্তমাংসের স্বাদ নিতে পারতাম!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু— বেড়ে যায় শুধু;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।

গত কয়েক মাসে আনন্দকে যেন ভূতে পেয়েছিল। একটা ঘোরের মধ্যে লিখে ফেলেছে চার-চারটি উপন্যাস। তার মধ্যে প্রথম দু'খানা রীতিমতো ঢাউস। এখন যেন সে ফুরিয়ে গেছে। ফিরে দেখা নেহ, ভবিষ্যৎ ঝাপ্‌সা। কুসুমকুমারী দিন দিন বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। কোথাও কোনো ভালো কিছু ঘটছে না। কেবল অনেকদিন টালবাহানার পর তার পঞ্চম কবিতা সঙ্কলনের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু কোনো আশা আছে ব'লে মনে হচ্ছে না আনন্দর। নিজের সম্পর্কে কত ভুল ভাবনাই-না ভেবেছে— বাংলাসাহিত্যে সে টপ্‌ মোস্ট কবি হবে— ধূসর পাণ্ডুলিপি সত্যিই কেমন ধূসর হয়ে গেল!

মহৎ একটা উপন্যাস লেখবার কথা ভেবেছিল সে, তার বিশ্বাস ছিল— এই শান্তির দেশে ব'সেও একটা ওয়র অ্যাণ্ড পিস লেখা যায়।

কিন্তু কী লিখলে আনন্দ?

আনন্দ ভাবছিল। বাড়িতে আজ সে একা। কোথাও বের হ'তে ইচ্ছে করেনি। নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কেমন একটা অনুভূতি তাকে পেয়ে বসেছিল। আবিষ্কার করেছে, অনেকদিন সে কোনো স্বপ্ন দ্যাখেনি। —প্রায়হ, নতুন ক'রে, ফিরে দেখার আয়োজনের আগে, সে বরিশালের স্বপ্ন দেখেছে, প্রায়ই তার কিশোর বয়সের— গোবরজলে নিকানো উঠোনে ছড়ানো তার বাল্যকাল, মায়ের হাতে সাজানো-গোছানো তার পড়ার ঘর, কখনও-কখনও বাবাকে দেখতে পেয়েছে— সত্যানন্দ বলছেন: মিলু, স্বদেশি আন্দোলনে তো স্বাধীনতা এলো।

—সত্যিই কি এলো! কমিউনিস্টরা তো বলছে— ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়!

—কেউ তো সত্য ব'লে মেনে নিয়েছে— সেটা বিষয় নয়, আমি বলছিলাম, ব্রাহ্ম সমাজ-আন্দোলনের মাধ্যমে মনের স্বাধীনতাই তো আমরা আনতে চেয়েছিলাম— এলো না তো! কেন?

এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছে আনন্দ— বিবৃত করেছে তার উপাখ্যানে। ব্রাহ্ম আন্দোলন আর কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে অদ্ভুত একটা মিল খুঁজে পেয়েছে আনন্দ— ব্রাহ্মরা মানুষসাধারণের ধর্ম কী, মানুষকেই তা জানাতে চেয়েছে, কমিউনিস্টরা জানাতে চেয়েছে, চায় তাদের অধিকার কী; কিন্তু ব্রাহ্মদের যা অবস্থা— দুনিয়ার সব ভোগসুখের জিনিসের সঙ্গে এতটা মাখামাখি! কমিউনিস্টরাও এর বাইরে থাকতে পারবে ব'লে মনে হচ্ছে না।

কখনও জ্যোতির্ময়ী, সেই কবেকার দীপ্তিমুখী মেয়েটির মতো গভীর হৃদয়ের সেই মেয়েটিও আর আসছে না!

আনন্দ তার ট্র্যাঙ্কের মধ্য থেকে খাতাগুলো বের করলো, ভাগ-ভাগ ক'রে সাজিয়ে রাখলো পর-পর— প্রথমভাগে ন'টি খাতা, দ্বিতীয়টিতে দশটি, তৃতীয় ও চতুর্থে যথাক্রমে সাত ও চার।

প্রথম ভাগের মাঝামাঝি থেকে একটা খাতা টেনে নিলো আনন্দ, মেলে ধরলো চোখের সামনে। পাতা উল্টে যেতে থাকলো। তারপর কেমন এক হতাশভাব জেগে উঠলো। কোথাও কি সূর্যদাক্ষিণ্য আছে এ-উপাখ্যানে?

আনন্দ যেন না-ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।

অনেক-অনেক অভিজ্ঞতা— অভিজ্ঞতার সার, কিন্তু কী পাবে একজন পাঠক?

খানিকটা চোখ খুলে যাবে না কি— জীবন সম্বন্ধে, আশা ও আশাবাদ সম্বন্ধে— যা ভুল বুঝেছিল মানুষ! হয়তো আরও স্পষ্ট কোনো দার্শনিক সংস্থানে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে।

তোমার ঝোঁক তো সেই ব্রাহ্ম সমাজের দিকে! চারদিকে এত অন্ধ, অন্ধকার— কোন্ দর্শন আলো ছড়াবে? তুমি কি মনে করো নীতিবিজ্ঞান নিয়ে ধর্ম?

না।

তাহলে কি বিজ্ঞাননিষ্ঠ ধর্ম?

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সত্যই-যে একমাত্র সত্য তা আমি পুরোপুরি স্বীকার করি না। বিজ্ঞানের সত্যকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মধ্যে কি কোনো সূর্যদাক্ষিণ্যের আভাস নেই? সেই আভাসকেই তো মূর্ত করতে চেয়েছে এই উপাখ্যানের দীপ্তিমুখী মেয়েটি; শুদ্ধ সত্য আর মানুষের কাজকর্মে ফলিত সত্যের রূপ— এইসব নিয়ে সে একটা নতুন ধর্মকে দাঁড় করাতে চায়— চেয়েছে।

মানে তুমি! তোমার অ্যানিমা! নিজের জীবনে ফসলটার দিকে তাকাও, ফলন কী?

খুব বিমর্ষ দেখালো আনন্দকে। বিড়বিড় করলো, 'এমন দীপ্তিমুখী মেয়েও তো কারও প্রেরণা হ'তে পারে, তখনই তো আমি সার্থক হবো।'

অতএব, প্রথম ভাগের খাতাগুলোকে ট্র্যাঙ্কের অন্ধকারে একদিন জেগে উঠবার সাধ মনে রেখে ঘুমিয়ে পড়তে বললো আনন্দ।

পরের ভাগ থেকে একইভাবে সে খাতাগুলোর পাতা উল্টে পাল্টে দেখলো। পড়লো কোথাও-কোথাও, সেই চৌদ্দ-পনেরো বছর আগে যেমন চরিত্রদের নামের জায়গায় তার নিজের নাম বসিয়ে পড়তো, এই অংশটা সেভাবে সে পড়ছে:

> ...আনন্দর নিজের জীবনদৃষ্টিও গত দু-তিন বছরের ভিতর সময়ের আগুনের ভিতর নিজেকে ক্ষালন করে নিতে নিতে অনুভব করেছে পৃথিবীর স্থির সত্যগুলো। স্থির হয়তো, কিন্তু কেবলি নতুন ধারাপ্রপাতের দ্রুততার ভিতর দিয়ে, নিজেদের স্থিরভাবে আবিষ্কার ক'রে নিতে ভালবাসে তারা— দ্রুত

বিদ্যুতের চুড়োয়-চুড়োয় আকাশও যে বিদ্যুৎ ও ঝড়— এরকম বিভ্রম বিলাস জাগিয়ে তোলে আত্মহারা মানুষের মনে। কিন্তু ঝড়, বিদ্যুৎ, অন্ধকার যখন সমস্ত শেষ করে দিয়ে যাচ্ছে— তখন লক্ষ-লক্ষ মানুষের দিশাভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া উপায় নেই— হত, নিহত, নির্বাপিত হওয়া ছাড়া পথ নেই— ইতিহাসের দু-তিন পুরুষ, ছ-পুরুষ, এক-পুরুষ যারা এরকমভাবে ক্ষয়িত হয়ে যায় তারা ভবিষ্যৎ মানুষের মনে জ্ঞান, হৃদয়ের অনুতাপ, শুদ্ধতা বাড়িয়ে দেয় কিনা বলা কঠিন— কিন্তু নিজেদের জ্ঞান সম্পূর্ণ করে যায় এই জেনে যে মানুষের বিদ্যা বাড়লেও তার জ্ঞান বাড়ে না, বাড়াতে গেলেও তা জ্ঞানপাপে দাঁড়ায় গিয়ে। মানুষের মন আলোকিত করতে পারে না (দু-একজন সৎ ও মনীষীর মন ছাড়া) মানুষকে আশা, ভরসা, প্রতিশ্রুতি, শান্তি দিতে পারে না কিছুই।... এ-যুগে ক্ষয়িত হওয়াই স্বাভাবিক— মৃত হওয়া— অবক্ষয় উত্তীর্ণ ক'রে ক্ষেম সূর্যের মুখ দেখাকে অপর যুগের সুস্থির সত্য বলে গ্রহণ করা চলতে পারে। কিন্তু সেই অপর যুগ কি এমনি-এমনি আসবে?

খাতার পাতা থেকে আনন্দ চোখ তুলে যেন আকাশ দেখতে চেয়েছিল। সিলিঙে দৃষ্টি ব্যাহত হয়ে আটকে আছে। কী-একটা ভাবতে চাইছিল, উন্নত মানুষের ধারণা কিন্তু কেমন যেন অলীক মনে হচ্ছে— মনের তপঃ-শক্তিতে সত্যিই কি মানুষ মেশিন চালাতে পারতো কিংবা পারবে?

আনন্দ নিজের মনে মাথা নেড়ে ফিরে এলো খাতায়:

> ...মানুষকে ছুটিয়ে চালাল মেশিন, মানুষকেই চালাল সে, যন্ত্রকে ব্যবহার করার মতো সততা ও মনীষা হারিয়ে ফেলেছে মানুষ।

আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'এসবই আজকের পৃথিবীর নিহিত সত্য, কতকাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকবে কে জানে।'

তবু মনীষারা ভালো বই লিখবেন।

নেতারা বিমিশ্র ভাষার কাঁচা বিবৃতি দেবে— পাকিয়ে তুলবে। কবি-বিজ্ঞানীদের একটা বড় স্বৈরী অংশ সূর্য-স্বপ্ন দেখবে। এরকম ভাবনার শেষে আবারও পড়তে থাকলো:

> ...কিন্তু সাধারণ মানুষ মরে যাচ্ছে; পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নেবার আগে হিংসার পরিবর্তে হিংসা ফিরিয়ে দেবার বিজাতীয় লোভে দুর্বল ঠোঁট কেঁপে উঠছে কারু; রিরংসাকে জীবনে সফল করে ভয়াবহ বৃষ-গর্দানের দোষে রক্তের চাপে মরে যাচ্ছে কেউ।

আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'লড়াই চাই— লড়াই ক'রে বাঁচতে চাই!' একটু উদ্দীপিত হলো সে, তবে কি আমি রাজনৈতিক উপন্যাস লিখতে চেয়েছিলাম?

না। আসলে আমি মানব-মানবীর সম্পর্কের কথা লিখতে চেয়েছি, না— তাও বোধহয় না—

কিন্তু রাজনীতির কথা এসেছে প্রচুর, এমন-কী তুমি বারো বছরের রঞ্জুকে ত্রিশ-একত্রিশ বছরের যুবক রূপে কল্পনা করেছো, যে তোমার মতো কোলকাতায় থাকে, যা খুশি তার করার মানসিকতা আছে কিন্তু কবিতা লেখে না, রাজনীতি করে— এভাবে নিজের সত্তাকে ভেঙে তুমি কী করতে চাইলে নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে জানান দেওয়া ছাড়া? অ্যান্টি কংগ্রেস, অ্যান্টি কমিউনিস্ট— এ বই কে ছাপবে?

আমি ছাপার কথা মাথায় রেখে লিখিনি— লিখেছি সত্যের অন্তঃসারে নিহিত আর-এক সত্যকে জানতে, জানাতে।

যে-পৃথিবীর মেয়েরা বিক্রি হয়ে যায়, পাচার হয়ে যায়, রক্তশূন্যতায় ভোগে, ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়, দুষিত রক্ত বয়ে বেড়ায়— সে-পৃথিবীর মানুষের মন কখনও উন্নত হ'তে পারে না, সে-পৃথিবীর মানুষ প্রেম আর প্রতিহিংসার কাহিনী ভালোবাসে, বাপ-ছেলে একই মেয়ের প্রেমে পড়ে কিংবা মা-মেয়ে একই ছেলের প্রেমে— সে-পৃথিবীতে কখনোই বড় প্রেমিক জন্মাতে পারে না, সে-পৃথিবীতে বিপ্লব হওয়া খুবই মুশকিল।

আনন্দ নিচের দিকের একটা খাতা টেনে বের করলো। একটা বিশেষ পাতা খুঁজে মেলে ধরলো:

'...আপনি কি কম্যুনিস্ট আনন্দবাবু?'

'না তো। আমার ছেলে একটা নতুন সোস্যালিস্ট পার্টি গড়েছে, আমি কোনো দিকেই ভিড়লুম না।'

'আমি তো ক্যাপিটালিস্ট—'

'দেখছি তো।'

'আমাদের কি উচ্ছেদ করে দেওয়া হবে?'

'চেষ্টা চলছে। তবে শিগগির সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।'

'এ চেষ্টায় আপনি কোন দলে?'

'সকলের যাতে ভালো হয়, সবার উপর সুবিচার হয়; আমি, আমার সেপাহ, আমার রাধাচক্রের জয় হল কিনা অন্যসব কাপ্তেনদের উপরে— সেদিকে লক্ষ্য না রেখে— এরকম একটা শিব সুস্থ প্রাণঘন পরিণতিতে আজকের কোনো বিপ্লবই আমাদের নিয়ে যাবে বলে মনে হয় না... তাহলেও যারা মনে করছে তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য সকলের ভালো, কল্যাণের পথ সত্যিই সুগম করে দেওয়া সকলের জন্য— আমার ঝোঁক তাদের দিকে।'

'অনেক ক্যাপিটালিস্টই তো আজকাল এইরকম কথা বলছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা বলছে বটে। সেজন্য এসব কথার মর্যাদা কমে যাচ্ছে। কথা চাচ্ছে না এখন আর মানুষ কোনো শ্রেণীর কোনো নেতার মুখ থেকে। এখন নমুনা চাই— ...যারা সত্যিই পৃথিবীর ভালো হবে মেনে নিয়ে ভেবেচিন্তে কাজ করে আমার ঝোঁক তাদের দিকে। কিন্তু পৃথিবী কোনোদিন শুদ্ধ হবে না আমি জানি। যে-কোনো বিপ্লব শেষপর্যন্ত বিপ্লবে গিয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎ মানবের ভালো করতে গিয়ে সমসাময়িক মানুষকে শেষ করে দিয়ে যায়। কিন্তু তবু ভবিষ্যৎ মানুষের ভালো হয় না। তিন হাজার বছর ধরে এই তো চলছে। আরও তিন-চার হাজার বছর এরকমই চলবে।'

'এটা কি আপনার ধারণা?'

'এর চেয়ে শ্রেয় ধারণায় আমাকে দাঁড় করিয়ে দিন না, আপনাকে শিরোপা দেব।'

'খুব ভালো হবে মানুষের; মনে হয় আপনার? আজ কংগ্রেস, কাল কম্যুনিস্ট, পরশু সোস্যালিস্টরা সত্যিই সিদ্ধির স্তরে পৌঁছিয়ে দেবে পৃথিবীটাকে?'

'হতে পারে। অসম্ভব কী? কংগ্রেস তো প্রাণান্ত চেষ্টা করেছে।'

'কম্যুনিস্টরাও প্রাণান্ত চেষ্টা করছে।'

'কম্যুনিস্টরা? কোথায়?

'কেন, তাদের দেশে রাশিয়ায়। আরো অনেক দেশে, আমাদের দেশেও তো।'

খাতাটা বন্ধ ক'রে চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকলো আনন্দ। অনেকদিন পর সুধীরকে মনে পড়লো। সুধীরের কাছে সে প্রথম শুনেছিল, লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ-স্বরাজের দাবির সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে— সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় জনগণের প্রধান শত্রু; একইসঙ্গে ধনতন্ত্র আর সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে; অভিমুখ— সমাজতন্ত্র। কিন্তু হায়! নেতাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। নেতারা যা চেয়েছিল, পেয়ে গেছে— বিয়াল্লিশের আন্দোলনটাকে একটা রুশ রেভল্যুশনের মতো যদি দাঁড় করানো যেতো! কে করবে, কম্যুনিস্টরাই তো বিরুদ্ধে গেল!

এ বিষয়টা কি উল্লেখ করা হয়েছে?

আনন্দ আর একটা খাতা টেনে নিলো:

'ওটাকেই একটা বড় রুশ রেভল্যুশনের মত দাঁড় করানো উচিত ছিল, শুধু ইংরেজ তাড়াবার জন্যই নয়, আমাদের দেশে যারা ইংরেজের চেয়েও অধিক তাদের নিঃশেষ করে ফেলবার জন্য। ইংরেজ গেছে, তারা আছে, তারা তো জাঁকিয়ে বসেছে!'

আনন্দ তার কপালে হাত বুলালো।

আচ্ছা আনন্দ, রাজনৈতিক কথোপকথন সবই মেয়েদের সঙ্গে হয়েছে— কেমন যেন অবাস্তব মনে হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বাস্তবসম্ভব— কোনো একদিন এদের জন্ম হবে, এরা সবাই সেই এক দীপ্তিমুখী মেয়ে, এখন প্রতিমা— একদিন প্রাণ পাবে।

কিন্তু এবারও তুমি প্রভাকে মেরে ফেললে!

প্রভা তো মৃত্যুই চেয়ে এসেছে এতদিন। সুমনার অ্যানিমিক হয়ে যাওয়া প্রতীকমাত্র— প্রেমহীনতা মানুষকে রক্তশূন্য ক'রে দেয়— আর প্রেম-যে মানুষকে কী সাংঘাতিকভাবে উজ্জীবিত করে— করতে পারে!

আনন্দ চতুর্থভাগ থেকে প্রথম খাতাটা তুলে নিলো। শুরুটা পড়লো:

> সারাদিন মাল্যবানের মনেও ছিল না; কিন্তু রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে অনেক কথার মধ্যে মনে হল বেয়াল্লিশ বছর আগে ঠিক এই দিনেই সে জন্মেছিল— বিশে অঘ্রাণ আজ।

খাতাটা বন্ধ করলো। তুলে ধ'রে বিড়বিড় করলো, 'এহ, যতবার আমি প্রভাকে মেরেছি, একটা দুঃখী মেয়েমানুষকে আমি নিস্তার দিতে চেয়েছি— এই প্রথম আমি একটা বেড়ালছানাকে আছড়ে মেরে ফেললাম—'

আনন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠছে কামনার রক্তিম আভা ছড়ানো প্রাণোচ্ছ্বাসের আশ্চর্য বিভায় উদ্ভাসিত প্রভার ঠোঁট, চোখ, হাসি— সমস্ত মুখমণ্ডল; মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললো, 'কত কথা বলার ছিল, কিন্তু ভাষা তৈরি করতে পারলাম না— না মুখের ভাষায়, না সাহিত্যের ভাষায়— কথা ফুটলো না।'

আর, কথা ফুটলো না ব'লে বনি প্রভা এমন-কী জ্যোতির্ময়ীও দূরতর দ্বীপ হয়ে গেল...

একটা হাই উঠলো। কেমন একটা ক্লান্তি। খাতাটা রেখে দিলো। দু'চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকলো আনন্দ।

যুদ্ধ আর শান্তির মতো শিল্পসাহিত্যও আজ বিশ্বের প্রেক্ষাপটে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে, বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যচর্চা আজ ফ্যাশন— রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত, পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সাহিত্যের পক্ষে-বিপক্ষে জোর বিতর্ক চলছে— পার্টিলাইন না নিরপেক্ষ বামপন্থা— পূর্ব্বাশার অফিসেও এসব বিতর্ক উঠেছে— পরিচয়, পূর্ব্বাশা, এমন-কী সম্প্রতি প্রকাশিত সাহিত্যপত্র পত্রিকাতেও জোর কাজিয়া—

আমার লেখা স্বাশ্রয়ী কিন্তু— সমাজমনস্কতার অভাব আছে ব'লে কেউ বাতিল করতে পারবে না। কিন্তু একইসঙ্গে তাতে মোটা দাগের আশাবাদের অভাব রয়েছে।

যুদ্ধ চলছে:

মঙ্গলাচরণ ভার্সেস সমর সেন

বিষ্ণু দে ভার্সেস মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাণিক ভার্সেস বুদ্ধদেব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধ ভার্সেস নারায়ণ

নারায়ণ ভার্সেস মঙ্গলাচরণ

আনন্দর মুখে একটা মিচ্‌কি হাসি ফুটে উঠলো— এদের কেউ-কেউ আমার ছাত্র, বন্ধু— কমিউনিস্ট পোয়েট রূপে যার পরিচিতি, সেই বিষ্ণুর দৃষ্টিভঙ্গি অমার্ক্সীয়! বিষ্ণু 'পরিচয়' থেকে বেরিয়ে এসেছে! আনন্দ উপন্যাস লিখছে— এরকম একটা আভাস সে বিষ্ণুকে দিয়েছিল, বিষ্ণু জিগ্যেসও করেছে তাকে, 'কী, উপন্যাস শুরু হলো?' আনন্দ বলেছিল, 'অবকাশ পেলেই ধরবো।' বিষ্ণুর ভ্রূ কুঁচ্‌কে যাওয়া দেখে বলেছিল, 'বেকার জীবনে অবসর কম— কাজের খোঁজে ছুটছি—' সেদিনই সে কথায় কথায় প্রভার কথা বলেছিল, তার যদি একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়া যায় তাহলে অন্তত কিছুটা সুরাহা হ'তে পারে। বিষ্ণু দেখবে বলেছিল। কথার কথা নয়, কেমন যেন একটা আশ্বাস ছিল। সেই আশ্বাস মতো এক বছরের জন্য একটা কাজ হ'লেও তো হয়েছে প্রভার। আরও হয়তো হবে। ভরসা আছে।

বিষ্ণু কমিউনিস্ট। যতই বলুক মাণিক— তার দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত অমার্ক্সীয়। কিন্তু আনন্দর লেখা— অ্যান্টি কমিউনিস্ট,— এ তক্‌মা সহজেই দেওয়া যাবে।

তখন কি বিষ্ণুর সঙ্গে, সঞ্জয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো থাকবে?

আনন্দ খাতাগুলো সব ট্র্যাঙ্কে তুলে দিয়ে, ট্র্যাঙ্ক বন্ধ ক'রে এমন একটা স্বস্তির ভাব অনুভব করলো যেন কোনো সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে।

AMARBOI.COM

মাঝে মাঝে অনেক দূর থেকে শ্মশানের চন্দনকাঠের চিতার গন্ধ,
আগুনের— ঘিয়ের ঘ্রাণ;
বিকেলে
অসম্ভব বিষণ্ণতা।

এই প্রথম নিজেকে প্রকৃত নিরাশ্রয় মনে হচ্ছে আনন্দর। অন্যের ওপরে রাগ-অভিমান কতবার সে মায়ের ওপর উগ্‌রে দিয়েছে। এমন-কী নিজের প্রতি যে রাগ, তা-ও। এই সেদিনও, তাঁর মৃত্যুর ক'দিন আগে কুসুমকুমারীর পাশে ব'সে থেকে আনন্দ বুঝতে পারছিল, মায়ের যাবার সময় হয়ে এসেছে, এই বুড়ো খোকাটার জন্য তখনও তাঁর ভাবনা, প্রকাশও করেছিলেন তিনি, 'তোকে যদি একটু থিতু দেখে যেতে পারতাম— কোনো দুঃখ থাকতো না।'

—'দুঃখ পাওয়ার কিচ্ছু নেই— আমি বরিশালে ফিরে যাবো, একা। তুমি তখন আকাশ থেকে দেখো।'

মা'র একটা কবিমন ছিল। সেটাই পেয়েছিলাম আমি। আঃ! যদি না-পেতাম— এই বাস্তবতায় কোথাও একটা আমার জায়গা হয়ে যেতো!

হঠাৎ সে ব'লে উঠেছিল, 'নিজে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে বেশ তো বাঁচলে, মা!'

আনন্দ ভাবছিল। একটা স্মরণ-লেখা লিখতে হবে। আনন্দর সহসা মনে পড়লো কুসুমকুমারীর বয়সের আঁক-কাটা কুঁচ্‌কে যাওয়া মুখমণ্ডলের রঙ— কথাটা শুনে তাঁর মুখের ওই বদলে যাওয়া রঙের স্পষ্ট আভাস যেকথাটি বলেছিল, তখন খেয়াল না-করলেও, এখন আনন্দর মনে হলো, কোথায় যেন অন্তর্লীন এক বেদনার আধারে আঘাত লেগে ছল্‌কে উঠেছিল বেদনা, ছোট হয়ে আসা বুকেও তাঁর জমেছিল দীর্ঘশ্বাস— এইসব অনুভব ক'রে আনন্দ ভাবলো, এমনও তো হ'তে পারে— মা লেখার সুযোগ পায়নি আর। কিন্তু কবিতা লিখতে না-পারার যে দুঃখ, আমি আজও মাঝেমধ্যে বহন করি, তার কোনো ছাপ মায়ের মুখে ফুটে উঠতে দেখেছি কি? দিনরাত অবিশ্রান্ত কাজের মধ্যে থাকা মায়ের মুখ মনে করার চেষ্টা করলো আনন্দ, কিন্তু কোনো মুখ ভেসে উঠলো না।

আনন্দ, তুমি কি কখনও জানতে চেয়েছো কেন তিনি লিখছেন না?

আনন্দ মাথা নাড়লো।

তাহলে তুমি তাঁর ভেতরের খবর বুঝবে কী ক'রে?

আনন্দর চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠলো— তার নতুন কবিতা-বই প্রকাশের খবর জানিয়ে বইটি কুসুমকুমারীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সে, কুসুমকুমারী তখন উঠে বসেছেন; ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে বইটা দেখছেন, 'কী যেন নাম বললি?'

—'সাতটি তারার তিমির।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের মুখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, যেন তাঁর মানস-দৃষ্টিতে ধরা পড়ছিল গাঢ় তমসা বিদীর্ণ ক'রে সাত-সাতটি নক্ষত্রের হীরকদ্যুতি।

তারপর তিনি নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকলেন। সেই গন্ধে যেন তাঁর স্মৃতি জেগে উঠছিল, যেন তাঁর একমাত্র কবিতা-সঙ্কলন কাব্যমুকুলের গন্ধ পাচ্ছেন, বাহান্ন বছর আগের একখানা ছবি তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন— এরকমই ভাবছিল আনন্দ।

আনন্দর ভাবনা এলো— বাবা কি মায়ের প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন? তা যদি না-হবে, অনেকদিন পর্যন্ত মায়ের কবিতা তো প্রকাশ পেয়েছে, আরও একটা বই তো হ'তে পারতো, হয়নি তো!

এখনও হ'তে পারে। অনেক পুরনো ও লুপ্ত পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছড়িয়ে আছে— উদ্ধার করা কি সম্ভব হবে? সহসা তার মনে পড়লো কাব্যমুকুলেরও তো কোনো কপি নেই! কেমন একটা হতাশভাব আনন্দকে পেয়ে বসলো, তার থেকে বেরিয়ে যে একটা উদ্যোগ নেওয়া যায়, এমন কোনো ভাবনা তার মাথায় এলো না। কেবল হতাশ-ভাবটা কেটে গিয়ে গভীর এক মনখারাপ তৈরি হচ্ছিল। মায়ের মধ্যে সে গভীর হৃদয়ের প্রকাশ দেখেছে অনেকদিন পর্যন্ত। তিনি বরিশাল মহিলা সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন, অসহায় আর্ত মানুষের সেবা করেছেন অক্লান্ত—

আমি তাঁর অযোগ্য সন্তান, তাঁর স্বপ্নের বিপরীতে আমার অবস্থান, চিরবিষণ্ণতা খেলা করে আমার মুখে, দুর্বল ভীরু মনের মানুষ আমি— মানুষ হবার জন্য কোনো পণ করিনি কখনও— কেবল মা তোমার কাব্যপথ অনুসরণ করেছিলাম, কবে-যে তুমি সে-পথ থেকে স'রে গেছ, সে-খেয়াল ছিল না— কবে আমি স্বপ্ন আর কল্পনা দিয়ে গড়া এক পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করলাম, কেউ আমার সঙ্গী হলো না— এই-যে চারদিকে এত আত্মীয়স্বজন, আমি কেমন ম্লান তাদের কাছে; এখনও বেকার জেনে কারও-কারও কাছে করুণার পাত্র; এমন একজনকে পেলাম না যার কাছে আমার নতুন বইটার কথা বলা যায়। আমার মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে কেউ-কেউ বেশ সন্দিগ্ধ মনে হলো।

সুচরিতা কাকে যেন ঢের গর্বের সঙ্গে তার দাদার সাম্প্রতিক বইটার কথা বলতে গেছিল, সে যেন শুনতেই চাইলো না। খুকির ব্যথাটা বুঝতে পারছিল আনন্দ, তার দিকে চেয়ে কেমন এক সমমর্মিতার হাসি হেসেছিল সে। তারপর কাছে গিয়ে বলেছিল, 'কবিতার বই কখনও সুসমাচার হয় না রে— এদের বল্, মায়ের মৃত্যুর ক'দিন আগে রেসের মাঠে দারুণ এক বাজি জিতেছে তোর দাদা— দেখবি কথা শুরু হয়ে যাবে।'

এসব মনে ক'রে আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে তুমি ভালোই করেছিলে মা—' ভাবলো, তার নিজস্ব কোনো খোঁজ ছিল না ব'লে কি আমার নিজেকে ফিরে দেখার সময়, তাঁকে আমি তেমনভাবে দেখতে পাইনি, যতটা দেখার বিষয় হয়ে উঠেছিলেন সত্যানন্দ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা ঠিক, মানুষের জীবন ও চরাচর সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব একটা বিশুদ্ধ ধারণায় পৌঁছুবার জন্য সত্যানন্দের একটা অন্বেষণ ছিল— মূলত তিনি জ্ঞানযোগী— কুসুমকুমারীর জীবনাদর্শের চালক-যে কর্মযোগ ছিল, এটা আজ আনন্দর কাছে আবিষ্কারতুল্য মনে হলো; মনে হলো, কেউ-ই সম্পূর্ণ হ'তে পারেননি। জ্ঞান-কর্মের সমন্বয় যদি ঘটতো!—

একটা পুরনো ছবি, কুসুমকুমারী আর ভুবনমামা মুখোমুখি ব'সে কথা বলছেন, কয়েক মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। কেন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস জ'মে উঠলো আনন্দর বুকের ভেতর। আনন্দ ভাবলো, জ্ঞান-কর্মও নয় সবখানি, আরও কিছু— সে এক রহস্য...

যেন সেই রহস্যের আবরণে জড়িয়ে পড়বার আগে আনন্দ তার লেখার খাতা টেনে নিলো।

আমার মা শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী দাস...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারিদিকে সৃজনের অন্ধকার রয়ে গেছে, নারি,
অবতীর্ণ শরীরের অনুভূতি ছাড়া আরো ভালো
কোথাও দ্বিতীয় সূর্য নেই,

ইদানিং নিবিড় হয়ে বসার মতো একটা পরিসর মাঝেমধ্যে তৈরি হয়— বসেও, কেবল নিবিড় হয়ে ওঠে না। একটা দূরত্ব, বরং বলা ভালো ফাঁক থাকে। কিন্তু কথা হয়। সাংসারিক কথা। মঞ্জুর বিয়ের বয়স হলো। মঞ্জুকে নিয়ে কথা হয়। পড়ানোর চাকরিটা পাওয়ার পর আনন্দর ওপর প্রভার খানিকটা হ'লেও আস্থা জন্মেছে। আনন্দর ক্ষমতা না-থাকলেও তার বন্ধুদের ক্ষমতা আছে— এ বিশ্বাস প্রভার দৃঢ়। আর এই আস্থা-বিশ্বাসের জায়গা থেকে প্রভা আজ বললো, 'তোমার বন্ধুদের একটু ব'লে রেখো।'

—'কী ব্যাপারে?'

—'এই তো একটু আগে কথা হচ্ছিল।'

—'কী কথা? অনেক কথাই তো হলো!'

—'মঞ্জুর জন্য একটা ভালো পাত্রের সন্ধান যদি দিতে পারে তোমার কোনো বন্ধু।'

—'কত বয়েস হলো মঞ্জুর—'

—'উনিশে পড়েছে।'

—'এত তাড়া কেন? তোমারই তো প্রায় একুশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল।'

—'তোমার মেয়ের যা চেহারা! বাপমুখো। যৌবনের ঢলানি থিতিয়ে এলে পছন্দ করবে কেউ?'

নিজেকে সামলে নিয়ে আনন্দ বললো, 'বিয়েটাই কি জীবনের সব?' প্রভাকে চুপ থাকতে দেখে ফের বলে, 'কী মনে হয় তোমার, জীবনের অভিজ্ঞতা কী বলে?'

—'সকলের জীবন তো আর আমাদের মতো নয়— অন্তত আমার দিদি-বোনের জীবন তো আমার থেকে ঢের-ঢের ভালো।'

—'না, আমি অবশ্য ওসব ভেবে বলিনি— আমাদের খুকি তো বিয়ে করলো না। পিসি, কাকা— এরা তো দিব্যি আছেন— জান্তব লালসায় কাছে আসার জন্য এদের ঝগড়া করতে হয়নি, হয় না।'

এবারও প্রভা কথা বললো না। যেন বলার কিছু নেই। আনন্দ কী ভেবে বললো, 'ভালো পাত্র বলতে, যদি জিগ্যেস করে কেউ, কী বলবো?'

—'তুমি জানো না?'

আনন্দ মাথা নাড়লো।

—'সত্যি, তোমার ন্যাকাপনা দেখলে পিত্তি জ্ব'লে যায়।'

আনন্দ অপরাধীর মতো মুখ ক'রে ব'সে থাকলো। একসময় বললো, 'প্রভা, বিয়েটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো নিয়তিসিদ্ধ ব্যাপার— এমনই তো মনে করো তুমি, মঞ্জুর জন্য কেউ-একজন নিশ্চয় আছে— বিধাতার জিম্মায়।'

—'তুমি যে কী বলো— আমার মাথায় ঢোকে না।'

—'জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে— আমরা কে?'

আনন্দকে দুর্বোধ্য লাগছে প্রভার।

—'তবু প্রভা, তোমার অভিজ্ঞতা থেকে মঞ্জুকে তুমি অন্তত এই কথাটা বোলো যে, পছন্দ না-হ'লে সে যেন অকপটে জানায় তার অপছন্দের কথা।' ব'লে একটু অন্যমনস্ক হলো আনন্দ। তারপর বললো, 'আমরা কেউ কারও যোগ্য হ'তে পারলাম না'— এই সত্যকে মেনে নিয়ে চুপ ক'রে থাকা ছাড়া আর কিছু বলার নেই কারও— এমন আক্ষেপের কথা, একই বয়ানে তারা কতবার যে বলেছে! বলেছে, তবু বলে; বলবে যতদিন একসঙ্গে থাকবে, এমন নিবিড় হয়ে ওঠার পরিসর তৈরি হ'লে; তবু ফাঁক থেকে যাবে। তবুও, কখনও প্রবৃত্তির উস্কানিতে, পৃথিবীর যে-কোনো স্তন্যপায়ী জীবের মদ্দাদের মতো আনন্দ প্রভার কাছে যায়, যেয়ে এসেছে এতদিন, হয়তো আজই যাবে আরও একবার, গিয়ে আবারও সে বুঝতে পারবে যে, সে নিতান্ত জীব নয়; তার প্রেমবোধ, ইচ্ছা, রুচি সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে, তাকে জান্তব হয়ে উঠতে হচ্ছে, ভাদ্দুরে কুত্তার মতো অনুনয়-বিনয় করতে হবে...

—'কী ভাবছো?'

প্রভার কণ্ঠস্বর আন্তরিক— মনে হলো আনন্দর। এবং বললো, 'ভাবছিলাম মানুষের প্রেম আর যৌনতার কথা— পশুদের থেকে খুব একটা আলাদা কিছু নয়—'

একথাটা যেন প্রভা জানে না। জানে, তবু বললো আনন্দ। আর প্রভাও না-জানার ভানে জানতে চাইলো, 'কীরকম?' প্রভার মুখে-চোখে যেন একটু নোনাগন্ধ ছড়ালো।

—'সবচেয়ে ভালো উদাহরণ তো কুকুরদের যৌনঋতু— আমাদের সঙ্গে তেমন কোনো পার্থক্য নেই ক্রীড়াকর্মে, এক গিঁট ছাড়া— দেখলেও কেমন একটা গা-শির্‌শিরানি—'

—'সবার সামনে দেখাও যায় না—'

—'হ্যাঁ, চুরি ক'রে দেখার মধ্যেও কেমন যেন গ্লানিবোধ এসে যায়। এইসব বোধ-বোধির কারণেই মানুষ পশুদের থেকে স্বতন্ত্র— সে স্বপ্নেও সঙ্গম করে, মৃত রমণীকেও করতে পারে।' ব'লে আনন্দ প্রভার মুখের দিকে তাকালো। হাতে-পায়ে ধ'রে এই রমণীটিকে যখন সে রাজি করিয়েছে, কখনও-কখনও তার মনে হয়েছে— সে মৃত শরীরকে রমণ করছে।

প্রভা ব'লে উঠলো, 'ধেৎ, তাই হয় নাকি কখনও!'

আনন্দ খুব প্রত্যয়ে বললো, 'হয়।' তারপর একটু সময় চুপ থেকে, গত বছরের মাঝামাঝি লেখা উপন্যাসে সে যেমন বিবৃত করেছিল একটি ঘটনা, সেভাবেই শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলো: 'আমি শুনেছি, একজন খুব রূপসী কুড়ি-একুশ বছর বয়সেই সুস্থ শরীরে হঠাৎ কেন যেন মারা গেল। বিকেলবেলাতে তাকে মাটি দেওয়া হলো। তারপর সবাই চ'লে গেল, যে যার গাঁয়ে। সেখানে আট-দশ মাইলের মধ্যে জনমানব কেউ ছিল না। সন্ধের পরেই একটা লোক এসে মাটি সরিয়ে সেই মড়াকে চুরি ক'রে নিয়ে গেল।'

কেমন অবাক শুনছিল প্রভা। অবিশ্বাস্য। তবু সে জিগ্যেস করলো, 'কেন?'

প্রভা কি এত বোকা? না, ভান? আনন্দর ইচ্ছে করছিল অসংস্কৃত ভাষায় উত্তর দিতে, মনে মনে আওড়ালো একবার, বললে প্যাসানটা ফুটবে ভালো। তবু সে বললো, 'কেন, বুঝতে পারলে না! মেয়েটি সুন্দরী ছিল, সোমত্ত— মাটি খুঁড়ে বার করবার পরও গা ফুটে রূপ বেরুচ্ছে, আর গতরের সে কী পুষ্টতা—'

আনন্দ যেন সেই লোকটাহ, তার কথা বলার ভঙ্গিতে, তেমনই মনে হলো প্রভার। আর সে দু'চোখ বন্ধ ক'রে নিজেকে যেন শব ভাবছে— শব হয়ে প'ড়ে আছে সে, আর আনন্দ সেই লোক হয়ে তাতে উপগত হচ্ছে—

একইসঙ্গে দু'জন মাথা ঝাড়া দিলো।

উপন্যাসে একটা সার্থক সঙ্গমের আভাস রেখেছিল আনন্দ— জীবনের এই খণ্ডিত মুহূর্তে তেমন আভাস ফুটে উঠলো না।

কিন্তু প্রভাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। এই অন্যমনস্কতার মধ্যে কেমন এক নিশিত আভা ছড়িয়ে পড়ছে প্রভার মুখমণ্ডলে। আনন্দর বেশ ভালো লাগলো। কামনার টান নেই। লালসা-রিরংসার দহন নেই। প্রভার মুখটা সত্যিই একটা দেখবার জিনিস হয়ে উঠলো। এই ভাবটাকে যদি চিরস্থায়ী করা যেতো! কিন্তু উপায় জানে না আনন্দ। এমন-কী এই মুহূর্তে কী কথা বলা উচিত, যেকথার প্রতিক্রিয়ায় আরও দীপ্তিময় হয়ে উঠবে ওই মুখ, তেমন কোনো কথা খুঁজে না-পেয়ে আনন্দ রূপটুকু উপভোগ করছিল।

প্রভা তার তাকিয়ে থাকা দেখে বিরক্তি প্রকাশ করলো, সমস্ত প্রতিমায় অজস্র ফাটাফুটি— একটা বিস্ময় জাগলো আনন্দর মনে। একইসঙ্গে সে নিজেকে জিগ্যেস করলো, আমাকে কি ইতর লোচ্চার মতো দেখাচ্ছে?

সব এভাবে ভেঙে যায় কেন?

কিংবা, সুন্দরকে বাঁচাতে পারি না কেন?

ভাবনাটা-যে আনন্দর প্রথম, তা নয়, কিন্তু আজ তাকে অস্থির ক'রে তুললো— তার আকাঙ্ক্ষিত আলো, ইঙ্গিত রূপদীপ্তি তো প্রভা-তে রয়েছে, তবে কেন বঞ্চিত সে?

আনন্দ উঠে, হয়তো আশা করছিল— প্রভা বলবে, উঠলে যে!— বলার সময়টুকু আন্দাজ মতো মন্থর হেঁটে পার ক'রে, দ্রুত গলিতে পা রাখলো। কোথাকার এক তুলোর মতো রোমশ সাদা বেড়াল, প্রায়ই আসে তাদের বাড়িতে, ঘুরে বেড়ায়— তাকে দেখে চমকে ছুটে পালালো— তার পালানোর পথটাকে সে অনুসরণ করতে গিয়ে বেড়ালটাকেই

হারিয়ে ফেললো। বড়রাস্তার ফুটপাথে এসে দাঁড়াতেই অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখলো সে— পার্কের কৃষ্ণচূড়া গাছটার দুটো ডালের ফাঁকে চাঁদ আটকে আছে, যেন সেই বেড়ালটা নিজের শরীরের মধ্যে মুখ গুঁজে কেমন ঘুমুচ্ছে।

চাঁদ দেখতে-দেখতে আনন্দর বুদ্ধদেবের কথা মনে পড়লো, ইতিহাসের বইয়ে দেখা কঙ্কালসার ধ্যানমগ্ন মূর্তি আর পরমান্নর থালা হাতে সুজাতা; আর মার— পৃথিবীর শুভার্থে সব ধ্যান-তপস্যার বিরোধী শক্তি কি শয়তান, শয়তান কি কেবল নারীর আত্মায় ঢুকে পড়ে? প্রেম-যৌনতার মোহ-মায়া সৃষ্টি ক'রে তাপসকে বিপথগামী করে? তাহলে সুজাতা, এথেনা— সিদ্ধার্থের সিদ্ধি সুজাতা নয় কি? প্রমিথিউসের সাফল্য এথেনা ছাড়া সম্ভব হতো না। এই শিল্পসত্য জীবনসত্য হ'তে পারে— এই বিশ্বাস যার, সে-ই একা, অবাস্তব হয়ে যায়— তারপর সে তার আত্মাকে বিক্রি ক'রে দেয় শয়তানের কাছে?

শয়তান কেন সৎ-সুন্দর আত্মা খেতে ভালোবাসে? সে এতক্ষণ চাঁদের দিকেই যেন তাকিয়েছিল, ভাবছিল। এখন কেমন ক্লান্তবোধ ক'রে দেখলো চাঁদ ঘনপাতার আড়ালে ঝিলিক তুলছে। এসব প্রশ্নের যেন মীমাংসা নেই। কেবল বিশ্বাস করা যায়। তবু মীমাংসার চেষ্টা তো আছে— ফাউস্ট থিম্ নিয়ে বিগত সাড়ে তিনশ বছর ধ'রে শিল্পীরা কাজ তো ক'রে যাচ্ছেন। আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'কিন্তু কী আশ্চর্য! শিল্পীরাই আক্রান্ত হচ্ছেন বার বার!'

কৃষ্ণচূড়ার মাথা ছাড়িয়ে চাঁদ এখন বিশাল আকাশে রজতশুভ্র টিপ হয়ে আছে। আনন্দ চাঁদের দিকে হাত বাড়ালো, তর্জনীর ডগায় চাঁদটিকে যেন তুলে নিলো—

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি...

মাঝেমধ্যে নিজেকে কেমন দুর্বোধ্য লাগে আনন্দর, কখনও চারপাশটা, বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি জটলার মধ্যে, গতির মধ্যে দিশাহারা হয়ে পড়ে। বিরক্তি লাগে, ক্লান্ত মনে হয়।

ক্লান্তভাবে পথ হাঁটছিল আনন্দ। কথা বলছিল নিজের সঙ্গে। তবে কি আমিও নাগরিক জীবনের অবসাদে আক্রান্ত? আর এই অবসাদে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আমি ফের কবিতা লিখতে পারবো? তখন আমি নির্জনতার কবি থেকে নাগরিক অবসাদের কবি হবো!

নিজেকে কেমন অধঃপতিত প্রাণী মনে হয়, তবু ছায়া-ছায়া প্রেমানুভব, কেমন যেন আগুনের মতো অকৃত্রিম, কেবল দহন টের পাই, আলো নেই—

মানুষের কাজকর্ম, বিচার-ব্যবহার দেখে কী মনে হচ্ছে জানো?

কী?

মানুষের সমস্ত জ্ঞান— ক্ষমতার লালসায় অহেতুক বস্তুপুঞ্জে কেমন যেন হিম হয়ে গেছে, একটা ধোঁয়াটে অবয়ব,— অথচ তা সূর্য-নক্ষত্রের মতো নিরুপম ছিল।

অথচ আমার চিরকালীন আকাঙ্ক্ষা— প্রেম; জ্ঞান প্রেম হোক— এমনই চেয়েছি আমি।

আনন্দ আকাশের দিকে তাকালো। বেরিয়েছিল সে কাজের জন্য তদ্বির-তদারকি করতে। দু'-এক জায়গায় নানান উপদেশ শুনে নিজেকে আরও একবার এ-পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অযোগ্য মনে ক'রে, তবু বেঁচে থাকতে হবে এই ভাবনায় বিব্রত হয়ে, নিজেকে ক্লান্ত অবসন্ন মনে করতে-করতে ফের সে কবিত্ব ক'রে বসলো, প্রেম এলো— জ্ঞানকে প্রসারিত করলো প্রেমে; তারপর খেই হারিয়ে আকাশ দেখলো, যেন আকাশবাণী শুনতে পাবে, কিন্তু সে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখলো— এক ভিড় সাদা হাঁসের উড়ে যাওয়া, নাকি বিভ্রম; যদিও আষাঢ়, মেঘলা দিন— নাগরিক আকাশ পেরিয়ে জলাভূমির দিকে উড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়; অনেক বছর আগে লেখা একটা কবিতার কথা মনে পড়লো— তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখায় তোমার রক্তের স্পন্দন... এসব স্বপ্ন-পরিভাষা কেউ বুঝলো না কিংবা বুঝেছে, বুঝেছে ব'লেই দূরে স'রে গেছে বনি। জ্যোতির্ময়ী কি কখনও কাছে এসেছিল? বিভ্রম? এইসব মধুর বিভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকা কিংবা বনির ছ'-মাসের ভালোবাসাকে অনন্তকাল ধ'রে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষায় প্রভার অপ্রেমকে উপেক্ষা করার জোর পাওয়া গেছে ব'লে আজও তাকে লালন করা; তবু এসে-যাওয়া এ-যুগের অবসাদে কোনো নারীর দিকে মন চ'লে যায়; মৃত মনিয়া আজও পাশে পাশে হাঁটে, তখন মনে হয়, সেই পাখিদের প্রেম এখনও মানুষের ছায়াপ্রেমে আলো দিতে পারে।

তব, হতাশ ভঙ্গিতে আনন্দর মাথাটা মৃদু আন্দোলিত হলো। খুব তেষ্টা পেয়েছে। তৃষ্ণার্ত কাকের গল্পটা মনে পড়লো তার। উদ্যোগ-অধ্যাবসায় এসব টিকে থাকবার পক্ষে খুবই জরুরি। কিন্তু এই মুহূর্তে ডানা থাকলে বেশ হতো। আনন্দ ফের আকাশের দিকে

তাকালো। মেঘ গাঢ় হচ্ছে। বৃষ্টি হবে ব'লে মনে হয় না। মনটাও এরকম মেঘলা। এ-সব মেঘের মধ্যে বজ্রমাণিক রয়েছে। তুমি কি তা টের পাচ্ছো নিজের মধ্যে?

না। আমি ভাবছি অন্য কথা— কেন বেঁচে আছি, বাঁচতে চাই? তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে কিন্তু জল খুঁজছি না কেন আমি? কিছুক্ষণ আগে প্রচুর ঘাম হচ্ছিল। এখন কেমন ভিজে-ভিজে। আমি এভাবে ছুটে বেড়াচ্ছি কেন? কোথায় পৌঁছুতে চাইছি?

একজনের ধাক্কায় তার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল, কিন্তু খেই ধ'রে আনন্দ ভাবতে পারলো, তার জীবন বড় মন্থর, গতির নেশা না-থাকলে ছিট্‌কে পড়তে হবে— পড়ার ভয়ে যেন সে আর-একটু বাঁ-দিক ঘেঁষে চলতে শুরু করলো।

তাহলে গতির বাইরে থাকা মানুষের কী হবে? 'প্রগতির পরিসরে এদের টেনে আনতে হবে'— কে যেন বলেছিল কথাটা। বিষ্ণু? সুধীন? হ'তে পারে সঞ্জয়!

ভাবনাটায় কোনো সত্য আছে ব'লে আনন্দর মনে হলো না— থাকলে প্রগতিপন্থীদের মধ্যে এত দলাদলি থাকতো না। এরকম একটা যুক্তি রেখে সে ভাবলো, কোনো পরাগতির কথা কি ভাবা যেতে পারে?

বাড়ি ফিরে আনন্দ একটা চিঠি পেলো। এক কবি-পাঠক চিঠিটা লিখেছে। নতুন বইটা প'ড়ে এই প্রথম কেউ চিঠি লিখলো। এখনও কোথাও রিভিয়্যু হয়নি। তার পুরনো কবি-বন্ধুদের কাছ থেকেও তেমন সাড়া পায়নি। ফলে এই চিঠিটা তাকে মুগ্ধ করলো। কৃতার্থ হলো সে। নিজের কল্পনাশক্তি আর অন্তর্দৃষ্টির প্রতি তার বিশ্বাস ফিরে এলো— এই কল্পনা আর অন্তর্দৃষ্টিই এই তরুণ-কবিকে মুগ্ধ করেছে, অভিভূত করেছে— চাপা গুমোট আবহাওয়া কেটে যাওয়ার মতো অদ্ভুত এক তৃপ্তি অনুভব করলো আনন্দ।

মেঝেয় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বইয়ের স্তূপ থেকে বইটা সে টেনে নিলো। প্রচ্ছদপট দেখলো। সাতটি উজ্জ্বল নক্ষত্র— সত্যজিৎ ছেলেটি এঁকেছে বেশ। এই প্রথম বই লিখে একশ টাকা পাওয়া গেছে, আজ এই চিঠি—

বই বুকের ওপর রেখে আনন্দ শুয়ে পড়লো। শুয়ে-শুয়ে চিঠিটা আরও একবার পড়লো।

একজন কবির চিঠি। তরুণ কবি।

অভিভূত— একথার কী মানে, ব্যবহারিক কোন্ প্রয়োজনে লাগবে, তার, আমার?

বরং কেউ যদি বলতো, আপনার কবিতা প'ড়ে আমি অভিভূত, শুনলাম আপনি একটা কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আপনার কাজই তো কবিতা লেখা— কাজ খুঁজতে হবে না, কবিতা লিখুন, আমি আছি।

পরিহাসের এক চিলতে হাসি ফুটে উঠলো ঠোঁটের কোণে।

সকল অজ্ঞান কবে জ্ঞান আলো হবে,
সকল লোভের চেয়ে সৎ হবে না কি
সব মানুষের তরে সব মানুষের ভালোবাসা।

কয়েক বছর আগে, সপরিবারে হত্যা-আত্মহত্যার কথা যখন ভাবছিল আনন্দ, তখন ট্র্যাঙ্কের এই খাতাগুলো ছিল তার পিছুটান— এগুলোর একটা বিহিত-ব্যবস্থা না-ক'রে তার ম'রে যাওয়া সম্ভব না, এই বোধই তাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। খাতার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে— গদ্যের খাতাগুলো আলাদা ক'রে রাখা, এগুলো সম্পর্কে খুব একটা মায়া-মমতা নেই— তবু এগুলো প্রকাশ পেলে একটু ভালো লাগতো। হয়তো কিছু উপার্জন হতো। প্রতিভা-নীহারদের মতো। দু'-একজনকে সে বলেছেও, যদি কেউ ছাপতে চায় একটু খোঁজ- খবর দিতে।

ক'দিন আগে কথায়-কথায় বুদ্ধদেব বলছিল, 'আপনার তিনের দশকে লেখা কবিতাগুলো সব ছাপা হয়ে গেছে? দেখবেন তো, ওই সময়ের কোনো কবিতা অপ্রকাশিত আছে কিনা। থাকলে দেবেন।'

আনন্দ একটু অবাক হয়েছিল। মহাপৃথিবী বুদ্ধদেবের ভালো লাগেনি। সেকথা অকপটে লিখেছিল বুদ্ধদেব। তার কাগজেই। তারপর থেকে তার কাগজে আজ পর্যন্ত মাত্র একটি কবিতা ছাপা হয়েছে। বুদ্ধদেব চায়নি। কবিতা দিতে বলেনি। আবার বলছে এতদিন পর। —আনন্দ কবিতার খাতাগুলো বের করলো।

গুপ্তধন পাওয়ার মতো চমকে উঠলো সে। আঃ! তখন নিজেকে আর মানুষ ব'লে মনে হচ্ছে না। কিন্তু প্রবল সঙ্গমেচ্ছা, কুকুর-বেড়ালের চেয়েও নিজেকে অধম মনে হচ্ছে— বেঁচে থাকার কোথাও কোনো মানে নেই— সমস্ত দিনমান নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে যেন রাত্রির খোঁজে; রাত্রির আকাশের চাঁদ কী যেন বলতে চেয়েছে তাকে, সপ্তর্ষি-কালপুরুষ, লুব্ধক বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকে লক্ষ করছে— বুঝতে পেরে সে আকাশের দিকে তাকায়নি। ক্লান্তি আছে, অবসাদ আছে, কিন্তু ঘুম নেই; যদি ঘুম আসে, সে প্রার্থনা করেছে— আর যেন তাকে জেগে উঠতে না-হয়। তবু ঘুম ভেঙেছে— যেসব কাকলি-কূজন, ডাক, ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শ্রুতিমধুর, নান্দনিক মনে হতো এক সময়, তখন জেগে ওঠার পর আনন্দর মনে হয়েছে শুয়োর নিধন চলছে, চারিদিকে হননোৎসব; তখন আনন্দ এই কবিতাটি লিখেছিল—

হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে আবার ঘুমোতে চেয়েছিলাম আমি, অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছিলাম...

তবু জেগে উঠে আরও এতটা পথ— ধানসিড়ি কীর্তিনাশার দেশ ছেড়ে আজ এই বাসাবাড়ি— এ-কবিতার আজ আর কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই জীবনে, তবু কেমন এক মায়া যেন; 'কবিতা' পত্রিকায় জমা দেওয়া পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে বিমর্ষ হয়েছিল তখন, এই কবিতাটি আবার পাঠিয়ে দেবার কথা ভাবলো সে। ওই সময়-পর্বের আরও কয়েকটি কবিতা পাওয়া গেল। কিন্তু আপাতত সে একটি কবিতাই পাঠাবে ব'লে ঠিক করলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতাটি কপি করার পর আনন্দ ভাবলো, কোনো ভুল বার্তা পৌঁছোবে না তো?

এখন সে একটি সংগঠনের সহ-সভাপতি। সংগঠনগতভাবে আনন্দ এর আগে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করেনি।-গত অক্টোবরে কয়েকজন তার সঙ্গে দেখা করে। তাদের সঙ্গে কথা ব'লে অধিকাংশ বিষয়ে সে সহমত পোষণ করেছিল— সত্যিই তো কোলকাতার সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলো ভিন্ন ভিন্ন নামে চালিত হ'লেও আসলে দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে আছে— কে যেন বলেছিল, নীরেন-অম্লান কেউ একজন, 'এক শিবির সনাতন ঐতিহ্যের বাহক, বস্তুত স্থিতাবস্থার পরিপোষক, প্রগতি-বিমুখ; অন্য শিবির সাহিত্যে ডিক্টেটরি নিয়ন্ত্রণের নীতিতে বিশ্বাসী, পরমত-অসহিষ্ণু, অতি উগ্র—'

—'আশ্চর্য কী জানেন, এরা সব সমাজবাদী!' —কে একজন বলেছিল। আর তার পিঠের কথাটি ছিল সন্তোষের: 'এক কথায় দক্ষিণপন্থী ও অতিবামপন্থী— এর মাঝখানে কেউ তো আছে— আমরা তাদের নিয়ে একটা সংগঠন গড়তে চাইছি—'

আনন্দ বলেছিল, 'বেশ তো। তা আমার কী করতে হবে?'

—'আমরা চাইছি, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন।'

সম্মতি জানিয়েছিল। ক্রমে সে জেনেছে এই সংগঠনেরও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে— সংগঠনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন একটা শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়ে আনন্দ অনুপস্থিত ছিল।

সেদিনকার সেই শুভেচ্ছাবার্তার বয়ান মনে ক'রে আনন্দ ভাবলো, জীবনের প্রয়োজনে এ-কবিতার কী মূল্য আছে? আদৌ মূল্য আছে কি?

স্বাশ্রয়ী এ-কবিতা নিশ্চয়ই স্টেটের বিরুদ্ধে যাবে না— বরং অবক্ষয়ী মূল্যবোধের কবিতা ব'লে মনে হ'তে পারে।

কবিতাটি আবারও পড়লো সে।

একটা অভিমানের সুর কি নেই?

হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া, আমাকে জাগাতে চাও কেন!

অদ্ভুত এক জীবনসংলগ্নতার ইঙ্গিত আবিষ্কৃত হয়ে গেল যেন। এবং চমৎকৃত হলো আনন্দ।

কবিতার সঙ্গে একটা নোট্ জুড়ে দিলো: 'অন্ধকার' কবিতাটি প্রায় সতেরো বছর আগে (১৩৩৯-'৪০-এ) লেখা হয়েছিল। খুব সম্ভব ১৩৪২-এ 'কবিতা'য় দিয়েছিলাম। তখন ছাপানো হয়নি, পরে পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছিল। আমার কাছেও কোনো কপি নেই ভেবেছিলাম। পুরনো খাতা খুঁজতে-খুঁজতে সেদিন বেরিয়ে পড়লো। সতেরো বছর আগের সেই মনোস্বভাব এখন আর নেই আমার; এরকম কবিতা আজ আর আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।

'সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রে' আনন্দ যুক্ত হয়েছে বটে, তাদের মুখপত্র 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক সে, তবু সম্পর্কের নিবিড়তা যেন গ'ড়ে উঠছে না। কেমন যেন একটা ব্যবহৃত হওয়া আর ব্যবহার করবার ঝোঁক। পরিচিতদের দু'-একজন তার রাজনৈতিক অবস্থান

গ্রহণ করবার জন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। আনন্দ বিমূঢ়ের মতো নিশ্চপ থেকেছে। এমন-কী প্রভাও একদিন বললো, 'সোস্যালিস্টদের সঙ্গে গেলে! সুবিধে করতে পারবে তো?' যেন সুবিধার জন্য কোথাও যাওয়া— রাজনীতির ব্যাপারটা ইদানিং এরকমই হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবিশ্বাস আর সন্দেহ। পলিটিক্স মানে পার্টি। আর পার্টি মানে কম্যুনিস্ট পার্টি। কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট ছাড়া আর পৃথিবী নেই যেন।

আনন্দ বলেছিল, 'এ-সংবাদ তুমি কোথায় পেলে?'

—'শুনছি।'

—'সোস্যালিস্টদের দিকে আমার একটা ঝোঁক ছিল, কোনো সুবিধে পাওয়ার আশায় যাইনি তো— সাহিত্যকে মুক্ত করবার একটা উদ্যোগ নিয়েছে— আমি তাদের সঙ্গে আছি মাত্র।' একটু থেমে, ভেবে, আনন্দ বলেছিল, 'এসব কথা আর কাকেই-বা বলবো, তুমি তুললে যখন, তোমাকেই বলি— ভেতর থেকে সাড়া পাচ্ছি না— একদল লোক পৃথিবীকে শোধরাবার চেষ্টা করবে। আর একদল তার বিরোধিতা করবে। সংখ্যায় তারাই বেশি— আমি সবসময় সংখ্যালঘুর দলেই থেকে গেছি, কখনও একা, একেবারেই একা— চার-পাঁচ হাজার বছর আগের জানা ইতিহাস থেকে আজ পর্যন্ত—'

—'আমার খুব অবাক লাগে— তুমি পৃথিবীর ভালো ভাবো, এই সংসারটার জন্য যদি একটু ভাবতে, রঞ্জু-মঞ্জুর জন্যে!'

—'ভাবি না কে বললো তোমাকে? এই-যে আবার এল.আই.সি.'র এজেণ্ট হলাম, এ আমার দ্বারা হবে না তবু তো চেষ্টা ক'রে যাচ্ছি— আচ্ছা তোমার কি মনে হয় আমি খুব সুখে আছি, আনন্দে আছি?' প্রভা নীরব ছিল। আনন্দকে যেন তখন কথায় পেয়েছিল, 'তোমার দিদি-জামাইবাবুরা এখনও এক বিছানায় শোয়। এ-পৃথিবীর কত বিয়ে ভেঙে গেছে, যাচ্ছে প্রতিদিন— আমরা কিন্তু বেশ টিকে আছি, বিবাহিত তবু বিবাহিতের মতো নই— এ-পৃথিবীর একটা বিড়াল-বিড়ালি যে-জীবন পায়, অনেক মানুষই তা পায় না— তব, মনুষ্যজন্ম বড় দুর্লভ জন্ম— এরকমই তো শুনি, না?'

—'এইজন্যে তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না।'

—'আমি খারাপ কী বললাম!' একটু স্মৃতিমনস্ক থেকে বললো, 'আমাদের জীবনে সবচে' সার্থক সঙ্গমের দিনটির কথা মনে আছে তোমার?'

—'এসব আবার কেউ মনে রাখে নাকি?'

—'জানি না, আমার মনে আছে— যেদিন আমি বি.এম. কলেজে চাকরি পেলাম, সেদিন— আমি আজও স্বপ্নে সেদিনটাকে দেখতে পাহ, যেমন দেখতে পাই সর্বানন্দ ভবনের গাছপালা— কীর্তনখোলা নদী, আমি হেঁটে যাচ্ছি, তেমনই সঙ্গম-দৃশ্যটি— দেখতে পাই—'

—'বাব্বা মাথা ধ'রে গেল— কী বললাম আর কী শোনালে!'

আনন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে, যেন এখনই সে প্রভার সামনে থেকে উঠে দাঁড়ালো।

ধনের অদেয় কিছু নেই, সেই সবই
জানে এ খণ্ডিত রক্ত বণিক পৃথিবী,

ইদানিং মাঝেমধ্যে মণিকার একটা কথা মনে পড়ে আনন্দর— 'তুমি কি বোঝো মিলুদা, তুমি একটা গোঁয়ার?' —এখন সে বোঝে অন্তর্লীন একটা গোঁয়ার্তুমি তার আছে, নইলে জীবনটা এমন বিড়ম্বিত হতো না। মণিকা ঠিকই বলেছিল, 'তুমি অ্যাডজাস্ট করতে জানো না।' অশোক দিল্লির মিলিটারি ট্রেনিং কলেজে একটা ব্যবস্থা করেছে। গেলেই চাকরিটা হয়ে যাবে। এই অনুষঙ্গেও মণিকার কথা মনে পড়ছে— মনে পড়ছে রামযশের তিক্ত অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতার নবীকরণ হোক— যেন আবারও এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে ডুবে যাওয়া— হওয়াটাই স্বাভাবিক যদি-না সে তার বাঙালিত্ব ছাড়ে; এই ছাড়াটাই বেঁচে থাকার সাপেক্ষে মণিকার ভাষায় অ্যাডজাস্ট করা— মানিয়ে নেওয়া।

আনন্দর ভাবনার মধ্যে তার শরীরে নানারকম ভাব-ভঙ্গি ফুটে উঠছিল। প্রভা লক্ষ করছিল। আনন্দ খেয়াল করেনি। প্রভা ব'লে উঠলো, 'নিজের মনে কী এত ভেবে চলেছো! পাগল হ'তে খুব আর বাকি নেই তোমার।'

প্রভার কথা গায়ে না-মেখে আনন্দ বললো, 'ভেবলুকে লিখে দিচ্ছি— এ বয়সে আর দিল্লিতে যাবো না।'

—'এ ভুল তুমি করতে পারো না—'

—'দ্যাখো, শরীরটা আমার ভালো নেই— হাই সুগার, প্রেসার— দিল্লি গেলে বাঁচবো না।'

—'দিল্লিতে হাই সুগার-প্রেসারের মানুষ বাঁচছে না— এ-খবর তুমি কোথায় পেলে?'

—'তোমরা থাকবে এখানে— টেনশন, টেনশন—'

—'যা খুশি করো! আমি কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত থেকে নড়ছি না।'

—'কীসের?'

—'এই সেশনে আমি বি.টি.-তে ভর্তি হবো।'

আনন্দ প্রভার মুখের দিকে কেমন অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকলো। ভর্তি হওয়ার জন্য আনুমানিক খরচা, বইপত্র— হিসেব ক'রে সে মাথাটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে ব'সে থাকলো। দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল প্রভা, তার চ'লে যাওয়া টের পেলো আনন্দ। কিন্তু খুবই অস্তিত্বময়ী হয়ে প্রভা তার কল্পনায় এসে দাঁড়ালো। এই মেয়েটির বয়েস বিয়াল্লিশ-তিতাল্লিশ, নতুন ক'রে শুরু করার পক্ষে এখনও যথেষ্ট সময় আছে।

কমলা গার্লসে এক বছর চাকরি করায়, হাতে পয়সাকড়ি থাকলে জীবনটাকে যে উপভোগ করা যায় তার একটা স্বাদ সে পেয়েছে।

প্রভা ফিরে এসে বললো, 'তুমি কখনোই চাওনি আমি নিজের পায়ে দাঁড়াই।'

আনন্দ মাথাটা তুলে প্রভাকে দেখলো। দুর্বোধ্য লাগছে। সে বললো, 'আমার নীতি— একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যা উচিত ব'লে মনে করবে তা-ই করবে, আমার চাওয়া-না-চাওয়া কোনো বিষয় নয় সেখানে—'

—'এটা বিষয় করা উচিত।'

আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে প্রভা। সে বললো, 'একজন যা উচিত মনে করছে, কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে— তা একটা মানুষের সারা জীবনের ক্ষতি ক'রে দিতে পারে।' আনন্দ এবার মুগ্ধ, বললো, 'ঠিক বলেছো। একশ ভাগ ঠিক।'

—'এখন বলছো ঠিক, সেদিন কিন্তু ঠিক মনে করোনি।'

আবারও কুয়াশা। আনন্দ বললো, 'কোন্ দিনটার কথা বলছো বলো তো?'

—'আমি যেবার বি.এ. পরীক্ষা দিচ্ছি— ইতিহাস পরীক্ষার দিন—'

আনন্দর মনে পড়লো। সেদিন প্রভার শরীর খারাপ লাগছিল। সে পরীক্ষা দিতে চায়নি। বোধহয় বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল। কেউ একজন সিনিয়র অধ্যাপক প্রভাকে তার কাছে নিয়ে এলে প্রভা বলেছিল, 'আমি পরীক্ষা দেবো না, বাড়ি যাবো।' আনন্দ স্পষ্ট মনে করতে পারছে, সে বলেছিল, 'ইচ্ছে না-করলে দিও না, শরীর খারাপ লাগলে বাড়ি যাওয়াই তো উচিত।'

—'মনে পড়ছে?'

আনন্দ মাথা কাত্ করলো।

—'তুমি জোর করতে পারতে— এইচ. জি. জোর করেছিলেন ব'লেই আজ নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ অন্তত পাচ্ছি— এতদিন তো দেখছি, আসলে জোর খাটাবার সাহস নেই তোমার।'

আনন্দর যেন কিছু বলার নেই— এরকম একটা ভাব ফুটিয়ে সে ভাবছিল, এটাকে বোধহয় পৌরুষের অভাব বলে। জোর খাটানোর মধ্যে যে একটা দমনের ব্যাপার থাকে— দমন-পীড়ন...

একটা ভাবনার মধ্যে ঢুকে পড়ছিল আনন্দ, প্রভা বললো, 'নিনির সঙ্গে কথা বলেছি, ওর কলেজেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুমি টাকার ব্যবস্থা করো!'

—'সে না-হয় টাকার ব্যবস্থা করা গেল, কিন্তু আমি ভাবছিলাম—'

—'কী?'

—'বি.টি. পড়ার বায়না কি ঠিক হচ্ছে?'

—'বায়না বলছো কেন?'

—'যা একখানা রোগ বাধিয়েছো তুমি!'

—'বুঝলাম না।'

—'ডাক্তারবাবুর কথাটা মনে আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তিনি তো অনেক কথাই বলেছেন— কোন্ কথাটা?'

—'উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা উত্তেজনা— দৌড়ঝাঁপ, এসব থেকে দূরে থাকতে হবে।'

—'এগুলো আমৃত্যু মানুষের সাথী— কী শান্ত-নিস্তরঙ্গ জীবন তুমি আমাকে দিয়েছো যে... মুখ ঝামটা দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল প্রভা।

আনন্দ বললো, 'কলেজে ভর্তি হ'লে ওগুলো আরও বৃদ্ধি পাবে!'

—'তা না-হয় পেলো— তাতে তোমার কী এসে গেল?'

—'আমার আর কী— ভুগবে তো তুমি, ক্লাস করতে পারবে না—'

—'সে আমি বুঝবো। আচ্ছা, তোমার মতলবখানা কী বলো তো? এত ব্যাগড়া মারছো কেন?'

আনন্দ চট্ ক'রে কিছু বলতে পারলো না।

—'টাকার সমস্যা—'

—'না, ও হয়ে যাবে।' ব'লে আনন্দ বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

এমনিতেই নানা সমস্যায় টাকার দরকার— ধার-দেনা করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কার কাছে হাত পাতবে? কোন্ ভরসায় তাকে পরিচিত জনেরা ধার দেবে? লেখা বিক্রি ক'রে টাকা পাওয়া খুব মুশকিল। কবিতা লিখে আর ক'টাকা পাওয়া যায়? যাদের কাছে গল্প-উপন্যাসের কথা বলেছে, কেউ উৎসাহ দেখায়নি, অনেকেই হয়তো ভুলে গেছে। এক সঞ্জয় তাকে কিছুটা হ'লেও সহযোগিতা করছে— আনন্দ ভাবলো সঞ্জয়কেই সে বলবে। সঞ্জয় একবার আনন্দকে জীবনস্মৃতি লেখবার কথা বলেছিল। কী তার জীবন, কী-ই-বা স্মৃতি, লেখার অনীহা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু কীভাবে টাকাটা চাইবে, মনে মনে তার একটা মহড়া চলছে; স্থান: পূর্ব্বাশার অফিসঘর, সময়: দুপুর।

আনন্দ খুব ঠেকে পড়েছি, তাই এই অসময়ে আসতে হলো।

সঞ্জয় কী হয়েছে?

আনন্দ সে অনেক কিছু।

সঞ্জয় যেমন?

আনন্দ পরে বলবো।

সঞ্জয় তা আমি কী করতে পারি?

আনন্দ চার-পাঁচশ টাকার একটু ব্যবস্থা ক'রে দিন।

সঞ্জয়

আনন্দ লেখা দিয়ে আপনার সব টাকা শোধ ক'রে দেবো।

সঞ্জয়

আনন্দ আপনি জীবনস্মৃতি লিখতে বলেছিলেন। লিখবো ভেবেছি। আশ্বিন-কার্তিক মাস থেকে পূর্ব্বাশার পাঠক ধারাবাহিক পড়তে পারবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঞ্জয়

আনন্দ   আপনি যদি চান, আমার একটা উপন্যাসও ছাপতে পারেন, অবশ্য ছদ্মনামে।

সঞ্জয়

আনন্দ   অবশ্য আমি ক্যাশেও শোধ দিতে পারবো, তবে একটু দেরি হবে।

মহড়া খুব একটা আশাব্যঞ্জক মনে হলো না আনন্দর। কথার পিঠে কথা উঠতেই পারে— বরং একটা চিঠি লেখার কথা ভাবলো সে।

চিঠির সঙ্গে কয়েকটি কবিতা অন্তত পাঠানো উচিত। সেইমতো সে কতগুলো অপ্রকাশিত কবিতা বাছাই করলো। তারপর চিঠির খসড়া। মোটামুটি মহড়ার কথাগুলো সাজিয়েগুছিয়ে লিখলো। কবিতা পাঠানোর বিষয়টি প্রথমেই উল্লেখ করেছে। শেষে সে লিখলো: কবিতাগুলোর সবই এক সময়ে লেখা নয়। কবিতা বেছেই পাঠিয়েছি, তবু যদি কিছু অপছন্দ হয়— আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। কবিতা আপনার সুবিধামতো পূর্ব্বাশায় কিংবা অন্য কোনো ভালো পত্রিকায় (উপযুক্ত টাকা দিলে ও মর্যাদা রাখলে) ছাপতে পারেন।

AMARBOI.COM

ঈশ্বর স্খলিত হয়ে গেছে— তবু মানুষের স্বভাবের গভীরতা আছে
প্রেম চায়, ন্যায় চায়, জ্ঞান চায়—

একবার আনন্দর নিজেকে 'ফাউস্ট' মনে হয়েছিল। তখন সদ্য-সদ্য সে টমাস মানের সাম্প্রতিক সৃষ্টি ডক্টর ফস্টাস শেষ করেছে। মান অনেকদিন থেকেই তার প্রিয় লেখক। তাঁর প্রতি তার মুগ্ধতা শ্রদ্ধা প্রকাশের একটা সুযোগ এসে গেছিল। চতুরঙ্গে ডক্টর ফস্টাসের আলোচনা লিখতে হবে। সেই কারণে গ্যেটের ফাউস্ট তাকে পড়তে হয়েছিল।

মানের 'ফাউস্ট' আড্রিয়ান লেফেরকুনের মধ্যে কখনও-কখনও সে নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল— লেফেরকুন তারই মতো কিংবা সে তার মতো— নিঃস্বার্থ, উদাস, বিমর্ষ; এবং মার্লোর 'ফাউস্ট', এমন-কী গ্যেটের ফাউস্টের সঙ্গে লেফেরকুনের খুব একটা সাদৃশ্য আছে ব'লে তার মনে হয়নি— সব-চেয়েছির মাৎসর্য লেফেরকুনের ছিল না, এখানেই তার সঙ্গে আনন্দর সবচে' বড় মিল, মনে-মনে সেও পৃথিবীর শুভেচ্ছু এক মানুষ। আর হয়তো মানুষ ব'লেহ, আনন্দ গ্যেটের মেফিস্টোফিলিসের সমর্থক হয়ে পড়েছে কখনও-কখনও— ঈশ্বরের 'সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি' মানুষ! মানুষ পশুরও অধম।

নিজেকেও তার পশু মনে হয়েছে— আকাঙ্ক্ষা-আসক্তি থেকে আত্মাকে তো দূরে রাখতে পারেনি— এখনও পুরনো পথ তাকে টানে, অনেক আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে পরিচিত কোনো-কোনো রমণীর সান্নিধ্য পেলে।

এরকম 'ফাউস্ট'-ঘোরের মধ্যে থাকার সময় একদিন, বাণীকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল আনন্দ, পথে বাণী রজনীগন্ধা কিনলো। বাড়ি গিয়ে ফুলদানিতে সেগুলো সাজিয়ে রাখতে-রাখতে বাণী বললো, 'আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?' আর তখনই তার মনে পড়লো, গ্যেটের 'ফাউস্ট'— হাইনরিশ-কে এমনই প্শ্ন করেছিল মার্গারেট। কয়েক মুহূর্ত বাণীর মুখের দিকে আনন্দ কেমন এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তার মনে পড়ছিল হাইনরিশের কথাগুলো। তার দৃষ্টি বাণীর মুখ থেকে অন্য কোথাও উধাও:

Who dare express Him?
And who profess Him
Saying I believe in Him!
Who, feeling, seeing,
Deny His being.

তবে কি আমি স্বাধীনতাযুদ্ধোত্তর ফাউস্ট?

বাণীকে দেখলো একবার। বাণী কি মার্গারেটের মতো কেউ?

—'কী হলো?'

আনন্দ যেন একটু চমকে উঠেছিল। ভুল— ভুল— এমন একটা ভাব ছিল তার মাথা নাড়ানোতে; বলেছিল, 'আমি মানুষের শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাস করি।'

আর আজ তার মনে হলো, যদি আমি 'ফাউস্ট' হতাম!

পূর্ব্বাশার অফিস থেকে বেরিয়ে যেন দিশাশূন্য হয়ে পড়েছে আনন্দ। অনেকক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে বিক্রি করবার কোনো জায়গা নেই!

সঞ্জয় অবশ্য কবিতা-পাঁচটা রেখে দিয়েছে। সঞ্জয়ের মুখখানা কী করুণ দেখাচ্ছিল! —'আনন্দবাব, ভুল বুঝবেন না, আপনাকে টাকাটা দিতে পারলে, নিজেই খুশি হতাম— কী-যে খারাপ লাগছে।'

তখন আনন্দর খুব খারাপ লাগছিল। এভাবে কাউকে বিব্রত করা ঠিক না।

তব, আর কার কাছে যাওয়া যায়— ভাবছিল।

চার-পাঁচশ টাকা মানে অনেক টাকা। কে দিতে পারে? প্রভাকর? আনন্দর প্রতি কেমন যেন উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে সে। 'সমকালীন সাহিত্য' সংগঠনের কাউকে কি বলা উচিত হবে?

টাকা দরকার। খুব দরকার। প্রভাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবার গৌরবটুকু অন্তত সে পেতে চায়। তার জন্য, কী না-করতে পারি আমি? শেষপর্যন্ত সে বাণীর কাছে যাবার কথা ভাবলো। মনে-মনে দৃশ্যটাকে সাজালো:

—আনন্দবাবু আপনি! আসুন! আসুন!

—খুব অকাব্যিক কারণে এসেছি।

—কিন্তু কাব্যিক হয়ে উঠবে আশা করছি। আরও কয়েকটা নতুন কবিতা লিখেছি। আপনি হবেন তার প্রথম পাঠক।

—না, শ্রোতা। —আপনি পড়বেন আগে।

তারপর কবিতা পড়তে-পড়তে, চা-জলখাবার— টুকরো টুকরো কথা— জীবন-সাহিত্য; সত্য, বিশ্বাস— এসবের মধ্যে একসময় তারা এত মশগুল হয়ে পড়বে যে, টাকার কথা আর মনেই থাকবে না। এটা ঘটতে পারে—

তাহলে প্রথমেই ব'লে ফেলবো, হ্যাঁ, এলাম— আমার কিছু টাকার দরকার— খুব দরকার।

কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারলো না।

মেঘলা আকাশ মাথায় নিয়ে আনন্দ বিকেলবেলা বেরিয়েছিল। তার চেনাপথে হাঁটলো। লেকের ধারে গিয়ে বসলো। কিন্তু ব'সে থাকতে পারলো না। গাঢ় সবুজ গাছপালা, মেঘলা আকাশ বুকে ধরা কাকচক্ষু সরোবর, হাঁস, বক— এসব তার দৃষ্টিকে টানলো বটে কিন্তু কোনো ভাব জাগালো না। ফেরার পথে বাণীর দরজায় থমকে দাঁড়ালো। কিন্তু কী ভেবে আর কড়া নাড়ালো না।

গল্পের মতো ঘটলোও না কিছু। তবু খানিকটা গিয়ে একবার ফিরে তাকালো— দরজা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানলায় কেউ নেহ, ব্যাল্‌কনি শুন্‌শান্‌, কেবল একটা শাড়ি শুকোতে দেওয়া আছে, মৃদু নড়ছে।

শেষপর্যন্ত সে নলিনীর কাছে গেল।

—'কী হয়েছে আপনার! এত উদ্‌ভ্রান্ত লাগছে?'

এমনই উদ্‌ভ্রান্ত দুপুরে ফিরে এসেছিল আনন্দ। প্রভা দরজা খুলে দিয়েছিল। তাকে কি লক্ষ করেছিল প্রভা? করলেও হয়তো খেয়াল করেনি। অথবা দেখতে-দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নিনির ওই কথায় বুকের ভিতর কীরকম একটা আলোড়ন। বললো, 'হ্যাঁ, আমার কিছু টাকা দরকার।'

—'কত টাকা?'

—'অন্তত চারশ।'

—'কবে লাগবে।'

—'দু'-একদিনের মধ্যে দিলে ভালো হয়।'

—'ঠিক আছে, আপনি কালই পেয়ে যাবেন।'

—'আমি তাহলে সন্ধের দিকে আসি।'

—'আপনাকে আসতে হবে না—'

—'না। আমিই আসবো—'

কী ভেবে নিনি বললো, 'আচ্ছা, তা-ই আসবেন!'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুলে যাব যেই সাধ যে-সাহস এনেছিল মানুষ কেবল
যাহা শুধু গ্লানি হল— কৃপা হল— নক্ষত্রের ঘৃণা হল— অন্য কোনো স্থল
পেল নাকো।

প্রভা কলেজে। রঞ্জু স্কুলে। এ-পৃথিবীর সব মানুষ কেমন কর্মচঞ্চল, ব্যস্ত। কেবল আনন্দর কোনো কাজ নেই। কাজ খোঁজাটাও একটা কাজ ব'লে মনে হতো একসময়। এখন সেই খোঁজটাও আর যেন নেই। কেবল খবরের কাগজে কর্মখালি প'ড়ে দু'-এক জায়গায় আবেদনপত্র জমা দিয়ে অপেক্ষায় থাকতে মন্দ লাগে না। তবে খুব একা লাগে এখন। কর্মহীন জীবনে সেটা স্বাভাবিক— একটা সময় কাজের খোঁজে কিংবা হতাশ হয়ে এভাবেই তাকে একা থাকতে হয়েছে— হ্যারিসন রোডের বোর্ডিঙে, সত্যানন্দ ভবনের কুটিরে। কিন্তু সেই একাকিত্বকে সে তখন উপভোগ করেছে। তার কবিতার পৃথিবী নির্জনতা চায়, নিস্তব্ধতা চায়— কিন্তু ইদানিংকার এই নির্জন-নিস্তব্ধতায় কবিতা আসে না। এই ঘরের মধ্যে ব'সে থাকতে-থাকতে মাঝেমধ্যে কেমন একটা গন্ধ পায়, খুব চেনা গন্ধ— শেষদিকে মায়ের ঘরে ঢুকলে এরকমই যেন একটা গন্ধ পাওয়া যেতো। আর ওই গন্ধের মধ্যে,— যেসব পরিচিত বন্ধুজন তার জন্য কাজের ব্যবস্থা করেছিল কিংবা সুপারিশ করেছিল কোনো কাজের জন্য— তাদের কেউ-কেউ তার সামনে এসে দাঁড়ায়। আজ, একটু আগে সত্যপ্রসন্ন এসেছিল। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের কাছে তাকে নিয়ে গেছিল সত্যপ্রসন্ন। তার একটা কাজ হ'তে পারতো। অধ্যাপনার সঙ্গে ব্যাঙ্কিং-কাজের কোনো মিল নেই। হয়তো এ-কারণে আনন্দ কোন্ কাজটা করতে পারবে, বা তার ভালো লাগবে— তার একটা আন্দাজ দিতে সত্যপ্রসন্ন তাকে অফিসের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। সত্যপ্রসন্ন কেমন করুণদৃষ্টিতে আজ বললো, কোথাও খাপ খাওয়াতে পারলে না!

—নাঃ।

—শুনলাম, কবিতাও ছেড়েছে তোমাকে?

—তাহলে তো আমি সুস্থ হয়ে যেতাম— আছে, আছে কোথাও, আমি তার ঘ্রাণ পাই—

আনন্দ ঠিক বুঝতে পারলো না সে ঘুমিয়ে পড়েছিল কিনা; সত্যপ্রসন্নর এখানে আসা সম্ভব না। সে অসুস্থ। তার চিকিৎসার কারণেই সঞ্জয় আর্থিক দিক থেকে বেকায়দায় আছে। তাহলে স্বপ্নই হবে। সত্যপ্রসন্নের আরোগ্য কামনা করলো সে।

গত দু'দিন বৃষ্টি হয়েছে। মেঘ ভাঙা রোদ্দুর এই একটু দেখা দিলো তো তক্ষুনি মিলিয়ে গেছে; আজ মেঘ খুব গাঢ়, যেন জমাট বেঁধে আছে। সূর্যের মুখ সম্ভবত দেখা যায়নি। সকাল থেকেই কেমন যেন বিকেল-বিকেল আলো। সন্ধ্যা হয়ে এলো বুঝি! রঞ্জু ফেরেনি এখনও! প্রভার অবশ্য ফিরতে দেরি হয়। ঘরের মধ্যে অন্ধকার আরও যেন জমাট বেঁধেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু কেমন রোদ্দুরের গন্ধ পাচ্ছে আনন্দ। আজ তবে সে রোদ্দুর হয়ে এসেছে, নিদাঘে সে বৃষ্টি—

—কোথায় তুমি?

—এই তো! এত বিষণ্ন কেন?

—কোনো কিছু ঠিকভাবে শুরু করতে পারিনি। যদি নতুন ক'রে সব শুরু করা যেতো আবার!

—একটা জন্ম তো প্রায় কাটিয়ে দিলে।

—কী বলছো তুমি! তবে কি তুমিই মৃত্যুর গন্ধ বয়ে আনো? আমার বাবা আশি বছরে, মা তিয়াত্তর বছরে গত হয়েছেন— আর দশটা বছর পরমায়ু কি আমি পেতে পারি না! —জানো তো, প্রভা নতুন ক'রে শুরু করেছে। আমি টের পাই— একটা আকাশ খুলে যাচ্ছে তার সামনে। আর আমি যযাতি-জরায় আক্রান্ত...
নতুন একটা কিছু শুরু করতে দাও!
আলো দাও।
আমি যদি ফাউস্ট হতাম!

—তুমি তো ঈশ্বরকে বিশ্বাস করোনি! অথচ শয়তানের বিরোধিতা করেছো আজন্ম!

—তুমি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করো?

—না-ক'রে উপায় কী বলো— সে-ই তো আমাকে অভিশপ্ত করেছে, আর শয়তানের হাতে ব্যবহৃত হ'তে-হ'তে— অথচ কী আশ্চর্য! তুমি আমাকে সাধনার বিষয় ক'রে তুলেছো!

—সিদ্ধি তো এলো না।

—তাহলে আমি কে?

—এই মুহূর্তে তুমি রৌদ্রের গন্ধ।

ঘরের মধ্যে আলো জ্ব'লে উঠলো। রঞ্জু ফিরেছে।

—'বাবা, অন্ধকারে ব'সে থাকতে তোমার ভালো লাগে?'

—'না, না তো! ঘুমোনোর সময় কি কেউ আলো জ্বেলে রেখে ঘুমোয়? আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম।'

রঞ্জু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। এই দৃষ্টিটা দেখলেই আনন্দর মনে হয় রঞ্জুর মধ্যে কোথাও একটা অস্বাভাবিকতা আছে।

থাকতেই হবে— সুন্দরী আর মূর্খের সঙ্গমে যাদের জন্ম, তাদের তো এরকমই হবার কথা!

জন্মের পর থেকেই এরা বাবা-মা'র মধ্যে সম্প্রীতির কোনো আবহাওয়া লক্ষ করেনি। স্নেহ-মমতার যে আচ্ছাদন তাদের ওপর থাকা স্বাভাবিক ছিল, তা তারা পায়নি। মঞ্জু একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ'লেও আনন্দর স্বভাব পেয়েছে, কিন্তু কবিতার প্রতি তার মায়ের বিতৃষ্ণার এত প্রকাশ সে দেখেছে যে— ওই স্বভাবকে কতখানি সে মূল্য দেবে বলা মুশকিল।

রান্নাঘরে খুট্‌খাট্‌ আওয়াজ। রঞ্জু ভাত বাড়ছে। আনন্দ মনে করার চেষ্টা করলো, তার স্কুল থেকে ফেরার বয়সে এভাবে ভাত বেড়ে খেতে হয়েছিল কিনা। তার মনে পড়লো, কতটা বয়েস পর্যন্ত তার খাওয়ার সময় কুসুমকুমারী গল্প বলতেন। আনন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

তক্ষুনি উঠে গেল রান্নাঘরের দরজায়। সে একটা গল্প বলতে চায়। রাক্ষসের প্রাণভোমরার মতো মানুষের প্রেম লুকোনো থাকে মানুষের অন্তঃসারের গভীরে— তাকে উদ্ধার ক'রে তবেই মানুষকে মানুষ হ'তে হয়— এই উপলব্ধির কথা সে রূপসম্ভব ক'রে বলতে চায়, কিন্তু কীভাবে শুরু করবে— ভেবে পাচ্ছিল না; রঞ্জু প্রথমে তাকে দেখে খাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছিল, এখন খেতে-খেতে তাকে দেখছে; একবার বলেছে, 'বাবা তুমি ঠিক কিছু-একটা ভুলে গেছ আমাকে বলতে— তাই না?' আনন্দ মাথাটা মৃদু নাড়িয়ে সায় দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই সে তার রূপকথার ভাষাটা তৈরি করতে পারলো না। তখন তার মনে পড়লো— এরকমই কতবার সে প্রভার কাছে গিয়েছে, কেবল প্রভা কেন— বনি, জ্যোতির্ময়ীদেরও কাছে— তারই উপস্থিতিতে অন্যরা এসেছে, কথা বলেছে। —জ্যোতির্ময়ী, বনি কি প্রভাকে তারা মুগ্ধ করেছে; নিজেরাও তৃপ্ত হয়ে চ'লে গেছে; আর আনন্দ তখন বলেছে, 'আচ্ছা, যাই!' সেকথায় অনুমতি চাওয়ার চেয়ে আর-একটু থেকে যাওয়ার ইচ্ছেটাই ব্যক্ত হতো বেশি, কিন্তু কেউ-ই যেন তা ধরতে পারতো না। কিংবা পারলেও আপদ বিদেয় হোক মনোভাবটাকে আড়াল করার জন্যে 'যাই' শব্দটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে তারা বিদায় জানাতো ঠোঁট আর চোখের ভাষায়; আহা যদি কেউ বলতো,— কিছুই তো বললাম না!

তখনই আমি ব'লে উঠতাম, হ্যাঁ, আমারও বলার ছিল।

কিন্তু তাতেও কি কথা জ'মে উঠতো খুব! সাহিত্যের ভাষায় কথা বলতে গিয়ে, মুখের ভাষাটাও হারিয়ে ফেলেছো—

কিন্তু এই মুহূর্তে আমি রূপকথার ভাষায় কথা বলতে চাইছি। যে-রূপকথার জগতে মৃত্যু আর শান্তির তরবারি আড়াআড়ি থাকবে না।

অথচ নাম রেখেছিলে সমর— সমরানন্দ। আকাঙ্ক্ষা লিখেছো— সে বিপ্লবী হবে।

—'বাবা তুমি ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

—'আচ্ছা খোকা, তুই নেতাজীর গল্প জানিস?'

রঞ্জু যেন মাথা কাত্‌ করলো। আনন্দ বললো, 'ঠিক আছে, তুই খেয়ে নে, আমরা আজ গল্প করবো—'

বাইরে তখন বৃষ্টি। আনন্দর কেমন শীত করতে লাগলো। নিজের ঘরে গিয়ে বসলো সে।

হৃদয়বিহীনভাবে— দশ বিশ শত কোটি টন
চলে আজ পঙ্গপাল— নিজেকে উজাড় ক'রে; জেনে
জীবন হতাশ নয় বলেই জীবন

দরজায় কেউ কড়া নাড়ছে। সবে একটা ভাবনাকে গুছিয়ে আনছিল, ঘেঁটে গেল। ঘর থেকেই সাড়া দিলো, 'কে?'

কে যেন তাকেই খুঁজছে, 'আনন্দবাবু আছেন?'

—'হ্যাঁ, আছি।' দরজা খুলে দু'হাত চৌকাঠে রেখে বললো, 'ও, আপনি!'

—'চমকে দিলাম তো!'

—'তা দিলেন। আসুন!'

আনন্দ তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো হিমাংশুভূষণকে। আনন্দ বললো, 'আমি আপাতত একা আছি—' কেমন একটা সঙ্কোচ প্রকাশ পেলো তার কথায়। কিন্তু তার কাবণটা বোধহয় হিমাংশুভূষণ ধরতে পারলো না। বললো, 'এই বর্ষার দিনে আর-সব গেলেন কোথায়?'

—'ছেলে স্কুলে। আমার স্ত্রী কলেজে— ডেভিড হেয়ারে বি.টি. পড়ছেন।'

হিমাংশুভূষণের ভ্রূ-কুঁচকানো দেখে আনন্দ বললো, 'সমস্ত সেট্-আপটা তো ভেঙে গেছে আমাদের, নতুন ক'রে আবার গড়ার চেষ্টা— ঘরের বউ বাইরে না-বেরুলে সংসার চালানো মুশকিল—'

—'হ্যাঁ, গড়াটা-যে কী কঠিন, তা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি।'

—'আপনার আসার কারণ কিন্তু বলেননি।'

—'আপনি আমাদের চিঠি পাননি?'

—'পেয়েছি।'

—'আশ্চর্য! আমি ভাবছি— চিঠি পাননি, তাই আসতে হলো। ব্যাপারটা কী বলুন তো! এতদিনে তো জয়েন করার কথা!'

—'ভাবছি।'

—'নির্দিষ্ট সময় তো পেরিয়ে গেছে— এখনও ভাবছেন?'

—'সময় পেরিয়ে গেছে, না! তাহলে তো ভাবনার আর প্রয়োজন নেই!'

—'কী ভাবছিলেন, বলুন তো!'

—'আমার কতকগুলো সমস্যা আছে— আপনারা আমার থাকার ব্যবস্থা করবেন, বলেছেন, কিন্তু ছাত্রাবাসে অনেকের সঙ্গে থাকতে পারবো কি পারবো না— এটা একটা সমস্যা; যা মাইনে দেবেন আপনারা— আলাদা ক'রে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকাও অসম্ভব— তাছাড়া সপ্তান্তে কোলকাতায় ফেরা আছে— এসব ভেবে হিসেব ক'ষে আমার আর যেতে ইচ্ছে করলো না।'

—'কী বলছেন! আপনি আমার দেশের মানুষ, বিকল্পহীন প্রথম ও একমাত্র পছন্দ আপনি!'

—'কিন্তু কী করবো, বলুন! ডায়াবেটিক পেশেন্ট, তার সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা— একটু ঘুম এলো তো 'খুট্' শব্দে চ'লে গেল— দেখছেন তো একা থাকি।'

আনন্দ যেন সিঙ্গল্ খাটের বিছানাটাকে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করালো, অন্তত চোখের কাজে সেরকমই একটা ভাব ছিল।

হিমাংশুভূষণকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সে বললো, 'আসলে কী জানেন আনন্দবাব, কলেজের বয়স এক বছর— বছরপূর্তির অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবেই আমরা অ্যাড করেছিলাম—'

—'বেশ পরিচ্ছন্ন বিজ্ঞাপন— একটা নামী কলেজ বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, মাইনে কী হবে জানানো হয়নি— এরকমই অবশ্য রীতি— গুণ অনুসারে মাইনে দেওয়া হবে, জানানো হয়— সেক্ষেত্রে আপনারা ব্যতিক্রম, বলতেই হবে!'

—'কলেজটাকে দাঁড় করাতে চাই— ইংরাজির অভিজ্ঞ শিক্ষক খুবই আবশ্যিক—'

—'কেন বলুন তো!'

—'আমার মনে হয়— কলেজের সুনাম খানিকটা নির্ভর করবে ইংরেজি শিক্ষার উপরে।'

—'গভর্ণমেণ্ট তো বলছে— পঁয়ষট্টির পর দেশে আর ইংরেজি থাকবে না!'

হিমাংশুভূষণ কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। তার মধ্যে যেন একটা হিসেবনিকেশ চলছে। কখনও একেবারে নিশ্চুপ। এবার সেরকমই এক অবস্থার মধ্য থেকে সে ব'লে উঠলো, 'আপনার আলাদা ঘরের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

আনন্দ একটু অবাক হলো।

—'হ্যাঁ, আপনি আমার দেশের মানুষ, আপনার সঙ্গে কাজ করবার সুবিধে হবে— বলুন, জয়েন করছেন কবে?'

ক্যালেণ্ডারে চোখ বুলিয়ে আনন্দ বললো, 'দু তারিখে।'

যাবার সময় হিমাংশুভূষণ বললো, 'নতুন ক'রে আর যেন ভাবতে যাবেন না।'

আনন্দ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। বাস্তবিক এ-পৃথিবীতে শিক্ষকতা ছাড়া তার আর অন্য কাজ নেই। কিছুদিন আগে উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের জন্য একটা স্কুল তৈরি করার কথা ভেবেছিল— একা নয়, সঙ্গে তারই মতো এক নবীন কবি, ভাগ্যান্বেষণে যে কোলকাতায় এসে পড়েছে, তারুণ্যের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ তবু সফল হয়নি— আর ওই হিমাংশুভূষণ, একক উদ্যোগে বরিশাল থেকে এসে, খড়্গপুরের মতো জায়গায় কলেজ প্রতিষ্ঠা ক'রে ফেলেছে।

হিমাংশুভূষণ ঝাপ্সা হয়ে যাচ্ছে, আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'কেউ কেউ পারে।'

—'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে!'

—'এক ভদ্রলোক এসেছিলেন—' ব'লে বাড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

—'কে?' পাশে চলতে-চলতে বললো প্রভা।

—'তুমি চিনবে না— হিমাংশুভূষণ সরকার, খড়্গপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, তিনি...'

প্রভার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'যে-কলেজে তুমি ইণ্টারভ্যু দিতে গিয়েছিলে?'

—'হুঁ।'

খাটের ওপর ঝোলা ব্যাগটা ফেলে হাঁপি রোগীর মতো বসলো প্রভা। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললো, 'কী ব্যাপার, তোমাকে নিশ্চয় নিচ্ছেন ওঁরা, নইলে স্বয়ং অধ্যক্ষ আসবেন কেন?'

—'হ্যাঁ। নেবে ব'লেই তো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দিয়েছিল।'

—'তাই নাকি, কই বলোনি তো!'

—'আসলে মাইনে খুব কম, তার ওপর যদি ঘরভাড়া ক'রে থাকতে হয়, আসা-যাওয়া আছে— হাতে কিছু থাকে না!'

—'কিছুই থাকে না, তা হয় নাকি?'

—'ও-ই— যৎসামান্য।'

—'তবু তো থাকবে।'

—'এত কম টাকায়— মুটে-মজদুরের সম্মানটুকু— কেমন যেন লাগে।'

—'কিন্তু প্রতিমাসে ভাই-বোনের কাছ থেকে অনুদান তো নিচ্ছো হাত পেতে।'

আনন্দ কিছু বলতে পারলো না।

—'তাছাড়া— এই তো সেদিন তুমি কাকে যেন বলছিলে, কোনো এক প্রফেসর, দেশভাগের আগে চারশ পনেরো টাকা বেতন পেতেন— এখানকার এক নামী কলেজে তাঁকে একশ পঁয়ত্রিশ টাকায় পড়াতে হচ্ছে— শুনছি তো চারদিকে, আমাদের মতো উদ্বাস্তুদের মান-সম্মানের কোনো দাম নেহ, দাম চাইতে গেলে না-খেয়ে মরতে হবে। তা, হিমাংশুবাবুকে কী বললে?'

—'বলেছি দু'-তারিখে জয়েন করছি।'

—'যাক বাবা! উঃ!'

—'কী হলো?'

প্রভার মুখে বেদনা সহ্য করার অভিব্যক্তি। তবু সে তার গ্রীবার বাঁ-পাশটা দেখালো। আনন্দ জানে এসবই তার অসুখের লক্ষণ। সে বললো, 'শুয়ে পড়ো!'

প্রভা কেমন বাধ্য মেয়ের মতো শুয়ে পড়লো। দু'চোখ বন্ধ। মুখটা শান্ত হয়ে আসছে।

—'শোনো! এক তারিখে আমি চ'লে যাবো, আমি তো থাকছি না, কখন কী ঘ'টে যায়, যদি রাস্তাঘাটে ঘটে— আমি আবারও বলছি, গলায় একটা চাকতি ঝুলিয়ে রেখো!'

কেমন করুণ-বিষণ্ণ তাকালো প্রভা।

—'চাকতিটা থাকলে মর্গ থেকে চিনে বের করতে সুবিধে হবে, এই আর কী!'

প্রভা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'তুমি নিশ্চিন্তে যাও— আমি মরছি না। আর নিতান্তই যদি মরি, খুব দ্রুত যাতে খুঁজে পাও সে-ব্যবস্থা আমি ক'রে যাবো!'

আবার পিপাসা সব ভূত হয়ে পৃথিবীর মাঠে—
অথবা গ্রহের 'পরে— ছায়া হয়ে, ভূত হয়ে ভাসে!—

প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের অপেক্ষায় ব'সে ছিল আনন্দ। হঠাৎ তার মনে হলো কেমন এক জাদুমায়ার মধ্যে ঢুকে পড়ছে সে। তার দিকে এগিয়ে আসছে এক বৃদ্ধা, ন্যুব্জ, হাতে লাঠি; মাথার চুল লালচে সাদা, মুখে অজস্র আঁকিবুকি, গাল ঢুকে গেছে মুখের মধ্যে— অবিকল সুন্দর মাসি, এখনই তার সামনে এসে বলবে, অ মিলু!

আনন্দ ধুতির খুঁটে চশমা মুছলো। চোখে দিতেই দেখলো, বৃদ্ধা হাত পেতে দাঁড়িয়েছে। আনন্দ তার মুখের দিকে তাকালো। করুণ আর্ত চাহনি।

একটা পয়সা তার হাতে দিলে হাতটা মুঠি হয়ে কপালে ঠেকলো প্রণামের মুদ্রায়।

বুড়ি চ'লে গেল কিন্তু তার সামনে সুন্দর মাসিকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেল।

সুন্দরমালা। তাদের বাড়ির ঝি। খ্রিস্টান। সাত কুলে তার কেউ ছিল কিনা, এখন আর মনে নেই। না-থাকাই স্বাভাবিক। মনিয়ার মায়ের মতো সুন্দরমালাকেও সত্যানন্দ থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন।

প্রতি রবিবার সুন্দরমালা গীর্জায় যেতো পাপ স্বীকার করতে। আনন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠলো অক্সফোর্ড মিশনের ফাদার হ্যাভোকের স্পষ্ট মূর্তি, ক্রুশবিদ্ধ যিশু আর সুন্দরমালা— সুন্দরমালার চোখে বিস্ময় আর অবিশ্বাস, সে একবার ফাদারকে দেখছে আর একবার যিশুকে; আর ফাদার তাকে আশ্বস্ত করছেন, 'প্রভু যিশু বলসেন সকোলকে প্রেম কোরটে। তাই হামিও টোমাকে প্রেম করি। সুণ্ডরমালা, সট্টিই হামি টোমাকে প্রেম করি।'

এমন প্রেমের খবর কে না জানাতে চায়, বিশেষ ক'রে যে-মানুষ কখনও ভালোবাসা পায়নি— সুন্দরমালা জনে জনে ব'লে বেড়াতো তার ভালোবাসার কথা।

ক্রমে লোকজন বলতে লাগলো:

'ফাদার হ্যাভোক সত্যিই তোমারে ভালোবাসে।'

'তুমি যদি রাজি থাকো, তাহলে তিনি বিয়েও করবেন।'

'তার আগে অবশ্য তোমার দাঁত বাঁধানো দরকার।'

আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'আমিও তার সঙ্গে মজা করেছি'— কেন যেন অনুশোচনার একটা আঁচ আনন্দ টের পেলো, একইসঙ্গে দেখতে পেলো সুন্দরমালার একটাও-দাঁত-নেই-মুখের অপূর্ব হাসি।

—আচ্ছা, প্রেমকে তুমি মজার বিষয় করতে পেরেছিলে কীভাবে?

—সেই যে, মাঝে-মাঝে আমার সকলের মতো হ'তে ইচ্ছে করে!

—এখনও করে?

—করে। কিন্তু সময় নেহ, আর হ'তে পারবো না।

বুড়িটার দিকে একবার তাকালো আনন্দ। জীবনটা যে কী!

—এক সময় তো জীবনকে প্রার্থনার গানের মতো মনে হয়েছিল!

—কেউ তো গ্রহণ করলো না!

—জীবন তবু প্রার্থনার গানের মতো!

—সেই তো প্রেমকে স্বীকার করলে।

—অস্বীকার তো করিনি কখনও।

আনন্দ চাদরটাকে বেশ জড়িয়ে নিলো। ট্রেন আসছে।

মাথার মধ্যে অজস্র কথা। কেন-যে ফুরোয় না! আনন্দ ভেবেছিল, ট্রেনে উঠে চাদর মুড়ি দিয়ে সে ব'সে থাকবে, ট্রেনের দুলুনিতে রক্তে জেগে উঠবে দোলনার স্মৃতি— দোল-দোল-দুলুনি তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। ভাবনা মতো সমস্ত আয়োজনই ছিল। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছিল। কেমন একটা হাসিতে তার ঘুম ভেঙে গেল— চোখ মেলে কোথাও সে উৎস খুঁজে পেলো না, কেবল তার সামনের সীটে মঞ্জুর বয়েসী এক মেয়েকে দেখলো— এ মেয়ে কি অমন হাসতে পারে; মুখটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে আছে!

তাহলে বোধহয় স্বপ্নই দেখছিলাম। বিরল হাসি। তখনই মনে পড়লো স্বপ্নই— প্রভা হাসছিল। প্রভা যে প্রাণের উত্তাপ ছড়িয়ে হাসতে পারে, সে-হাসিতে তার দু'চোখে ঝিলিক ওঠে, ঠোঁট হয়ে ওঠে শানিত— যদিও সে-হাসি বিরল, আনন্দ দেখেছে দু'-একবার; প্রথমবার,— ব্রজমোহন কলেজে যেদিন আনন্দ জয়েন করেছিল। দীর্ঘদিন খরার পর প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা পাতায় ফের রোদ্দুরের যে-ঝিলিক ওঠে, প্রভাকে দেখে সেদিন তেমনই মনে হয়েছিল। আনন্দ আবার চোখ বন্ধ করলো। ট্রেন দুলছে। আবারও সেই হাসির শব্দ। চোখ মেলে তাকালো। মেয়েটি হাসছে! একা! পাশের একজন মেয়েটির কাঁধে হাত রাখতেই, মুখ থেকে হাসি মুছে গেল।

কল্পনার পৃথিবীতে মেয়েটি খুশি— এটা অনুমান ক'রে আনন্দ তা'র পৃথিবীটাকে কল্পনায় ধরতে চাইলো, কিন্তু চেষ্টাটা খুব একটা এগোলো না। কেবল মনটা তার খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মনখারাপকে সে ঝেড়ে ফেলতে চাইলো। বস্তুত আনন্দ আর-এক মনখারাপের পটভূমি তৈরি করছে।

তার চিরবিষণ্ণ মুখে খুশির ঝিলিক দেখে প্রভা বলবে, হাসছো যে!

আনন্দ বলবে, আজকের দিনটা একটা বিশেষ দিন— এরকম মনে হচ্ছে; তাই কী?

—কী জানি, মনে পড়ছে না তো!

—বিশেষ দিনই— কতদিন পর তোমার কাছে এলাম।

আর ঠিক তখন প্রভা তার মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে হেসে উঠবে, চোখে উঠবে ঝিলিক, আর ঠোঁটে... কল্পনা করতেই আনন্দ শিহরিত হলো, বন্ধ জানলা খুলে আকাশ দেখতে চাইলো— নক্ষত্রের রূপালি আগুনের অনুভব যেন ছড়িয়ে পড়ছে রক্তপ্রবাহে।

কে একজন খিঁচিয়ে উঠলো, 'বাবুমশায়ের কি বড্ড গরম লাগছে!'

আনন্দ বললো, 'হ্যাঁ ভাই, আমার একটু প্রেসারের দোষ আছে।' জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলো।

কে একজন বিশেষজ্ঞের মতো বললো, 'পৃথিবীটা পাগলে ভ'রে যাচ্ছে।'

যুতসই একটা উত্তর দিতে ইচ্ছে করলেও আনন্দ উৎসাহ পেলো না।

বাড়ি ফিরে আনন্দ দেখলো প্রভা বিছানায় প'ড়ে আছে। লেপটা গলা পর্যন্ত তোলা। মাঝেমধ্যে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে। আনন্দর সমস্ত আকাঙ্ক্ষারা ম'রে গেল কিংবা বলা ভালো, ঘুমিয়ে পড়লো। প্রভার লেপের মধ্যে শোয়া হলো না তার। প্রভার মাথার কাছে একটা টুলের ওপর বসেছে সে। তার বাঁ-হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে ম্যাসাজ ক'রে দিচ্ছে। প্রভার অনুভবে— বুক থেকে ব্যথাটা উঠে হাতে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ ক'রে বাঁ-হাতে, একেবারে আঙল পর্যন্ত। প্রভা বোধহয় একটু আরাম পাচ্ছে।

আনন্দ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। গত চারদিন সে এই অবস্থায় প'ড়ে আছে। ধকল নিতে পারছে না শরীর। কেন-যে অসুস্থ অবস্থায় কলেজে ভর্তি হ'তে গেল! কতবার ডাক্তারের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে আনন্দ, 'তাড়াহুড়ো ক'রে হাঁটবে না। কোনো টেন্‌শন্‌ নেবে না।' নিশ্চয় কোনো অনিয়ম হয়েছে। মঞ্জুকে জিগ্যেস করেছে, 'কোথাও নেমন্তন্নটন্ন ছিল নাকি?' মঞ্জু জানিয়েছে,— 'না।'

ডাক্তার জানিয়েছে— এই রোগটা সাধারণত পুরুষদের হয় চল্লিশের পর— প্রভার কেন-যে হলো— তবে কি প্রভার মধ্যে পুরুষসত্তাটি প্রবল—

আনন্দর হাতটা টেনে নিয়ে প্রভা বুকে রাখলো। বুকের ভেতরের ওই ব্যথা— বাইরে থেকে উপশমের কোনো উপায় নেহ, একটু পরে বিরক্ত হয়ে হাতটা সরিয়ে দেবে— জেনেও আনন্দ তার বুকে হাত বুলাতে লাগলো, চুপ্‌সে যাওয়া স্তন, বৃন্ত ছুঁয়ে যাচ্ছিল তার হাত...

প্রভা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

মঞ্জু দরজায় দাঁড়িয়েছিল। সমর শুয়ে পড়েছে। আনন্দ বললো, 'যা! আমি আছি।'

কিছু না-ব'লেই মঞ্জু চ'লে গেল। আলো নিভিয়ে ব'সে থাকলো আনন্দ। তার পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। পা-দুটো খাটের ওপর তুলে দিয়ে লেপচাপা দিলো।

তারপর একসময় সে প্রভার লেপের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

কতবার এই নারীটিকে মেয়েমানুষ জ্ঞানে মেরে ফেলেছে, অসহনীয় অবস্থায় যেমন নিজের মৃত্যুর কথা ভেবেছে, তেমনই তার মৃত্যুকামনা করেছে— আজ যখন সত্যিই প্রভা মৃত্যুর পরিধির মধ্যে ঢুকে পড়ছে, তখন নিবিড় মমতায় তার এই পলকা জীবনে যতটুক প্রাণের উত্তাপ আছে তা ছড়িয়ে দিতে চাইছে আনন্দ; নতুন ক'রে জীবন শুরু করবার আকাঙ্ক্ষায়, স্বপ্নে— প্রভার এই-যে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া— তাকে যেন রুখে দিতে চাইছে আনন্দ। তার মনে হচ্ছে কফিনের অন্ধকারে প্রাণের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে...

সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ—

চিঠি হাতে আনন্দ কেমন জুবুথুবুর মতো ব'সে ছিল তার নিজের ঘরে। বাথরুম থেকে ফেরার পথে প্রভা আনন্দকে ওভাবে ব'সে থাকতে দেখে ক্লান্তস্বরে বললো, 'কার চিঠি?'

—'আমার। আমারই।'

প্রভা ঘরে ঢুকলো, 'খারাপ কিছু?'

নিচের ঠোঁট উল্টে অন্যমনস্ক আনন্দ মাথা নাড়লো মৃদু।

—'কী হয়েছে?' প্রভার ক্লান্তস্বরে উদ্বেগ আর আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে।

আনন্দর স্বরে অসহায়তা, 'চেয়েছিলাম ছুটি। দিয়েছে বরখাস্তের চিঠি।'

—'কী বলছো!' যেন একটা আর্তনাদ উঠে এলো।

আনন্দ নিশ্চুপ।

প্রভা খাটের ওপর বসলো, 'তখন আমি বার বার চ'লে যেতে বলেছিলাম, তা শুনলে আমার কথা!'

—'তোমাকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে পারিনি, কোনো স্বামীই তা পারে না।'

—'কিন্তু তুমি তা পেরেছিলে— ঢের আগে—' প্রভা স্মৃতিমনস্ক, 'মঞ্জু হবার সময় মরতে বসেছিলাম, হবার পরও— তুমি ছিলে আমার পাশে?'

—'তখন তো কাজের খোঁজে আমাকে বাইরে থাকতে হচ্ছিল। তাছাড়া তখন মা-বাবা দু'জনই ছিলেন— তাঁরাই তো সামলেছেন সব; এখানে কে আছে? রঞ্জু-মঞ্জুর ভরসায় তোমাকে রেখে আমি যেতে পারিনি—'

—'উচিত ছিল। আমি কিন্তু বলেছিলাম, আমার কিচ্ছু হবে না। দেখলে তো! বাঁচলাম। মরলেই ভালো হতো।'

—'কী বলছো! এসব অলক্ষুণে কথা বলতে তোমার ভালো লাগছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রভা বললো, 'এবার তো না-খেয়েই মরতে হবে।'

—'আমার কাজটাই শুধু গেছে— এখনও তো মরিনি।'

—'তুমি কখনও ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে না!'

—'ঠিকই বলেছো।'

—'কেন জানো?'

না-জানার ভঙ্গিতে আনন্দ মাথা নাড়লো।

—'প্রেম, মায়া-মমতাকে তুমি বড্ড বেশি মূল্য দিয়েছো।'

—'এগুলোকে বুঝি তুমি কম মূল্য দাও?'

—'কী জানি— আমাকে তো কখনও সিদ্ধান্ত নিতে হয়নি।'

—'কেন, এই যে বি.টি. পড়ার সিদ্ধান্তটা— তুমিই নিয়েছো।'

নিজের প্রতি মায়া-মমতা নিশ্চয়ই কম তোমার, নইলে এভাবে কেউ ভোগে?'

প্রভা চুপ ক'রে থাকলো।

—'তুমি যদি না-ভুগতে, আমি ঠিক সময়ে ফিরে যেতাম—'

—'তবু ওরা তোমাকে বরখাস্ত করতো। 'স্বরাজ'-এর ক্ষেত্রে তো দেখলাম— আসলে তুমি অকম্মার ঢেঁকি, দু'-একদিন ব্যবহার করলেই লোকে বুঝে যায় তোমাকে।'

প্রভার কি দাঁত-নখ বেরিয়ে আসছে? আনন্দ বললো, 'থাক্। কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। আবার না বাড়াবাড়ি হয়।' চিঠিটা ছুড়ে ফেলে আনন্দ উঠে দাঁড়ালো, 'তুমি বরং এখানে একটু শুয়ে নাও।'

প্রভাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তবু আনন্দ বেরিয়ে পড়লো।

আনন্দ হাঁটছে...

—কী হলো ব্যাপারটা?

—এটা হতোই— মর্নিং আর ইভিনিং— দুই শিফ্‌টে কলেজ বসিয়েও ঠিকমতো ছাত্র হচ্ছিল না, আমাকে বরখাস্ত হ'তেই হতো— কর্তৃপক্ষ অজুহাতটা আগেই পেয়ে গেছে, এই যা।

—খুব অবাক লাগে, বরিশালের মানুষ ব'লে এত খাতির-যত্ন— তারপর এভাবে ছেঁটে দিলো!

—ওসব কিছু না, আসল ব্যাপারটা হলো, তোমাকে কম পয়সায় পেয়েছিল— হয়তো তোমার চেয়ে আরও কমে কেউ রাজি হয়েছে।

—অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু আর-একটা ব্যাপারও আছে— ছাত্ররা আমাকে বোধহয় ঠিক পছন্দ করেনি। ভারী অবাক লাগে, যখন ভাবি— কারও কাছেই নিজেকে তার পছন্দের মানুষ রূপে উপস্থাপন করতে পারলাম না!

...থমকে দাঁড়ালো। কোথাও একটা কোকিল ডাকলো না? কান পেতে রাখলো। সাদার্ন অ্যাভেন্যু ধ'রে হাঁটছিল। এদিকটায় এখনও গ্রাম্য প্রকৃতি জেগে আছে। হয়তো থাকবেও অনেক কাল— লেকটা আছে ব'লেই থাকবে— হ্যাঁ ঠিকই, কোকিলই ডাকলো আবার, এই প্রথম শুনলো— কতকাল মাঘনিশীথে ডেকে ওঠা কোকিলের বিষণ্ণবিধুর ডাক শোনেনি, তখন শুনলেই তার মনে প'ড়ে যেতো— জন্মদিন আসছে; এ-পৃথিবীতে জন্মদিনের একটা মানে আছে, ছিল— তুমি আছো তাই আমি আছি, থাকবো; এই সেইদিন, তোমার আবির্ভাবের দিন, আমার উৎসবের দিন; ইস্, এবার মঞ্জুর জন্মদিনের কথা কারও মনে ছিল না! মনে করার মতো মনের অবস্থা ছিল না কারও, না প্রভার, না তার; মঞ্জুরও কি মনে পড়েনি— আজ সতেরো— আজ তো আমারই জন্মদিন, আশ্চর্য! মনে প'ড়ে গেল তো— মনে পড়বার মতো আর কেউ নেই। বাটিভর্তি জন্মদিনের পায়েস— আনন্দর জিভ ভিজে উঠলো, দু'দিন আগে মঞ্জুর জন্মদিন ছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন থেকে আমার চাকরিটি নট্ হয়ে গেছে— এ তো অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপার! এর কি কোনো প্রতীকী তাৎপর্য আছে?

ফেরার পথে আনন্দ একটা বই কিনলো। শরৎচন্দ্রের দত্তা— পুস্তানির ওপর লিখলো: মঞ্জুশ্রীর বিংশতিতম জন্মদিনে বাবা, ১৫-২-৫১।

রাস্তা পার হবার আগে ডাইনে-বাঁয়ে একবার দেখে নিলো। বালিগঞ্জের দিক থেকে একটা ট্রাম আসছে। ট্রামটা এসে দাঁড়ালো তার সামনে প্রায়। দু'জন যাত্রী নামলো। তাদের একজন প্রায়-মহিলা-হয়ে-ওঠা এক মেয়ে। যেন তার দিকেই এগিয়ে আসছে। চেনা-চেনা লাগছে যেন। যেন এখনই ব'লে উঠবে, কোথায় থাকো, সেই কখন থেকে খুঁজছি তোমাকে!

মেয়েটি তার পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল।

আনন্দ আকাশের দিকে তাকালো। আকাশটাকে আর সে ঠিকমতো দেখতে পায় না। কেমন এক ধূসরতা ছেয়ে আছে। অথচ, এমন দিনে আকাশকে সে বরাবরই নীল দেখেছে।

অনেক রাতে আনন্দ ছাদে উঠলো। দু'-একটা নক্ষত্র তার চোখে পড়লো যেন। সত্যানন্দ আর কুসুমকুমারী। আজ আমার জন্মদিন। তোমাদের কেউ ছিলাম কখনও, আজ আর কারও কেউ না আমি।

আজকের দিনটার কথা কারও মনে নেই, এমন-কী মঞ্জুরও মনে পড়েনি!

বাবা, তোমার দেওয়া সূর্যচেতনা এ-পৃথিবীতে আমাকে অযোগ্য ক'রে তুলেছে!

মা, বড় একা!

তোমাদের কাছে ডেকে নেবে মা? ডেকে নাও!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে
আবার তাহারে কেন ডেকে আন?

ঘরে কেউ ঢুকছে অনুভব ক'রে সেই-যে সঞ্জয় মুখ তুলে তাকিয়ে আনন্দকে 'বসুন' ব'লে ফের প্রুফ রিডিঙে মন দিয়েছিল সেভাবেই ঘাড় গুঁজে, চশমাটা নেমে এসেছে নাকের ডগায়; আনন্দ দেখছিল তাকে। কাজের সময় এসে মানুষকে বিরক্ত করতে আনন্দর ভালো লাগে না। তবু আসতে হয়, অন্যসময় লোকজন মেলা থাকে— নিজের কথা তখন বলা মুশকিল। আর কতকাল-যে এভাবে প্রার্থীর মতো দরজায়-দরজায় ঘুরে বেড়াতে হবে!

সময়প্রবাহে যেন গতি নেহ, সঞ্জয় কেমন প্রস্তরীভূত হয়ে আছে, আনন্দ নিজেও, মাথার ওপর ফ্যানটাও ঘুরছে মন্থর। আনন্দর হাতে ধরা ছিল সদ্যপ্রকাশিত পূর্ব্বাশা— একটু আগে সে উল্টেপাল্টে দেখছিল, হঠাৎ কখন সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল... এ-সংখ্যায় সঞ্জয় এই সময়কার বাংলা কবিতাকে বিষয় ক'রে লিখেছে... আনন্দ চোখ বোলাচ্ছিল, সঞ্জয়ের মনে হয়েছে বাংলা কবিতায় লিরিকের সুর ফিরে আসছে, এবার বিশুদ্ধ কবিতা-সৃষ্টি হবে— বিশুদ্ধ কবিতার উদাহরণ হিসেবে সঞ্জয় বনলতা সেনকে উল্লেখ করেছে...

বনলতা, বনচ্ছবি— যদি সঞ্জয়কে বাসমতীর উপাখ্যান পড়ানো যেতো, বাসমতী কি বিশুদ্ধ উপন্যাসের উদাহরণ হ'তে পারবে; অন্তত বনচ্ছবির নিরিখে তা হ'তে পারবে ব'লে আনন্দর মনে হয়— বনচ্ছবি যে বলতে পারে, 'আমারও একটা ধর্ম আছে কিন্তু সেখানে কোনো গুরু, সমাজ, এমন-কী বিজ্ঞান পর্যন্ত কোনো ঠিক নিরিখ দিতে পারছে না— কারও ওপরেই কোনো আপ্তবিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই—' অবিশ্বাস থেকে গভীরতর অবিশ্বাসে তলিয়ে যেতে তার আপত্তি নেই; নক্ষত্রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকবার মতো মন নেই সে-মেয়ের, 'আমি যা কামনা করি তাকে পেতে হ'লে নক্ষত্র আমাকে বাধা দেবে কেন?'

আনন্দর চোখের সামনে বরিশালের মাঠ-ঘাট, ক্ষেত-প্রান্তর— জোছনা মাখা হালকা কুয়াশা মেখে একটা মানুষকে সে চাঁদের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে দেখলো, দেখলো পরী নেমে আসছে, পরী নয় কিংবা পরী-হ, তার ডানা-দু'খানা খুলে রেখেছে— আর হয়ে গেছে বনচ্ছবি, কিংবা বনলতা।

—'কী, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?'

—'সুগার-লেভেল খুব বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

—'অনিয়ম করছেন?'

—'অনিয়মটাই তো নিয়ম হয়েছে— আসলে...' আনন্দ দেখলো সঞ্জয় আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেও পূর্ব্বাশা খুললো আবার। বনলতার বিশ্লেষণ পড়তে-পড়তে নিজের অজান্তেই বুকের মধ্যে ঘূর্ণি উঠলো, 'অভিজ্ঞতাই বটে।' সঞ্জয় লিখেছে:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

...বনলতা সেনের সঙ্গে কয়েকটি মুহূর্ত যাপনের অভিজ্ঞতাই এখানে ফিরে পাচ্ছেন কবি, কেন সে মুহূর্তযাপন, বা কিভাবে— তার উত্তর এখানে নেই। এ-অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবিমনের বহু-বিচিত্র অনুভব, যা স্থান ও কালের সীমা মানতে চায় না এমন সব সঞ্চয় তাদের রঙ মিশিয়ে দিচ্ছে। এ-অবস্থাটারই বর্ণনা বোদলেয়ার এভাবে করেছেন: 'There are moments of existence when time and expanse are more profound, and the sense of existence is hugely enhanced'। এমনি অবস্থায়ই 'বনলতা সেনে'র কবি উচ্চারণ করছেন: চুল তার কবেকার...

আনন্দ তার অতীত অভিজ্ঞতাটি যেন ফিরে পাচ্ছে কিংবা ফিরে যাচ্ছে সে কুড়ি-বাইশ বছর আগে

—ঈশ্বরের ইচ্ছা আমিও অনুভব করতে পারছি।

—সত্যি!

—ইয়েস! তোমার খোঁপাটা খুলে ফেল!

—এমা! কেন?

—খোলোই না— ঈশ্বরের ইচ্ছা এরকমই।

—তুমি খুলে দাও। —আমিও অনুভব করছি তাঁর নির্দেশ।

এত বছর আগের বনির কণ্ঠস্বর যেন স্পষ্ট শুনতে পেলো আনন্দ। স্মৃতির অন্ধকার ছবিঘরে আরও আলো পড়তে পারে, পড়াটা স্বাভাবিক এবং অনিবার্য— ওই অনিবার্যতাকে যেন রুখে দিতে আনন্দ চোখ মেলে তাকালো। দেখলো, সঞ্জয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অবাক।

—'স্বপ্ন দেখছিলেন?'

—'না। ভাবছিলাম। ভাবছিলাম— দারুচিনি দ্বীপটিও যদি তলিয়ে যায়! হালভাঙা নাবিক, মৃগতৃষ্ণিকার মতো মায়াদ্বীপ— ভাবছিলাম— আমার অবস্থা এখন সেরকম কিনা—'

—'কীরকম?'

—'আমি আবারও বেকার হয়ে পড়েছি।'

—'সে কী! কেন?' অনাবিল উদ্বেগ।

—'কলেজ-কর্তৃপক্ষ বরখাস্তের চিঠি ধরিয়েছে।'

—'কিন্তু কেন?' কারণটা জানা যেন খুব জরুরি।

—'আপনাকে বোধহয় বলেছি, আমার স্ত্রী ক্রনিক অ্যানজাইনার পেশেণ্ট, জানুয়ারির শেষের দিকে ফিরে দেখি খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা, তার অবস্থার কথা জানিয়ে ছুটির দরখাস্ত করেছিলাম, উত্তরপত্রে দেখলাম,— আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।'

কারণটা জেনে কিছু-একটা করার যে বাসনা ছিল তা নিমেষে উধাও হয়ে গেল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঞ্জয় নিজের মনে হতাশ ব্যঞ্জনায় মাথা নাড়িয়ে বললো, 'আপনাকে দেখে আমার কেমন যেন ভাগ্য-গ্রহ-নক্ষত্র— এসব মানতে ইচ্ছে করে।'

—'এক সময় আমারও মনে হয়েছে, মনে হতো, মানুষ-মানুষী— এ-পৃথিবীর সবই অদৃশ্য দুর্দৈবের হাতের ক্রীড়নক— অসহায়; তবু টমাস হার্ডির টেস যেকথা বলেছিল: why the sun do shine on the just and unjust alike— এই জিজ্ঞাসা, বিস্ময়ও ছিল— এখন আর ততটা হয় না— কেমন একটা সংশয় জাগে— নক্ষত্রদোষে না-হয় আমার চাকরিটা গেল, কিন্তু একটা দারুণ ঘটনাও তো ঘটেছে!'

—'কী?'

—'আমার বাক্সবন্দি পুরনো বইগুলো— ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা, এমন-কী— মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমিরের যে কয় কপি ছিল— সিগনেটে পাঠিয়েছিলাম, উদ্যোগটা অবশ্য নরেশের—'

—'গুহ?'

—'হ্যাঁ, তো ভালোই বিক্রি হয়েছে— এটা তো হলো।'

—'তার মানে রয়্যাল্‌টির টাকায় জীবন চলবে ব'লে মনে করছেন?'

—'নতুন ক'রে নয় অবশ্য— সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মহাপৃথিবীর দ্বিতীয় সংস্করণ আপনি করছেন— এ-মর্মে অবশ্য দিলীপবাবুকে আমি জানিয়েছি— তাঁকে অনুরোধ করেছি আমার নতুন একটা কবিতার বই বের করবার— দেখা যাক।'

—'কতকগুলো নতুন কবিতা দেবার কথা ছিল—'

—'খুব শিগ্‌গিরি দিয়ে দেবো—'

—'আর স্মৃতিকথা?'

—'চাকরিটা থাকলে বোধহয় লিখে ফেলতে পারতাম— দেখি, একটু অবসর পেলে শুরু করবো ভাবছি—'

—'লেখা পড়লেন?' ব'লে হাতের পত্রিকাটাকে চোখের ভাষায় ইঙ্গিত করলো সঞ্জয়।

আনন্দ মাথা কাত্‌ ক'রে জানালো যে, সে পড়েছে।

—'ঠিক লিখলাম?'

—'খুব ঠিক। তব, অভিজ্ঞতার ঘনীভূত রূপ থেকে কোনো অরূপের দিকে যাওয়ার একটা ঝোঁক বোধহয় থাকে কবিমনে— ভেবে দেখবেন তো!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

জীবনে বোধহয় একটা বাঁক আসছে; প্রতিটি বাঁকে নদী ভাঙে গড়ে— কেমন এক নিস্তরঙ্গ দুঃখী নদীর মতো জীবন এতটা বয়ে এলো, তবু বাঁক ভাবছি কেন আমি?

কবিতা লেখার মন, মেজাজ— কোনোটাই নেই। তবু কবিতার মধ্যে আছে আনন্দ। সিগনেট প্রেস তার বই করবে ব'লে জানিয়েছে। নরেশ এসেছিল সেদিন। সে বললো, 'আপনার বইয়ের কাট্‌তি ভালো। তবু ঝুঁকি নিতে চাইছেন না দিলীপবাবু— বনলতা সেনের এখনও ক্রেজ আছে, তাই কিছু নতুন কবিতা সংযোজন ক'রে বনলতারই দ্বিতীয় সংস্করণ করতে চাইছেন।'

—'কতগুলো নতুন কবিতা থাকবে ব'লে মনে করছেন আপনি?'

—'কুড়ি-বাইশটা।'

—'আপনাকে যেজন্যে আমি আসতে বলেছিলাম, হাতে সময় আছে তো?'

—'হ্যাঁ, বলুন।'

আনন্দ তখন কতকগুলো পত্রিকা খাটের ওপর তুলে রেখে বললো, 'এগুলো মোটামুটি আমি বাছাই ক'রে রেখেছি, এর মধ্যে কিছু যাবে পূর্ব্বাশায়— মহাপৃথিবীর জন্য— আপনি একটু দেখুন।'

নরেশ প্রতিটি কবিতা প'ড়ে বলেছিল, 'ঠিকই তো আছে।'

—'তাহলে আমি কয়েকদিনের মধ্যে ফাইল ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

পাঠিয়ে দেওয়ার পরও, মনে-মনে অশান্তি চলছিল— বনলতার জন্য নতুন কবিতাগুলো বনলতার স্পিরিট বজায় রাখবে তো! মহাপৃথিবীর স্পিরিটও আলাদা— লিস্ট নিয়ে বসছে মাঝেমধ্যে— কোনো-কোনো কবিতা নতুন ক'রে পড়তে হচ্ছে... আজও বসেছিল। মহাপৃথিবীর লিস্ট থেকে আনন্দ কবিতা পড়ছে। আচমকা সে দুটো লাইন আবৃত্তির মতো ক'রে ব'লে উঠলো, 'মানুষ কাউকে চায়— তার সেই নিহত উজ্জ্বল/ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল—' কয়েক মুহূর্তের একটু ফাঁক দিয়েই তৃতীয় স্তবকের শেষ লাইন জুড়ে দিলো, 'আরো আলো: মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।' বার-কয়েক ওই লাইন-ক'টি নিজের মনে আউড়ে সে যেন নিজেকেই শোনালো, 'এ কবিতা মহাপৃথিবীর নয়—' আরও একটি কবিতা সে মহাপৃথিবীর লিস্ট থেকে তুলে নিলো; এ-দুটো বনলতায় ঢোকাতে হবে। কিন্তু মহাপৃথিবীর জন্য? আনন্দ একগুচ্ছ পত্রিকা তুলে নিলো বিছানার ওপর।

কবিতার মধ্য থেকে উঠে আসা এক-একটি দৃশ্য, ভাব— এমন-কী অনুভবও— আনন্দকে অন্যমনস্ক ক'রে দিচ্ছিল... কখনও চোখের সামনে ভেসে উঠছিল কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ— হাড়-জিরজিরে এক ভিখিরি, তার খুব কাছে এক ভিখিরিনী, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'গালে আব— যেন দুর্ভিক্ষের সেই সময়ে মৃত্যুর মিছিল, লঙ্গরখানা ইত্যাদির পটভূমি আড়াল ক'রে দাঁড়ানো সেই যুবক-যুবতী— সূর্যালোকিত মিথুন— আজও যেন প্রেমপ্রতিভায় উজ্জ্বল; আনন্দ বিড়বিড় ক'রে নিজেকেই যেন পশ্ন করেছে 'তাহলে কেবল দুর্ভিক্ষের সময়ই মেয়েদের স্বভাব বদলে যায় ব'লে পুরুষের কাছ ঘেঁষে সে— এমন উপলব্ধি কেন হয়েছিল?' কখনও বিকেলবেলার কমলা হলুদ মেঘ, মেঘ ছিঁড়ে বর্শার মতো সূর্যকিরণ... কতকাল এ-দৃশ্যের জন্ম হয়নি... কী যেন এক হারিয়ে যাওয়ার বেদনা... এখন সে দেখতে পাচ্ছে অদ্ভুত একটা দৃশ্য: বেড়ালের মুখে-ধরা ইঁদুর হাসছে, হাসছে বেড়ালও... আনন্দর মুখে বিষণ্নতার ছায়াপাত, সে কখনও কাউকে হাসাতে পারেনি— তার বিষাদের ছায়া কেমন গাঢ় হয়ে তাকে গম্ভীর দেখায়, আনন্দ তার চারপাশে বই-পত্রপত্রিকার দিকে তাকালো— বুদ্ধ-যিশু, মার্ক্স-হেগেল, প্লেটো-সক্রেটিস, ডারউইন-ফ্রয়েড, টমাস মান-হার্ডি, চর্যাপদ-পদাবলী-উপনিষদ, রবীন্দ্রনাথ... জ্ঞান, জ্ঞান কি মানুষকে দুঃখী করে? তবে জ্ঞানের চেয়ে প্রেমই ভালো— মাটি-মানুষের প্রেম, তবু কেন-যে একজন নারীর হৃদয় টোটেম-সম হয়ে উঠলো আমার অবচেতনায়!

তুমি তো জানতে নারীর হৃদয় সব নয়, এমন-কী প্রেমও! ডায়ালেক্‌টিক্‌— জড়-অজড়ের দ্বন্দ্ব— ঠিক নারীর হৃদয় নয়, নারীর হৃদয়ের অন্তঃসারে নিহিত— দীপদণ্ড হাতে এক দিব্য রমণী, যেন এথেনা; কিংবা সে স্বপ্নে যেমন দেখেছে ধূ-ধূ দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি একটা উটের সিল্যুট, তেমনই সে নারী।

আচ্ছা মেয়েমানুষ নিয়ে তোমার এত ভ্যান্‌তাড়া কেন? এত অবাস্তব কেন তুমি? তুমি তো জানো— বিপ্লবীও সোনা-রুপো ভালোবাসে?

পুনর্জন্মের লোভে একজন বণিক আত্মহত্যা করেছে— এ সংবাদ তোমার অজানা নয়।

তুমি তো জানো সেই প্রেমিককে— যে-মহিলার প্রতি সে একনিষ্ঠ ছিল, সেই মহিলা অন্তত দশজন মূর্খের প্শস্তিতে প্রীত হয়ে প্রেমিককে ভুলেছিল!

কত কোকিলকে স্থবির হয়ে যেতে দেখেছো! দ্যাখোনি?

তবু এ-পৃথিবীতে এমন মেয়ে আছে যার মুখের দিকে চেয়ে থেকে আমৃত্যু জীবন কাটানো যায়।

কেমন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'এসব মেয়েদের আমি ম'রে যেতে দেখেছি নিরুপায়। এরা কেউ-কেউ মহামানবী হ'তে পারতো, হয়নি ব'লে আজও মহাপুরুষের উক্তি চারিদিকে কোলাহল করে—'

কেমন একটা গভীর চিন্তার আবর্ত আনন্দকে টেনে নিচ্ছিল তার কেন্দ্রের দিকে, কিন্তু তার থেকে সে বেরিয়ে এলো। তাকে কবিতা বাছাই করতে হবে...

কয়েকটা বাছাই হলো। এবার নরেশকে একটা চিঠি লিখতে হবে। ওঃহো— নরেশকে একটা কথা বলার ছিল, একটা ঘর সে সাব্‌লেট্‌ করতে চায়, একা কিংবা দু'জনের থাকবার

মতো— নরেশ যদি একটা যোগাযোগ ক'রে দিতে পারে। ছেলেটির ওপর তার নির্ভরতা, দাবি— যেন দিনদিন বেড়েই চলেছে, বিব্রত না-হয়; সাব্‌লেট্ করার ব্যাপারটা অবশ্য সে আরও দু'-একজনকে বলেছে— এ-সম্পর্কে সে নরেশকে চিঠিতেই জানাবে ব'লে মনস্থির করলো। আরও একটা চিঠি লেখার দরকার। জলপাইগুড়ি থেকে একটা নতুন পত্রিকা বের হ'তে চলেছে— তার একটা কবিতা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে কোনো এক সুরজিৎ— লতায়-পাতায় প্রভাকরের মতো এর সঙ্গেও হয়তো কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে— প্রভাকরের মতো সেও তার কবিতার ভক্ত কিন্তু ভক্তের দাবি পূরণ করার মতো কোনো উপায়ই যেন নেই আর— কেমন যেন নিঃশেষিত মনে হচ্ছে নিজেকে— একটা লাইনও লিখতে পারেনি কতদিন, পাতাঝরা দেখেও রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো ভাব জেগে ওঠেনি, যদিও ইদানিং কেন যেন তার মনে হচ্ছে, সেও ঝরাপাতাদের দলে প্রায় বৃন্তচ্যুতির অপেক্ষায় আছে; তবু একটা— একটা বাঁক আসছে জীবনে, কেমন এক সুসমাচারের মতো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা...

AMARBOI.COM

মনে পড়ে কবে এক রাত্রির স্বপ্নের ভিতরে
শুনেছি একটি কুষ্ঠকলঙ্কিত নারী
কেমন আশ্চর্য গান গায়;
বোবা কালা পাগল মিনসে এক অপরূপ বেহালা বাজায়;

—'তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

সাতসকালে শরীরের খোঁজ নিচ্ছে আনন্দ— ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না প্রভা, বললো, 'কাল ঘুমুতে যাবার আগে যেমন ছিল, তেমনই আছে ব'লে তো মনে হচ্ছে।'

শুনে আনন্দ খানিকক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করলো। তারপর রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রভা তখন সেখানে।

আনন্দকে দেখে প্রভা বললো, 'তোমাকে অস্থির লাগছে কেন?'

আনন্দ মনে মনে বললো, বাঃ! এই তো তুমি আমাকে বুঝতে পারো! অপলকে প্রভার মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'ঘাড়ে-গলায় ব্যথা নেই তো? মাথায়?'

—'না। কিন্তু হঠাৎ আজ আমার শরীর নিয়ে পড়লে কেন? কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছো নাকি— আমি ম'রে গেছি?'

—'না। কিন্তু তার সম্ভাবনা রয়েছে।'

—'তোমার মাথাটা কি একেবারেই গেছে?'

—'না না, আমার মাথায় কিছু হয়নি— আচ্ছা আজ কি কিছু ঘটবে আমাদের জীবনে— তোমার জীবনে?'

—'নিত্যদিন যা ঘটে তা-ই ঘটবে— নতুন ক'রে আর কী?'

—'আছে।'

বিমর্ষ আনন্দর চোখে চোখ রেখে প্রভা বললো, 'কী সেটা—'

—'আজ তোমার রেজাল্ট বেরুচ্ছে—'

—'মনে ছিল, মনে পড়েনি।'

—'মনে পড়িয়ে দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হলো না— শোনো, তুমি কিন্তু বেশি কান্নাকাটি করবে না—'

—'কেন, কাঁদবো কেন?'

—'দ্যাখো, ন'মাসের কোর্স— চারমাস তুমি বিছানায় প'ড়ে থাকলে। পড়াশুনো তো ঠিকমতো হয়নি— আমি বারণ করেছিলাম, নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি এমন রেগে গেলে— আমার কবিতার খাতাগুলো আগুনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই...' ব'লে আনন্দ প্রভার চোখে চোখ রাখলো। প্রভা ফিক্ ক'রে হেসে ফেললো। রুগ্ন অবস্থাতেই প্রভা কলেজে যেতে চাইলে আনন্দ তাকে নিষেধ করেছিল, প্রিন্সিপালের কাছে চিঠি লিখে তার নাম কাটানোর কথা বললে প্রভা বলেছিল, 'আমার নাম কাটার সঙ্গে সঙ্গে তোমার

কবিতার খাতাও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।' কিন্তু পরক্ষণেই মুছে গেল সে হাসি। প্রভা বললো, 'তার মানে তুমি ধ'রেই নিয়েছো আমি ফেল্ করছি।'

—'তুমি পাশ করছো— এ-আশা আমি করি কী ক'রে!' কেমন করুণভাবে তাকালো আনন্দ, 'কিন্তু আমি চাই তুমি পাশ করো, পাশ করলে তোমার জীবনটা বদলে যাবে— এ আমি জানি।' একটু থেমে বললো, 'তুমিও জানো। জানো ব'লেই তোমাকে নিয়ে ভয়— ব্যর্থতা মানুষকে কাঁপিয়ে দেয়, ধসিয়ে দেয়—' একটু চুপ থেকে ফের সে বললো, 'ব্যর্থতা অবশ্য মানুষের জীবনে স্বাভাবিক ব্যাপার, সামলেও নিতে পারে সে, কিন্তু তোমার শরীরের যা অবস্থা— কান্নাকাটি করলে, সে ধক্ সামলাতে পারবে না— তোমাকে বাঁচাতে পারবো না।' ব'লে করুণভাবে তাকিয়ে থাকলো তার মুখের দিকে, এই রুগ্ন মুখশ্রীতেও কেমন এক আভা জমেছে, এ-মেয়েটিকে ঠিকভাবে লালন করতে পারলে...

—'আমাকে বাঁচানোর জন্য এত তেরিয়া হয়ে উঠেছো কেন, কখনও তো মনে হয়নি এর আগে!'

একথার কোনো উত্তর জানা নেই আনন্দর— কেবল ফুলশয্যার রাতে সেই গানটার কথা মনে পড়লো, মনে মনে বললো, জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে তোমাকেই তো বন্ধু ভেবেছিলাম—

—'আমার এই রোগটার জন্য ডাক্তার খুব বিস্ময়বোধ করেছে— জানো তো— এ-রোগটা নাকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদের হয়—'

—'হ্যাঁ, জানি— তোমার জীবনে নারীসুলভ অনেক স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে গেছে— তার জন্য দায়ী অবশ্যই আমি— সময়োপযোগী হ'তে পারিনি, জীবনের কিনারা ঘেঁষে থেকে যাবার মোহে— তব, একটা বাঁক আসছে, প্রভা— আমাদের জীবন অন্যরকম হবে, এ আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি— তোমার বেঁচে থাকাটা জরুরি।' কেমন এক স্বপ্ন-কল্পনার মধ্যে যেন ডুবে যাচ্ছে আনন্দ, সেই মগ্ন অবস্থা থেকে সে বললো, 'মৃত্যু তো জীবনের একমাত্র সত্য, তবু চৌকাঠের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে যে-মৃত্যু কিংবা বিষ খেয়ে যে মরণ— এসব তেমন সত্য নয়— আচ্ছা প্রভা, তুমি তো 'সন্ধ্যার মেঘমালা'— এই গানটা জানো, আমার মৃত্যুভাবনায় কখনও-কখনও মনে হয়েছে, যদি ওই মেঘের মধ্যে— কমলা হলুদ— আশ্চর্য সোনালি রঙ মেখে আমি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতাম— এই মৃত্যু—'

আনন্দ দেখলো তার সামনে কেউ নেই। তবে কি সে স্বপ্ন দেখছিল? সে এখন নিমগাছটার গায়ে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রভা কলতলায়।

প্রভাকে কলেজে না-গেলেও চলবে। নিনি তাকে রেজাল্ট জানিয়ে যাবে কিংবা তার ব্যবস্থা করবে। অন্তত একটা বিষয়ে আনন্দ নিশ্চিত— যা কিছু ঘটবে তার উপস্থিতিতেই ঘটবে; চোখের সামনে অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে দেখা— ভারী বিশ্রী ব্যাপার, সেটার জন্য সে মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিল কিন্তু সমস্ত প্রতিরোধব্যবস্থাই ভেঙে পড়ছিল। সে যতবার

প্রভাকে মেরেছে তার গল্প-উপন্যাসে, কোথাও তার উপস্থিতি ছিল না— ছিল কি কোথাও? মনে পড়ছে না— বাস্তবে যেন তাকে থাকতেই হবে— এমনই এক অনিবার্যতায় তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দুর্দৈব— প্রভাকে অবশ্য নির্বিকার মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা অন্যকিছুর আভাস নয় তো!

দুপুর গড়িয়ে গেছে। এখন যে-কোনো মুহূর্তে নিনি অথবা তার পাঠানো কোনো লোক এসে পড়বে। নিনি আসলেই ভালো। কিন্তু লোক যদি আসে, সম্ভবত সে একটা খামবন্দি চিঠি নিয়ে আসবে— খামের ওপর অবশ্যই লেখা থাকবে প্রভার নাম, তার নামও থাকতে পারে। পায়চারি করছিল আনন্দ... আবারও কড়া নড়লো।

দরজা খুলে, এবারও একটা প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলে আনন্দ দেখলো একটা লোক,— সে-ই বললো, 'প্রভা দেবী—'

—'আমার স্ত্রী। কেন, কী দরকার?'

—'আজ্ঞে একটা চিঠি—'

—'দিন, আমাকেই দিন।' পকেট থেকে চিঠিটা বের করতেই যেন ছোঁ মেরে আনন্দ চিঠিটাকে নিয়ে নিলো, 'যান! আমি দিয়ে দেবো।'

দরজা বন্ধ ক'রে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলো— প্রভা। —'কার চিঠি?'

—'তোমার।'

—'নিশ্চয় নিনি পাঠিয়েছে, দেখি।'

একটা ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে চিঠিটাকে না-দেখানোর জন্য আড়াল করলো আনন্দ।

—'চিঠিটা তো এসেছে আমার নামে!'

—'হ্যাঁ, এ-চিঠিটা আমি তোমার হাতে দিতে পারছি না— আমি জানি এটা একটা শমন—'

প্রভা কেমন অবাক দৃষ্টিতে আনন্দকে দেখছিল। এরকম ছেলেমানুষী মাঝেমধ্যে প্রকাশ যে পায় না আনন্দর তা নয়, এই তো ক'দিন আগে, খেতে বসেছে সবাই একসঙ্গে, খাবার সময় তেমন কথা হয় না, চুপচাপ খাচ্ছিল, হঠাৎ আনন্দ ব'লে উঠলো, 'দেখি তো রঞ্জুর ডিমটার টেস্ট কেমন—' বলতে-বলতে রঞ্জুর পাতে রাখা ডিম থেকে একটু ভেঙে নিয়ে মুখে দিলো। সেই মুখটা মনে পড়লো প্রভার। একটু হাসিও যেন পেলো। বললো, 'শমন যখন, অস্বীকার করার উপায় নেই— তুমিই খোলো।' খুলতেও যেন দ্বিধা। শেষপর্যন্ত খুললো। দেখলো। আর তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অবাক বিস্ময়ে আনন্দ প্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'তুমি কি ম্যাজিক জানো?' একইসঙ্গে চিঠিটা বাড়িয়ে ধরেছে।

অস্পষ্ট বাঁক দেখতে পাচ্ছে আনন্দ। অন্তত প্রভার জীবন-যে বাঁক নিয়েছে— ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে প্রভার একটা চাকরির জন্য যাদের কাছে বলেছিল তাদের

একজন রমেশ, রমেশের কথা মনে পড়লো। ব্রজমোহনে রমেশের সহকর্মী ছিল আনন্দ। দেশভাগের পর-পরই রমেশরা চ'লে এসেছে। আনন্দর খুব অবাক লাগে— কী সহজভাবে রমেশরা এখানকার মাটিতে শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছে। রমেশ এখন পার্কসার্কাসে শিশু বিদ্যাপীঠের পরিচালক সমিতির সদস্য। প্রভার চাকরির ব্যাপারে বললে রমেশ বলেছিল, 'সাধারণ বি.এ.— মুশকিল, বি.টি.-টা করা থাকলে সুবিধে হতো।'

আনন্দ জানিয়েছিল, 'প্রভা বি.টি. করছে— ডেভিড হেয়ারে।'

—'পাশ করুক—'

আনন্দ ভাবলো, রমেশের সঙ্গে দেখা করতে হবে। প্রভার জন্যে কিছু একটা না-করতে পারলে ম'রেও যেন শান্তি পাওয়া যাবে না!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইখানে স্মৃতি;
এখানে বিস্মৃতি তবু; প্রেম
ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি

—ম্যাডাম আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

—বলুন!

—বসি?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ— স্যরি!

—আপনি বোধহয় জানেন, মানে, শুনে থাকবেন আমার সেই ছাত্রটির কাছ থেকে, যে আপনাকে এই বাসা ঠিক ক'রে দিয়েছে— আমি একটু-আধটু কবিতা লিখি।

—হ্যাঁ, শুনেছি বটে। তবে কবিতার প্রতি আমার তেমন কোনো আগ্রহ নেই।

—না-থাকাটা দোষের নয়— আমার স্ত্রীরও নেই। কিন্তু তিনি সঙ্গীত ভালোবাসেন। একসময় রীতিমতো রেওয়াজ করতেন। আপনি যখন গান, প্রভা গলা মেলায়,— আমারও বেশ লাগে।

—থ্যাঙ্কয়্যু!

—কিন্তু আপনার এত সুন্দর সুরেলা কণ্ঠ— রাতের বেলা যে আসরগুলো হয় তাতে কেমন বেসুরো লাগে, আর এটাই আমাকে খুব ডিস্টার্ব করছে—

—মানে?

—যে সঙ্গীত আমাকে সূর্যচেতনায় নিয়ে যেতে পারতো, তা আমার মধ্যে আগুন জ্বেলে দিচ্ছে— যে আগুনে আলো নেই।

—জানেন, আপনাকে যেদিন প্রথম দেখি— বলতে দ্বিধা নেই বেশ রুচির মানুষ মনে হয়েছিল।

হলো না হলো না ভঙ্গিতে আনন্দ খসড়া-সংলাপটি বাতিল ক'রে দিলো। কিন্তু খসড়াটার প্রথম থেকে 'কবিতার প্রতি আমার তেমন কোনো আগ্রহ নেই' পর্যন্ত রেখে, নতুন ক'রে ভাবলো আনন্দ—

—সে না-থাকতেই পারে। আমার আর্জি— কবিতা খুব নৈঃশব্দ্য ভালোবাসে— রাত্তির বেলার আপনার আসরটা যদি একটু বন্ধ করেন ভালো হয়!

—দেখুন ওটা আমার রিক্রিয়েশন। আমার ব্যক্তিস্বাধীনতা।

—মানছি। কিন্তু একইসঙ্গে এটাও তো স্বাধীনতা ভোগকারীর দেখার বিষয়, যেন কারও শান্তি বিঘ্নিত না-হয়!

আনন্দ ভাবলো, না— কবিতার কথা না-ব'লে, বলা ভালো: আমার ছেলেমেয়ে-দুটোর পড়াশুনোয় খুব ক্ষতি হচ্ছে। তারপর যেমন আছে তেমনই—

নাঃ, তার চেয়ে ছাত্রটিকে ডেকে পাঠানো ভালো। কিন্তু কী লাভ তাতে? ছেলেটি যে

ইন্‌ফর্মেশন দিয়েছিল তাতে কোনো ভুল নেই— মহিলা বিধবা, হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানির একজন এজেন্ট, একা; একাই থাকেন— যত উৎপাত রাত্রে, মধ্যরাত পর্যন্ত গড়িয়ে যায়!

কী বলবে ছেলেটিকে— এমন এক মহিলাকে আমার এখানে ঢুকিয়ে দিলে যে, নরক হয়ে গেল সমস্ত পরিবেশটা!—

একথা বলতে পারবে না আনন্দ অথচ মদের গন্ধ সত্য, সত্য প্রলাপ কথা, হাস্য-উল্লাস—

যদি বলেও, ছাত্রটি হয়তো ব'লে বসবে, 'স্যার, আপনি খুব সেকেলে, সিনিক্— লাইফটাকে ওঁরা এন্‌জয় করছেন— জাস্ট্ উপভোগ—'

সেদিন প্রভা বলছিল, 'একজন বিধবার চারপাশে এত ভিড়! আমাদের মা-পিসিরা একবেলা আতপসিদ্ধ খেয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন!'

প্রভার কথায় কোথাও একটা আফশোসের সুর লেগে আছে— মনে হয়েছিল আনন্দর, তেমনই যদি ছাত্রটির মনে হয়— আনন্দ ঈর্ষা থেকে বলছে।

বরং সহজ-স্বচ্ছভাবে একথাটা বলা যায়— ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে, তুমি ওনাকে নতুন কোথাও বাসা খুঁজতে বলো!

এই এক অশান্তি আনন্দকে কুরে-কুরে খাচ্ছিল, তার ওপর নতুন ক'রে মনখারাপ, নতুন বই প্রকাশ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই; তার চতুর্থ বই প্রকাশের পর চার-চারটে বছর চ'লে গেল, তবু মন্দের ভালো মহাপৃথিবীর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হবে, বনলতায় নতুন কবিতা ঢুকছে— এসব নিয়ে বাঁকের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তাও অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে— মহাপৃথিবীর কাজ স্থগিত, বনলতার গতি মন্থর...

এসবের সঙ্গে রয়েছে না-লিখতে পারার যন্ত্রণা, বরং বলা ভালো কথা না-রাখতে পারার গ্লানিবোধ; কেউ-কেউ হয়তো ভুলও বুঝছে। সুরজিৎ কি তেমনই ভুল বুঝে জানতে চেয়েছে— একটি কবিতার জন্য আমি কত নিই? পক্ষান্তরে সে কি এটাই জানালো,— আপনি কবিতা পাঠান, যথার্থ সম্মানমূল্য আপনাকে দেওয়া হবে! সুরজিৎ, তুমি বিশ্বাস করতে পারো, আমি লিখতে পারছি না! তুমি একটু খোঁজ নিলে জানতে পারবে সাহিত্যের পেশাদারিত্বের ব্যাপারে আমি একেবারেই আনাড়ি— দরদামের প্রশ্নই ওঠে না। তবু, বাঁধাধরা কোনো আয় নেই, লিখে টাকা পেলে ভালো লাগে— অস্বীকার করবো না— কিন্তু আমার লেখা সেভাবে অর্থকরী হয়ে উঠলো না।

সুরজিৎকে একটা চিঠি লেখার কথা ভাবলো আনন্দ, চিঠির বয়ানে কোথাও যেন বেনেবুদ্ধি প্রকাশ না-পায়; সে সত্য জানাবে— একটা কবিতা লিখে সে সবচেয়ে বেশি পেয়েছে পঞ্চাশ টাকা আর সবচে' কম পঁচিশ টাকা— তারপর সে লিখবে, তোমাদের যা খুশি দিও! কিন্তু সেক্ষেত্রে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে কোনো সংখ্যা তাদের ভাবতে হবে। বরং আমি বলবো, তোমরা কুড়ি টাকা দাও না আমাকে!

আনন্দ কবিতার খাতা নিয়ে বসেছিল। অথচ একটি শব্দও লেখা হয়নি। তার সাব্‌-লেট্‌ শ্রীমতী এখনও ফেরেনি, অনেকটা সময় পাওয়া গেছে আজ তবু—

ফুরিয়ে ফেলেছি সময়, নীড়— এই মেয়েটিকেও কি আমি প্রেমিকের দৃষ্টিতে দেখেছিলাম?

অসম্ভব কিছু নয়, বরং স্বাভাবিক— প্রেমের বিষয়ে তুমি আজও স্থির!

আনন্দ একটা লাইন লিখে ফেললো: প্রেমের বিষয়ে তবু স্থির হয়ে থেকে ভয়াবহ ইতিহাস—

ওই শ্রীমতী ফিরলেন।

এখনই গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপবে।

বাঃ! রবীন্দ্রসঙ্গীত—

এই যে রবীন্দ্রসঙ্গীত— লো ভল্যুমে শুনছে যে মেয়ে— তাকে ভালো না-বেসে পারা যায়?

আনন্দ ভেবে পায় না, এই মেয়েটি কীভাবে দানবীয় সুরে ভাসতে পারে, তাকে কি অসুরে পায় তখন? আনন্দ শুনছে...

শুনতে-শুনতে আনন্দ ভাবছিল, জীবনে কখনও প্রেম হয়েছিল, কিছু মানুষের সঙ্গে সদ্‌ভাব— ভালোবেসে কাছে এসেছিল— দূরে চ'লে গেছে; তব, দু'-একটা গাছ, নক্ষত্র, পাখি তাদের প্রতীক হয়ে আছে— ছায়া-আলো-সুর তাদের ছবি সব মেলে ধরে... কিছু জ্ঞান, সত্য— স্বস্তি দিয়েছিল জীবনে; সে-স্বস্তির দিন গ্রাস ক'রে নিয়েছে এই সংসার, সমাজ; তবু কোথাও ঋদ্ধি নেহ, না সমাজে— না সংসারে; তবুও আজও আমি ভাবছি— এ-জীবন বাঁক নেবে, কখনও-কখনও মনে হয়: হৃদয় উন্মুখ হয়ে আছে— সমস্ত কোলাহল ভেদ ক'রে সে যেন ধর্মতলার মনুমেণ্টের মতো হয়ে উঠছে, অখণ্ড দিগন্তবলয়— ভেসে আছি মহাশূন্যতায়...

শ্রীমতীকে ডাকছে কেউ।

রেকর্ড থেমে গেছে।

শ্রীমতী সাড়া দিয়েছে।

ছিট্‌কানির খুট্‌ আওয়াজ। পর্দা সরিয়ে শ্রীমতীর মুখ— সুস্বাগতম... পর্দা পাট-পাট ঝুলে থাকলো। ছিটকানি উঠলো।

এসব সাবলীল কল্পনার পর যেসব দৃশ্যের জন্ম হ'তে পারে তা সবই ক্লিশে তবু নিয়মাধীন— কেবল আমাকেই গ্রহণ করলো না সে-নিয়ম। বরং হৃদয় নিয়ে মশগুল হওয়া যাক... আনন্দর ঠোঁট-দুটো নড়ছে: হৃদয় তুমি সেই নারীকে ভালোবাসো তাহ/আকাশের ওই অগ্নিবলয় ভোরের বেলা এসে/প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে অমেয় কাল হৃদয়সূর্য হবে/তোমার চেয়েও বেশি সেই নারীকে ভালোবেসে।

ছ'-সাত বছর আগের মতোই হৃদয় যেন ব'লে উঠলো: বাসুক! আমার আকাঙ্ক্ষা তবু সে সূর্য হয়ে উঠুক— নারীসূর্য, আমাকে আলোকিত করুক।

—এখনও এ আকাঙ্ক্ষা তোমার!

—আলোকিত হ'তে হ'তে এ-জীবন হয়ে উঠবে এক শান্ত বিপ্লবী, স্থির আগুনের মতো অবিরল আলো দেবে!

হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা জেনে আনন্দ যেন চমৎকৃত হলো। তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল শান্ত বিপ্লবীর এক প্রতিকৃতি। তখন হাত থেকে বাসন খ'সে পড়ার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ— কোন্‌ ঘর থেকে এলো ঠিক বুঝতে পারলো না, হৃদয় চমকে উঠেছে খুব— স্পষ্ট হওয়ার আগেই ঝুর-ঝুর হয়ে ভেঙে পড়লো ছবিটা...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক দিন ভাবিনি কি আকাশের অনুরাধা নক্ষত্রেরা বোন হবে— বোন নক্ষত্রের ভাইয়ের—

এ-পৃথিবীতে সুপারিশ ছাড়া আনন্দর জীবনে কিছু হয়নি— সেই অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলের কাল থেকে খবরের কাগজে চাকরি অবধি; একটি ব্যতিক্রম খড়্গাপুর কলেজ— ব্যতিক্রম তো আর নিয়ম নয়, একথা সবাই জানে— না-জানার মতো মূর্খ আমি নই—

অতএব, সুপারিশ করতে পারে এমন সফল মানুষের অন্বেষণে আনন্দকে মাঝেমধ্যে বের হ'তে হয়— এক-একটা দিন মিছে কেটে যায়, নিজেকে আরও নিঃস্ব, নিঃশেষ মনে হয়— কোনো কিছুর মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে ফের ভেসে ওঠার মতো কোনো উপায় নেই। নিজেকে ফিরে দেখবার, দেখাবার মতো কিছু নেই আর— সম্ভাবনার গল্প তৈরি করতে গিয়ে আরও হতাশা, গ্লানির বোঝা বাড়ে। মাঝে একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল— খুব কি মানসিক চাপ ছিল সেদিন— একজন কবি, সে করবে ব্যবসা? একজন অধ্যাপককে বেঁচে থাকবার জন্য ব্যবসা করতে হবে! সহপাঠীর কাছে করুণাভিক্ষা করতে হবে পারমিট পাওয়ার জন্য! রক্তের চাপ বেড়ে গেছিল খুব। আঃ! রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণটা যদি বিপজ্জনক মাত্রায় থাকতো— অনন্ত ঘুমের মধ্যে চ'লে যেতাম! মাঘ-নিশীথের কোকিল, কস্তুরী আভার চাঁদ যতই নীল জোছনা ছড়াক, যতই ডাকুক আমি আর জাগতাম না। কী-যে ভালো হতো! এমন দিন কাটাতে হতো না আর— রাতটা তো আরও খারাপ— নিরাশায় ব্যর্থতায়— নির্ঘুমে, আধোঘুমে— শরীর জেগে ওঠে— এই শরীরটাকে ভালোবাসলো না কেউ। কারও ভালোবাসা পাওয়ার মতো যোগ্য হয়ে উঠতে পারলো না এই মনটাও— তবু ভুল ক'রে ভালোবেসে ফেলেছিল কেউ—

ভাগ্যিস তুমি ভুল করেছিলে! তুমি ভুল করেছিলে ব'লে— এই মহার্ঘ উপলব্ধি, অনুভব— তোমার 'ভুল'-ভালোবাসাকে ভালোবেসে এ-জীবন তবু প্রার্থনাসঙ্গীতের মতো, আজও তা মনে হয়; নিত্যপ্রেমের ইচ্ছে নিয়ে তবু পদ্মপাতায় জলের মতো সেই স্ফটিক মুহূর্ত আজও উজ্জ্বল— তোমার আলোয় আলো হয়েছি, তোমার গুণে গুণবান...

এমন সত্যকে কেন যে তোমার ভুল মনে হলো! কোথায় হারিয়ে গেলে! এ-পৃথিবী জুড়ে ভরাট বাজার, ভরা লোকসান— তবু আজও খুঁজি তোমাকে, খুঁজছি— আজও ইচ্ছে করে তোমার মধ্যে মিশে যেতে, শরীর যেমন মনের সঙ্গে মিশে যায় কিংবা মন শরীরের সঙ্গে।

জানি না তুমি আজ কোথায়। তোমার মুখ মনে পড়ে আবছা। জানো তো, ল্যান্সডাউনের এই বাসাতেও কুমোরপোকা আসে, কেমন যেন মনে হয় বরিশালের সেই পোকাটা— তার গৃহনির্মাণ দেখতে-দেখতেও তোমাকে মনে পড়ে— তোমার কি মনে পড়ে এমনই একটা গৃহনির্মাণ করতে চেয়েছিলাম আমরা? চেয়েছিলাম কি? হয়তো স্বপ্নে!

ওঃ স্বপ্ন! ছায়াকে শরীর দিতে চাওয়াই তোমার কাল হয়েছে আনন্দ— এটা কি তুমি বুঝতে পারো না!

দিতে যে চাহ, এটাই বুঝি; আর কিছু বুঝতে চাই না।

বুঝতে চাওনি ব'লেই যা কায়া ছিল সব ছায়া হয়ে গেছে, যাচ্ছে— প্রভাও। অথচ তুমি শরীর চাও— কী জঘন্য কাকুতি-মিনতি—

একটা জলজ্যান্ত শরীর তবু ছায়া হয়ে যায়—

কেন যায়?

অনেক কারণ— মুখের দুর্গন্ধ, প্রভা বাজারমুখী, আমি পণ্যবিমুখ সভ্যতার কথা ভাবতে-ভাবতে অলীক হয়ে উঠেছি— কে না জানে অলীক আর বাস্তবের সম্পর্ক আড়াআড়ি।

তবু তুমি সময়োপযোগী হবে না!

হ'তে তো চাই— এই তো সেদিন, নরেনকে আমি বললাম, 'নরেন, একদিন ব্রজমোহনে আমি তোমার সহকর্মী ছিলাম, এখানে— কী সুন্দর নাম, মতিঝিল— এই ঝিলে একসময় মুক্তো পাওয়া যেতো বুঝি!— কী দারুণ প্রতিভা তোমার— কলেজ পত্তনের উপযুক্ত জায়গাটি পর্যন্ত তুমি চিনে নিতে পেরেছো!'

আনন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠলো নরেন্দ্রনাথের মুখ, 'প্রতিভা! সে তো তোমার— কবি হিসেবে তোমার নাম-যশ হয়েছে— তুমি কি ব্যঙ্গ করছো?'

—'না নরেন, ব্যঙ্গ করবো কেন— আমি কবিতা লিখতে পারি, কিন্তু কলেজ তৈরি করতে পারি না, তুমি পেরেছো— পেরেছো ব'লেই তোমার কাছে এসেছি, এখানে তোমার সহকর্মী ক'রে নাও আমাকে।'

—'বেতন অত্যন্ত কম, না আনন্দ, অত কম বেতনে তোমাকে এখানে আমি নিতে পারি না, বেশি দেওয়ার উপায়ও নেই।'

—'তোমাকে বলতে আমার দ্বিধা নেই নরেন— খুব মুশকিলের ভেতর আছি— কত কিছু লেখার ছিল, পূর্ব্বাশায় আত্মজীবনী লিখতে হবে, একটু সুস্থতা এনে দাও ভাই— আমার জীবনীতে তুমি অমর হয়ে থাকবে।'

কথাটা শুনে কেমন এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল নরেন। যেন ভাবছিল, একটা ব্যর্থ মানুষের আত্মজীবনীও হয়! তাও আবার পত্রিকায় প্রকাশ পাবে!

টোপটা আমি ঠিক ফেলতে পারিনি।

আসলে তা নয়, নরেন তো তার অমরত্ব নিজেই নির্মাণ ক'রে ফেলেছে— প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, মৃত্যুর পরে আবক্ষমূর্তি বসবে। তোমার ওই টোপ কি আর গেলে!

কেউ যেন ডাকলো। আনন্দ চোখ মেলে তাকালো। দরজায় সুচরিতা।

—'দাদা, এরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

আনন্দ বিছানা থেকে নেমে ধুতির খুঁট্টা গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে বাইরে এলো।

—'বুঝলে দাদা, ক'দিন ধ'রে বাড়ির সামনেটায়, এদের ঘোরাঘুরি করতে দেখছিলাম, কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল— আজ জিগ্যেস করতেই জানা গেল, তোমার সঙ্গে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে ব'লে আসে কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস পায় না।'

আনন্দ জিগ্যেস করলো, 'কী নাম তোমাদের?'

পরপর চারজন তাদের নাম বললো,

—আমি স্নেহাকর

—আমি সমর

—ভূমেন

—আমি জগদিন্দ

ভূমেন ছেলেটা একটা কাগজ বাড়িয়ে ধ'রে বললো, 'এই কাগজটা আমরা করি।'

আনন্দ কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলো, এক ফর্মার— ময়ূখ, দেখতে দেখতে সে শুনতে পেলো, 'আগামী সংখ্যার জন্য একটা কবিতা যদি দেন!' আনন্দ বললো, 'কবিতার ব্যাপারে এত সঙ্কোচ-সমীহ কেন— এখন দিতে পারছি না, হাতে লেখা নেই। লেখা হোক, দেবো।'

—'আমাদের কাগজটা একটু পড়বেন দয়া ক'রে, পরে মতামত জানাবেন।'

—'প্রবীণ কবিদের কোনো কবিতা দেখছি না যে, আপনারা বুঝি অগ্রজদের পছন্দ করেন না!'

—'না, তা নয়— আমরা ঠিক পৌঁছুতে পারি না, এই তো— আজও হয়তো ফিরে যেতে হতো আপনার দরজা থেকে, ভাগ্যিস দিদি এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন! নইলে আরও কতদিন লাগতো কে জানে!'

আনন্দ হেসে উঠলো, সে-হাসির দমকে তার শরীর কাঁপলো। হাসি থামিয়ে বললো, 'লিখতে পারলে নিশ্চয়ই দেবো।' যেন বিদায় জানালো। এক মুহূর্ত আর দাঁড়ালো না।

আগে নতুন ছেলেরা এলে বেশ উদ্দীপিত হতো আনন্দ। এখন কেমন যেন ভয় করে। এদের দাবি মেটাতে না-পারলে নিজের ফুরিয়ে যাওয়া— নিঃস্ব চেহারাটা বড্ড প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তাছাড়া কুৎসা রটনার সম্ভাবনাও প্রবল। এছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে— যে-কাগজগুলো লেখা ছাপলে দক্ষিণা দেয়, তাদের জন্য লেখা রেডি রাখতে হয়— স্টক্ ক'রে না-রাখলে চলে না।

বেনেবুদ্ধি যে একটু-আধটু নেই— একথা বলতে পারছো না! কিন্তু তাতে লাভ কী? ইণ্টেলেক্টুয়াল কবিতার বিক্রি নেই। দেখলে না, তোমার নতুন কবিতার বই কেউ করতে চাইলো? তুমি প্রেমচেতনায় ইতিহাস মেশাচ্ছো, ইতিহাসচেতনায় প্রেম— নির্ভেজাল প্রেম লেখো, পারবে? কিংবা বিদ্রোহের কবিতা?

আনন্দ নিজের অজান্তে মাথা নাড়লো।

তার মনে পড়লো কয়েকদিন আগে সে জাহাজের স্বপ্ন দেখেছে— সমুদ্রের প্রতিটি তরঙ্গ যেন এক-একটি জীবন, অস্পষ্ট মুখাবয়ব; জাহাজের খোলে, ডেকে, কেবিনে কেবলই মানুষ, কিন্তু একা। একা একা। তবু একের সঙ্গে অন্যের পরিচয় হওয়া দেখেছে, হাসি-গল্প, কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যথাতুর, কাউকে বোকা-বোকা লাগে, কেউ-বা ভীষণ অবাক; শোকাবহ ক্লান্তিতে কেউ ক্ষয়ে যাচ্ছে, কেউ-বা ভয়াবহ বেদনা নিয়ে; আরও কিছু মানুষের মন স্বভাবত নিহত-চেতন— তারা দিব্যি আছে, চালানি মালের মতো দিন-রাত নিচ্ছে দিচ্ছে দেহ, ভালোবাসা।

তারপর কে যেন তাকে গল্প শোনালেন— জাহাজ-ডুবির গল্প, হাজার বছর ধ'রে কেবল যাত্রীরা মরেছে, নতুন যাত্রী, তবু— আপ্তবাক্যের মতো সেই গম্ভীর উচ্চারণ আনন্দ শুনতে পেলো: যাত্রীরা বিপন্ন চিরদিন— ম'রে গিয়ে তবু মৃত্যুশীল—

আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'মৃত্যুর নিঃশেষ নেই— নেই—'

না-ম'রেও তো আমাদের টুকরো-টুকরো মৃত্যু আছে প্রতিমুহূর্তে। প্রতিমুহূর্তে জীবন মরছে না কি? ম'রে যাচ্ছে চিন্তা-অনুবেদনায় ভরপুর মাথা— মৃত মাথা তবু জীবনের খবর রাখছে— সেই প্রাজ্ঞ নৌ-বিশারদ তাকে দেখিয়েছিলেন, ওই দ্যাখো মৃত মাথার মানুষেরা তবু বন্ধু হচ্ছে কারও, কেউ-বা ভেক্ ধরছে, কেউ পরামর্শ দিচ্ছে— ওই-যে দেখছো খুব নিবিড়, কাগজে-কলমে ওদের বিয়ে হবে, এর আগেও হয়েছে ঢেরবার, আবারও বিচ্ছিন্ন হবে।

ঘুমের ভান্ ক'রে প'ড়ে থাকা নারী-পুরুষের দিকে কেমন করুণাঘন তাকিয়ে থেকে তিনি বলেছিলেন, এক জোড়া তাস হাতে যদি জাদুকর হ'তে পারতাম!

—তাহলে কী হতো?

—খেলা করা যেতো এই অন্ধকারে, এই টুপিটার ভেতর থেকে অনেক পায়রা উড়িয়ে— ওড়ানো যেতো ওইসব যাত্রীদের হৃদয়কে— অনন্ত রাত্রির দিকে, হয়তো একটা উৎসব হ'তে পারতো। জাহাজ ডুববার আগে উৎসবটা...

কেমন রহস্যময় দৃষ্টিতে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে, যেন নিজের মনেই বলছিলেন, জানি না কোথাও শুভ বন্দর রয়েছে কিনা।

আনন্দ স্পষ্ট সেই জাহাজটা দেখতে পাচ্ছে— সে তার কবিতা লেখার খাতাটা টেনে নিতে যাচ্ছিল, তখন সুচরিতা তার দরজায়, 'দাদা, বাণী তোমাকে ওর দাদা— সুশীলদার সঙ্গে একটু দেখা করতে বলেছে।'

—'কেন, বললো কিছু?'

—'হ্যাঁ, একটু কথা হয়েছে— সুশীলদার কলেজে বোধহয় লিভ্ ভ্যাকেন্সি হচ্ছে—' বলতে-বলতে সে ঘরে ঢুকলো, 'এই টাকা ক'টা রাখো!'

—'এই তো দিলি সেদিন।'

সুচরিতা একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সে তো সংসারের জন্য—'

সুচরিতার মুখের দিকে কী এক বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আনন্দ, দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলো— বুকের ভেতর উথালপাথাল ঝড়বৃষ্টি—

—'দাদা, তুমি কিন্তু মনে ক'রে সুশীলদার সঙ্গে দেখা কোরো।' সুচরিতা বেরিয়ে যাচ্ছে।...

আনন্দ কেমন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবুও এদের গতি স্নিগ্ধ নিয়ন্ত্রণ ক'রে উত্তরসমাজ
ঈষৎ অনন্যসাধারণ।

সুরজিৎ মোড়ার ওপর বসেছে। আনন্দ খাটের ওপর। খাটের ওপর কনুই রেখে দু'হাতে ধরা সুরজিতের মুখ— কেমন মুগ্ধ চেয়ে আছে, দেখছে আনন্দকে। বনির চেয়ে-থাকার সঙ্গে ওর এই ভঙ্গির আশ্চর্য মিল আছে। অদ্ভুত সেই চেয়ে-থাকা। মুগ্ধতার, গভীর অনুরক্তির আভায় রাঙানো সেই চোখের চাউনি কীভাবে যে তির্যক হয়ে গেল, উপেক্ষা-অনাদরের ভাষা ফুটে উঠলো— আজও রহস্য। মুহূর্তের মধ্যে সেই রহস্য থেকে বেরিয়ে আনন্দ কেমন একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়লো। বললো, 'তোমার হাতে যেন একটা বই দেখলাম!'

—'হ্যাঁ।' ব'লে সুরজিৎ টেবিলের ওপর থেকে বইটা টেনে নিলো, তুলে ধ'রে বললো, 'এটা— সিগনেট থেকে কিনে সোজা চ'লে এসেছি, এটাতে একটা অটোগ্রাফ চাই।'

—'তোমাকে তো অনেকগুলো চিঠি লিখেছি, প্রত্যেকটিতে পুরো নামটাই সই করেছি— আবার এ-বইয়ে কেন?'

—'আপনার এ-বইয়ে আপনার সই থাকবে!' যেন দাবি, একটু জিদও যেন। সমরও এরকম করে। এ-বয়সের ধর্মই বোধহয় এই। তবু সমরের চেয়ে সুরজিৎ অনেক বেশি পরিণত— এ-বয়সেই সে কবিতাপাগল, প্রেমেন-অন্নদার সঙ্গে চিঠি-চালাচালি করে। কোলকাতায় এলে তাদের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। সমরেরও একটা পাগলামি আছে অবশ্য— গানপাগল—

সুরজিতের হাত থেকে বইটা নিতে-নিতে বললো, 'এবার কোথায় উঠেছো?'

—'কোথাও উঠিনি, একটা রাত শিয়ালদায় কোনো হোটেলে থেকে যাবো, কালই ফিরতে হবে—'

—'শান্তিনিকেতনে?'

—'না। জলপাইগুড়িতে।'

রঞ্জুর বয়েসী ছেলেটা একা যাতায়াত করছে— প্রয়োজনে রঞ্জুও হয়তো পারবে। এরকম ভাবনার মধ্যেই বইটা নেড়েচেড়ে দেখছিল আনন্দ। বললো, 'এতদিন ধ'রে শেষে এই প্রডাক্‌শন?'

সুরজিৎ কী বলবে ভেবে পেলো না।

—'আর এটা—' মলাটটা তুলে ধরলো তার সামনে, 'এ কি বনলতা সেন? নাকি কোনো শেওড়াবনের সুন্দরী?' বইটা ফেরৎ দিতে-দিতে যেন নিজের মনেই বললো, 'এত বড় প্রকাশক, অত বড় শিল্পী!'

সুরজিৎ প্রচ্ছদচিত্রটা দেখছিল। সত্যজিৎ রায়ের আঁকা। নিশ্চয় কোনো মাহাত্ম্য আছে এর মধ্যে। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'— মুখে একটা পাথর-পাথর ভাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে যেন, এরকম মনে হ'তেই সুরজিৎ বললো, 'শিল্পী বোধহয় শ্রাবস্তীর কারুকার্য ফোটাতে চেয়েছেন।'

—'তা হবে, বিদিশার নিশা তিনি দেখতে পাননি। আর নামটাও তার মনে ছিল না!'

কেমন এক বিষণ্ণতা খেলে গেল তার কণ্ঠস্বরে, বললো, 'সাহিত্যে যখন কোনো চরিত্রের নাম দেওয়া হয়, তখন নামের সঙ্গে একটা রূপভাবনাও থাকে।' আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'নাম ও রূপ।' তারপর কোথায় যেন সে হারিয়ে গেল, সেখান থেকে সে বললো, 'এ-পৃথিবীর সবকিছুকেই আমরা নাম আর রূপ দিয়ে চিনি, নাম-রূপের আবরণে আবৃত বস্তুকেই আমরা জানি— বস্তুর অন্তঃসার কিছুটা রূপে কিছুটা নামে ফুটে উঠতে পারে— তার কোনো আভাস নেই ছবিটাতে—'

সুরজিৎ কথাগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করছিল যেন, আনন্দও চুপ ক'রে ছিল। সুরজিৎ বললো, 'নাম ঠিক করেছেন?'

—'কীসের?'

—'আমি যে-বইটা করার কথা ভাবছি।'

—'ওঃ হো! ভুলে গেছি। কোন্ কোন্ কবিতা থাকছে— তুমি একটা লিস্ট পাঠিয়েছিলে, না?'

—'হুঁ।'

আনন্দ টেবিলের ওপরে, আশেপাশে খোঁজার চেষ্টা ক'রে বললো, 'কোথায় রেখেছি। পেয়ে যাবো ঠিকই— তোমাকে পরে জানাচ্ছি।' সুরজিৎ একটু ক্ষুণ্ণ হলো যেন। আনন্দ বললো, 'শোনো, তোমাকে একটা ভালো খবর শোনাই—'

সুরজিৎ আগ্রহভরে তাকিয়ে থাকলো।

—'নভেম্বর থেকে একটা কলেজে, আবার আমি পড়াবো— অবশ্য লিভ্ ভ্যাকেন্সি, চারমাসের জন—'

—'সত্যিই ভালো খবর।'

আনন্দ নিচের ঠোঁটটা একটু ঝুলিয়ে দিয়ে মাথাটা মৃদু নাড়ালো। তারপর বললো, 'আমার এই জীবনটাকে মাঝেমধ্যে সিনেমার ট্রেলারের মতো মনে হয়।'

সুরজিতের মনে পড়লো, গত বছর 'সাতটি তারার তিমির' বিষয়ে সে একটা মন্তব্য করেছিল, 'আপনার এক-একটি কবিতা যেন এক-একটি সিনেমার ট্রেলার।'

—'কিন্তু তুমি যেমন বলেছিলে, বাছাই করা টুকরো-টুকরো দৃশ্যের ঝলকে একটা আগ্রহ তৈরি করা হয় দর্শক-সাধারণের মধ্যে— তেমনই যেন, চারমাসের কাজ পাওয়া— এ একটা ঝলক, জীবনে একটা আগ্রহ তৈরি হচ্ছে— ট্রেলারের মধ্যে একটা ধোঁকাও থাকে, না?'

—'তা বোধহয় থাকে! আচ্ছা, পূর্ব্বাশায় আপনার বইয়ের বিজ্ঞাপনে লিখেছে: আধুনিক বিখ্যাতদের মধ্যে নির্জনতম কবি— একথার মানে কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দর মুখে মিটিমিটি হাসি, 'ওই যে, তোমার অন্নদাশঙ্কর যেমন বলেছেন, 'উনি আমাদের শুদ্ধতম কবি'— একথার কী মানে? কোনো মানে নেই— নন্‌সেন্স বাট শুনতে ভালো।'

একটু চুপ ক'রে থেকে কিছু ভাবলো আনন্দ, তারপর বললো, 'সুরজিৎ আমাকে একটু বেরুতে হবে—'

সুরজিৎ অপ্রস্তুত হ্‌লো। বেরিয়ে যাচ্ছিল। আনন্দ বললো, 'দাঁড়াও! একসঙ্গে বেরুবো।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি শেষ হব শুধু, ওগো প্রেম, তুমি শেষ হলে!
তুমি যদি বেঁচে থাক— জেগে রব আমি এই পৃথিবীর 'পর—

প্রভার জীবন শেষপর্যন্ত বাঁক নিয়েছে। কে জানে কোন্ বিপদ আছে বাঁকে। তবু কেমন এক নিস্তার অনুভূত হচ্ছে আনন্দর। অভাবজনিত দুর্ভোগ, দুর্ব্যবহার অন্তত আর পেতে হবে না তার। প্রভার অসুখের মানসিক কারণগুলো আশা করা যায় আর থাকবে না। ইতিমধ্যেই তার লক্ষণ ফুটে উঠেছে প্রভার চোখে-মুখে; বেশ প্রাণবন্ত, রূপ-লাবণ্যের বিভা ছড়াচ্ছে অবয়ব— ঠোঁট, গাল, চোখে আশ্চর্য রঙ-রশ্মি— বেশ রমণীয়!

আনন্দর প্রাণধারা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। বরিশা কলেজে সে পড়াচ্ছে বটে। কিন্তু কোথাও উৎসাহ পাচ্ছে না। ক্লান্তি আর অবসাদ তাকে পেয়ে বসেছে। রক্তের অসুখ তার জীবনশক্তিকে যেন শুষে নিচ্ছে। এক-একদিন আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে কেমন অচেনা মনে হয়। সে ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের— এখন মুখটা যেন ঝল্সে গেছে।

আনন্দ কখনও রূপবান সুপুরুষ ছিল না— এ যেমন সত্য তেমনই তো সত্য নার্সিসাসের মতো নিজেকে বিমুগ্ধ দেখেছিল একদিন, পৃথিবীর তাবৎ লোক দেখেছিল তার মুখে বিষাদের কোনো চিহ্ন নেই, বন্ধুরা তো বলেছিল, মিলুকে বেশ ফ্রেশ দেখাচ্ছে— দেখছে কিছুদিন যাবৎ!

আনন্দ ভাবছিল।

চোখ বন্ধ ক'রে সে তেইশ বছর আগের দেখা একটি মুখ দেখতে চাইছিল। মনে পড়লো না। কেবল কল্পনা করতে পারলো: একটি মেয়ে, এক হাতে তার দীপশিখা অন্যহাত পক্ষপুটের মতো আড়াল ক'রে আছে শিখাটিকে— সেই আলো আর আলোরঙ তার কুৎসিত মুখখানায় লাবণ্য ছড়িয়েছিল—

অমন আলোয় কি ফের আমি বিষাদমুক্ত হ'তে পারি? এ-পৃথিবীর সব রূপকথায় রাজকুমারীরা ক্ষয়ে যায়, বন্দি হয়ে থাকে পাতালপুরীতে— তেমনই বনি যেন বন্দি ছিল, তেমনই তো বলেছিল সে, বনির রূপ রাজকুমারীদের মতো ছিল, আমি নাকি তার অনন্ত ঘুম ভাঙিয়েছিলাম! সত্যিই কেমন যেন রূপকথা!

যদি এমন রূপকথা হতো— কোনো এক মায়াবীর জাদু-বলে রক্তের অসুখে শুকিয়ে যাচ্ছে রাজপুত্র, আর রাজকুমারীর স্পর্শে ভালো হয়ে যাচ্ছে তার রক্তের অসুখ—

আনন্দ মাথা নাড়লো। যেন সমস্ত ভাবনাকে সে বাতিল ক'রে দিলো। স্বামী হিসেবে যে-মানুষ বাতিল হয়ে গেছে বহুদিন, প্রেমিক হিসাবে যাকে মনে রাখেনি কেউ, তার রক্তের অসুখ ভালো করবে কে?

কী লাভ আর বেঁচে থেকে?

একসময় মনে হতো, এ-পৃথিবীকে তার বলার আছে অনেক কিছু— এখন মনে হয় কাকে বলবে, কে শুনবে তার কথা, কে-ই-বা মানবে— নতুন কী-ই-বা আর বলার আছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেম নেহ, প্রেমব্যসনের দিনও শেষ হয়ে গেছে— তবু তুমি প্রেমের কথা ভাবো, এখনও জীবনকে মনে হয় প্রার্থনার গানের মতো—

তুমি তো আজও বিশ্বাস করো— কোনো প্রেমের কোনো স্বপ্নের কোনোদিন মৃত্যু হয় না!

তাহলে নতুন কী লিখবে?

এ-পৃথিবীর নক্ষত্র-নারী সব ঝাপ্‌সা হ'তে-হ'তে মিলিয়ে আচ্ছে কোন্ মহাশূন্যতার অন্ধকারে—

তবু হৃদয় অন্তিম ফল হিসাবে আনন্দ চায়— আনন্দ!

চায় কিন্তু তাও তো লিখতে পারলে না— এ-জন্মে আর তা সম্ভব নয়।

মৃত্যুর পর আবারও জন্ম আছে, না? তাহলে মৃত্যুই ভালো— নতুন ক'রে শুরু করার পক্ষে।

তাহলে শেষ হলো এ-জীবনের সব লেনদেন?

আনন্দ ভাবছিল।

তব, এই সেদিনও মনুমেণ্টের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকবার সময় তার মনে হলো চারপাশটা যেন বদলে যাচ্ছে— তার চোখের সামনে সেই বিরাট স্তম্ভ, শীর্ষের সিংহটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

এ-শহরের প্রাসাদের আলিসায় ব'সে থাকা পায়রাগুলোকে আজও তো মনে হয় তিনহাজার বছরের পুরনো, কিন্তু আজ কোনো মুখ নেই— যে-মুখের দিকে তাকালে বেবিলনের সেই বিরাট প্রাসাদ জেগে উঠতো; আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পেতো সেই মুখ ঘিরে পায়রার ওড়াউড়ি, কোলে তার সোনালি সিংহের ছানা...

একটা দীর্ঘশ্বাস অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করছিল, এবার ছেড়ে দিলো আনন্দ, যেন সিদ্ধান্ত নিলো— মৃত্যুই ভালো।

মাথার মৃত্যু হওয়ার আগে মৃত্যুই ভালো। সত্যানন্দ নেই— সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-বৃক্ষ-লতা সবই আছে; কুসুমকুমারী নেহ, এখনও আমরা আছি, আমি থাকবো না— এসবই থাকবে; আমি আছি, কার কী লাভ; থাকবো না, কার কী ক্ষতি!

যেন জীবনের একটা সমাধান পেয়ে গেল। কেমন এক ইউরেকা ভঙ্গিতে আনন্দ উঠে দাঁড়ালো।

খাস্তাগজা আর রসগোল্লা খাবার যে-ইচ্ছেটাকে ক'দিন ধ'রে সে চেপে রেখেছিল, আজ তাকে মুক্ত ক'রে দেবার কথা ভেবে ঘর থেকে বের হলো।

বেরুনোর মুখেই প্রভার সঙ্গে দেখা। প্রভা স্কুল থেকে ফিরছে। প্রভা সেই আগের মতো দেখবার জিনিস হয়ে উঠেছে। কাছে এসে প্রভা বললো, 'এখানে দাঁড়িয়ে কেন?'

—'তোমাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম।'

—'কোথাও যাচ্ছো নাকি?'

—'হ্যাঁ। ভাবছিলাম, লেকের দিকে যাই— যাবে?'

—'আচ্ছা, তোমার কি মাথা খারাপ— এখন আমি লেকে যাবো? এই স্কুল ঠেঙিয়ে এলাম!'

—'এখন কি আর লেকে যাবার সময়— তুমি যদি চাও, তাহলে সময়মতো যাওয়া যাবে!'

—'না।' পাশ কাটিয়ে প্রভা চ'লে গেল।

নিজের বে-খেয়ালের জন্য নিজেকে করুণা করলো আনন্দ, স্বামী হিসেবে বাতিল জেনেও কেন প্রস্তাব দেওয়া!

এটাই আমার দোষ— বাতিল জেনেও কতবার বনির সামনে গিয়ে বসেছি... পছন্দ করে না জেনেও, এই সেদিনও জ্যোতির্ময়ীদের বাসায় গেছি...

আনন্দ হাঁটছে। মন্থর।

আসলে সেদিন— একটা স্বপ্ন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছিল। ভোরবেলার স্বপ্ন সত্য হ'তে পারে— এমন বিশ্বাসে সে জ্যোতির্ময়ীদের বাড়িতে গেছিল— স্বপ্নে জ্যোতির্ময়ীর কপালে ছিল নক্ষত্রটিপ, বাস্তবে শূন্য কপাল, স্বপ্নে জ্যোতির্ময়ী তার চোখে চোখ রেখেছিল, তার চোখ থেকে নির্গত অলৌকিক রশ্মি আনন্দর চোখে এসে পড়ছিল, ছড়িয়ে পড়ছিল তার মগজে; আনন্দর মনে হচ্ছিল তার রক্তের অসুখ ভালো হয়ে যাচ্ছে, সে অনিন্দ্যকান্তি হয়ে উঠছে; জ্যোতির্ময়ীর পিঠে দুটো ডানা গজাচ্ছে, পরী হয়ে যাচ্ছে জ্যোতির্ময়ী... বাস্তবে খুবই ব্যস্ত ছিল সে, তাকে বসিয়ে রেখে নানান কাজ ক'রে বেড়াচ্ছিল...

আমিও সংসারে মন দিতে চেয়েছিলাম; স্বামী হই, পিতা হই— চেয়েছিলাম; তবু আমি পৃথিবীর মানুষের মতো বাসা বাঁধতে পারিনি, বাসা তো চেয়েছিলাম!

জীবনের অবিরাম বিশৃঙ্খলা স্থির ক'রে নিতে গিয়ে এটা তো বুঝেছি, জীবনের শুভ অর্থ ভালো ক'রে জীবনধারণ— রণ-রক্ত-সফলতার বাইরে আর-এক সত্যে আমি স্থির হ'তে চেয়েছি ব'লে আমি এস্কেপিস্ট— আমার হাতে কারও রক্ত লেগে নেই ব'লে আমি মানুষ হ'তে পারিনি!

আমি বোকা, ক্ষ্যাপা— নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলা এক মানুষ।

একটা সাইনবোর্ড আনন্দকে ডাকলো। থমকে দাঁড়ালো। শো-কেসে থরে-থরে নানান মিষ্টি সাজানো। দু'-একটা মাছি। আনন্দর মুখের ভিতরটা ভিজে উঠছে।

আনন্দ ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে ছিল। একটু আগে সে ফিরেছে। গিয়েছিল পূর্ব্বাশায়। রোববারের সকালে ওখানে সাহিত্যের আড্ডা বসে। আনন্দর খুব একটা যাওয়া হয় না। আজ সে আড্ডায় বসবে ব'লে যায়নি। সঞ্জয়ের কাছে তার একটা হিসেব আছে। মূলত সেটা মনে করানোর জন্য যাওয়া। সে যখন পৌঁছেছিল, তখন আলোচনা বেশ জ'মে উঠেছে। সকলেই কথার ঝোঁকে ছিল। কবিতার বিশ্বময় ছড়িয়ে যাওয়া, ছড়িয়ে থাকার বিষয়ে কথা হচ্ছিল। কবিতার ওপর অন্য কবিদের প্রভাব, আত্মা-পরমাত্মার মতো বিষয় হয়ে উঠছিল। একসময় উদাহরণ হিসাবে তাকে টেনে আনলো সঞ্জয়, 'আপনার কাব্যের সঙ্গে শেলি-কীট্‌স্‌-হুইট্‌ম্যান, ইয়েট্‌স-রিল্‌কে-এলিয়ট, ডিলান টমাস— এঁদের কবিতার আত্মীয়তা রয়েছে না?'

এ-প্রশ্ন আনন্দকে কিন্তু উত্তর পাওয়ার জন্য নয়। বছর-দশেক আগে তাকে নিয়ে এক প্রবন্ধে সঞ্জয় এসব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। আনন্দ চুপ ক'রে শুনছিল। সেবার সেই প্রবন্ধপাঠের পর যে-প্রশ্ন উঠেছিল আনন্দর মনে, প্রকাশ হয়নি, তা যেন আজ প্রকাশ হ'তে চাইলো ফের, কথার ফাঁকে একসময় বললো, 'একজন সচেতন কবিকে পূর্বজ ও সমসাময়িক কবিরা একই সঙ্গে কি প্রভাবান্বিত করতে পারেন?'

—'আমি কি প্রভাবের কথা বললাম এতক্ষণ? প্রভাব নয়, আত্মীয়— আত্মীয়তার কথা বলতে চেয়েছি— আপনি এঁদের বংশপরম্পরায় আছেন, এটাই সোচ্চারে বলতে চাই।'

তার দৃঢ়প্রত্যয়ী উত্তেজিত মুখমণ্ডল, পুরু কাচের আড়ালে কথা-বলা-চোখ মনে ক'রে আনন্দ একটু হাসলো— সঞ্জয় তাকে ভালোবাসে, বুদ্ধদেবও; প্রভাকর, সুরজিৎ, ভূমেন— এইসব সদ্য যুবকেরা— ছাদের দিকে তাকিয়ে সে ভূমেনের কথা ভাবছিল, ঠিক ভূমেনকে নয়, আত্মহত্যা করেছে যে-মেয়েটির কথা ভূমেন বলেছিল, অনেকটা তার কথা— কিংবা তাও নয়, সে তার এই ঘরে সিলিঙের সঙ্গে আটকানো একটা আংটার কথা ভাবছিল; কড়িবর্গা আছে, আংটা নেই।

পূর্ব্বাশা থেকে ফেরার পথে ভূমেন তার সঙ্গে ছিল, বাসে ক'রে ফিরছিল। কথায় কথায় ভূমেনদের আস্তানার কথা উঠলো— একটা ঘরে তারা ক'জন মেস্‌ ক'রে থাকে। সেই ঘরে সিলিঙের আংটায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে একটি মেয়ে নিজেকে খুন করেছিল, সেই আংটায় এখনও নাকি শাড়ির এক টুকরো লেগে আছে।

মেয়েটির সাহস আছে বলতে হবে! আমি কতবার পরিকল্পনা করেছি,— পারিনি। কেন? ঠিকমতো জাস্টিফাই করতে পারিনি ব'লে? মেয়েটির জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে তাই যুক্তি খাড়া করতে চাইছি আজ?

—'মেয়েটা আত্মহত্যা করলো কেন, জেনেছো কিছু?'

—'ওই বয়েসী মেয়েদের আত্মহত্যার কারণ হাতে গুণে বলা যায়।'

—'নাঃ।' কেমন যেন কঁকিয়ে উঠেছিল আনন্দ, 'কোনো বয়সেই তা যায় না।' একটু চুপ থেকে ফের বলেছিল, 'যে-কোনো আত্মহত্যায়— খোঁজ করলে দেখবে, লোকে যা বলছে, পুলিশ যা বলবে, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট— এসবের চেয়ে কারণটা অনেক বেশি অস্পষ্ট—' বাসের জানলার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে, দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বললো, 'একথাটা কি কখনও ভেবে দেখেছো ভূমেন, যে-ঘটনা জীবনে নিজে থেকে ঘটবে, যা অনিবার্য, তাকে কেউ নিজে ঘটায় কেন?'

ভূমেন কিছু বলেনি। বলার মতো বয়েসও হয়নি তার।

—'ঘটায়, কেননা— সে সদর্থক বেঁচে-থাকাকে ভালোবাসে ব'লে, রোগে-শোকে, সুখে-দুঃখে, সফলতা-অসফলতায় ক্রমাগত বেঁচে থাকতে চায় ব'লে— কিন্তু এই চাওয়ার মধ্যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরের কোনো চিড় যখন ক্রমাগত ফাটলের আকার নেয়, তখন— ভালোবাসার জিনিসটাকেই সে ভেঙে ফ্যালে— এসব মৃত্যু জীবন-লালসার ঠিক উল্টোপিঠ।'

জীবন-লালসা, তা-ও তো স্তিমিত হয়ে এলো। এ-পৃথিবীতে যা হবার নয়, হয়ে গেল। প্রত্যাশামতো কিছুই ঘটলো না। কিন্তু একটা চিড় ধরেছে, নিজেরই পাপে— অশান্তি অভাব-যে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা নষ্ট ক'রে দেয় আমার মতো আর কে ভুক্তভোগী আছে— কী কুক্ষণেই যে সাব্‌লেট্‌ দেবার কথা ভেবেছিলাম! করুণা-প্রেম এসব আমাকে বশীভূত করেছিল ঠিকই, কিন্তু কেন আমার মনে পড়েনি— নারী নরকের দ্বার, দুর্ভোগের অন্য নাম নারী!

মনে পড়লেও তুমি তাকে নেগেট্‌ করতে। আরও আলো: মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়। কে বলতে পারে এই মেয়েটির গভীর হৃদয় নেই! এভাবেই তুমি যুক্তি খাড়া করতে।

কিন্তু এখন আমি হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি।

কী অদ্ভুত ব্যঙ্গ করে প্রভা, আমি নাকি ওই মহিলার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলাম! আরও নাকি কী-সব অভিসন্ধি ছিল। অভিসন্ধি-ভাবনায় আনন্দর একটা গল্পের কথা মনে পড়লো। নিজেরই লেখা, ছ'-সাত বছর আগে লিখেছিল— আর-পাঁচটা গল্পের মতোই সে-গল্পেও জীবনের নিষ্ফলতা-আক্ষেপ ধ্বনিত-প্রতিফলিত হয়েছিল— প্রভার মধ্যে যে জিনিস ছিল, সেই গল্পেও তা সে স্বীকার করেছে; তার প্রবল কামুক প্রকৃতিতেও প্রভার শরীর-যে কোনো ভাব জাগাতো না, দু'-একটা জান্তব ব্যতিক্রম ছাড়া; প্রভার মন-যে তার মনকে নাড়া দিতে পারে না— এসবের অকপট দায় স্বীকারের সেই গল্পে তার ভালোবাসার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছিল। আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'এ-জীবনে বহতা সৌন্দর্য প্রকৃতির— নারীর মননের— ভালোবেসেছি, আর স্থিরতাকেও। স্থিরতা ঠিক সৌন্দর্য নয়, বলা চলে চেতনা অভিনিবেশের— এ আমারও ছিল, আমি যাকে চাই তারও— পরস্পরকে একজন ক'রে আর নেওয়া হলো

না—' ফলে সে-গল্পেও প্রভাকে মেরে ফেলেছিল আনন্দ। আর মৃতদার আনন্দ অতি স্বাভাবিক হয়ে উঠলো যেন, কোথাও কোনো ভুল হয়নি, পাপ হয়নি, কোথাও কোনো ছেদ অবচ্ছেদ তাকে খণ্ডিত করেনি— এরকম একটা ভাব রপ্ত হয়েছে দেখে একজন আলাপী জুটেছিল, সে ছিল বিধবা; গল্পে তাকে 'বাজে স্ত্রীলোক' ব'লেই উল্লেখ করেছে—

গল্পের শেষ-ক'টি বাক্য হুবহু মনে পড়লো: সুযোগ পেলেই বিধবাটি অসিতের কাছে আসতো। এ কোনো মিলন নয়— সঙ্গম নয়— আলাপ পরিচয়ও নয়। অদ্ভুত এই খেলা— এর কোনো বিষময় পরিণতিও নেই।

সাব্‌লেট্‌ করবার সময় বিধবা মহিলাটির প্রতি অমন কোনো মনোভাব হয়তো অবচেতনে ছিল— অথচ কী বিষময় পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আনন্দ—

—'বাবা!' দরজায় রঞ্জু, 'মা-র হয়ে গেছে। চান করবে তো!' দরজা থেকে স'রে গেছে সে। আনন্দ উঠলো। চান না-করতে পারলেই যেন ভালো হতো। শীতের দুপুর। দ্রুত বিকেলের দিকে ঢ'লে পড়ছে। বাঁ-হাত দিয়ে ডান হাতের নাড়ি টিপে অনুভব করার চেষ্টা করলো, প্রেসার বেড়েছে কিনা,... একটু যেন জ্বর-জ্বর।...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারিদিকে হিংসা দ্বেষ কলহ রয়েছে;
সময়ের হাত এসে সে সবের অমলিন, মলিন প্রেরণা
তবুও তো মুছে দিয়ে যেতে পারে— ভাবি।

বসন্তোৎসবের সময় শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলা হবে, আয়োজন চলছে। এটি একটি স্মরণোৎসবও বটে— গত বছর পূর্ব-পাকিস্তানে একুশে ফেব্রুয়ারির দিন ভাষা-আন্দোলনের ওপর পুলিশ গুলি চালানোয় যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের স্মরণে এই সাহিত্যমেলা। এ-খবর আনন্দ জানতো, সুরজিৎ জানিয়েছিল, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে লেখক-কবিরা আসবেন।

আনন্দ বলেছিল, 'খুব ভালো কাজ হবে।'

ওই ঘটনার পরে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামে আনন্দ একটা ফরমায়েসী লেখা লিখেছিল। কিন্তু ভাবনাটা তাৎক্ষণিক ছিল না, দেশভাগের সময় থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে— এ-বিষয়ের আলোচনা মাঝেমধ্যে খবর হয়েছে— উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হবে— এরকম একটা মত পাকিস্তানপন্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ধর্ম ও দেশ-ধারণার বাইরেও-যে মানুষের অন্য আত্মপরিচয় থাকতে পারে, আর তা প্রতিষ্ঠার জন্যে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পটভূমি প্রস্তুত হ'তে পারে— ওপার বাংলায় ঘটনাটা না-ঘটলে জানা যেতো না। এই সাহিত্যমেলায় পুববাংলা থেকে যাঁরা আসবেন, তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানা যাবে— এই আকাঙ্ক্ষায় আনন্দ সুরজিৎকে জানিয়েছিল, 'আমি যাবো। থাকার ব্যবস্থা কোরো, আর কত কী খরচ পড়বে— একটু জানিয়ে দিও।'

মেলা কমিটি আনন্দকে চিঠি পাঠিয়েছে— সে যদি যায় মেলা কমিটিই সব দায়িত্ব নেবে। অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয়নি। গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু এ-মাসের আঠাশ তারিখে তার কাজের শেষ দিন। সম্মেলন শুরু হচ্ছে আঠাশে— চলবে দু' তারিখ পর্যন্ত। সদ্য-বেকার অবস্থায় সাহিত্য সম্মেলনে যাওয়া ঠিক হবে না। মার্চ মাস থেকে তো তাকে প্রভার আয়ের ওপর নির্ভর করতে হবে। এসময় টাকা ধ্বংস করা চলবে না। তাছাড়া এর মধ্যে হয়তো ফকিরচাঁদ কলেজের ইণ্টারভ্যু লেটার এসে যাবে।

আনন্দ না-যাবার সিদ্ধান্ত নিলো।

মেলা শেষ হবার পর-পরই সুরজিৎ এলো। তখন দুপুর। তাকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল, 'আপনাকে দেখে তো অসুস্থ মনে হচ্ছে না!'

—'দাঁতে ব্যথা, বুঝতে পারছো— সব কি বাইরে থেকে বোঝা যায়?'

—'তা অবশ্য যায় না— আপনি যাবেন বলেছিলেন কিন্তু শুভেচ্ছাপত্রে যেতে না-পারার কারণ হিসেবে শারীরিক অসুস্থতার কথা লিখেছেন, প'ড়ে ভাবলাম— কী হলো—'

—'না-যাওয়ার পিছনে অনেক কারণ, সব ঘটনার পিছনেই হয়তো থাকে— গত এক তারিখ থেকে আমি আবারও বেকার হয়ে পড়েছি, একটা ইণ্টারভ্যু লেটার পাওয়ার কথা ছিল সেটা অবশ্য পেয়েছি তিন তারিখে; কত বড় বড় কবি-সাহিত্যিক আসবেন তাঁদের

মাঝখানে আমি লিলিপুট— শেষপর্যন্ত আর যেতে ইচ্ছে করলো না— ধরতে পারছো অসুখটা কোথায়?'

সুরজিৎ কী যেন ভাবছিল।

—'কেমন হলো সম্মেলন?'

—'অনেক তর্ক-বিতর্ক হলো। আপনি না-গিয়ে ভালোই করেছেন।'

—'কেন?'

—'সুভাষদা যা বললেন, আপনার মন খারাপ হয়ে যেতো।'

—'কী বলেছেন, একটু বলো, শুনি!'

—'না-শোনাই ভালো।'

—'খুব কটুকথা কী আর বলবে সুভাষ— কটুকথা কম শুনিনি জীবনে— গণ্ডার কবি, পাগল— যাকগে, তুমি বলো!'

—'সুভাষদা একটা প্রবন্ধ পাঠ করেছেন— পাঁচ বছরের কবিতা, উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে বাহান্ন— মূলত বাংলাকবিতা-যে মানুষের মুখের ভাষাকে গ্রহণ করেছে, জীবনের কাছাকাছি চ'লে এসেছে— এটাকে বিষয় ক'রে গদ্যকবিতার সম্ভাবনার কথা বলেছেন— মানুষের জীবন-সংগ্রামের নানা দিক প্রতিফলিত হচ্ছে কবিতায়— এ-বিষয়ে বলতে-বলতে আপনার প্রসঙ্গ এলো— সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও আপনি নাকি ভাবান্তরহীন কবি।'

আনন্দ একটু হাসলো, 'আর?'

—'আপনার পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে কিন্তু সুভাষদা তারিফ করেছেন— সমস্ত কিছুই আপনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেন আর তারপর একের পর এক তাদের মুখগুলো ধূসর কুয়াশায় মুড়িয়ে দেন। আকার থেকে নিরাকারে আপনার যাত্রা— এহ্, এইরকম কথা সব— আপনি অবশ্য একা নন, অমিয় চক্রবর্তী আপনার দলে— মানুষের ভাগ্যের প্রতি উদাসীন অবজ্ঞা আপনাদের।'

—'কেউ কোনো প্রতিবাদ করেননি?'

—'বুদ্ধদেববাবু করেছেন। আমি সুভাষদাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছি— ভাবছি একটা চিঠি লিখবো।'

—'কী হবে লিখে?' ব'লে আনন্দ একটু সময়ের জন্য অন্যমনস্ক থেকে বললো, 'বরং, তুমি একটু খোঁজখবর নিও তো— কয়েকটা উপন্যাস লেখা আছে, কেউ যদি ছাপে!'

—'আপনি উপন্যাসও লিখেছেন!'

—'চেষ্টা করেছি বলতে পারো।'

—'কতদিন আগে?'

—'সেই তিনের দশকে লিখেছিলাম কিছু, আর বছর-পাঁচেক আগে— চারটে, এই চারটের দু'-একটা প্রকাশ করা যেতে পারে।'

সুরজিৎ সেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললো, 'আমাকে পড়তে দেবেন?'

আনন্দ মাথা নেড়ে বললো, 'তুমি এখনও 'ইউলিসিস'-এর আবহাওয়ার মধ্যে আছো, আমাকে ভালো লাগবে না!' কী ভেবে নিয়ে বললো, 'তুমি তো পড়বেই, তার আগে তুমি একটু দেখো— কতদিন আবার বেকার থাকতে হয়, কে জানে! —শুনেছি, নীহাররঞ্জন গুপ্ত উপন্যাস লিখে যা আয় করে, তা তার ডাক্তারির আয়ের চেয়ে বেশি?'

—'হ্যাঁ, তাঁর বইয়ের বেশ কাট্‌তি আছে— উপন্যাস— তবে রহস্যোপন্যাস। শুনেছি ডাক্তারি বিদ্যাটাকে খুব ভালোভাবে লেখায় ব্যবহার করেন!'

—'জাত বদ্যি।' হেসে উঠলো আনন্দ, হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললো, 'আমিও বৈদ্য।'

—'আপনি আর কাউকে বলেননি?'

—'সঞ্জয়বাবুকে বলেছিলাম, বে-নামে উপন্যাস ছাপার কথা— উনি কিছু বলেননি, আমিও আর মনে করাইনি।'

হঠাৎ যেন কথা ফুরিয়ে গেল। সুরজিৎ একটা পত্রিকা নাড়াচাড়া করছিল। হয়তো কথা খুঁজছিল। আনন্দ ভাবছিল, তার ছেলের বয়েসী ছেলেটা কী উজ্জ্বল, এর উপর নির্ভর করা যায়— কতদূর থেকে তার অসুস্থতার খবর জেনে ছুটে এসেছে— আনন্দ বললো, 'আমি খুবই দুঃখিত সুরজিৎ—'

—'কেন, কী হয়েছে!'

—'এই যে, আমার মিথ্যে শরীর খারাপের খবর তোমাকে ছুটিয়ে এনেছে।'

—'ও বাদ দিন— নতুন কিছু লিখলেন?'

—'নাঃ!' একটু ভেবে নিয়ে বললো, 'আসলে আমি ফুরিয়ে গেছি। কোথাও আর আর্ট-সিচ্যুয়েশন তৈরি করতে পারি না, পারছি না। পারলে, এই দুর্দশা থেকে একটু নিস্তার পাওয়া যেতো।'

AMARBOI.COM

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
শত জলঝর্নার ধ্বনি।

রূঢ় বাস্তবের মধ্যেও স্বপ্নের মতো কখনও-কখনও নিস্তার আসে, যদিও আনন্দর জীবনে তা কয়েকবার এসেছে, আবারও এলো। আজ ছিল তার ইণ্টারভ্যু। এই ল্যান্সডাউন রোডেরই একটা বাড়িতে ইণ্টারভ্যু-রুমে ঢোকা। অভ্যর্থনা পাওয়া। এসবই বাস্তব। তবু স্বপ্নের মতোই মনে হচ্ছে ব্যাপারটা।

—'আপনি কি মিস্টার বসু?'

এটাও বাস্তব। নিজের নাম বলাটাও বাস্তব।

নামটা শুনেই একজন উঠে দাঁড়ালো, তার গাম্ভীর্যের মুখোশ খ'সে গিয়ে জেগে উঠলো সম্ভ্রমের দৃষ্টি, 'আসুন দাদা, আসুন! বসুন! আপনার জন্যই আজ আমি এখানে এসেছি।'

কোনো ইণ্টারভ্যু-বোর্ডে এরকম হয় না, কোথাও শোনেনি সে, ফলত আনন্দর মনে হয়েছিল, সে স্বপ্ন দেখছে। ঝাপ্‌সা একটা মুখ। একটুও চেনা আদলে নেই। আনন্দ বসলো। সেও বসতে-বসতে বললো, 'যাতে আপনার চাকরিটা হয়। এতক্ষণ আপনার কথাই আমি এঁদের বলছিলাম, এঁরা সকলেই আমার বন্ধুস্থানীয়। আপনার চাকরি হয়ে গেছে।' আনন্দ স্বপ্নাবিষ্টের মতো, বিস্ময়ের ঘোরে মানুষটাকে দেখছিল। বার-কয়েক চশমার কাচ মুছে নিয়েছিল তার মধ্যে।

তখন একজন জিগ্যেস করলো, 'আপনি কোলকাতা থেকে যাতায়াত করবেন, না ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে থাকবেন?'

আনন্দ— 'একটু ভেবে দেখি' বলবার আগেই আর একজন বললো, 'এখান থেকে যদি যাতায়াত করেন, যেদিন সকালের দিকে ক্লাস থাকবে, সেদিন কিন্তু আপনাকে অনেক সকালে বেরুতে হবে।' আনন্দ ভাবছিল... তার সিদ্ধান্ত নেওয়াকে সহজ করতেই যেন কথার খেই ধ'রে সে বললো, 'কলেজের হোস্টেলে থাকতে পারেন। যদি ফ্যামিলি নিয়ে যেতে চান, তাহলে বাড়ির ব্যবস্থা করা যাবে।'

এ যেন এক ইচ্ছাপূরণের গল্প।

তবু আনন্দ সময় নিয়েছে। কাল-পরশুর মধ্যে সে জানাবে ব'লে এসেছে।

যে ছেলেটি, ছেলেই বটে— কত আর বয়েস হবে— পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, তার চাকরিটা যাতে হয় নিশ্চিত করতে এসেছিল, কেমন যেন অলৌকিক, নাম তার গোপাল, সে একটু-আধটু লেখালেখি করে, কাজ করে 'ভারতবর্ষ' কাগজে— সে নাকি আনন্দর ভক্ত। এই তো কবিতার শক্তি! কোথাকার কোন্ মানুষকে যে সে আত্মার দোসর ক'রে নেয়! কাউকে কাউকে দেয় ত্রাতার ভূমিকা!

আনন্দ ভাবছিল।

কিন্তু এ মুক্তি তার জন্য নয়। অন্তত পাঁচঘণ্টা লেগে যাবে যাতায়াতে— কী ক্লান্তির বোঝা-যে চাপবে! হোস্টেলে থাকবার উপায় নেই— বাসায় সোমত্ত মেয়ে, বউ; ঠিক হবে না ওদের ফেলে যাওয়া, তার ওপর ওই ভাড়াটে বিধবা— আর ফ্যামিলি নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, প্রভার স্কুল আছে। সে যদি হোস্টেলে থেকে কলেজ করতে চায়, করতে পারে, প্রভা বলেছে, খুব একটা অসুবিধে হবে না।

'বরং সুবিধেই হবে।' বিড়বিড় করলো আনন্দ, 'দুঃখিত, সুবিধা ক'রে দিতে পারছি না ব'লে।'

এই ক'বছরে ঘরটার প্রতি একটা মায়া জ'ন্মে গেছে, কেমন একটা ডেন্ যেন, এখানে ঢুকে পড়তে পারলেই— এক ধরনের নিস্তার পাওয়া যায়। হোস্টেলে তা পাওয়া যাবে না। এখানে ব'সে কিছু আর্ট-সিকোয়েন্স এখনও তৈরি করা সম্ভব, যা রিয়েলিটিতে কন্‌ভার্ট হ'তে পারে।

এই-যে আমরা দু'জন পাশাপাশি ঘরে থাকি, কেউ কারও প্রয়োজনে লাগি না। কথা না-বলতে পারলেই যেন ভালো, তবু বলতে হয়, নিতান্ত কেজো কথা। বিড়ম্বনা।

আমি নাকি সংসার বুঝি না, সংসারের প্রতি আমি নাকি উদাসীন— তাহলে আমি কবিতা লিখি কেন?

আসলে কবিতার পৃথিবীতে যে-সংসার গ'ড়ে ওঠে, তার হদিস সবাই পায় না, প্রভা পায়নি, কেউ কি পায়, এমন-কী বাণী— এই সেদিন, বাণীর ফ্ল্যাটে কতবারই তো গেছে আনন্দ, কখনও তেমন মনে হয়নি, সেদিন তার মনে হলো, কী শান্ত নির্জন; আনন্দ কেমন এক ঘোরের মধ্যে বলেছিল, 'আপনার বাড়িটায় যদি থাকতে পারতাম, কী ভালোভাবেই-না লিখতে পারতাম! কত কী লিখবার আছে! আপনার ঘরটি যদি পেতাম।' সেটা ছিল একটা আর্ট-সিচ্যুয়েশন।

বাণী তো বলতে পারতো, বেশ তো, আসুন না আপনি! যদি বলতো, হয়তো ওই সিচ্যুয়েশনটা ভেঙে পড়তো, কিংবা— সত্যিই সে একদিন লিখবার জন্য চ'লে যেতো। কে জানে হয়তো একটা মহৎ উপন্যাস লেখা হ'তে পারতো। কবিতার পৃথিবীতে রক্তপাতহীন নানান সম্ভাবনা— সেখানে শুকুতে দেওয়া শাড়ি বৃষ্টিতে ভিজলে স্ত্রীর চোখ থেকে স্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রে বেরোয় না। কবিতার পৃথিবীতে নৈঃশব্দ্য কথা বলে। জীবনের পারে থেকে মৃত্যুর ওপার দেখা যায়।

ক্রমশ কবিতার পৃথিবী থেকে আনন্দ নির্বাসিত হচ্ছে, এ-পৃথিবী থেকে নিজেকে নির্বাসনে পাঠাতে পারলে, একটি নদী পাওয়া যেতো— ডায়মণ্ডহারবারে বিশাল ব্যাপ্তির নদী আছে— কিন্তু নদী আজকাল আর তাকে টানে না। ভাবনা কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল।

আনন্দর মনে হচ্ছে, সে যেন প্রভার অপেক্ষায় রয়েছে। প্রভার সঙ্গে জরুরি কী একটা আলোচনা আছে— বিষয়টা মনে পড়ছে না।

একবার কোথাও বেড়াতে যাবার কথা হয়েছিল— হয়েছিল কি? জলপাইগুড়িতে গেলে হয়। সুরজিতের বাড়িতে গিয়ে ওঠা যাবে। সেই কবে ফোটোগ্রাফে দেখা সুরজিতের বাড়ি, বাড়ির সামনে সমস্ত প্রকৃতি আনন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠলো— কোথায় যেন ছবিগুলো আছে, সুরজিৎ পাঠিয়েছিল— ঝিল, হাঁস, শিরীষগাছ, ঘাস...

ছবিগুলো খুঁজলো। পেলো না। কোথায় কোন্ বইয়ের মধ্যে রাখা আছে। আর খুঁজলো না।

আচ্ছা, এখন যদি তুমি ম'রে যাও?

মুক্তি।

আবার আসিবে কি ফিরে?

আনন্দর মাথা না-ভঙ্গিতে নড়ছে।

প্রভা-রঞ্জু-মঞ্জুর কথা ভাবছো কিছু?

না। প্রকৃতির নিয়মেই তারা নিজেদের মতো ক'রে বাঁচবে। যেমন আমাদের সাব্‌লেট্ শ্রীমতী বাঁচছেন—

আচমকা আনন্দর একজন মৃতদার মানুষের কথা মনে পড়লো— লোকটাকে সত্যিই কি আমি আমার মেস্‌জীবনে দেখেছিলাম? তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল— তা কি স্বপ্নে অথবা কল্পনায়? ঠিকভাবে মনে করতে গিয়ে আনন্দ দেখলো, ব্যাপারটা আদতে ছিল একটা আর্ট-সিচ্যুয়েশন। কিন্তু তার অরিজিন মেসে থাকা অস্বাভাবিক নয়।

আনন্দর মনে হলো লোকটাকে সে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিঙে দেখেছিল, তার নামটাও মনে পড়লো—

বিপিন ঘোষ—

আনন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে: বোর্ডিঙের একটা অন্ধকার ঘর। তার মধ্যে গাঁটরি-বোঁচকা নিয়ে চুপচাপ ব'সে আছে বিপিন ঘোষ। জীবনের প্রত্যাশাভরসা-শূন্যতার প্রতীক যেন। মৃতদার।

আনন্দ তখন প্রায়ই গল্পে প্রভাকে মেরে ফেলছে—

ওই ঘরে কি আমি নিজেকে দেখেছিলাম?

একদম না। তুমি তোমার দাম্পত্যের কনট্রাস্ট দেখাতে চেয়েছিলে।

কিংবা, চেয়েছিলাম অমন দাম্পত্য। আমি চেয়েছিলাম প্রভা একটা সোয়েটার বুনে দিক আমাকে।

বিপিন ঘোষের সঙ্গে আনন্দর কথোপকথন বেশ মনে প'ড়ে যাচ্ছে:

—আমার স্ত্রী একটা সাদা উলের গোলা হাতে করে হাসতে হাসতে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলেন—

—উলের পেটি?

—হ্যাঁ, ভেস্ট্ বুনছিলেন আমার জন্যে—

—ওঃ!

—বুনছিলেন আশ্বিন মাসে— দেশে শীত পড়বার আগে। গেল শীতে গরম জামার অভাবে খুব কুঁদেছিলুম; না, তত বেশি কুঁদিনি বটে, আমি তো ছেলেমানুষ নহ; তবে কোঁ-কোঁ করতুম খুব, সত্যিই ভারী শীত-কোঁৎকা হয়ে গিছলুম, টের পেয়েছিলেন উনি। কাজেই এবারে উলের জামা বানিয়ে দিচ্ছিলেন—

এই টের পাওয়া— ভালোবাসা না-থাকলে টের পাওয়া যায় না, নিনি পেয়েছিল— নিনি তাকে একটা সোয়েটার বুনে দিয়েছিল।

নিনির দু'হাত কুরুচ-কাঁটা দিয়ে উল বুনছে— এই আশ্চর্য দৃশ্যটা আনন্দ কতবার স্বপ্নে দেখেছে।

বিপিন ঘোষের স্ত্রী বুনতে-বুনতে তার সঙ্গে হেসে কথা বলতে-বলতে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেলেন, ব্যাস।

অথচ ভেস্ট্ বোনা শেষ হয়ে এসেছিল— বিপিন ঘোষের ওপর আনন্দর এখন একটু রাগ হলো, যেন সে তার সামনে রয়েছে, আনন্দ বললো, 'রাত্তিটার জন্যে বায়না দেবার আর সময় পেলেন না!'

তখনই প্রভা ফিরলো। কথাটা সে শুনে ফেলেছে, বললো, 'কার সঙ্গে কথা বলছো?'

—'শুনবে তুমি? তাহলে বোসো!'

প্রভা বসলো।

—'একটা লোক, তার স্ত্রী কীভাবে মরেছিল, সেকথা একবার আমাকে বলেছিল। হঠাৎ আজ মনে পড়লো তার কথা— মনে হলো, সে নিজেই তার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ— মেয়েমানুষটা উল বুনছিল, বিপিন তার পাশে ব'সে এটা-সেটা বলতে-বলতে সে-রাতে তারা মিলিত হবে— এই মর্মে কথা হলো— লোকটার ভাষায় 'বায়না দিয়ে রাখা'— মেয়েমানুষটা বোনায় ভুল করলো। কেন ভুল করলো— এটাও ভাববার মতো কথা, যৌনতার কথায় আমাদেরও ঢের ভুল হয়ে গেছে। সে যাকগে আবার নতুন ক'রে শুরু করতে হলো, তার ওপর, লোকটার ভাষায় 'বায়নার কাজে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল— প্রায় শেষ-রাত অব্দি। রক্তের চাপ বেড়ে গেছিল খুব'। পরদিন একটু বেলা ক'রে উঠেই রোদ্দুরে ব'সে বুনতে শুরু করলো, একসময় মাথা ঘুরে প'ড়ে গেল— আর উঠলো না।

বউকে বিপিন খুব ভালোবাসতো— এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত, ভাবছিলাম, ভালোবাসার মধ্যে কি মৃত্যু থাকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভা হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'কপালে-যে আমার কী আছে!'

—'কেন? কী হলো আবার?'

—'তোমাকে নিয়ে আবার পাগলা-গারদে ছুটতে না-হয়।'

—'ওঃ, এই কথা!' একটু চুপ থেকে বললো, 'ডায়মণ্ডহারবার কলেজের কাজটা আমি নিচ্ছি না।'

—'নিতে পারতে—'

—'না, ভেবে দেখলাম, আমার দিন বোধহয় ফুরিয়ে আসছে, হোস্টেলের ঘরে একা ম'রে প'ড়ে থাকবো—'

—'তাতে ভয় করবে বুঝি তোমার?' ব'লে হেসে উঠলো প্রভা। রসিকতার মধ্যে আশ্চর্য এক প্রাণোচ্ছলতা রয়েছে দেখে আনন্দর ভালো লাগলো। সে বললো, 'তা তো একটু করবেই— কিন্তু ব্যাপারটা অন্য, মৃত্যুর সময় তুমি আমার কাছে থাকবে না, তোমাকে দেখতে পাবো না— এ দুঃখ ম'রেও কি আমার যাবে?'

—'আচ্ছা, লোকে বলে— তুমি কম কথার মানুষ— তা এত বকছো কেন?'

—'আমি তো প্রাণের কথা বলছি, তোমার বকা মনে হচ্ছে— জীবনের কথা, ভালোবাসার কথা কেউ শুনতে চায় না— তাই আমি চুপ থাকি— রবীন্দ্রনাথের ওই গানটা জানো তো— আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল— কেউ জিগ্যেস করে না, কথা হয়?'

প্রভা কিছু বললো না। আনন্দ 'সুবোধ তো এখনও এলো না' ব'লে উঠে দাঁড়ালো। সুবোধ এলে সে বেড়াতে বেরুবে। আনন্দ এক পা, দু' পা ক'রে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালো।

AMARBOI.COM

—'কন্‌গ্রাচুলেশন আনন্দবাবু!

—'ওয়েলকাম জানাতে পারছি না, দুঃখিত।'

—'আপনি খুশি হননি!'

—'আপনি বুঝি খুব খুশি?'

—'তা তো হয়েইছি, আমার প্রিয় কবি রবীন্দ্রপুরস্কার পাচ্ছেন— এ তো খুশি হবারই কথা!'

—'সঞ্জয়বাবু, আপনিও ধরতে পারলেন না ব্যাপারটা?'

—'কী বলুন তো!'

—'সাতটি তারার তিমির-কে বাদ দিয়ে বনলতা সেন কেন? পুরস্কারের তো উদ্দেশ্য থাকে— কবির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা, যদি ধ'রে নিই তার অন্যতম— তাঁরা বনলতা সেনের কবিকেই হাইলাইট করলেন—'

—'বনলতা আপনাকে খ্যাতি দিয়েছে—'

—'বাট দ্যাট্‌স্‌ অ্যা ক্লোজ্‌ড চ্যাপটার। কিন্তু বনলতার বাজার আছে।' রহস্যময় এক হাসি ফুটে উঠলো আনন্দর চোখে-মুখে, 'বারো বছর আগেকার কবিকে বারো বছর পর স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে—'

—'তবু বনলতা-য় এমন কয়েকটি কবিতা আছে, যা সাম্প্রতিক— একইসঙ্গে আবহমানের— আমি যদি হতাম, সুচেতনা— কিছু মনে করবেন না আনন্দবাব, আপনি যাকে ক্লোজ্‌ড চ্যাপ্টার বলছেন তা প্রবহমানতার সঙ্গে থেকে যাবে— আপনার প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা, বিদ্রোহ ও সত্যচেতনা— আমাদের ডেকে নিয়ে যায় শান্তিসংঘের দিকে— ধর্মে— নির্বাণে' আনন্দর মুখের দিকে চেয়ে থেকে গাঢ় স্বরে বললো, 'তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে—'

মহাজাতি সদনের মঞ্চে ব'সে এসব আনন্দর মনে পড়লো। যেন যথার্থ মনে হলো। সামনে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, প্রায় হাজার-দুই দর্শক তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, সঞ্জয়ও আছে কোথাও— এত মানুষ কবিতা ভালোবাসে— এঁরা সবাই প্রেমিক!

আনন্দ অভিভূত।

আলো, গুঞ্জন, করতালি— আনন্দ সংবর্ধিত হচ্ছিল, একটা স্বপ্ন যেন... তাকে বলতে বলা হবে, কথা সাজাচ্ছিল: আপনারা-যে আমার কবিতা গ্রহণ করেছেন— এটাই আমার সবচে' বড় পুরস্কার। আজ তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেন 'নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন'-এর উদ্যোক্তারা, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আজ আমার বিশেষ কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলার নেই। তবে, পরবর্তী কোনো অধিবেশনে, এই সম্মেলন যদি চায়, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আমি কিছু বলবো। ধন্যবাদ!...

আনন্দ-যে রবীন্দ্রপুরস্কার পাচ্ছে, খবর হয়েছিল। —বনি-জ্যোতির্ময়ীরা কি এসেছে? আনন্দর ঝাপ্‌সা দৃষ্টি খুঁজছিল তাদের, যে দু'-একটা নারী-মুখ তার নজরে পড়ছিল সবাইকে তার— হয় বনি, না-হয় জ্যোতির্ময়ী মনে হচ্ছিল। কে এক মেয়ে তার দিকে হাত তুললো যেন, অনেকদিন পর এক-ভিড় মুখের মধ্যে হাত তুলে নিজেকে জানান দেওয়ার মতো ক'রে, ওই তো সে এগিয়ে আসছে— কী সর্বনেশে কাণ্ড দ্যাখো, মেয়েটি ডায়াসে উঠে-এলো, আনন্দ একটু বিব্রত যেন, তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো, যেন এখনই সে সমবেত দর্শকদের উদ্দেশে বলবে, এ-কবির অভিভাবিকা আমি, না— আমি বনলতা সেন নহ, আমি দীপ্তি— মেয়েটি তার কাঁধে হাত রেখেছে, কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বলছে—

—'আনন্দবাব, এবার আপনাকে কিছু বলতে বলা হচ্ছে।'

আনন্দ যা বলবে ভেবেছিল তা মনে করবার চেষ্টা করতে করতে মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবুও মূল্য ফিরে আসে
নতুন সময়তীরে সার্বভৌম সত্যের মতন
মানুষের চেতনায় আশার প্রয়াসে।

—'আসুন! আসুন গোপালবাব! আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম।'

—'সে তো আমার সৌভাগ্য।'

তারপর ঘরে এসে আনন্দ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'শ্রীকৃষ্ণের শতনামের এক নামে আপনার নাম— আপনিও কি অন্তর্যামী?'

—'কী যে বলেন!'

—'সত্যিই আমি আপনার কথা ভাবছিলাম— আর আপনিও এসে গেলেন, এরকম সব কাণ্ড ঘটতো না শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের জীবনে? আচ্ছা, আপনাকে কি বনলতা সেন বইটা দিয়েছি?'

—'দিয়েছেন মানে— একেবারে অটোগ্রাফসহ—'

—'ভুলে গেছি— খুব ভুলছি জানেন, এক-একটা ব্যাপার যখন মনে পড়ে, খুব আপশোষ হয়— তেমনই একটা ভুল হয়েছে, তাই ভাবছিলাম আপনার কথা।'

গোপালের অবাক হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কী যেন ভেবে বললো, 'কাল নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন আমাকে সংবর্ধনা জানিয়েছে— এই ব্যাপারটা আমি আপনাকে জানাতে ভুলে গেছিলাম, ঠিক হয়নি।'

—'আপনি-যে রবীন্দ্রপুরস্কার পাচ্ছেন— ছোট্ট একটা খবর বেরিয়েছিল, এবারই তো সাহিত্য সম্মেলন প্রথম পুরস্কার দিলো— দিনটা মনে ছিল না— অথচ ব্যাপারটা নিয়ে আমি বিজয়দার সঙ্গে কথাও বলেছি।'

—'নগদ একশ টাকা! আর এইসব—' ব'লে আনন্দ তার উপহার পাওয়া জিনিসগুলো দেখালো। কুলোর মতো একটা পাত্রভর্তি ফল— আপেল, পেঁপে, বেদানা, নারকেল— একটা আপেল তুলে নিয়ে আনন্দ বাইরে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বললো, 'নিন খেয়ে ফেলুন!'

গোপাল আপেলটা হাতে নিয়ে কোনো-এক ভাবনার মধ্যে ছিল। আনন্দ বললো, 'একেবারে নাড়ুগোপালের মতো দেখাচ্ছে— খান!'

এক কামড় আপেল চিবুতে-চিবুতে গোপাল বললো, 'আচ্ছা দাদা, বনলতা সেন নামে সত্যিই কি কেউ ছিলেন?' আনন্দর মুখে মিচকি হাসি। কিন্তু কোনো কথা বললো না সে। কেবল মায়াবী এক ধূসর জগৎ যেন তাকে ডাকছিল।

—'এরকম আর-একটা কবিতা লিখুন! পারবেন? ভারতবর্ষের জন্য।'

আনন্দর মুখের হাসিটা একটু প্রসারিত হলো মাত্র, কোনো কথা বললো না।

আরও দু'-একটা কথা হলো। কিন্তু বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল আনন্দ। কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে ভালো লাগছিল না। গোপাল বললো, 'দাদা, আজ তাহলে আমি উঠি।'

কোনো এক জগৎ থেকে ফিরে এসে আনন্দ বললো, 'হ্যাঁ, উঠবেন? আচ্ছা।' গোপাল উঠে দাঁড়াতেই সে বললো, 'চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই।'

গোপালকে বাসে তুলে দেবার কয়েক মুহূর্ত পরই আনন্দ কপাল চাপড়ালো। ভুল হয়ে গেছে। বাসটার দিকে তাকালো। বাসটা মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ফেরার পথে আনন্দর মনে পড়লো, কবে একদিন সে যেন স্বপ্নে গোপালকে জাদুকর রূপে দেখেছিল— সে তার টুপির ভেতর থেকে অসংখ্য সাদা পায়রা উড়িয়ে দিচ্ছিল... সে দর্শকদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করছিল এক-এক ক'রে, কবেকার এক ধূসর আনন্দর সামনে এসে, তার চোখে চোখ রেখে জাদুকর গোপাল বললো, আমি মুশকিল আসান— আনন্দর মাথায় হাত রাখলো সে, আর আনন্দ অনুভব করছিল বৃষ্টি, তার সমস্ত ধূসরতা ধুয়ে যাচ্ছে—

বাসার দরজায় এসে থমকে দাঁড়ালো আনন্দ— সে বুঝতে পারছিল না, সত্যিই স্বপ্ন ছিল, নাকি তার ভূমিকাকে এভাবে কল্পনা করেছিল—

ডায়মণ্ডহারবার কলেজের চাকরিটা সে করবে না— এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবার বোধহয় দিন-দুই পর গোপাল খবর নিতে এসেছিল। তার সিদ্ধান্তের কথা শুনে গোপাল কেমন থম্ মেরে ব'সে ছিল। আনন্দ বলেছিল, 'আপনাকে একটা অপ্রস্তুতের মধ্যে ফেললাম। আগে ভাবা উচিত ছিল আমার। এটাই আমার দোষ— আমাকে ক্ষমা করবেন ভাই।'

—'আপনি ঠিকই করেছেন— আপনার জায়গায় আমি থাকলে, এই সিদ্ধান্তই নিতে হতো।'

তখন কথায় কথায় গোপাল জানতে চেয়েছিল, 'তাহলে ওই টিউশনির ওপরেই নির্ভর করবেন?'

—'আপাতত তাছাড়া আর উপায় কী? মাঝেমধ্যে কাগজে দু'-একটা প্রবন্ধ লিখছি— কিছুদিন আগে দেশ পত্রিকায় শিক্ষার ওপরে লিখলাম, স্টেট্‌সম্যানেও লিখছি—' ডান হাতের বুড়ো আঙুলে নাগের ডগাটা চুলকে বলেছিল, 'একটু কাছাকাছি আর-কোথাও একটা জোগাড় ক'রে দিন না!' কেমন একটা করুণ-আর্তি ফুটে উঠেছিল তার কণ্ঠস্বরে।

ওই ঘটনার পর হঠাৎ একদিন গোপাল এসে বললো, 'দাদা, আপনার ওই শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলো দিন তো!'

—'কেন, কী হবে?'

—'দেখি আর-একটা ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।'

আনন্দ তাকে কাগজগুলো দেবার একদিন কি দু'দিন পর গোপাল এসে জানালো, 'আপনি একবার হাওড়া গার্লস্ কলেজের অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করুন।' তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভঙ্গি— যেন সব ঠিক হয়ে আছে, দেখা করলেই একটা অধ্যাপনার চাকরি আনন্দ পেয়ে যাবে। আরও যেন কী-সব নিস্তারের আভাস ছিল।

বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই সব স্পষ্ট হয়ে গেল— অমন সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, নাগরিক কোলাহল থেকে একেবারেই মুক্ত— বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা ক'রে আশ্বস্ত হয়ে ফেরার পথে গোপালের প্রতি কৃতজ্ঞতায় কখন যেন তাকে জাদুকর ব'লেই মনে হয়েছিল। তার হাতে আশ্চর্য জাদুদণ্ড।

তাদের বাসার ভাড়াটে মহিলার ব্যাপারটা গোপালকে বললে হয়তো কিছু সুরাহা হ'তে পারে, এই ভাবনাটা আনন্দ ভেবে রেখেছিল— কিন্তু মনে পড়লো, সে চ'লে যাবার পর—

নিজের ভুলো মনটার প্রতি তার কেমন যেন করুণা হলো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকল লোভের চেয়ে সৎ হবে নাকি
সব মানুষের তরে সব মানুষের ভালোবাসা।

কৃষ্ণচূড়ার সবুজ হাত আগুনের অর্ঘ্য সাজিয়ে তুলে ধরেছে সূর্যের দিকে, সূর্যের অতিবেগুনি কিরণ শুষে নিয়ে জারুল ফুটিয়েছে ফুল, দু'-একটা অমলতাসও দেখা যায় ইতস্তত— এই শহরেও! কী সুন্দর এই সবুজ আর আকাশ— আড়ালে চ'লে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে! লেকের দিকে গেলে এখনও তার নিবিড়তা উপলব্ধি করা যায়, অনুভব করা যায় নৈঃশব্দ্যের প্রবল মুখরতা।

কৃষ্ণচূড়ার অজস্র অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে থেকে অনেক ভাবনা আসছিল আনন্দর— ওই নির্দাহ অগ্নির ওপর শুয়ে আছে এক নারী, নির্বসন; যে-কোনো অজস্র ফুলের সমারোহ দেখলেই এরকম মনে হয়েছে তার, আজও মনে হলো, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস— তোমার মুখের প্রতিভাদীপ্তি বৌদ্ধসংঘের শান্তির মতো, সংঘ তবু ভেঙে যায়— সমাজ ভাঙে; গ'ড়ে উঠেছে মহানগরী— উঁচু-উঁচু বাড়িগুলোর দিকে আনন্দ তাকালো, চারপাশটা কেমন ক্লান্ত ঝিমুনো মনে হলো তার, কেমন একটা চাপা ব্যথায় নিঃঝুম। যেন-বা সভ্যতার ভেতর ক্লান্তি জমেছে। অথচ আকাশ নীল, গাছেরা গাঢ় সবুজ— বরিশালে তো এমন মনে হতো না— আনন্দর খেয়াল পড়লো, এখানে টুনটুনির বিধুর ডাক নেহ, নেই রঙিন মথ-প্রজাপতি, ঘাসফড়িং-ঝিঁঝি— কিচ্ছু নেহ, ছিল তো কখনও, অতীত— যেন তাদের ফসিল থেকে উঠে আসে; ওই ব্যথা— সংঘের স্মৃতি, নির্বাণলাভের মতো কোনো পরম প্রাপ্তির আনন্দ— আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'তবু নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো; এখনও নারীর মানে তুমি—'

তব, নদীরও মৃত্যু আছে, সূর্যও নিভে যাবে একদিন— তবে কেন তোমার মৃত্যুকে মেনে নিতে পারিনি আমি, অথচ তুমি রয়েছো এ-পৃথিবীতে আজও, হয়তো বৌদ্ধসংঘের শান্তির মতো হয়েই আছো, কেবল আমি ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাই না— যে পায় সে পায়... তারা সব সার্থক-সফল মানুষ; তোমার ব্যবহার— তোমাকে ব্যবহার করতে জানে তারা— মানুষ তো ব্যবহৃত হ'তে ভালোওবাসে!

—'দাদা, আপনে কি কাউরে খোঁজেন?'

আনন্দ কেমন ঘোরের মধ্যে তাকালো বক্তার দিকে।

—'না, মানে অনেকক্ষণ, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন তো— ওপারের লোকজন এপারে আইসে, কেমন দিশাহারা— ভাবলাম, আমার মতো অবস্থা আপনার— কদ্দিন আইছেন?'

—'সেই রুশ বিপ্লবের বছর।'

—'তয় আপনে তো...' তার আপদমস্তক জরিপ ক'রে কেমন সংশয় দেখা দিলো, সিদ্ধান্ত নিলো যেন— তার মাথাটা না-ভঙ্গিতে নড়লো মৃদু।

—'তবে খুঁজছি, বাসা।'

—'এতদিনেও থিতু হ'তে পারেন নাই! আপনে তো দাদা কন্‌ফার্মড উদ্বাস্তু!'

—'কীরকম?'

—'কন্‌ফার্মড ব্যাচেলার— মানে কিনা যে আর বিয়া কইরবে না, কন্‌ফার্মড উদ্বাস্তু মানে হইলো— যারা বাস্তুর মায়া ত্যাগ কইরাছে—'

—'আমি জমিও খুঁজছি।'

—'তয় আশা আছে— আপনে উদ্বাস্তু?'

—'একশ ভাগ।'

—'উদ্বাস্তু দলে নাম লেখান। ঢাকুরে, যোদপুর, যাদবপুর— কোথাও একখণ্ড জমি জবরদখল কইরা ফেলান, ব্যাস্! ছ'মাসের মধ্যে চালে পুঁইডগা লক্‌লক্ কইরবো।'

—'শুনছি জবরদখল উচ্ছেদের জন্যে সরকার নাকি কী-একটা বিল আনছে।'

—'আসেন কথা যখন তুললেন— বইসা কহ, চা খাই— আসেন।'

একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলো দু'জন। নিজেদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় সেরে নিয়েছে। লোকটার নাম হরিপদ বিশ্বাস। হরিপদ বাস্তুহারা পরিষদের সঙ্গে আছে। তাদের আন্দোলনের নেতা 'বীর বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তী।'

—'তিনি কে?'

—'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন— পরিষদের যে তেরিয়াভাব, উনি আছেন বইল্যাহ, অবশ্য আরও কয়েকজন আছেন যারা বিপ্লবী-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন'— চায়ে চুমুক দিয়ে হরিপদ বললো, 'গত ফেব্রুয়ারি মাসে— ময়দানের জমায়েত দেইখা সরকারের পিলে চমকাই গেছে, তার ওপর এই গেল-মাসে বিধানসভা অভিযান, ধর্না— মনে হইতাছে বিল আনা অত সহজ হইবো না।'

আনন্দ শ্রোতা মাত্র। তাদের কথা চা-দোকানের কেউ-কেউ আগ্রহভরে শুনছে, কথার পিঠে কথাও উঠেছে দু'-একটা, বক্তা মূলত হরিপদ। শুনতে-শুনতে আনন্দ বার-কয়েক অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কোথাও-কোথাও খেই কেটে গেছে, 'দাবির পর দাবি— কোলকাতা উত্তাল হয়ে উঠছে।' একথার অনুষঙ্গে আনন্দ দেখতে পাচ্ছিল— মিছিল লালঝাণ্ডা কাস্তে-হাতুড়ি— শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের প্রতীক— দাবি মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে!

জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও!

ইন্‌কিলাব। জিন্দাবাদ!

—'শোনেন, এই চা'র দোকানে আমারে খোঁজ কইরবেন, পাইয়া যাবেন।'

হরিপদর কাছ থেকে নিস্তার পেয়ে আনন্দ হাঁটছিল। একখণ্ড জমির আকাঙ্ক্ষা তার রয়েছে— সে যে 'কন্‌ফার্মড' উদ্বাস্তু হ'তে পারেনি, এ-বিষয়ে আনন্দ নিশ্চিত— একখণ্ড জমি, একটু নিরিবিলি জায়গায়, না— কোনো রোমাণ্টিকতা নেই ভাবনায়, দু'-একটা গাছ লাগানোর মতো জায়গা থাকবে, পাখিরা এসে বসবে তাতে, বাসা বাঁধবে, এক ফালি জায়গায় গ'ড়ে উঠবে কিচেন গার্ডেন, ফুল-প্রজাপতি— কিন্তু সুবিধেমতো পাওয়া যাচ্ছে না। শান্তিনিকেতনে

ভেবলু জমি কিনেছে, সে বলেছে, 'তুমি যদি ওখানে যেতে চাও, বেশ নিরিবিলি, গ্রাম্য পরিবেশ, তাহলে কটেজ বানিয়ে দিই।'

নিনি বলেছিল, 'দাদা, মন্দ হয় না কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ আর তুমি একই আকাশের নিচে! একটা দারুণ ব্যাপার! কবিতাপাগলরা, রবীন্দ্রনাথকে দেখতে গিয়ে তোমাকেও দেখে আসবে।'

আনন্দ কেমন ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে বলেছিল, 'আমি আর কোথাও যাবো না— তোমাদের কাছাকাছি থাকতে চাই।'

আপাতত একটা ঘর পেলে, ল্যান্সডাউনের বাসাটা ছেড়ে দিতে পারলে হয়তো নিস্তার পাওয়া যেতো— আবার নতুন ক'রে লেখা শুরু করা যেতো। ভূমেনরা নতুন লেখা চেয়েছে— এক বছর হয়ে গেল দিতে পারিনি, জুন মাসের মধ্যে কতকগুলো লেখা রেডি করা দরকার।

আনন্দ হাঁটছে।...

ফেব্রুয়ারি মাসে ময়দানে দেড় লাখ মতো মানুষ সমবেত হয়েছিল— সব উদ্বাস্তু, তারা পুনর্বাসন চায়, জবরদখল-সম্পত্তির আইনি অধিকার চায়— এত মানুষ নিজেদের জমি-সম্পত্তি রক্ষা করতে পারলো না, অথচ এখানে এসে সমবেতভাবে অন্যের জমি দখল ক'রে নিলো!

আনন্দ ভাবছিল।

এখানে যাদের জমি দখল হয়েছে— অধিকাংশ জমিই মুসলমানদের, সেই জমির একখণ্ড আমি পেতে পারি— হরিপদ তেমনই আশ্বাস দিয়েছে, সে উদ্বাস্তু পরিষদের সঙ্গে আছে, এই অবস্থান নেওয়ায় সে গর্বিত, তার নেতা 'বীর বিপ্লবী'— বিপ্লবী আজ উদ্বাস্তু-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, কী পরিহাস! তাঁর অনুগামী কী সাবলীল দালাল!

আনন্দ হাঁটছিল। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, সিঁড়ি টপকাচ্ছে একের পর এক— কোথায় যেন উঠছে সে...

ক্লান্ত লাগছে।

AMARBOI.COM

এরা সব এই পথে
ওরা সব ওই পথে— তবু
মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন— অন্তহীন বেদনার পথে।

গরমের ছুটি শুরু হয়েছে। সুচরিতা এখন কোলকাতায়। যদিও সে অধিকাংশ সময় কাটাচ্ছে রাসবিহারী অ্যাভেন্যুয়ে— নিনিদের বাড়িতে, অশোক এখন দিল্লিতে, ফলে জায়গার অভাব নেই। তাছাড়া এ-বাড়িতে এলে ঠিকভাবে যেন মেলে ধরতে পারে না সুচরিতা— চারিদিকে এত অযত্নের ছাপ, হয়তো তাকে পীড়িত করে। সুচরিতা এবার আসার আগেই আনন্দ তার ঘরটা মোটামুটিভাবে সাজিয়ে ফেলেছে— কোথাও বইপত্র এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে নেই।

আনন্দ তার অপেক্ষায় ছিল। তার সঙ্গে জরুরি কিছু কথাবার্তা আছে। গরমের ছুটির পরেই আনন্দ হাওড়া গার্লসে জয়েন করবে। অতএব টাকার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে— এ-বিষয়ে একটা প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছিল বৈশাখের প্রথম দিকে। এ-বাসা ছাড়তেই হবে। এ যেন প্রেতপুরী, মহিলাকে যখন সে তার অলক্ষ্যে লক্ষ করে, যেন অতীত জেগে ওঠে— এমন সুন্দর মুখশ্রী যার, স্নিগ্ধ-প্রতিভার আভাস যেন লেগে আছে ওই শ্রী-তে— তা-যে অমন কুৎসিত বীভৎস হয়ে যায় কীভাবে! কীভাবে কবি-হৃদয়কে সে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে? কেমন এক বিপন্নতা আনন্দকে গ্রাস করে— এই মেয়েটি আবার রবীন্দ্রনাথের গান গায়! সে তো প্রভাও গুনগুন করে আজও— সর্বনাশের আশায় ব'সে থাকে—

দাঁড়াও-দাঁড়াও— এরকম একটা ভঙ্গিতে আনন্দ নড়েচড়ে বসলো।

তার মানে তুমি, তোমার অস্তিত্ব— তোমার উপস্থিতি এইসব সুন্দরীদের হত্যা করে, আর তাদের প্রেতাত্মা তোমাকে খায়!

—এরকম একটা উপলব্ধি এর আগেও যেন হয়েছিল!

—হ্যাঁ, বনির সামনে ব'সে থাকার সময় কিন্তু তখন সংশয় ছিল— অ্যাজ ইফ! কিন্তু এখন সত্য—

—ইন্‌ক্রেডিব্‌ল— আমি এ-পৃথিবীর সব রূপসীদের রূপ শুষে নেবার ক্ষমতা অর্জন করেছি!

আনন্দর সমস্ত শরীরটা অন্তর্লীন হাসির দমকে কাঁপছে, গুড়-গুড় মেঘ ডাকার মতো, এখনই সশব্দে ফেটে পড়বে সে-হাসি—

কিন্তু হাসিটা মিলিয়ে গেল। কার সঙ্গে যেন কথা বলতে-বলতে সুচরিতা আসছে। আনন্দ একটু এগিয়ে গেল। সঙ্গে ভূমেন আর স্নেহাকর।

আচ্ছা এরা কীভাবে টের পায় সুচরিতা এসেছে!

—'দাদা, এরা তোমাকে নিয়ে দারুণ একটা লেখা লিখেছে। এহ, এসো তোমরা।'

সকলে ঘরে এসে বসলো।

—'আমাকে নিয়ে লিখেছো! কী?'

—'প্রবন্ধ।' বললো ভূমেন।

সুচরিতা বললো, 'নির্জনতম শিরোপা থেকে ওরা তোমাকে মুক্ত করেছে।' আনন্দ কেমন এক তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো, তার একটু রেশ কেবল ফুটে উঠলো ঠোঁটের কোণে। স্নেহাকর বললো, 'আপনি সৌরচেতনার কবি— এটাই আমরা প্রচার করতে চাই।'

আনন্দ হাত বাড়ালো।

ভূমেন লেখাটা তার হাতে দিলো।

—'এটা অবশ্য খসড়া—' বললো স্নেহাকর।

শুরুটা প'ড়েই আনন্দ বললো, 'বাঃ! প্রমথ চৌধুরীকে খুব ভালো ব্যবহার করেছো তো! নানা মুনির নানা মত— সাহিত্য-সমাজের আসল দুঃখের কারণ মতানৈক্য— দেখছি তো, সেই ছত্রিশ থেকে— এখনও চলছে, এবার শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলায় যা হলো!' নিজের মনে কথা বলার মতো বলতে-বলতে থেমে গিয়ে আবার পড়তে থাকলো।... মুখ তুলে তাকালো, 'লেখাটা কার?'

ভূমেন বললো, 'লিখেছে স্নেহাকর—'

আনন্দ স্নেহাকরের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললো, 'ভালো লিখেছো।' তারপর লেখাটা থেকে প'ড়ে শোনালো:

AMARBOI.COM

> সৃষ্টির চিরকালের কথা হচ্ছে নির্জনতা, অন্ধকার। নিঃসঙ্গ একাকী হৃদয়ে সেই সৃষ্টির বীজ যখনি ভাবের ও আবেগের আলো-হাওয়ার ডাক শুনল তখনি সৃষ্ট অঙ্কুর এল সবার মাঝখানে— অন্ধকার মাটি ভেদ করে।

তারিফ করার ভঙ্গিতে আনন্দর ভ্রূ নেচে উঠলো। পড়তে-পড়তে তার কবিতার উদ্ধৃতিগুলো টপকে, কোথাও কেবল চোখ বুলিয়ে আবারও আনন্দ স্নেহাকরের দিকে তাকালো, 'সীমান্তের লেখা তাহলে তোমরাও পড়েছো!'

ভূমেন বললো, 'হ্যাঁ, লেখাটা বড্ড একপেশে— স্নেহাকরের ওই কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছে— মহৎ শিল্পীর মধ্য দিয়ে কাল নিজের উদ্দেশ্যটুকু ফুটিয়ে তোলে। শিল্পী কখনও কাল ফোটাতে পারেন না।'

আনন্দ কোনো কথা না-ব'লে আবার পড়তে থাকলো।

পড়া-শেষে কিছুসময় গুম হয়ে থেকে আনন্দ বললো, 'কী হবে এসব ছেপে?'

সবাই যেন নিভে গেল।

—'গত মাসে সুরজিৎ... সুরজিতের সঙ্গে কি তোমাদের আলাপ হয়েছে? দাশগুপ্ত— জলার্ক নামে একটা কাগজ করে— সেও একটা চিঠি পাঠিয়েছিল, একটা প্রতিবাদ-নিবন্ধের খসড়া বলা যায়— তাকেও আমি লিখে পাঠিয়েছি— কী আর হবে ওসব প্রবন্ধের প্রতিবাদ ক'রে?'

যেন একটা প্রচণ্ড স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তোমরা তো আমার কবিতাকে ভালোবাসছো, কেউ তো বাসে— যাঁরা বলছেন, তাঁরা আমার কবিতা পছন্দ করেন না— কী করা যাবে— একদিন ওঁরা থাকবেন না, আমিও থাকবো না, তখন কবিতা তো থাকবে, তোমরাও বুড়ো হয়ে যাবে তখন, তারও পর—' দূর-ভবিষ্যতের কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে আনন্দ। সেখান থেকে ফিরে এসে বললো, 'কিন্তু ভূমেন, তোমাকে-যে বলেছিলাম আমাকে একটা বাসার ব্যবস্থা ক'রে দাও— বড্ড বিপদে আছি। বুঝলি খুকি, কোথাও চ'লে যেতে পারলে নিস্তার পেতাম। কিন্তু ঘর খুঁজে পাচ্ছি না।'

ভূমেন বললো, 'আমি দু'-একজনকে বলেছিলাম, কিন্তু তারা এখনও কোনো খোঁজ দিতে পারেনি।'

আনন্দ বললো, 'কী আর করা যাবে, একটু মনে রেখো।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবর্ণ জড়িত এক ঘর;
কী করে প্রাসাদ তাকে বলি আমি?
অনেক ফাটল নোনা আরসোলা কৃকলাস দেয়ালের 'পর
ফ্রেমের ভিতরে ছবি খেয়ে ফেলে অনুরাধাপুর ইলোরার
মাতিসের— সেজানের পিকাসোর

আবার সময়-মাপা বাঁধা পথ— দেশপ্রিয় পার্ক থেকে হাওড়া ময়দান। সেখান থেকে হাঁটাপথে হাওড়া গার্লস। শিক্ষা-শিক্ষকতায় নতুন কিছু নেই। কিন্তু একঘেয়ে ব্যাপারটা এখনও আনন্দর মনে আসেনি। ভক্তিশ্রদ্ধার ব্যাপারে আনন্দ বরাবরই একটু সিলেক্‌টিভ, কথা-কাজে যে-মানুষ প্রায় অভিন্ন, সে, যতই তার কনিষ্ঠ হোক, শ্রদ্ধেয়— বড় পোর্টফোলিও হোল্ড করলেই-যে তোমাকে ভক্তি করতে হবে, এর কোনো মানে নেহ, বি.এম. কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে তার অপ্রকাশ্য আড়াআড়ি ছিল— কলেজের একজন অধ্যক্ষ যদি পঠন-পাঠন বিষয়ে নজর না-দেয়, চেয়ারের কারণে তাকে মান্য করতে হয় বটে, কিন্তু কখনোই সে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠতে পারে না। সেদিক থেকে বিজয়কৃষ্ণবাবু ব্যতিক্রম, দু'-দুটো কলেজ তিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায় দাঁড় করিয়েছেন। শিক্ষা সম্পর্কে ভাবেন যথেষ্ট— ভাবেন-যে, তা হাওড়া গার্লসের প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা দেখলে বোঝা যায়— আনন্দ বুঝেছিল সেই প্রথম দিনে— শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান, উপলব্ধি; এমন-কী অনুভবও কী গভীর! তিনিও আনন্দকে বলেছেন, 'শিক্ষা সম্পর্কে এমন গভীরভাবে ভাবতে আমি খুব কম শিক্ষককেই দেখেছি। আমার মনে হচ্ছে একজন উপযুক্ত শিক্ষককে পাচ্ছে আমাদের কলেজ।' শুনে আশ্চর্য ভালো হয়ে গেছিল তার মন। কাজে যোগ দেবার পর গত দু'মাসে, তার একটা পুরনো ধারণা বদলে গেছে। এই কলেজে যোগদানের আগেও আনন্দ মনে করতো, অর্থের জন্য অধ্যাপনা— আর সাহিত্য হচ্ছে আনন্দের জন্য। কিন্তু এখন সে নির্দ্বিধায় বলতে পারে,— পড়ানোর মধ্যেও আনন্দ আছে। একথা সে অজিতকুমারকে বলেছে, 'এখানে কাজ ক'রে শুধু অর্থই মেলে না, তার চেয়েও বড় কথা, অপার আনন্দ মেলে।'

অজিতকুমার হাওড়া গার্লসের দর্শনের অধ্যাপক, আনন্দর প্রায় প্রতিবেশি। যতীন দাস রোডে তার বাড়ি। বছর-ত্রিশের এই যুবকের সঙ্গে কথা ব'লেও আনন্দ পাওয়া যায়।

এখন সে কেমন আছে কেউ জানতে চাইলে আনন্দ স্বতস্ফূর্ত বলতে পারে, 'ভালো, ভালো আছি।' কিন্তু পরক্ষণেই তার সাব্‌লেট্‌ মহিলার মুখ মনে পড়ে। মনটা তখন ভার হয়ে যায়। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ক্লাসে গেলে, তার ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে মেয়েদের মুখগুলো যতটা স্পষ্ট দেখায়, তা দেখতে-দেখতে মনে হয় এই মেয়েগুলোর মতোই তো একদিন তার প্রতিবেশি মহিলাটি ছিল, বনি— প্রভাও; তবে কি এরাও একদিন... দেখে তো মনে হয় না এরা কেউ ব্যথা দিতে পারে... আনন্দ তখন নিজের মনে মাথা নাড়ে, এদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই তো রয়েছে সেই গভীর হৃদয়— মানুষের জন্য— পাঠ্য বিষয়ে ঢুকতে তবু একটু অসুবিধে হয়।... কখনও সে নিজেকে গালাগাল করে। নিজেকে দোষী মনে ক'রেও দোষস্খালনের পথ জানে না— তখন নিজেকে কেমন বিপন্ন মনে হয়।

কলেজ থেকে ফেরার পথে এক-একদিন নিনিদের বাড়ির স্টপেজে নেমে পড়ে। নিনিদের বাড়িতে গিয়ে কখনও দ্যাখে— নিনি কলেজ থেকে ফিরেছে, কোনোদিন অপেক্ষা করে, অপেক্ষা করার ধৈর্য হারিয়ে কখনও পরে আসবো ব'লে চ'লে আসে।

আজ সে অপেক্ষা করছিল। ড্রয়িংরুমে। একটা পত্রিকার পাতায় মনকে স্থির করতে চাইছিল।

আজ অজিতকুমার ছিল না। বাসের মধ্যে চোখ বুজে ব'সে ছিল আনন্দ। একটা ঝিমুনি ভাব টের পাচ্ছিল। তারপর কখন সে ঘুমিয়ে গেছে। একটা বিকট আওয়াজে চোখ মেলে তাকালো। বাসটা থেমেছে— যাত্রী ওঠা-নামা, সবই স্বাভাবিক। কিন্তু তার বুকের ধুক্‌পুকানি অস্বাভাবিক। বাইরের দিকে তাকালো। কেমন সব অচেনা মনে হচ্ছে। বাস চলতে শুরু করার পর মনে হলো— বাসটা হাওড়ার দিকে যাচ্ছে। কিন্তু সে উঠেছিল বালিগঞ্জের বাসে। তাহলে কি বালিগঞ্জ থেকে বাস ফের হাওড়ায় যাচ্ছে? এত গভীর ঘুম সে ঘুমিয়েছে! কিন্তু বাইরে মেঘলা আলো যে-সময় নির্দেশ করছে, তার সঙ্গে ফিরে যাওয়া-আসার আনুমানিক সময় মিলছে না। কিছুক্ষণ যাবার পর, ফের তার মনে হলো বালিগঞ্জের দিকেই যাচ্ছে বাসটা।

এই ব্যাপারটা নিয়ে আনন্দ ভাবছিল— এরকম কখনও হয়েছে ব'লে তার মনেও পড়লো না। অদ্ভুত— এই ক'দিন আগে কলেজ বাউণ্ড্রির মধ্যে সে পায়চারি করছিল, কয়েকটা প্রজাপতির ওড়াউড়ি। একটা প্রজাপতি বসলো ফুলের ওপর। নিবিষ্ট দেখছিল আনন্দ। দেখতে-দেখতে তার মনে হলো প্রজাপতিটা শুঁয়োপোকা হয়ে যাচ্ছে...

এসব ভাবছিল আনন্দ। তখন নিনি এলো।

—'দাদা কতক্ষণ?'

দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এই তো— মিনিট-কুড়ি।'

—'তোমার কি শরীর খারাপ?'

—'না, নতুন ক'রে কিছু হয়নি তো!'

—'মুখটা কেমন যেন পোড়া-পোড়া দেখাচ্ছে!'

আনন্দ কিছু বললো না। এই মেয়েটি আর সুচরিতাই কেবল তার শরীর খারাপ বুঝতে পারে।

—'বোসো। আসছি।'

নলিনী ঘরোয়া হয়ে এসে বসলো। আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তার বোধহয় একই রকম মনে হলো কিন্তু প্রকাশ করলো না। বললো, 'লেখা হলো কিছু?' আনন্দ বললো, 'না, ও-বাসা না-ছাড়লে কিছু হবে ব'লে মনে হচ্ছে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কিন্তু বলেছিলে যে, মহিলাকে তাড়ানোর একটা ব্যবস্থা হচ্ছে?'

—'হ্যাঁ, গোপালবাবু খুব চেষ্টা করেছেন— আইনমাফিক কিছু করার নেই— উনি ওঁর পরিচিত উকিলের কাছে নিয়ে গেছিলেন।'

—'কী বললেন তিনি?'

—'যেহেতু আমি সাব্‌লেট্‌ করেছি, ভাড়া নিচ্ছি, তোলা মুশকিল। গোপালবাবু একটা প্যাঁচ কষলেন— রশিদ তো দিই না, আর যদি আমি ভাড়া না-নিই? উকিলবাবু বললেন, ও মানি অর্ডার করবে, আমি যদি না-নিই, রেণ্ট কণ্ট্রোল না কী একটা অফিস আছে— সেখানে জমা দেবে। একটা পথ অবশ্য উকিলবাবু বাত্‌লে দিয়েছেন, ভয় দেখিয়ে যদি তোলা যায়!'

নলিনী চিন্তিত মুখে বললো, 'সে কি আর আমাদের পক্ষে সম্ভব!'

আনন্দ একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'গোপালবাবু অবশ্য ব্যাপারটা দেখবেন বলেছেন।'

চা-জলখাবার এলো। আনন্দর জন্য অম্‌লেট— মাছ-মাংস-ডিমের মধ্যে ডিম তার প্রথম পছন্দের, নিনি মনে রেখেছে! আসলে মনে রাখার মতো মনটা আছে তার, মনটা দিয়েছে তার দাদু আর মা মিলে— ঠিক আমার মতো। নিনির দিকে মুগ্ধ তাকিয়েছিল আনন্দ। নিনি এক চুমুক চা নিয়ে বললো, 'দাদার তো খুব মন খারাপ হয়েছে না?'

—'নতুন কিছু না।'

—'সুভাষবাবুর লেখাটা পড়েছো?'

—'পড়েছি।'

—'মন খারাপ হয়নি?'

—'নাঃ, সাত-আট বছর হয়ে গেল, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি— সুভাষবাবুরা বলেছেন— মিথ্যে স্বাধীনতা, আমি তাদের সঙ্গে একমত— স্বাধীনতা তো সম্ভব ছিল, তার সঙ্গে অসম্ভব ভাবনা তো ওঁরাই মেলাতে চেয়েছিলেন— চীন মিলিয়েছে— সম্ভবের সঙ্গে অসম্ভব মিলেই সুররিয়ালিজ্‌ম— আমার বিরোধিতা করতে গিয়ে বিপ্লবের কুয়াশাচ্ছন্নতায় নিজেদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন; নারী-পুরুষের সম্ভব-সম্পর্কের মধ্যে অসম্ভব বিষয়টি হলো প্রেম, এটা-যে সুভাষবাবু বোঝেন না তা নয়, তা যদি হতো, তিনি এ-উচ্চারণ কখনোই করতে পারতেন না: তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে/আনতে চলেছি/লাল টুকটুকে দিন—' একটু থেমে, কী ভেবে বললো, 'আমার কবিতা সম্বন্ধে চারদিকে এত অস্পষ্ট ধারণা— এ-বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছে করে।'

—'তা লিখছো না কেন?'

—'লিখবো— শরীর-মনের একটু সুস্থতা পেলেই লিখবো ভাবছি। কিন্তু কবে যে পাবো!'

নলিনী শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখলো। কিছু একটা ভাবছে সে। তার মুখটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখলো আনন্দ। নলিনী বললো, 'দাদা, আমাদের দোতলায় দুটো ঘর তো ফাঁকা প'ড়ে আছে—' আরও একটু ভেবে বললো, 'সামনের মাস থেকে তোমার ঠিকানা হবে— প্রযত্নে: শ্রী এ. এন. চক্রবর্তী, একশ বাহাত্তর বাই তিন রাসবিহারী এঅ্যাভেন্যু, কোলকাতা-২৯।'

কথাটা শোনার পর আনন্দর মনে হলো, দীর্ঘদিনের ঘুস্‌ঘুসে জ্বর যেন ঘাম দিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে। নিনি বলছে, 'তোমার নতুন ঠিকানার কথা সবাইকে জানিয়ে দাও।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশ: শূন্যতা, সমাজ: অঙ্গার
জীবন: মৃত্যু, প্রেম: রক্তঝর্ণা;— জ্ঞান
এই সবের অপরিমেয় শববাহন শুধু, নিজেকেও বহন করছে।

লেকের ধারে বেঞ্চিতে তিনজন ব'সে ছিল। মাঝখানে আনন্দ। ডানপাশে সুবোধ, বাঁ-দিকে অজিতকুমার। একটু আগের একপশলা কতাবার্তার পর, সকলেই নীরব। আনন্দ জলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একটুকরো রঙিন মেঘের ছায়া। মনের ভুলও হ'তে পারে। আকাশের দিকে তাকালো আনন্দ। আকাশকে তো এখন সব সময় মেঘলাই মনে হয়, কিন্তু রঙিন মেঘটাকে কোথাও দেখলো না।

অজিতকুমার বললো, 'আপনার উচিত আত্মজীবনী লেখা।'

কী হবে— এমন এক ব্যঞ্জনায় আনন্দ হাসলো নীরবে।

সুবোধ বললো, 'আমিও বলেছি। অন্তত স্মৃতিকথা।'

—'হ্যাঁ, তাও লিখতে পারেন— রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছেন।'

—'ভেবেছি লিখবো। একটা কাগজে ধারাবাহিক লেখার কথাও হয়েছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত বেঁচে থাকায় বৈচিত্র্য এত কম, ভেবে দেখেছি, আগামী পৃথিবীর জন্য কোনো মেসেজ নেই।'

সুবোধ বললো, 'বৈচিত্র্য নেই— না থাক—'

অজিতকুমার বললো, 'প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার মধ্যেই একটা-না-একটা মেসেজ থাকবেই— এই যে, আপনার সঙ্গে না-মিশলে আপনার কবিতা না-পড়লে আমি বোধহয় একথা বলতে পারতাম না: প্রথা নয় প্রাণ, জোর নয় যুক্তি— জ্ঞানই আমার পরম প্রিয়।'

—'আমি কখনও বলেছি বুঝি?'

—'জ্ঞান বিহনে প্রেম নেই— প্রেমধারণাই আমার বদলে গেছে।' আনন্দর মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠে পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল, সে বললো, 'প্রেম সম্পর্কে, এখন মনে হয়, এ আমার অতি রোম্যান্টিক ধারণা— প্রকৃতিস্থ প্রকৃতিতে এর কোনো মানে নেই।'

—'কিন্তু প্রকৃতিস্থ মনুষ্যত্বে এর মানে আছে— পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে প্রেমের সাহস-সাধ-স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষায় এর মানে আছে—'

আনন্দ কেমন বিস্ময়ের ঘোরে বললো, 'ব্যথা পাবেন জেনেও!'

অজিতকুমার সায় দিয়ে বললো, 'ঘৃণা পাবো, মৃত্যু পাবো জেনেও আমি কখনও খুনি হ'তে পারবো না।'

—'কিন্তু খুন করতে ইচ্ছে করবে তো?'

—'আপনার সান্নিধ্যে থাকলে তাও বোধহয় করবে না।'

আনন্দ হাত তুলে তাকে যেন থামিয়ে দিতে চাইলো।

সুবোধ বললো, 'কিন্তু অজিতবাব, এই সেদিন আপনি আনন্দদাকে পরামর্শ দিয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মনের কন্দর থেকে জীবনের বন্দরে' আসতে— যাতে উনি 'সোচ্চার মন্দ্রে দিগন্ত মন্দ্রিত করে' তুলতে পারেন!'

—'হ্যাঁ বলেছিলাম, কিন্তু তারপর একদিন—' ব'লে অজিতকুমার আনন্দর মুখের দিকে তাকালো। আনন্দ তখন একটা ছোট্ট নুড়ি-মতো কিছু তুলে নিচ্ছে— তুলে নিয়ে জলে ছুড়ে দিলো, নুড়ির পতন ঘিরে ঢেউ উঠলো, উঠে ছড়িয়ে পড়তে-পড়তে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

—'একদিন উনি বললেন, জীবনটাকে কেমন যেন আমার সঙ্গীতের মতো মনে হয়, খুব নির্দিষ্ট ক'রে বললে প্রার্থনা সঙ্গীত— তার ছন্দ ছোট-ছোট সুরের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে— আনন্দদা, তার পরের কথাগুলো আপনিই বলুন আবার!'

—'সুবোধবাবুও জানেন— বলেছি কখনও।'

সুবোধ বললো, 'কী কথা?'

অজিত বললো, 'সে বলেছেন— বলেছেন, আবার বলুন।'

আনন্দ আবার জলে একটা নুড়ি ছুড়ে দিলো। তারপর বললো, 'আপনিই বলুন! আসলে কী জানেন, কথাটা কোথাও আমি পেয়েছি, হয়তো বুদ্ধ-ভাবনা— পলে পলে আদর্শের জন্য আত্মদান, নিজের বোধিকে শাশ্বত ক'রে তোলবার জন্য জীবনকে ক্ষয়িত করা— এ-সবের মধ্যেই, মনে হয়, প্রকৃত বীরত্ব—'

—'বুঝলেন তো সুবোধবাবু', কেন আমি ওই কথা বললাম! আর আনন্দদা, আপনাকে বলছি, জীবন ঘটনাবহুল হ'লেই-যে তা অটোবায়োগ্রাফীর যোগ্য হবে, তা না-ও হ'তে পারে, কিন্তু আপনার জীবনের আন্তপ্রবাহের যে-রূপ আমি দেখেছি— তার প্রকাশ একমাত্র আপনিই পারেন করতে! এটা করা জরুরি,— নইলে রটনা ঠেকাবেন কী দিয়ে?'

—'রটনা মানে?' কেমন এক উৎকণ্ঠা ফুটে উঠলো তার কণ্ঠস্বরে।

—'যা আপনি নন তা-ই আপনার সম্পর্কে প্রচার হওয়া। যেমন আপনার কবিতা সম্পর্কে ইতিমধ্যে হয়েছে।'

—'তাহলে, আমি কী করতে পারি?' কেমন এক অসহায়তার সুর, আর্ত চাহনি তার চোখে।

—'অন্তত জীবনস্মৃতি লিখুন, যার মধ্যে আমরা পেয়ে যাবো আপনার আত্মার অভিসার, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন রাজ্যে আপনার পথ-পরিক্রমা—'

সায়-এর ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে-নাড়তে আনন্দ বললো, 'সময় কোথায়? বিরূপ ব্যাখ্যা হ'লেই-বা কী করবো? রবীন্দ্রনাথই কি রেহাই পেয়েছেন?' ব'লে উঠে দাঁড়ালো আনন্দ। তারপর হাঁটতে শুরু করলো।

দ্রুত পা চালিয়ে সুবোধ-অজিতকুমার— আনন্দর পাশাপাশি; কিন্তু আর কোনো কথা হলো না। কিছুসময় পর আনন্দ থমকে দাঁড়ালো, 'আপনারা যান, আমার এদিকে একটু কাজ আছে।' ব'লে সে রাস্তা পার হওয়ার জন্য একটু এগিয়ে দাঁড়ালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ হাঁটছে...

এই তো জীবন— তাকে আবার মহত্ত্ব দান করতে চাইছো!

আমি কিছুই করতে চাইছি না, চাইনি।

স্মৃতিকথা কারা লেখে জানো?

সফল মানুষেরা। কিন্তু সফলতার মাপকাঠি কী?

তোমার তো না-জানার কথা নয়— কোথায় যেন তুমি লিখেছিলে, একজন সফল সুখী মানুষের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে— তার ব্যাঙ্কের হিসাব কী চমৎকার, মাইনের ব্যবস্থা কী আশাপ্রদ— ঘরদোর কী নিটোল— মনে পড়ছে?

হ্যাঁ— স্ত্রীটি কী বৈদগ্ধে ভরা অথচ স্নিগ্ধ— তার শরীর প্রকাশের জন্য না-জানি কত কী রোমাঞ্চে উর্বর!

কিন্তু তুমি কী চেয়েছো? পৃথিবীর সমস্ত ইনসিওরেন্স কোম্পানি, ব্যাঙ্ক অফিস ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছে তোমার। এই বিধ্বংসী ইচ্ছে নিয়ে আর যা-ই হোক বিবাহিত জীবনের স্বাদ পাওয়া যায় না, সৎ-শুদ্ধতার বড়াই ক'রে নারীহৃদয় জয় করা যায় না।

আনন্দ হাঁটছে...

নস্যাৎ করার ভঙ্গিতে তার মাথাটা বার-কয়েক আন্দোলিত হলো। সে বিড়বিড় করলো, 'নারীসূর্য!'

আনন্দ আকাশের দিকে তাকালো। আজকাল একটিও নক্ষত্র দেখতে পায় না সে।

অথচ অবচেতনায় অজস্র নক্ষত্র।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। ক্রমে যেন সে দু'টি নক্ষত্র পাশাপাশি দেখতে পেলো, সত্যানন্দ আর কুসুমকুমারী— তাঁরা যেন বিষণ্ণ দেখছেন তাকে।

লোকায়ত চেতনার ম্লান সূর্য তার কবে যেন অস্ত গেছে, 'কবে?' যেন জিগ্যেস করলো সেই তারা-দু'টিকে। কবে— কোন্ সুদূর অতীতে— তার পাশে এসে কে যেন দাঁড়িয়েছে, সে বলছে: সেই ছোট্টবেলায় এক-একদিন শীতের শেষরাতে বাউলের গান শুনতে তোমার ভালো লাগতো—

আনন্দ দেখতে পাচ্ছে হিজলবনের ওপার থেকে সেই সুর ভেসে আসছে কুয়াশা মাখা।

—আর তোমার আঁতে ব্যথা দিয়ে যেতো! মনে পড়ছে?

মনে পড়ছে, সব মনে পড়ছে আনন্দর— ডাণ্ডাগুলি খেলছে তার কিশোর বয়েস...

আনন্দ হাঁটছে। আলপথ। ধানক্ষেত। খেলা-শেষে বাড়ি ফিরছে সে... ভাটিয়াল গানের সুর...

—মনটা কেমন ক'রে উঠছে, না মিলু?

—হ্যাঁ, আমার কথারা সব কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে, মাছের মতো, একটা শান্ত দিঘির ওপরের জল যেমন ঝিক্-ঝিক্ ঝর-ঝর জল খেজুর নারকেল পাতা— আমি তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি, আমি গান শুনছি, যে-গান জলের মতো— নাকি ওই জলই গানের মতো—

—বুঝতে পারছো তবে— যেদিন থেকে তুমি আর-একটি বাড়তি ইন্দ্রিয় পেয়ে গেলে— যখন থেকে তুমি আর্ট সিচ্যুয়েশন তৈরি করতে শিখলে—

—হ্যাঁ মনে পড়ছে— হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের মধ্যে সূর্যকে ডুবিয়ে দিয়ে আমি নারীসূর্যের প্রতীক্ষায় ছিলাম। সে এসেছিল। তার আলোয় আমি আলো হওয়ার আনন্দে ভুলে গেছিলাম— উৎসও ইন্ধন চায়; সে নিভে গেছে— তবু তার মুখ রয়ে গেছে মনে।

—সে আমি জানি, সঙ্গম-মুহূর্তে যাকে আড়াল ক'রে রাখতে হয়।

—আচ্ছা তুমিই বলো, এসব কথা কি অকপটে জীবনস্মৃতিতে লেখা যায়? এসব কথা কি লিখতে পারবো যে, মননের মধুর আস্বাদে রক্তমাংসে স্ফূর্তি এলে তবে একটি সার্থক সঙ্গম হ'তে পারে?

—এসবই তো লিখেছো তুমি!

—লিখেছি, না? তাহলে তো গান্ধিজীকে অনুকরণ ক'রে বলতে পারি: মাই লিটারেচার ইজ মাই মেসেজ।

—পারো, কিন্তু যতক্ষণ-না তুমি হিমাংশু প্রবোধ অজিত প্রমথ, প্রভাত সন্তোষ নিশীথ সিদ্ধার্থ মাল্যবান— এদের মুক্তি দিতে পারছো, ততক্ষণ তুমি তা পারছো না।

—তাহলে নতুন ক'রে আর আত্মজীবনী কি স্মৃতিকথা লেখার কোনো মানে হয় না!

কোনো সাড়া না-পেয়ে আনন্দ তার চারপাশে তাকালো। কেউ কোথাও নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপদমস্তক আমি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছি;
গগ্যাঁর ছবির মতো— তবু গগ্যাঁর চেয়ে গুরু হাত থেকে
বেরিয়ে সে নাকচোখে ক্বচিৎ ফুটেছে টায়ে টায়ে:
নিভে যায়, জ্বলে ওঠে, ছায়া, ছাহ, দিব্যযোনি মনে হয় তাকে।

—'এ-বাড়িটা ছেড়ে দেবো ভাবছি।'

—'নতুন ঘর পেয়েছো তাহলে? যাক বাঁচা গেল।'

—'না।'

—'না মানে?'

—'ঘর পাইনি।'

—'তাহলে! এ-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কোথায় উঠবে— ফুটপাথে?'

—'১৭২/৩ আর.বি.-তে।'

—'তার মানে নিনিদের বাড়িতে?'

—'হ্যাঁ। ওদের দোতলায় ঘর খালি আছে।'

—'আর তুমি কাঙালের মতো বললে...'

—'না। আমি কিছু বলিনি। বলিনি বলা ভুল হবে, সেদিন কথায়-কথায় লেখা না-হবার কারণ জেনে নিনি বললো যে, সামনের মাস থেকে আমার ঠিকানা হবে ১৭২/৩— এই মর্মে সকলকে জানিয়েও দিতে বলেছে আমার নতুন ঠিকানা।'

—'না।'

—'না মানে?'

—'আমি এ-বাড়ি ছাড়ছি না।'

—'কেন?'

—'অসুবিধা আছে।'

—'কী?'

—'আছে।'

—'সেটা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু অসুবিধেটা কোথায়?'

—'বুঝতে পারছো না, না? পারবে কী ক'রে— সারা জীবন তো অনুদান আর অনুকম্পায় কাটালে!'

—'আমরা তো ভাড়া দেবো!'

—'তুমি দিতে চাইলেই ওরা নেবে ভেবেছো? তাছাড়া...'

—'তাছাড়া?'

—'বাসাবাড়ি হ'লেও এখানে যে নিজস্বতা আছে— ওখানে তা থাকবে না।'

—'থাকবে না কেন, শুনি!'

—'এই-যে এখানে যখন খুশি আসছি যাচ্ছি— কাউকে কোনো জবাবদিহি করতে হচ্ছে না—'

—'ও, এতক্ষণে বুঝলাম— রাত ক'রে ফেরাতে তোমার অসুবিধা হবে... না, আমি বলছি, হবে না।'

—'কী ক'রে বলছো? কথা উঠবে, উঠবেই।'

—'এখানেও তো উঠতে পারতো— কই উঠেছে কখনও?'

প্রভার ভ্রূ-তে এতক্ষণে ভাঁজ পড়লো।

—'তুমি আমাকে নির্বোধ ভাবো— জানি, কিন্তু আমি-যে তা নই— তা প্রমাণ করতেও ইচ্ছে হয়নি। পৃথিবীর মানুষ জানে তুমি আমার স্ত্রী—'

প্রভার কাছে যেন দুর্বোধ্য লাগছে সব।

—'পরস্পরের মান-সম্মান, যতটুক আছে আর-কী, তাকে রক্ষা করার দায় তো আমাদেরই। এই-যে তুমি অভিনয় করবার অফার পেয়েছো, ভাবছো— আমি তোমাকে বলেছি, করো— পারফর্মিং আর্ট, তুমি আনন্দ পাবে— এ নিয়ে কথা উঠবে, আমি সামলে নেবো; বলেছি তো!'

প্রভা কোনো এক গভীর ভাবনার মধ্যে যেন ডুবে গেছিল। আনন্দর মনে হলো, তার কথাগুলো প্রভা ঠিকমতো শোনেনি। কিন্তু তার মনে হওয়া ভুল প্রমাণ ক'রে প্রভা ব'লে উঠলো, 'তোমার এই ভালোমানুষি কথাবার্তার উদ্দেশ্য কী, শুনি!'

একটু যেন আহত আনন্দ কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বললো, 'কারও কাছে তোমার জবাবদিহি করতে হবে না— এটা বোঝাতে চাইছিলাম।'

—'তবু আমি ১৭২/৩-য়ে যাবো না।' কেমন যেন ঘাউড়ার ভঙ্গিতে প্রভা বললো কথাটা।

নিবেদনের ভঙ্গিতে আনন্দ বললো, 'কিন্তু আমি-যে ঠিক করেছি— এ-মাসের দু'-একদিন থাকতে শিফ্‌ট করবো, পুজোর ছুটিটা দিল্লিতে টেনশন ফ্রি কাটিয়ে ফিরবো একেবারে নতুন বাসায়।'

—'না, এখানেই ফিরবো!'

আনন্দ বিকেলের দিকে ১৭২/৩-য়ে গেল। নিনির বাবা-মা'র সঙ্গে দু'-একটা কথা বলার সময়, নিনির বাবা অরুণনাথ বললেন, 'তা তোমরা কবে আসছো এ-বাড়িতে?' আনন্দ বললো, 'আসা হচ্ছে না।'

নিনির মা বললেন, 'কেন?'

আনন্দ মাথা চুলকে বললো, 'আসলে ভাড়াটে মহিলাকে তুলে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া চলছে তো— অনেকেই এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন— তাছাড়া দু'-একটা বাড়িও দেখা হয়েছে—'

অরুণনাথ বললেন, 'দ্যাখো, যেটা করলে ভালো হয়, সেটাই করবে।'

আনন্দ নিনির জন্য আর ব'সে না-থেকে বেরিয়ে পড়লো। লেকের দিকে যাবে কিনা

ভাবছিল। একা যেতে তার ইচ্ছে করছিল না। সুবোধকে ডেকে নেওয়া যায়। সুবোধ সঙ্গে থাকলে একটু ভরসা পায় সে। মহাকরণে সেই মাথা ঘুরে প'ড়ে যাওয়ার পর থেকে, মনের জোর অনেকটাই ক'মে গেছে— তারপরও বার-দুই— অনন্ত নক্ষত্রের আকাশ নেমে এসেছে তার চারদিকে কিংবা জমাট অন্ধকারে অজস্র জোনাকি— যেন আলোর চুমকি গাঁথা অন্ধকারের চাদর... কিন্তু শেষপর্যন্ত আনন্দ সামলে নিতে পেরেছিল।

শেষবারের ব্যাপারটা ঘটেছিল গভীর রাতে। ঘুম আসছিল না। শুয়ে থাকতেও অস্থির লাগছিল। বাইরে এসে পায়চারি করছিল আনন্দ। কখনও আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। অন্ধকার মাখা নিমপাতার ফাঁক দিয়ে আকাশটা তত ভালো আর দেখতে পায় না ব'লে আপশোষ হচ্ছিল। ভাড়াটে মহিলার ঘরও অন্ধকার। কী মনে ক'রে বারান্দায় উঠে সে হাঁটছিল। একেবারে মহিলার দরজা পর্যন্ত— কী-একটা শব্দে কান পাততেই সে দেখতে পেলো হালকা নীল অন্ধকারে সঙ্গমরত দু'টি দেহ, সেই দেহ থেকে নির্গত শীৎকার আনন্দর মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ছিল আর তখন তার মনে পড়ছিল, একদিন অমনই রাতে সে যেন প্রভাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল— তার সাড়া পেয়ে সুড়ৎ ক'রে ঢুকে পড়েছিল ঘরের মধ্যে— বিভ্রম? এও কি বিভ্রম— মনের ভুল? এরকম কী-সব ভাবনার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আনন্দর মনে হচ্ছিল— নক্ষত্রের আকাশ নেমে আসছে... কু-দৃশ্য দেখো না, কু-কথা শুনো না।

আনন্দ হাঁটছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য স্থির করতে পারছিল না। শেষমেষ সে ভাবলো, বাড়ি ফিরে ইজিচেয়ারে ব'সে থাকবে। মঞ্জু যদি বাড়ি থাকে, বলবে এক কাপ চা ক'রে দিতে। এখন কি বাড়ি থাকার বয়েস তার? —কোথায় কোন্ যুবকের সঙ্গে পথ হাঁটছে! কবিতাও আর সেভাবে লিখছে না। মা-মেয়ের কি একই প্রেমিক হ'তে পারে?

একই মেয়ে যদি বাবা-ছেলের প্রেমিকা হ'তে পারে, তাহলে একটি ছেলে মা-মেয়ের প্রেমিক হ'তেই পারে।

বছর-খানেক আগে মঞ্জুর জন্য প্রভা একটা ছেলেকে এনেছিল, তার মুখটা মনে পড়লো, কেমন যেন ক্যাবলা টাইপ, প্রভা যে কীভাবে পছন্দ করলো তাকে, ভাগ্যিস মঞ্জুর মনে ধরেনি!

বাসায় ফিরে আনন্দ দেখলো, কেউ নেই। ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে সে বারান্দায় বসলো। তারপর মাথাটাকে সে চিন্তাশূন্য ক'রে দিতে চাইলো। কিন্তু অদ্ভুত একটা স্মৃতি ফিরে এলো, কাল বা পরশু দেখা একটা দৃশ্য— একটা কুত্তির পেছনে দু'-তিনটে কুত্তা— খুবই পরিচিত দৃশ্য— প্রতিবছরই এসময়ে এসব দৃশ্যের সামনে দু'-একবার পড়তে হয়, কিন্তু আজ তা স্মৃতিতে ফিরে দেখাটা আশ্চর্যের— অদ্ভুত; কেন?

এক বৃদ্ধ কুকুর কুত্তির মুখ-খিঁচুনি খেয়ে কেমন হতভম্ব; করুণ হয়ে উঠেছিল তার মুখখানা, স্থির দাঁড়িয়েছিল— স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আনন্দ, কুকুরটার চোখে যেন তারই করুণ-বিষণ্ণ দৃষ্টি। এ-পৃথিবীর সৃষ্টিযজ্ঞে সে বাতিল, কোথাও কোনো ডাক নেই।

তবুও মঞ্চের 'পরে অনিরুদ্ধ দেবযানী কচ
নিজেদের ভাষা ভেঙে একটুও হয় না দাঁতালো।

যখন কিছুই করার থাকে না কিংবা কোনো পত্রিকাকে কবিতা দেওয়ার কথা থাকলে ট্র্যাঙ্কের অন্ধকার থেকে দু'-একটা খাতাকে আলো-হাওয়ায় নিয়ে আসে আনন্দ— নিজের কল্পনা আর অনুভবের জগতে বিচরণ করতে করতে পঁচিশ-ত্রিশ বছরের আগের পৃথিবীকেও কেমন ধূসর মনে হয়, মনে হয় সেইসব জনপদ মাঠ-প্রান্তর আজ মৃত— মৃত সেইসব নগরী— এসিরিয়া-নিনভে-টায়ার-বেবিলন-উজ্জয়িনী-বিদিশা যেমন জেগে উঠতো একসময়, নিজেকে দেখতে পেতো, তেমনই মাঠ-প্রান্তর, আকাশ-নদী জেগে ওঠে, নিজেকে দেখতে পায় আর তার মনে হয়— কোনো প্রেমের কোনো স্বপ্নের কোনোদিন মৃত্যু হয় না— আমরা কেবল পথ থেকে আর এক পথে চলি— চলতে-চলতে এখানে, পেছনে ধূসরতা, সম্মুখে গাঢ় কুয়াশা; আর সত্তা— ব্যথা আর কুয়াশার ঘরে বন্দি।

আজ একটা বিশেষ খাতা নিয়ে বসেছিল আনন্দ। কুড়ি-একুশ বছর আগেকার খাতা। রঞ্জু-মঞ্জু বাড়িতে তাদের নিজস্ব জগতে মশগুল। বাড়িতে যে তারা আছে, মনেই হচ্ছে না। এটা কুসুমকুমারীর অবদান। নিজের ঘরে একা আনন্দ মানেই, লেখার মধ্যে আছে, এই সময় চিৎকার-চেঁচামেচি করতে নেই— এই শিক্ষা তারা কুসুমকুমারীর কাছ থেকেই পেয়েছে— এক অদ্ভুত দূরত্বজ্ঞাপক সম্ভ্রম, একটা খাদও যেন— তাকে অতিক্রম ক'রে ছেলে-মেয়েরা খুব কম সময়েই তার কাছে আসতে পারে, পেরেছে; একইসঙ্গে সেও পারে না তাদের কাছে পৌঁছুতে।

অথচ কী অবলীলায় আনন্দ পৌঁছে গেছে বাইশ-তেইশ বছর আগেকার পৃথিবীতে! তখন বরিশাল 'দ্রুত আধুনিক' হয়ে উঠছে। গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ির পাশাপাশি বাস-লরি, বাইসাইকেল। কোলকাতা থেকে সিনেমা-থিয়েটার শো করতে আসছে। জ'মে উঠছে নাটক-সিনেমা। অভিনয়প্রীতি বাড়ছে— একদিকে। অন্যদিকে বিরোধিতা। মহিলাসভার নেতৃত্বে থিয়েটার-বায়োস্কোপ 'দেখবো না' ব'লে আওয়াজ তোলা হচ্ছে ব্রজমোহন স্কুলের ছাত্ররাও বায়োস্কোপ না-দেখার আবেদন জানিয়ে শহর পরিক্রমা করছে। ক্রমে থিয়েটারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গ'ড়ে উঠলো, এমন-কী সত্যাগ্রহের মাধ্যমে আন্দোলন এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো যাতে থিয়েটারের দল কোলকাতায় ফিরে যেতে বাধ্য হলো। তখন প্রভা এসেছে তার জীবনে— প্রভা ওই আন্দোলনের বিরুদ্ধে, কিন্তু তা প্রকাশের উপায় নেই। তবু সে আনন্দকে বলেছে, গোপনে বায়োস্কোপ দেখা যায় কিনা। আনন্দ 'যায় না' ব'লে তার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে, 'তুমি বুঝতে পারছো না প্রভা, এ-আন্দোলনের পেছনে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা রয়েছে, বায়োস্কোপ দেখতে গেলে কারও-না-কারও চোখে প'ড়ে যাবো, তা নিয়ে অনর্থ ঘটবে।'

—'তুমি একটা ভীতুর ডিম!'

—'যা বলো!'

—'আমার তো অভিনয় করতেও ইচ্ছে করে।'

—'আপাতত পূরণ হবার কোনো পথ দেখছি না।'

—'হবে কোনোদিন? তোমার মনে হয়?'

—'আশা রাখতে পারো।'

—'ওঃ! যা একখানা বন্দিপুরি!' ব'লে প্রভা আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। প্রভার মধ্যে যেন এক পাখির হৃদয় রয়েছে— কতকাল আগের প্রভার সেই মুখ মনে পড়ছে— সব মানুষের মধ্যে পাখি-স্বভাব আছে— এই উপলব্ধি সেদিন প্রভাই তাকে দিয়েছিল... তারপর কবে একদিন প্রভাকে গুনগুন করতে শুনেছিল, 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা—'

প্রভার আকাশ এখন মুক্ত— সে ডানা মেলে দিয়েছে, তার অভিনয় করবার ইচ্ছে সার্থক হ'তে চলেছে... সেই সার্থকতায় নতুন মাত্রা দিতে চায় আনন্দ— বাইশ-তেইশ বছর আগেকার তার সেই মনটাকে আনন্দ ফিরে দেখতে চাইছে...

আনন্দ পড়ছিল। পড়তে-পড়তে একসময় সে ভাবলো, যেন প্রভাকে লক্ষ ক'রেই সে বলছে, 'ভীতু কিনা জানি না, বাস্তবত সাহস প্রকাশ করার পদ্ধতি আমার জানা নেহ, থাকলে এই লেখা আমায় লিখতে হতো না।'

দরজায় রঞ্জু। ঘরের মধ্যে উঁকি মারলো। আর কেউ তো নেই— এরকম একটা ভাবনায় সে বললো, 'কার সঙ্গে কথা বলছো?'

—'একা-একা।'

—'মা-র মতো তুমিও কি নাটক করছো কোথাও?'

—'না, তোমার মা তো করছেন— তাই।'

রঞ্জু চ'লে গেল। কী বুঝলো কে জানে। হয়তো ঠিকই বুঝেছে। তার মা-ও তো এ-ভাবে একা-একা পাঠ মুখস্থ করে... আনন্দ ফের পড়তে থাকলো... নিজের লেখা পড়তে-পড়তে এমন বিমুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল— এই লেখাটা যদি প্রভাকে পড়ানো যেতো!

প্রভার সঙ্গে আজ কিছু কথা হবে। নাটক বিষয়ে ব'লেই হয়তো প্রভা খুব আন্তরিকভাবে বলেছিল, 'রিহার্সাল থেকে ফিরে আসি, তারপর—' তখন, এই লেখা থেকেই অনেক কথা বলতে পারবে; বিশেষ কথাগুলোকে আনন্দ আরও দু'-একবার দেখে নিয়ে খাতাটা ট্র্যাঙ্কের মধ্যে রেখে দিলো।

টেবিলের ওপর রাখা ছিল 'ঘরে বাইরে'। বইটা আনন্দ নিনিদের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এসেছে, প্রভার জন্য, বইটা টেনে নিলো।

কতকগুলো জায়গা সে চিহ্নিত ক'রে রেখেছে, সেগুলো প্রভাকে শোনাবে। বিমলার আত্মকথায় তার মনোজগতের যে উন্মোচন, তা যেন প্রভারও, হয়তো-বা সব মেয়েদেরহ,

অন্তত বিয়ের ব্যাপারে যাদের কোনো কথা থাকে না, তাদের। প্রভা যদি কখনও আত্মকথা লেখে, সেও বিমলার মতো লিখবে: ছেলেবেলায়, রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছি, তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল। ...দেহখানি যেন চামেলি ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া, যুগযুগান্তর যেসব কুমারী শিবপূজা ক'রে এসেছে তাদেরই একাগ্র মনের কামনা দিয়ে তার মুখ যেন তিলে তিলে তৈরি। সে কী চোখ, কী নাক! তরুণ গোঁফের রেখা ভ্রমরের দু'টি ডানার মতো...

আনন্দ কল্পনা করলো, প্রভা তার সামনে ব'সে আছে। আনন্দ তাকে বলছে, তুমি মেজোরানির রোল করছো, নিখিলেশকে কিন্তু বুঝতে হবে ভালো ক'রে; কেননা তোমার অধিকাংশ কথা বিমলার সঙ্গে, বিমলা নিখিলেশকে বোঝেনি; শোনো! নিখিলেশের কথা: আজ পর্যন্ত বিমল এক জায়গায় আমাকে কোনোমতেই বুঝতে পারেনি। জবরদস্তিকে আমি বরাবর দুর্বলতা ব'লেই জানি। যে দুর্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না; ন্যায়পরতার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যায়ের দ্বারা সে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়। ধৈর্যের 'পরে বিমলার ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন-কী অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে।

তুমি, মানে মেজোরানি, বার বার বিমলাকে আঘাত করতে চাইছে... সন্দীপ— এ চরিত্র সম্পর্কেও তোমাকে সচেতন হ'তে হবে। সন্দীপ এক জায়গায় বলছে: আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে আমার দেরি হয় না। ওরা-যে বাস্তব পৃথিবীর জীব, পুরুষদের মতো ওরা ফাঁকা আইডিয়ার বেলুনে চ'ড়ে মেঘের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় না।

কত বছর আগে, ভাবো— আটত্রিশ বছর পরেও, ওই কথার সত্যতা একটুও ম্লান হয়নি।

সন্দীপদের কাছে মেয়েরা জীবমাত্র, তারা মানুষী নয়, নয় ব'লেই তাদের কোনো আইডিয়া থাকতে নেই— ঠিক; এখনও কি তা-ই নয়? আইডিয়া নেই ব'লেই তাদের জয় করা যায়। জয় করবার শক্তি কী? সন্দীপের ভাষায়— পড়ছি শোনো: যে-শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায় সেইটেই হচ্ছে বীরের শক্তি, অর্থাৎ বাস্তব জগৎকে পাবার শক্তি।

কী আশ্চর্য! সন্দীপ স্বদেশি পন্থায় ইংরেজ তাড়াতে চায়, অথচ সে নিজেই ইংরেজদের জীবনবোধে আক্রান্ত— এসব তোমাকে বুঝতে হবে—

কিন্তু প্রভার সঙ্গে কথা শুরু হলো এভাবে, শুরু করলো আনন্দই, 'ঘরে বাইরে তুমি পড়েছো?'

—'না।'

—'তোমাদের ডিরেক্টর মূল উপন্যাসটা পড়তে বলেননি?'

—'বলেছে, বিমলা-সন্দীপ-নিখিলেশদের অবশ্যই পড়তে হবে, আমাদের পড়লে ভালো, না-পড়লে ক্ষতি নেহ, এমনই মনোভাব— মনে হলো।'

—'না, ক্ষতি আছে; তুমি পড়বে। এই নাও।' বইটা এগিয়ে দিলো। প্রভা বইটা তুলে নিলে আনন্দ বললো, 'নাটক লেখার ইচ্ছে ছিল খুব—'

—'এখনও তো লিখতে পারো!'

—'নাঃ! থিয়েটারের জগৎও কেমন জটিল হয়ে পড়েছে। নতুন নাটক লেখা খুব মুশকিল। যেসব বই জীবন সম্পর্কে খুব অভিজ্ঞ, যেসব কলম বিধাতার কল্পনা বিচার বুদ্ধি দুর্বুদ্ধি, সফলতা ব্যর্থতার নাড়ির খবর সবচেয়ে গভীরভাবে রাখে, সেরকম একখানা বই নিয়ে নাটক লিখলে হয়, কিন্তু সময় কোথায়?' একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'ঘরে বাইরে কিন্তু তেমন একখানা বহ; আমার তালিকায় এ-বইটা ছিল— জীবনের পক্ষে এ-বইটা খুবই মূল্যবান— এর অভিনয়ও তেম্নি হবে ব'লে আমার মনে হয়—'

প্রভা কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

—'এই জন্যে পড়তে বলা— আসলে কী জানো, অভিনয়েরও একটা মূল্য আছে— একটা ঐশ্বর্যভরা কবিতা বা গান বা ছবির যে মূল্য— ঠিক ততটাই—'

প্রভার মধ্যে এক ধরনের মুগ্ধতা জেগে উঠছিল, সে নির্বাক।

আনন্দ বললো, 'আমি চাই তোমার অভিনয় তেমন মূল্যমানে পৌঁছোক!'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভা যাচ্ছে। তার যাওয়ার পথের দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে আনন্দ। আজ রাজভবনের সামনে শিক্ষকদের গণঅবস্থান। প্রভা সেই অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হবে। গতকাল শিক্ষক সংগ্রাম কমিটির ডাকে সারা বাংলায় হরতাল পালিত হয়েছে। মিছিলে হাঁটবার ইচ্ছা ছিল প্রভার, কিন্তু হাঁটাহাঁটি করলে যদি আক্রমণ ক'রে বসে রোগটা— আনন্দ তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল। না-হেঁটে প্রভা নাটকের স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসেছিল। কালই সে জানিয়েছিল, আজ অবস্থানে বসবে। আনন্দ বলেছিল, 'সেই ভালো, উপেক্ষার জবাব যৌথভাবেই দেওয়া উচিত।'

—'উপেক্ষা বলছো কী! রীতিমতো বঞ্চনা— জানো তো, এবিটিএ একটা সমীক্ষা চালিয়েছিল, একশ চল্লিশটা স্কুল আর ষোলোশ'রও বেশি শিক্ষকদের মধ্যে— গড় মাইনে চল্লিশ থেকে ষাট টাকা, ভাবা যায়!'

একটু চুপ ক'রে থেকে আনন্দ বলেছিল, 'উপেক্ষা-অবহেলার বিরুদ্ধে একটা জোরদার আন্দোলন গ'ড়ে উঠছে— এটা আশার কথা, নিশ্চয়ই তুমি যাবে, তোমার দাবি জানাতেই যাবে তুমি।'

প্রভাকে যেতে দেখে আনন্দর শান্তিসুধার কথা মনে পড়লো। কেমন আছেন তিনি? কোথায় আছেন? আনন্দর মনে হলো তিনি সংগ্রামেই আছেন— এত সংগ্রাম চারিদিকে— আছেন কোথাও!

প্রভা যাচ্ছে, ভালো, সংগ্রাম ছুঁয়ে থাকা ভালো— আমি কখনও মিছিলে হাঁটিনি, যার যা-কিছু-সব— সুপারিশ আর অনুকম্পায় পাওয়া, তার আর কী দাবি থাকতে পারে? প্রাইভেট কলেজের অধ্যাপনায় একটা যৌথ দাবির পরিসরও ঠিকভাবে গ'ড়ে ওঠেনি। তবু গতবছর ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর অভিযানে আমার একটা সই আছে—

প্রভা দৃষ্টির বাইরে। তবু তাকিয়ে আছে আনন্দ পলকহীন। কী এক আবর্তের মধ্য থেকে একটা কথা উঠে এলো— 'কোনো এক বিপদের গভীর বিস্ময় আমাদের ডাকে'— মনে মনে আওড়ালো বার-কয়েক। বাঃ! অনেকদিন পর একেবারে নিটোল কবিতা হয়ে উঠে এলো কথাটা! 'কোনো এক বিপদের গভীর বিস্ময় আমাদের ডাকে?'

আনন্দ চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকলো। আসলে সে আরও কথা খুঁজছিল। একসময় তার মনে পড়লো, কথাটা নতুন নয়, অনেকদিন আগে, কুড়ি বছরের বেশি, কোনো এক সময় সে লিখেছিল। তখন আইন অমান্যর দ্বিতীয় পর্ব— গান্ধিজী সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছেন। সত্যাগ্রহ— কিন্তু দমন-পীড়ন সহিংস। সমস্ত কংগ্রেসী সংগঠন নিষিদ্ধ, ধড়পাকড় চলছে— আর আজ সরকার চালাচ্ছে কংগ্রেস, দেশ স্বাধীন তবু বিপদের গভীর বিস্ময় কেন আমাদের ডাকছে, ডেকে নিয়ে গেল প্রভাকে? —প্রভার হৃদয় কি আশার দাহনে উদ্বেল?

আনন্দ সাতটি তারার তিমির খুঁজে-পেতে বের করলো। কবিতাটি মেলে ধরলো চোখের সামনে:

কোনো এক বিপদের গভীর বিস্ময়
আমাদের ডাকে।
পিছে পিছে ঢের লোক আসে।
আমরা সবার সাথে ভিড়ে চাপা প'ড়ে— তবু—
বেঁচে নিতে গিয়ে
জেনে বা না জেনে ঢের জনতাকে পিষে— ভিড় ক'রে,

কয়েকটা লাইন টপকে:

যারা বড়ো মহীয়ান— কোনো এক উৎকণ্ঠার পথে
তবু স্থির হয়ে চলে গেছে;
একদিন নচিকেতা ব'লে মনে হত তাহাদের;
একদিন আত্তিলার মতো তব;
আজ তারা জনতার মতো।

পরের লাইনগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে আনন্দ শেষের তিনটি লাইন বার-কয়েক পড়লো:

আজকে সমাজ
সকলের কাছ থেকে চেয়েছে কি নিরন্তর
তিমির বিদারী অনুসূর্যের কাজ।

AMARBOI.COM

আনন্দকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। বইটা সরিয়ে রেখে, বাইরে এসে ইজিচেয়ারে বসলো। ব'সে থাকলো চোখ বন্ধ ক'রে। তার ঠোঁট নড়ছিল— নচিকেতা... আত্তিলা... জনতা... আত্তিলা... নচিকেতা...

আনন্দর চোখের সামনে যেন বৈদান্তিক পৃথিবীর কুয়াশা, সেই কুয়াশার মধ্যে ফুটে উঠছে যম ও নচিকেতার উপাখ্যান, কথকের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে:

—'মিল, যে-অগ্নিবিদ্যা নচিকেতা জ্ঞাত হ'তে চাইছে তা কিন্তু পার্থিব অগ্নি নয়; নয় ব'লেই তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, এমন-কী মনের কোনো বৃত্তি একে ধরতে পারে না।

এই অগ্নি হৃদয়ে নিহিত—

এই অগ্নিবিদ্যা আয়ত্ত করতে পারলেই এই জীবনেই মৃত্যুর সর্বপ্রকার বন্ধন হ'তে মানুষ মুক্ত হ'তে পারে।'

আনন্দ মিলুকে দেখতে পাচ্ছে, কেমন দুর্বোধ্য লাগছে সবকিছু, সত্যানন্দের শান্ত দু'চোখ তার মুখের ওপর:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এক্ষেত্রে মৃত্যুর বন্ধন বলতে বুঝতে হবে অন্ধকার— অধর্ম, রাগ-দ্বেষ, কামনা-বাসনার বশ্যতা— অজ্ঞান, অন্ধত্ব—' পঞ্চান্নে পা দেওয়া আনন্দ তারই বয়েসী সত্যানন্দকে জিগ্যেস করলো, 'বাবা, তোমার দেওয়া সূর্যচেতনার অনুসারী হয়ে আমি অন্ধকারকে বিদীর্ণ করতে চেয়েছিলাম, বছর-কুড়ি আগেও আমার বিশ্বাস ছিল, আমি সেই বিশ্বাস লিখেছিলাম— তিমির বিদারী অনুসূর্যের কাজ সকলের কর্তব্য হওয়া উচিত।'

সত্যানন্দ 'সব জানি'র ভঙ্গিতে হাসলেন, অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে, তাই তো?

—'গাঢ় কিনা জানি না, কেবল অদ্ভুত মনে হচ্ছে!'

—এই অন্ধকারে অন্ধরা কেমন সাবলীল ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই না?

—'বলো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে!'

—হ্যাঁ, দাপানোই বটে! মিল, আমি সবই লক্ষ করছি, প্রেম-প্রীতি-করুণাশূন্য মানুষেরা আজ পৃথিবী চালাচ্ছে—

—'বাবা, হয়তো সেজন্যে আমি রঞ্জুকে বলতে পারছি না, মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখবি— মঞ্জুকে বলতে পারি না, কবিতা লেখ্!'

কে যেন আনন্দর কাঁধে হাত রেখে তাকে জাগানোর চেষ্টা করছে, চোখ মেলে তাকালো— মঞ্জু, 'স্বপ্ন দেখছিলে?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে আনন্দ—

—'কী-সব বিড়বিড় করছিলে!'

—'তা হবে!' চোখ বন্ধ করলো।

—'কলেজে যাবে না?'

—'ক'টা বাজে?'

—'এগারোটা বাজতে যাচ্ছে।'

কী ভেবে আনন্দ বললো, 'না, আজ আর যাবো না।'

একবার 'নাভানা'য় গেলে হয়। নাভানা তার শ্রেষ্ঠ কবিতা সঙ্কলন প্রকাশ করছে। কবিতা বাছাই করেছে বিরাম মুখোপাধ্যায়, বলা যায় তারই উৎসাহ-উদ্যোগে বইটা প্রকাশ পাচ্ছে— একটা ভূমিকা লিখতে হবে। বিরামের দাবি, ভূমিকায় যেন তার প্রতি যেসব অভিধা ব্যবহার করা হয়েছে সেসবের একটা সমুচিত জবাব থাকে। কবিতাগুলো চূড়ান্ত বাছাই হয়েছে কিনা একটু জানা দরকার।

নাভানায় পৌঁছে আনন্দ দেখলো গভীর মনোযোগে বিরাম একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। সে তার উপস্থিতি টের পায়নি। সৌরেনবাব, তার হবু প্রকাশক হাতের ইশারায় বসতে বললেন। একটু পরে চোখ তুলতেই বিরাম আনন্দকে দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে বললো, 'আপনাকেই ভাবছিলাম।' পত্রিকাটা এগিয়ে দিলো, 'গত সংখ্যা দেশ পত্রিকায় সুনীল সরকারের লেখাটা পড়েছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না।' পত্রিকাটা নিতে-নিতে বললো আনন্দ।

—'শুনেছেন কিছু?'

—'না তো!'

—'সে কী! আধুনিক বাংলাকবিতা বিষয়ে ভদ্রলোক লিখেছেন, ন'জন কবিকে তিনি বেছেছেন—'

—'তাই নাকি!' সূচিপত্র দেখলো আনন্দ। তারপর প্রবন্ধটা প্রথম পাতায় চোখ বুলিয়ে বললো, 'ন'জন কে কে?'

—'সুধীর চৌধুরী, প্রমথ বিশী, অচিন্ত্যকুমার, সুধীন দত্ত, প্রেমেনদা, বিষ্ণু-বুদ্ধ, অমিয় চক্রবর্তী, আর আপনি— আপনার দুটো বই ধ'রে আলোচনা হয়েছে— পড়ুন না!'

আনন্দ ম্যাগাজিনটা রেখে দিলো, 'পরে পড়বো।'

উচ্ছ্বাসের যে-আভা বিরামের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল তা ম্লান হয়ে গেল, বললো, 'ভূমিকা লেখার আগে লেখাটা পড়বেন কিন্তু!'

—'খুব কি নতুন কিছু লিখেছে ব'লে আপনার মনে হলো?'

—'না, তা অবশ্য হয়নি, কিন্তু আধুনিক বাংলাকাব্যে আপনার দানই সবচেয়ে অসাধারণ এবং কৌতূহলোদ্দীপক— একথাটা অকপটে ঘোষণা করেছেন তিনি।'

আনন্দ কী-যেন ভেবে বললো, 'কী বৈশিষ্ট্য তিনি আবিষ্কার করেছেন?'

বিরাম পত্রিকাটা তুলে নিলো।... প'ড়ে শোনালো অবচেতন বা প্রাণ ও মনের অর্ধজাগ্রত স্তরের মধ্য দিয়ে জীবন ও জগৎকে দেখাই তাঁর বৈশিষ্ট্য।'

—'তার মানে সেই সুররিয়ালিস্ট—'

—'উনি বলছেন— আপনি হেমন্তের কবি।'

—'আগেও কেউ বলেছেন।'

—'উনি আপনাকে ইতিহাসসচেতন বলেননি, যদিও কালচেতনা উল্লেখ করেছেন।'

—'আর?'

—'এক জায়গায় তিনি লিখছেন—' প'ড়ে শোনালো: 'প্রাণের যে স্তরে প্রবৃত্তিগুলির প্রদক্ষিণ পথ, সেইখানে দাঁড়িয়ে কবি জগৎকে দেখেছেন। তাই স্বভাবতই তাঁর দৃষ্টি আর নির্জন প্রকৃতির দিকে নয়, উইদিন ব্র্যাকেট— যা বনলতা সেনের বিশেষত্ব— জনসমাজের দিকে। কিন্তু মানুষের মধ্যে থেকেও তিনি নিজে নিঃসঙ্গ।'

একটু ভেবে আনন্দ বললো, 'এ আর নতুন কী কথা! সেই তো নির্জনতম কবি আখ্যা মনে করিয়ে দেবে।' কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললো, 'তাতে কোনো দোষ নেই— এসবই তো আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু মুশকিল কী জানেন বিরামবাবু, অংশের উপস্থাপনা যদি যথার্থ না-হয়, তখন অংশকে সমগ্র ভাববার একটা ঝোঁক তৈরি হয়ে যায়, যায না কি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা শেষ হ'তেই আনন্দ উঠে দাঁড়ালো।

—'উঠলেন যে!'

—'হ্যাঁ। সঞ্জয়বাবুর ওখানে একটু যাবো।'

এতক্ষণে সৌরেনবাবু বললেন, 'এক কাপ চায়ের সময় অন্তত ব'সে যান।'

আনন্দ বসলো। আর তখনই তার মনে পড়লো, সে কবিতা বাছাইয়ের ব্যাপারে জানতে এসেছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস;
যদি না মানব এসে তিন ফুট জাগতিক কাহিনীতে হৃদয়ের নীলাভ আকাশ
বিছিয়ে অসীম করে রেখে দিয়ে যায়:
অপ্রেমের থেকে প্রেমে গ্লানি থেকে আলোকের মহাজিজ্ঞাসায়।

—'আমি তোমার কথা ভাবছিলাম' ব'লে আনন্দ একটু চুপ ক'রে থেকে, তার বলার কথাটি যেন গুছিয়ে নিয়ে বললো, 'খুব ক'রে কাউকে চাইলে, ঠিক পাওয়া যায়, না?'

সুরজিৎ কী বলবে, ভেবে না-পেয়ে, কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আনন্দ ততক্ষণে একটা আচ্ছন্নতায় ডুবে গেছে, 'নইলে তোমার তো আসা হয় না।' তারপর কোথায় যেন হারিয়ে গেল আনন্দ, তার ঠোঁট-দুটো নড়ছে মৃদু, যেন এখনই কিছু ব'লে উঠবে সে। সুরজিৎ বললো, 'আমিও ভাবছিলাম।'

—'তাহলে, তুমি বলছো, ব্যাপারটা পারস্পরিক?'

সুরজিৎ মাথা নাড়লো।

—'আচ্ছা, তুমি কেন ভাবছিলে আমার কথা?'

—'আপনার সান্নিধ্য পাবো ব'লে, আর তারপর মন গেয়ে উঠবে, এই লভিনু সঙ্গ তব—'

সুরজিতের একটা হাত আনন্দ তার দু'হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে যেন তাকে কৃতজ্ঞতা জানালো। তারপর বললো, 'আমার ভাবনায় ভেজাল ছিল, স্বার্থবুদ্ধি—'

—'কীরকম?'

—'তুমি কোলকাতায় বাসা খুঁজছো— খুঁজছো তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমি ভাবছিলাম, তুমি আর আমি পাশাপাশি থাকতে পারি।'

—'কীভাবে?'

—'আমি যে-ঘরটাকে সাব্‌লেট্ করেছি, ওখানে।'

—'তাহলে শ্রীমতী ভয়ঙ্করীকে তাড়াতে পেরেছেন?'

—'না। তাড়ানো যায়নি।'

—'ভাবছিলাম, যদি তুমি পারো।'

—'আমি?'

—'হ্যাঁ— তোমরা তো একালের ছেলে, একটু গুণ্ডাবাজি করতে পারবে না?'

সুরজিৎ বিস্মিত হলো। যেন মিলছে না। যে-আনন্দকে সে চেনে, এ যেন সে নয়— আনন্দ সুরজিতের এই মনোভঙ্গি পড়তে পারলো, তার মনে পড়লো, এভাবেই সেও একদিন বিস্মিত হয়েছিল, সত্যানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে... সেদিন তাঁকেও অচেনা মনে হয়েছিল তার— সত্যানন্দ তাকে কোলকাতায় পাঠিয়েছিলেন 'যোগ্য' হবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য— প্রায় পঁচিশ বছর কোলকাতায় আলো-হাওয়ার মধ্যে থেকেও সে যোগ্য হ'তে পারেনি।

আনন্দ বললো, 'লেখার পরিবেশ একদম নষ্ট হয়ে গেছে—' একটু চুপ থেকে রসিকতার ঢঙে বললো, 'বাংলাভাষার জন্যে ঢাকার ছেলেরা লড়ছে। বাংলাকবিতার জন্য কোলকাতার ছেলেরা এটুকু করতে পারবে না!'

ব্যাপারটাকে সে এভাবে হালকা করতে চাইলেও, আর্ট সিচ্যুয়েশন গ'ড়ে ওঠার স্পষ্ট আভাস আনন্দ দেখতে পেলো— ময়ূখের ছেলেরা, সুরজিৎ, সেই-যে সেদিন তাকে অনর্গল তারই কবিতা শুনিয়ে, তার স্বকণ্ঠে কবিতা শুনে গেল যেসব ছেলেরা, তারা সকলে শ্রীমতীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে— তাদের স্লোগানে উঠে আসছে কবিতা রচনার পরিবেশ ফিরিয়ে দেবার দাবি, বাংলার কবি ও কবিতার দীর্ঘজীবন কামনা।

আনন্দ বললো, 'শোনো, ওই মহিলাকে যদি তুলে দিতে পারি, তুমি এখানেই থাকবে।'

তবু যেন সুরজিৎ স্বাভাবিক হ'তে পারছে না।

আনন্দ বললো, 'আমি কেমন দুর্বোধ্য হয়ে উঠছি, না?'

—'ঠিক তা নয়— অনেকেই আপনাকে মেলাতে পারেন না— আচ্ছা, আপনি কি ব্রাহ্ম?'

—'তোমার সঙ্গে আলাপের মাধ্যম তো কবিতা, ধর্ম তো বিষয় হয়নি কখনও, হঠাৎ এ-প্রশ্ন?'

—'আপনার কবিতা প'ড়ে, শুনেছি, কারও কারও সংশয় আপনি ব্রাহ্ম কিনা।'

—'কেন কেন! সংশয় কেন?'

—'ব্রাহ্ম হয়ে আধুনিক কবিতা লেখা নাকি সম্ভব নয়।'

—'কেন?'

—'তা তো জানা হয়নি, তবে তাদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে উল্লেখ করেছেন—'

—'রবীন্দ্রনাথ আধুনিক নন— তাই তো? যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবাদী— তুমি কি রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাসখানা পড়েছো?'

—'না। এখনও পড়া হয়নি।'

—'অথচ তুমি ইউলিসিস পড়েছো! লেখাটা পড়ো— পড়া দরকার। এই কিছুদিন আগে আমি আবারও পড়লাম, নাটক দেখলাম—'

—'ঘরে বাইরে?'

—'হ্যাঁ, পাড়ার একটা ক্লাব করেছে। তো, সেখানে একজন আধুনিকবাদীর মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলাচ্ছেন— প্রবৃত্তিকে বাস্তব ব'লে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডার্ন। বুঝতে পারছো, শিশ্নোদরতন্ত্র-মাফিক বেঁচে থাকাটাই আধুনিক!— এদের দৃষ্টিতে আমি অনাধুনিক।'

—'তার মানে আপনি ব্রাহ্ম?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'গড-এ বিশ্বাস না-রাখলে কেউ খ্রিস্টান হ'তে পারে কি? ব্রহ্মে বিশ্বাস না-করলে কেউ কখনও ব্রাহ্ম হ'তে পারে না।'

—'আপনি তাহলে ব্রহ্মে বিশ্বাস করেন?'

—'না।' একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আমি মানবে বিশ্বাস করি, মানবোচিত যে-সব গুণকে মনুষ্যত্ব বলে, তাতেই আমার বিশ্বাস।'

নিজের ভাবনাটাকে আরও স্বচ্ছ করবার জন্য সুরজিৎ বললো, 'মানবই কি সব? তার পরে বা উপরে কেউ বা কিছু নেই?'

আনন্দ যেন গভীর প্রত্যয়ে বললো, 'আছে।'

—'কী?'

—'মহা জিজ্ঞাসা।'

—'তাকে আপনি ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলবেন না?'

আনন্দ মাথা নাড়লো। তার মুখে স্মিত হাসি 'তোমার ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হলো আপাত মহা উত্তর—' মুহূর্ত-কয়েক পর, আবৃত্তির ঢঙে, 'মানুষ কাউকে চায়— তার সেই নিহত উজ্জ্বল/ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল/আরো আলো: মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়—'

ক্রমে তার স্বর স্তিমিত হয়ে এলো। কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিল আনন্দ, তার চোখের সামনে ভাসছিল উড়ন্ত প্রজাপতি— এঁকেবেঁকে উড়ছে, তার দু'দিকে দুই সাগরের বিস্তার, ডাইনে আলোসাগর, বাঁয়ে আনন্দসাগর আর তার ওপর মহাশূন্যতায় সূর্য, যেন মাছরাঙা আগুনের মতো জ্বলছে— প্রজাপতি মাছরাঙা— সূর্য-ঋতুর অপূর্ব ফসল, রঙের উৎসব— কী যেন এক বলার মতো খুঁজে পেয়ে আনন্দ উদ্দীপিত হয়ে ব'লে উঠলো, 'এক এক সময়, এ-বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকালে, দু'-একটা আটপৌরে দৃশ্য দেখে আমার কীরকম যেন মনে হয়, জ্ঞানের অগম্য এক অহেতুক উৎসবের সুর ছড়িয়ে আছে রোদ্দুরে, হাওয়ায়, পাতা-পতঙ্গে— সর্বত্র—' একটু থেমে বললো, 'এই অনুভব শেষে চেতনায় ফিরে এলে নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হয়— সেই কত বছর আগের অনুভব ফিরে আসে ফের; নিজেকে মানুষ ব'লে মনে হয় না— তখন তোমার মতো দু'-একজনের কথা মনে পড়ে— আমাদের জীবনের কাহিনী কী— সব তো একহ, শিশ্নোদরতান্ত্রিক— এই কাহিনীতে যখন হৃদয়ের নীলাভ আকাশ বিছিয়ে দেয় কেউ— কোনো মানব এসে, তখন তা অসীম বা চিরন্তন হয়ে যায়— তার মধ্যেই ফুটে ওঠে— অপ্রেমের থেকে প্রেমের, গ্লানি থেকে আলোকের মহাজিজ্ঞাসা—' একটু চুপ থেকে, 'এবার আনন্দবাজারে একটা কবিতা বেরুচ্ছে, প'ড়ে দেখো।'

সুরজিৎকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে আনন্দ বললো, 'বলো, তোমার কথা বলো!'

—'আপনিই বলুন! শুনতে ভালো লাগছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমার কী মনে হচ্ছে জানো তো, কবিতা আমাকে ছেড়ে গেছে, আমাকে যেন কথায় পেয়েছে— কিন্তু লক্ষ করেছি, ঠিক-ঠিক সংযোগ তৈরি হচ্ছে না।'

—'যেমন?'

—'এই কিছুদিন আগে, গত বৈশাখে, দুপুরবেলা আমার এক সহকর্মীর বাড়িতে, কথায়-কথায় আড্ডা বেশ জ'মে উঠেছিল, কী কথার সূত্রে আমার চোখের সামনে তখন সমুদ্র— সমুদ্রকে আমার নীল স্ফটিক মনে হলো। আমাকে অন্যমনস্ক দেখে একজন জিগ্যেস করলো, আমি কী ভাবছি, নীড়ের কথা কিনা। আমি জানালাম যে, নীড় বা মাটি— কিছুর কথাই ভাবছি না, কেবল জল, নীল জল। ক্রমে সমুদ্র বিষয় হয়ে উঠলো— কথা হচ্ছিল, একজন অধৈর্যভাবে আমার বলার কথাটি ধরতে পারছে না ব'লে জানালো। আমি বললাম, বিশেষ কিছু না— মনটা যদি সীমাহীন সমুদ্রের মতো হতো! তবু আমার চাওয়াটা তারা বুঝলো না।'

—'মন— সীমাহীন সমুদ্র— এ দিয়ে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?'

—'বিস্তৃতি— জীবনের প্রবলতর একটা আইডেন্টিটি ওই বিস্তৃতির মধ্যে— নিজেকে হারিয়ে ফেলে নিজের সত্তাকে আরও বিশুদ্ধরূপে, আরও পরিপূর্ণভাবে খুঁজে পাওয়া।'

সুরজিতের মুখ দেখে, 'দুর্বোধ্য লাগছে, না? এই আমার মুশকিল... ঘাসের ডগায় শিশির দেখেছো, ভোরবেলা?'

—'হুঁ'

—'তার ওপর সকালের রোদ্দুর— কী উজ্জ্বল! না?'

সুরজিৎ সায় দিলো।

—'রাতের বেদনার নির্যাস শিশির— যদি এরকম ভাবো, তাহলে দেখবে, রাত তার বেদনার উজ্জ্বলতাকে খুঁজে পাবে ওই ভোরবেলা— এসব কথা ওই বিস্তৃতি বোঝাতে সেদিন বলেছিলাম, আমার মনে হয়, পাখিও ফুল— পালকগুলো তার পাপড়ি, আলো আর হাওয়ায় সে ফুটে ওঠে, সূর্যমুখী যেমন, আর একইসঙ্গে সে গতি পায়— পাখি নিজেকে চিনলো তার গতিময়তায়... আমি বললাম— এসব, বললাম— সব দেহই আসলে ফুল, নিজেকে আবিষ্কারের আনন্দে আয়ুর ডালে ডালে ধীরে ধীরে সব দেহই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।'

সুরজিৎ বললো, 'এ তো সিম্বলিজ্‌ম!'

—'ঠিক তাই। তারাও বলেছিল একথা। কিন্তু শুধু সিম্বলরূপে দেখলে, ঠিকভাবে সংযোগ গ'ড়ে উঠতে না-ও পারে, প্রতীক বিষয়টিকে তার ইতিহাস-সমেত দেখতে হবে।'

—'এসব বিষয় নিয়ে আপনি তো লিখতে পারেন।'

—'পারি! না? তা পারি। লিখবো হয়তো, সময়-সুযোগ পেলে। তার আগে এই বাসাটা ছাড়তে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এবার পুজোর ছুটিতে কি বেড়াতে যাচ্ছেন কোথাও?'

—'না, তেমন কোনো সম্ভাবনা আপাতত নেই।'

—'তাহলে চলুন এবার জলপাইগুড়িতে।'

—'দেখি। পরে কথা বলবো।'

—'আপনার শ্রেষ্ঠকবিতা কি বেরুলো?'

—'হ্যাঁ-হ্যাঁ— এই তো ক'দিন হলো— তুমি দ্যাখোনি, না?' ব'লে আনন্দ বইয়ের গাদা থেকে একটা শ্রেষ্ঠকবিতা বের ক'রে দিলো।

—'বাঃ!'

—'প্রচ্ছদটা পছন্দ হয়েছে তোমার?'

—'খুব ভালো হয়েছে।'

সুরজিৎ ভূমিকাটা পড়ছে।

আনন্দ কিছু না-ব'লে উঠে গেল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারে সবচেয়ে সে শরণ ভালো:
যে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো।

একটি সাফল্য মানুষকে কত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক'রে তুলতে পারে, প্রভা তার উদাহরণ। মেজোরানির ভূমিকায় তার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। জীবনের সঙ্গে অভিনীত চরিত্রের সামান্যতম মিল যদি থাকে, চরিত্র-যে তাতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে— আনন্দর এ-ধারণা সত্য হয়ে উঠেছে। প্রভাকে বলতেই প্রভা বিস্মিতভাবে জিগ্যেস করেছিল, 'মেজোরানির সঙ্গে আমার আবার মিল দেখলে কোথায়?'

—'একটা বিধবা-বিধবা জীবন তো যাপন করছো তুমি!'

প্রভার সমস্ত শরীর একটু যেন ঝাঁকুনি খেলো— লক্ষ ক'রে আনন্দ বললো, 'রাগের কথা নয়। এ সত্য— একটা পুরুষের যদি তার রমণীর রুচিমাফিক প্রাণশক্তির উন্মত্ততা না-থাকে, তাকে তো বিধবার জীবন যাপন করতেই হবে— সে যা হোক, বিমলার পাট তুমি করতে পারতে, মানে যদি তোমাকে দিতো ওরা, আরও ভালো করতে তুমি— এ-কথা যারা বলেছে, আমি তাদের সঙ্গে একমত।'

কোথায়-যে কার প্রতিভা লুকিয়ে থাকে— প্রতিভার মৃত্যু হ'লে বোধহয় মনুষত্ব আর বাঁচে না, অন্তত প্রভাকে দেখে তেমনই মনে করা যায়— অবরুদ্ধ প্রতিভা তার আলো দেখেছে, অনেক সহজ হয়েছে তার ব্যবহার, নরম। প্রভা এখন পেশাদার মঞ্চে অভিনয় করার কথা ভাবছে। থিয়েটার পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো লোকজনের যাতায়াত শুরু হয়েছে এ-বাড়িতে। যাতায়াত বাড়ুক। প্রভার জীবন পল্লবিত হোক।

আনন্দ ভাবছিল। অথচ সে কবিতার খাতা নিয়ে ব'সে ছিল। দুটো খাতা। কয়েকজন ছেলে এসেছিল সেদিন, কবিতার জন্য; তাদের একজন পূর্বপরিচিত, তাকে দেখে আনন্দর মাথায় এমন রক্ত চ'ড়ে গেছিল, বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার ঘটেছে সেদিন— আনন্দ মাথাটা নিজের মনে নাড়ালো— ঠিক হয়নি, ঠিক হয়নি— কত কথাই তো শুনতে হয়েছে— গম্ভীর, পাগল—। 'ব্যক্তিত্বহীন' কী এমন কথা! তাও সে লেখার মধ্যে শব্দটা ব্যবহার করেছে— এমন অবিবেচকের মতো ক্ষেপে গেলাম কেন?

হয়তো রক্তচাপ বেড়েছিল। সুগারও বাড়তে পারে।

ডাক্তারের কাছে যাচ্ছো না কেন?

ইচ্ছে করে না।

কেন?

জানি না। হয়তো বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা ম'রে যাচ্ছে ব'লে।

একদিন বৃক্ষ আর আগুনের মতো আমি আকাশ ছুঁতে চেয়েছিলাম। আগুন নিভে গেছে, বৃক্ষের পাতায়-পাতায় হেমন্তের হিম, ঝ'রে যাওয়ার সময় এলো।

আচমকা ক্লাসের উজ্জ্বল মুখগুলো ভেসে উঠলো। তারা তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে 'জাস্টিস' পড়াতে হবে। বেঁচে থাকার ঢের প্রয়োজন।

আনন্দর ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত হাসি— তাচ্ছিল্যের— নাকি বিষাদের— কেমন যেন দুর্বোধ্য।

বিস্ময়কর প্রমত্ততার মুহূর্ত, দু'-একবার যা জীবনে আসে, আর আসবে না; বিস্ময়ের বিপন্নতা উৎরিয়ে জীবনের নতুন কোনো রূপ— নাঃ, আজ আর সম্ভব নয়।

কিন্তু কল্পনাপ্রতিভা?

প্রায় দু'বছর একটিও কবিতা লিখিনি— কী জানি কোথায় হারিয়ে ফেলেছি তাকে! তবু এই কিছুদিন আগে অনুভব করেছি— তার মুখ, মুখের রূপ আমার হৃদয়ে ফুটে আছে— হয়তো স্বপ্ন— স্বপ্নে নদী, শঙ্খচিল, শরবন; এই যে আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, খাতা থেকে উঠে আসছে দৃশ্যটা— একটি শান্ত নদী, শরবন, তালগাছ কয়েকটা— দূরে দিগন্ত, সমস্ত চরাচর নরম সন্ধ্যার রঙে নীল হয়ে আছে,— কিন্তু সেই মুখ?

আনন্দ সেই মুখ খুঁজতে যেন দু'চোখ বন্ধ ক'রে হৃদয়ের দিকে তাকালো। না, হৃদয়ে কেবল একটা ছাপ রয়ে গেছে।

জলছাপ যেন-বা।

কল্পনাপ্রতিভার চমৎকার সংহতির যে মুহূর্ত কবিতা সৃষ্টি করে কিংবা নির্মাণ, সেই মুহূর্ত গত দু'বছরে একবারও আসেনি। আসবে ব'লে আর মনেও হয় না।

কিন্তু জীবন ছাড়িয়েও যে অনন্য অভিজ্ঞতার দেশে পৌঁছে যাওয়া যায়— এ-বিশ্বাস তো তোমার ছিল!

ছিল, নেই তা বলছি না— সেই বিশ্বাসে আমি স্থিত হয়ে আছি, কিন্তু নিত্যব্যবহার্য এই সমাজ-সংসার-পদ্ধতির বাইরে কোনো কিছুর দৃষ্টান্ত, অন্তত, আমার সংসারের ক্ষেত্রে আমি রাখতে পারিনি— কোনো কিছুর কথা আমি আর ভাবতে পারি না।

প্রেমের বিষয়ে তবু তুমি স্থির?

স্থির তবু মানব-জীবন সম্পর্কে নতুন ক'রে যা কিছু বলবার— বলা হয়ে গেছে— তাতেও কি ভয়াবহ ইতিহাসকে এতটুকু স্নিগ্ধ করতে পারলাম! পঞ্চান্নটা বছর প্রায়— খুব কি কম সময়? অন্তত আমাদের পঁচিশ বছরের দাম্পত্য-ইতিহাসে— অথচ, ঘরে ফিরে এক-একদিন প্রভাকে দেখে মনে হয়, সে যেন দেয়াসিনী— দেয়াসিনীর মতো সে যেন কাউকে ভালোবেসেছে, আর নির্জন একাকিত্বে সে খুঁজছে মনের মানে—

ভালোবাসতে দাও!

আনন্দ কী মনে ক'রে পাতা উল্টেপাল্টে কী যেন দেখছিল। এক সময় খাতাটা মেলে ধরলো চোখের সামনে: অনেক দূরের জলের আলোড়ন/যেন তোমার মন;/সেই নদীর জল/যেন আমার মনের কোলাহল;/তোমায় খুঁজে পায় না, তব/ঘুরছে আমরণ।

আমরণ ঘুরতে হবে? জলের মতো। জল।

আনন্দ পাতা উল্টোয়। চোখ বোলায়... অন্ধকারে হৃদয়ের দায়/বিমুক্ত করার মতো কাকে আর পায়/জল ছাড়া?...

কোথায় যেন একটা নিস্তারের আভাস, কেমন যেন উত্তেজনা ছড়ালো, তারপর শান্ত হয়ে এলো তার মন, সে একটা কবিতা খুঁজতে থাকলো... ছেলেদের বলেছিল সাতদিন পরে আসতে, ওরা ঠিক কাল আসবে—

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হে আকাশ, হে সময়গ্রন্থি সনাতন,
আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালোবেসে আজ;
সকালের নীলকণ্ঠ পাখি জল সূর্যের মতন।

—'কী ব্যাপার ভূমেন, এই ভরদুপুরে? তোমার দিদি আসছে নাকি?'

—'কই, না তো!'

স্নেহাকর বললো, 'আমরা কবিতা নিতে এসেছি।'

—'বলেছিলাম বুঝি আজ দেবো!'

ভূমেন বললো, 'না। অনেকদিন আগে— তা প্রায় একবছর হ'তে চললো, আপনার কবিতা আমরা পাবো— এই মর্মে আপনি কথা দিয়েছিলেন।'

আনন্দ অসহায়ভাবে বললো, 'একটিও কবিতা লিখিনি।'

—'এই তো ক'দিন আগে শতভিষা-কে কবিতা দিয়েছেন।'

—'বছর-দুই আগেকার লেখা—'

—'অপ্রকাশিত তো?' বললো স্নেহাকর।

—'হ্যাঁ, কোথাও প্রকাশের জন্য এর আগে দিইনি।'

—'তাহলে আপনি আমাদের পুরনো কবিতাই দিন, 'আট বছর আগের একদিন'-এর সমসাময়িক কোনো কবিতা যদি থাকে ভালো হয়।'

আনন্দ একটু যেন বিস্মিত, স্নেহাকরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'ও-ধরনের লেখা— এখন তো বেশ নিন্দিত, তোমরা পছন্দ করছো কেন?'

—'আমাদের কেউ-কেউ মৃত্যুর কাছাকাছি বাস করছি।'

—'সে কী! কেন?' দু'জনেরই মুখের দিকে তাকালো আনন্দ।

ভূমেন বললো, 'কারও টিবি হয়েছে, কারও হবো-হবো।'

—'তুমি তো ডাক্তারি পড়ছো— ওদের নিরাময় করবার কথা ভাবছো না!'

—'আপনার কবিতাই আমাদের জীবন বিষয়ে বেশি মনোযোগী ক'রে তুলছে।'

আনন্দ একটু সময় অন্যমনস্ক থেকে বললো, 'কিন্তু সে-সময়কার লেখা কোথায় পাবো! এখন তো ওরকম লেখা আর লিখতে পারবো না!' তখনও কী যেন ভাবছিল আনন্দ, বললো, 'দিন-তিনেক পরে এসো, লেখা তৈরি ক'রে রাখবো।'

ভূমেনরা চ'লে যেতেই আনন্দ ভাবলো, এ কী ব'লে গেল ওরা— জীবনবিমুখ কবির কবিতা জীবন বিষয়ে বেশি মনোযোগী ক'রে তুলছে!

মৃত্যুচেতনা তবে জীবনের কোলাহল বহন করে? পুবের ওই ঘরে মেয়েটির জীবন ঘিরে তবে জীবনের কোলাহল, যা অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে, কিংবা আগ্রহের বিষয় প্রভার কাছে— ওই কোলাহলে কি প্রভা প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে? এই কোলাহল তো একটি মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, মৃত্যুতে তার উৎসমুখ খুলে দিয়ে গেছে মানুষটা— একটা মৃত

সম্পর্কের লাস বয়ে বেড়ানোর চেয়ে মৃত্যু ভালো— এই মনে ক'রেই তো কতবার প্রভাকে আমি মেরে ফেলেছি!

অদ্ভুত এক গ্লানিবোধ আনন্দকে যেন ঘিরে ধরলো। কিন্তু তাকে যেন দু'হাতে সরিয়ে আনন্দ তেড়েফুড়ে উঠে দাঁড়ালো। ট্র্যাঙ্ক খুলে তার মধ্যে মাথা ডুবিয়ে দিলো। পুরনো গন্ধ তার মগজে ছড়িয়ে পড়ছে— যেন পিরামিডের মমিঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। পরপর সাজিয়ে রাখা কবিতার খাতাগুলোর মধ্য থেকে একটা খাতা তুলে নিয়ে এলো।

ভূমেনদের কবিতাটা আজই তৈরি ক'রে রাখতে হবে।

খাতাটা খুলে বসলো আনন্দ। একটা পাতায় চোখ আটকে গেল তার। পড়লো। পড়তে-পড়তে সে ভাবলো, ঠিকই— একদিন এ-পৃথিবী জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষায় কোথাও অস্পষ্ট ছিল না, বৃক্ষস্বভাবীই তো ছিলাম— বৃক্ষের মতো কেবল আকাশমুখী—

আবৃত্তির ঢঙে বিড়বিড় করলো, 'পাশে তুমি রয়েছিলে ছায়া। একদিন এ জীবন সত্য ছিল শিশিরের মতো স্বচ্ছতায়;/কোনো নীল নতুন সাগরে/ছিলাম— তুমিও ছিলে ঝিনুকের ঘরে/সেই জোড়া মুক্তো মিথ্যে বন্দরে বিকিয়ে গেল হায়।'

কেমন এক হাহাকার উঠলো আনন্দর বুকের মধ্যে। একটি মুহূর্তকে এমন চিরন্তন ক'রে ব্যথা পাওয়ার কোনো মানে নেই— ভাবলো আনন্দ। তারপর, কবিতাটা সে কপি করতে শুরু করলো...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন ভালোবেসে হৃদয় বুঝেছে অনুপম
মূল্য দিয়ে আসছে চুপে মৃত্যুর সময়।

—'রঞ্জু, দ্যাখ্ তো— আকাশে তারা আছে?'

—'হ্যাঁ-আ— অ-নে-ক তারা। আমাদের দেশের পুকুরে— সেই শাপলার মতো ফুটে আছে।'

তা-ই ফোটার কথা, শরতের আকাশ, টলটলে জলের মতো— বাঃ!

—'তুই তারা চিনিস?'

—'ভূগোল বইতে সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুব নক্ষত্র, কালপুরুষ পড়েছি।'

আনন্দর বড় আফশোষ হলো— বরিশালের আকাশ তখন এত ঝাপ্‌সা হয়ে যায়নি। দু'-একটা নক্ষত্র, নক্ষত্রমণ্ডল তো ওকে চেনাতে পারতাম!

উঠোনে মাদুর পেতে বসন্তের রাতে কিংবা বৈশাখে— খুব ছেলেবেলার কথা মনে পড়লো আনন্দর, কী আশ্চর্য— বড়মামার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ছোট্ট মিলুকে তিনি আকাশের তারাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন— কালপুরুষের কোমরে তলোয়ার, যোদ্ধা...। রঞ্জুকে শেখাতে পারতাম, আমারই মতো একটা ব্যর্থ নাম বয়ে বেড়াবে ছেলেটা— এবার থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করলো, কী-যে জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্য!

দু'-একটা পাখি তাকে শিখিয়েছিল আনন্দ, ক'দিন আগে, একটা পাখি ডাকছিল, সুরটা কেমন চেনা— কিন্তু এখানে সে-পাখি কোথা থেকে আসবে! হয়তো স্বপ্ন দেখছে এমনই মনে করছিল সে, তখনই রঞ্জু হঠাৎ দেখা পাওয়ার আনন্দ কণ্ঠে ছড়িয়ে বলেছিল, 'দ্যাখো দ্যাখো বাবা, দুর্গা টুনটুনি।'

আনন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল কিন্তু দেখতে পায়নি। রঞ্জু কত চেষ্টা করেছিল তাকে দেখানোর। আনন্দ কেবল বার-কয়েক তার ডাকটা শুনতে পেয়েছিল।

পৃথিবীর রঙ-রূপ ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। শিশিরভেজা ধুলোর গন্ধ নেই। নদীর গন্ধ, নারীর গন্ধ— নেই। অন্ধকারে ব'সে থাকতে-থাকতে আনন্দর মনে পড়লো, কবে যেন অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিল— এমনই সে ব'সেছিল, আবছা অন্ধকার, তার চারপাশে ছাতকুড়ো জমলো, ঘুনপোকা এলো; তারপর এলো মাকড়সা— তারা সমস্বরে বলছিল: আরও কঠিন আঁধার নেমে পড়ার আগে আমরা এলাম।

ছাতকুড়ো-ঘুণপোকা-মাকড়সার নির্মাণে ক্রমে সে ঢাকা পড়বে— সেরকমই একটা অনুভূতি হচ্ছে যেন আজ— এভাবেই কি মমি হয়ে যাবো আমি?

যেন দু'হাতে সব সরিয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, আলো জ্বাললো, বসলো। বিড় বিড় করলো, 'মমি হ'লে চলবে? দু'দিন পর কবি সম্মেলন, তোমার ভক্তরা সব রেডিয়োর সামনে ব'সে থাকবে।'

কিন্তু আমি কোনো উৎসাহ পাচ্ছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার পুরনো বন্ধুরা আসবে— সুধীন-বিষ্ণু, অচিন-প্রেমেন—

প্রেমেন আসবে, না? দেখা হবে। হবে। প্রেমেনের সঙ্গে জরুরি একটা দরকার— প্রভা, মতিগতি যা— কোথায় কার খপ্পরে যে পড়বে, প্রেমেন যদি কোনো সুযোগ ক'রে দিতে পারে— তা পারে, ডিরেক্টার ব'লে কথা!

যদি ক্লিক্ করে ব্যাপারটা—

—প্রভা, আজ বিকেলটা একটু ফাঁকা রেখো।

—না, একটু বেরুতে হবে।

—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে বেরুবে।

—তোমার সঙ্গে! না, কার সঙ্গে বেরুবো না-বেরুবো— সেটাও রুচির ব্যাপার।

—তুমি সেই ধুতির ব্যাপারে এখনও রেগে আছো।

আনন্দর তখন মনে পড়বে, চাকরি পাবার পর, কবে একদিন প্রভা, হয়তো প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে, তার জন্যে একটা ধুতি এনেছিল, ভালো মিহি— আনন্দ তখন কিছু লিখছিল, প্রভা ধুতিখানা টেবিলের 'পরে রেখে বললো, 'তোমার জন্য।'

আনন্দ ধুতিখানা না-ধ'রেই বুঝেছিল, দামি, অন্তত যে-ধুতি সে পরে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। লেখা থামিয়ে প্রভার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'শোনো, তুমি তোমার খুশিমতো সাজপোশাক করো, সে-ইচ্ছায় আমি কোনো বাধা দেবো না। কিন্তু আমাকে তুমি এ-বিষয়ে তোমার ইচ্ছেমতো চালানোর চেষ্টা কোরো না।'

—শোনো। আমার সঙ্গে তুমি না-যাও, আমাকে ফলো কোরো তুমি। কিংবা, আমি পথ ব'লে দেবো, তুমি যাবে, আমি একটু দূরে থেকে তোমাকে অনুসরণ করবো— কেউ বুঝতেই পারবে না আমি তোমার কেউ।

—কোথায় যেতে হবে?

—প্রেমেন মিত্রের বাড়ি।

—প্রেমেন মিত্র! মানে?(!)

—হ্যাঁ, সিনেমা করেন যিনি।

—কেন! কেন যাবো আমরা?

—কবি সম্মেলনে দেখা হলো। কথায় কথায় তোমার অভিনয়ের কথা বললাম। উনি আগ্রহ দেখালেন। আমি তখনই কথাটা পাড়লাম— কোনো সুযোগ ক'রে দেওয়া যায় কিনা। উনি সঙ্গে-সঙ্গেই বললেন, একদিন নিয়ে আসুন।

স্বপ্ন-সম্ভাবনায় খুশিতে উজ্জ্বল প্রভার মুখখানা আনন্দ স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছে।

তারপর আমরা পাশাপাশি হেঁটে যাবো, যেমন হেঁটে যায় এ-পৃথিবীর প্রেমিকযুগল, আমাদের শরীর থেকে অপার্থিব আলো বিকীর্ণ হবে...

আনন্দ যেন দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছিল, দেখতে-দেখতে তার ঠোঁট চেপে বসলো, একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুর-গুর হাসি উঠে আসছে, হাসির তোড়ে ফাঁকা হচ্ছে ঠোঁট— সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে ছুটছে হাসির ফোয়ারা...

—'পাগল হয়ে গেলে নাকি?' দরজায় প্রভার কণ্ঠস্বর, 'একা-একা হাসছো!'

হাসি থামিয়ে আনন্দ বললো, 'কখন ফিরলে তুমি— টের পাইনি তো! নিঃশব্দে, বেড়ালের মতো!'

—'হাসছিলে কেন?'

—'তোমার কথা ভাবছিলাম। ভাবতে-ভাবতে হাসি পেলো— তোমার শরীর ভালো?'

—'হঠাৎ শরীরের খোঁজ নিচ্ছো-যে বড়!'

—'কেন, নিই না যেন!' তারপর একটা কবিতার লাইন মনে পড়লো, লাইনটা কথা হলো, 'আজকে রাতে তোমাকে কাছে পেলে কথা বলা যেতো।'

—'তোমার ওই ভাবের কথা, বলেছি না, আমার ভালো লাগে না।' প্রভা চ'লে গেল। আজ একটুও খারাপ লাগলো না আনন্দর, আসলে তাকে-যে পাওয়া যাবে না, সে জানতো, জানতো ব'লেই নিজেকে সে সান্ত্বনা দিতে শোনালো: যেই নিট নিয়মে ভাবনা আবেগ ভাব/বিশুদ্ধ হয় বিষয় ও তার যুক্তির ভিতর;/আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে/দেখেছি ভারত লণ্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন/আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব/অটুট নিয়মাধীন।

আনন্দ দু'খানা পোস্টকার্ড বের করলো। দুটো চিঠি লেখা দরকার। কাব্য-সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন একজন, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে, তাঁকে দিন-পাঁচেক পর আসতে অনুরোধ জানিয়ে চিঠিটা লিখলো সে। আর একখানা লিখলো সুরজিৎকে, তাকে সাতদিন পরে কোনো একদিন, তার ইচ্ছেমতো— আসার কথা বললো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার মুখের রূপ নিয়ে তুমি বেঁচেছিলে তোমার শরীরে
তাই তো মসৃণ তুলি হাতে লয়ে জীবনেরে এঁকেছি এমন
অনেক গভীর রঙে ভরে দিয়ে;

এ-বাড়িতে ভোরের রোদ্দুর আসার কোনো পথ নেই, তবু আনন্দর মনে হলো ভোরের রোদ্দুর তার মাথায় হাত রেখেছে। কোথা থেকে যেন প্রার্থনা সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে, তাতে কথা ফুটে উঠছে: মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে/তোমার বিশ্বের সভাতে/আজি এ মঙ্গল প্রভাতে...

আনন্দ তার মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে... একটা দোয়েল ডাকছে কোথাও... শিশুগাছের পাতার মতো তার চোখের পাতা সূর্যের দিকে মেলে দিচ্ছে...

যদিও রোদ্দুর নেই, সঙ্গীত নেই, তবু আনন্দর মনে হলো— অনেকদিন পর একটা সুন্দর সকাল এসে তাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল।

আর তখনই তার মনে পড়লো সে কোনো এক আর্ট গ্যালারিতে ছবি দেখছিল— এক-একটা ফ্রেমে আটকানো টুকরো টুকরো প্রকৃতি: হিজল শিরীষ নক্ষত্র কাশ হাওয়ার প্রান্তর; অবিরল সুপারির সারি আর চাঁদ; শান্ত নদীতে ভাসছে ভেলা, দু'পাশে ধানক্ষেত সবুজ সন্ধ্যার মায়াবী নরম নীল ছড়ানো সমস্ত চরাচরে; সোনালি ধানের ক্ষেত— একটি কাকতাড়ুয়া; সন্ধ্যার রাঙা মেঘ, মেঘ ছিঁড়ে সন্ধ্যাতারা— তারপর একটা কালো ক্যানভাসের সামনে— কালোর মধ্যে একটিমাত্র আলোর বিন্দ, যেন উড়ছে; আর তখন, আনন্দ স্পষ্ট মনে করতে পারলো— অসংখ্য জোনাকি ফ্রেমের মধ্যে জ্বলছিল নিভছিল— সেই জ্বলা-নেভা দেখতে দেখতে সে যেন গভীর ঘুমে ডুবে গেছিল,— এই জেগে উঠলো।

কিছুদিন আগে আনন্দ নন্দলাল বসুর একক প্রদর্শনী দেখেছিল, সেখানে সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা— সঙ্গে তার সুবোধ ছিল, কথায়-কথায় পাশ্চাত্য শিল্পীদের কথা উঠলো, তখন একজন বলেছিল, 'ভ্যান গখের কথা ভাবাই যায় না— মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের জীবন, অথচ পৃথিবীর যাবতীয় রঙ বদলে দিয়েছেন তিনি!' আর একজন বলেছিল, 'বস্তুবাদী চেতনায় এক বিরাট আঘাতের নাম ভ্যান গখ।'

সঞ্জয় বলেছিল, 'কী বিশাল ট্রাজেডি, দারুণ রোমান্টিক,— মৃত্যুভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ফসলের ক্ষেত!' তখন আনন্দর মনে পড়েছিল, তাঁর মৃত্যুমিথ্ কোথাও শুনেছে— সঞ্জয় বলেছিল, 'লাস্ট ফর লাইফ পড়েছেন?' আনন্দ মনে করতে পারেনি, সে পড়েছে কিনা। তাকে চুপ থাকতে দেখে সঞ্জয় বলেছিল, 'আপনার অবসরের গান যতবার পড়েছি, ততবারই মনে পড়েছে ভ্যান গখের কথা— ফলন্ত মাঠের 'পরে আমরা খুঁজি না আজ মরণের স্থান/প্রেম আর পিপাসার গান/আমরা গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন...। ফলন্ত মাঠের 'পরে ভ্যান গখ মরণের স্থান খুঁজে নিয়েছিলেন! আশ্চর্য!'

আশ্চর্য! পিপাসার গান তো লিখেছিলাম আমি!

বিছানার ওপর মশারির ঘেরাটোপে জুবুথুবু ব'সে ছিল আনন্দ। তার ছবি আঁকতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

আঃ! যদি আঁকতে পারতাম! কতকাল আগের সেই আফশোস টের পেলো আনন্দ— উপেক্ষালিপি ছড়ানো বনির মুখখানাকেও তার মনে হতো আশ্চর্য সুন্দর। সেই মুখও ফুটে উঠতো হৃদয়ে, হৃদয় আজ প'চে গেছে, তবু সন্ধ্যার মেঘমালা ছিঁড়ে যে নক্ষত্রদীপ্তি— নক্ষত্রটিপ প'রে যে-মেয়েটি একদিন তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল, যেন-বা নারীসূর্যের প্রতিভাস... আনন্দ চোখ বন্ধ করলো— এই ছবিটি আঁকতাম; কিংবা সহজ ওই ছবিটি— অন্ধকার আর আলোমাছি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ অনন্ত প্রতিপদে তবু
চাঁদ ভুলে উড়ে যাওয়া চাই
উড়ে যেতে চাই।

কাল রেডিয়ো স্টেশনে আনন্দর কবিতা পাঠ ছিল। কবিসভার আয়োজক কোলকাতা রেডিয়ো। আত্মীয়স্বজন পরিচিত বন্ধুজন শুনেছে। সাতসকালে এক প্রতিবেশি তাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেছে। তারপর আর একজন। সে চ'লে যাবার পর আনন্দর মনে হলো, এখন তার বাজারে যাবার সময়, বাজারে গেলে যদি কেউ আসে তাকে ফিরে যেতে হবে— সে একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার— আনন্দ রঞ্জুকে ডাকলো। রঞ্জু এলো।

—'শরীরটা ভালো লাগছে না, সকাল থেকে লোকজনও আসছে দেখছিস তো, একটু বাজারে যা না!'

—'তাহলে আমাকে পয়সা দিতে হবে কিন্তু।'

—'আচ্ছা। পয়সা কী হবে?'

—'বই দেখবো।'

—'মা বকবে তো!'

—'তুমি ম্যানেজ করবে।'

—'আচ্ছা।'

রঞ্জু বেরিয়ে যাবার পর-পরই তীব্র ব্রেক ক'ষে একটা গাড়ি যেন দাঁড়িয়ে গেল তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায়। ব্রেক কষার শব্দটা আনন্দর মাথার মধ্যে যেন জমাট বেঁধে গেছে। একটা রক্তাক্ত দেহ। আনন্দ উঠে দ্রুত বাড়ির সামনে, গলির মুখটায় গিয়ে দাঁড়ালো। ল্যান্সডাউন রোড সুস্থ-স্বাভাবিক। ফিরে এলো। তবু মনে হলো, রঞ্জুকে পাঠানো উচিত হয়নি। টানটান একটা উদ্বেগ নিয়ে ব'সে থাকলো আনন্দ।

রঞ্জু ফিরে এলো। কেউ আসেনি।... বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে— কেউ এলো না। কে আসবে? কার অপেক্ষায় ছিলে? ভাবতে গিয়ে দেখলো, কোনো নাম নেই। তবু এলো, অফিস থেকে ফেরার পথে সুবোধ এলো। তার সঙ্গে কবি সম্মেলন নিয়ে অনেক কথা হলো। কে একজন সুবোধকে তার কবিতা ভালোলাগার কথা জানিয়েছে— সে নাকি বার বার উল্লেখ করছিল 'হৃদয়ের নীলাভ আকাশ' কথাটা— কী দারুণ কথা! কথাটা শুনে আনন্দ বললো, 'সুবোধবাবু, এই আকাশটাই আমি বিছিয়ে দিতে চেয়েছিলাম—' ব'লে কেমন উদাস হয়ে থাকলো। তারপর একসময় বললো, 'আর কী— কথা ফুরালো!'

আনন্দর মুখের দিকে চেয়ে থেকে সুবোধ বললো, 'তাহলে আমি আসি!'

—'হ্যাঁ-হ্যাঁ—'

সুবোধ বেরিয়ে যাচ্ছে।

—'আসছেন তো আবার? আমি কিন্তু অপেক্ষা করছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আচ্ছা।'

সুবোধ চ'লে যাবার পর আনন্দর মনে হলো সুবোধ যেন বার বার তার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, ঠিক যেমন সঞ্জয় কাল তাকে লক্ষ করছিল। তখনও কবিতা পাঠ শুরু হয়নি, আনন্দ চুপচাপ ব'সে ছিল, তবু একসময় সঞ্জয় বললো, 'আনন্দবাব, এমন উদ্‌ভ্রান্ত-অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে আপনার?'

—'কিছু না তো! প্রেমেন— প্রেমেনকে খুব দরকার, জানলেন! প্রেমেন বোধহয় এলো না আজ! —এই।'

তবু সঞ্জয় তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, যেমন সুচরিতা— সেও কি ভাবছিল আমার কোনো অসুখ করেছে?

অলীক দর্শনের মতো অলীক শ্রবণও কি অসুখ?

কয়েকদিন আগে, আজ চোদ্দ— এগারো তারিখ, তখন সন্ধ্যা। লেক থেকে ফিরছিল আনন্দ। সঙ্গে সুবোধ বা অজিত কেউ-ই ছিল না। একটু দূর থেকে সে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে একটা জটলা দেখতে পেলো। কাছাকাছি হ'তেই তার মনে হলো সবার মধ্যে কেমন উদ্বেগ-অস্থিরতা, বলাবলি করছে: একটু আগে এইখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে— ত্রিকোণ পার্কের কাছে লোকটার বাড়ি।

ত্রিকোণ পার্ক— একশ বাহাত্তর বাই তিন আর.বি. অ্যাভেন্যু— নিনিদের বাড়ির কেউ নয় তো? আনন্দর মনে হলো লোকটা নিনিদের বাড়ির কেউ— নিনির বাবা, অশোক— আনন্দ ছুটলো ত্রিকোণ পার্কের দিকে।... নিনিদের বাড়িতে তখন এক ঝি ছাড়া কেউ ছিল না। ঝি-কে সে ব'লে এসেছিল ফিরলেই কেউ যেন ল্যান্সডাউনে আসে।

সুচরিতা ছুটতে ছুটতে এসেছিল। তখন এরকমই ব'সে ছিল আনন্দ। দরজায় সুচরিতা। আনন্দ বললো, 'কী হয়েছে? হাঁপাচ্ছিস কেন?'

সুচরিতা তখন বিস্মিত।

—'বোস্! বোস্!'

—'কী হয়েছে তোমার, শরীর খারাপ?'

—'শরীর খারাপ হ'তে যাবে কেন? নতুন ক'রে কিছু হয়নি।'

—'না, তুমি বলো, কী হয়েছে?'

—'কিছুই হয়নি, তোকে দেখেই তো বুঝতে পারছি, ও.কে.—'

—'আমাকে দেখে কী বুঝতে পারছো?'

—'ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ— বোস্, বোস্ না!'

সুচরিতা বসলো। সন্ধ্যাবেলার ঘটনা শুনে সে বললো, 'অ্যাক্সিসেন্ট! তেমন কিছু শুনলাম না তো!' ব'লে আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের দিনও আনন্দ একই জায়গায় একই কথা শুনলো,— আগের দিনের মতো আনন্দ নিনিদের বাড়িতে গেল উদ্বিগ্ন হয়ে, ঝিকে ব'লে এলো একই কথা।

সেদিনও সুচরিতা এসেছিল।

ঠিক। আমার নিশ্চয় কোনো অসুখ করেছে। নইলে একই খবর রোজ বানিয়ে নেবো কেন?

আনন্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সুচরিতার রাগত কণ্ঠস্বর, 'তোমার নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেছে, নইলে একই খবর রোজ বানিয়ে নেবে কেন?'

সুচরিতার এমন কণ্ঠস্বর আগে কখনও শোনেনি আনন্দ— তার তাকিয়ে থাকাটাও কেমন যেন— উদ্‌ভ্রান্ত হওয়ার লক্ষণ খুঁজছে সবাই, এমন-কী সুবোধও!

আনন্দ আর সুবোধের জন্য অপেক্ষা করলো না। একাই বের হলো। রাসবিহারী আর ল্যান্সডাউনের ক্রসিঙে এসে দাঁড়ালো। পশ্চিম আকাশে রঙিন মেঘ। খুব-যে স্পষ্ট দেখতে পেলো তা নয়, কিন্তু তার ঘ্রাণ পেলো। আজও, সেই কতদিন আগেকার মতো, তার মনে হলো, আঃ! যদি ওই মেঘের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া যেতো! মেঘ যেন শুনলো তার কথা। মেঘ নেমে আসছে ব্যস্ত ক্রসিঙের ওপর। উজ্জ্বল বর্ণময় মেঘ, থরে থরে সাজানো। মেঘের ভিতর থেকে একটা সিঁড়ি নেমে আসছে। কেমন এক পবিত্র ঘণ্টাধ্বনি... একটা দেখবার জিনিস হয়ে আনন্দ দাঁড়িয়ে আছে... ঘণ্টাধ্বনি কেমন বদলে যাচ্ছে চেনা শব্দে... একটা ট্রাম ঘণ্টি বাজিয়ে চ'লে গেল। উধাও মেঘসিঁড়ি... ট্রামের চ'লে যাওয়া তখন আনন্দর চোখে দারুণ এক দৃশ্য: একটা অজগর সবুজ ঘাস দলিত-মথিত ক'রে মিলিয়ে যাচ্ছে...

রাস্তা পার হ'তে গিয়ে আনন্দ ট্রামলাইনের ওপর দাঁড়ালো, মুহূর্ত-কয়েক দাঁড়িয়ে থাকলো— যত দূর দৃষ্টি যায় ডাইনে-বাঁয়ে ঘাস আর ঘাস, কাশফুল— একবার মাটির দিকে তাকালো, ঘাসের মধ্যে ডুবে আছে পা, পা যেমন ডুবে আছে— এমন যদি সমস্ত দেহটাকে ঘাসের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া যেতো, ঘুমিয়ে পড়তাম!

ফুটপাথ ধ'রে আনন্দ হাঁটছে... বাঁ-দিকে বাঁক নিলো, সাদার্ন অ্যাভেন্যু... রাস্তার দু'ধারের গাছগুলো কি বদলে যাচ্ছে... ওই তো ঝাউবীথি— বগুড়া রোড, নদীটা কোথায় গেল— একটা নদী ছিল তো এখানে! মোরাম বিছানো পথ? নেই— যেন বিলুপ্ত কোনো নগরীর পথ কিন্তু ভগ্নপ্রাসাদের খিলান গম্বুজ উধাও; কিছু নেই কোথাও তবু সামনে সমুদ্র, এ কি জুহুর সমুদ্রতট? ওই নীল স্ফটিক— এই তো সন্ধ্যার সমুদ্র... স্ফটিকের মধ্যে নিজেকে শায়িত দেখতে পাচ্ছে... কেমন এক দিব্যকান্তি পেয়েছে—

এই শরীর কেউ গ্রহণ করলো না! এ মনের সমস্ত প্রলাপ ট্র্যাঙ্কবন্দি, যা প্রকাশিত— কোনো নারীহৃদয়কে তা স্পর্শ করলো না— এ হৃদয়, এ শরীর তবে তুমি গ্রহণ করো হে সমুদ্র!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আনন্দবাবু!'

কেউ যেন ডাকলো তাকে! নাকি অলীকশ্রবণ?

—'শুনছেন?'

সমুদ্র উধাও হয় গেল— সামনে লেক, আনন্দ কেমন ঘোলাটে দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো।

—'কাল আপনার কবিতা শুনলাম, অপূর্ব!'

লোকটাকে সে চিনতে পারলো না। বললো, 'তাই বুঝি!' তাকে বিমূঢ় ক'রে দিয়ে আনন্দ দ্রুত হাঁটতে থাকলো...

উজ্জ্বল সমুদ্রকে মরণের স্থান হিসাবে বেছে নেবার ইচ্ছে যদি কারও হয়— হ'তে পারে। কিন্তু সমুদ্র যদি না-থাকে? আনন্দ বিড়বিড় করলো, 'ম'রে যাওয়াও কঠিন ব্যাপার!'

—কিন্তু বেঁচে থাকা কি আরও কঠিন নয়?

—কঠিন, খুব কঠিন। ইট ইজ হার্ড টু ডাই বাট হার্ডার টু লিভ।

—তাহলে মৃত্যুভূমি হিসাবে ফসলের মাঠ চমৎকার! কী বলো!

—কিন্তু আমি তো বার বার ফসলের ক্ষেতে জন্মাতে চেয়েছি।

—তবু ফলন্ত মাঠের 'পরে তুমি কিন্তু একদিন মরণের স্থান খুঁজে নিতে চেয়েছিলে!

আনন্দ থমকে দাঁড়ালো।

—যদি না-ই খুঁজবে, একথা তুমি কীভাবে লিখেছো— ফলন্ত মাঠের 'পরে আমরা খুঁজি না আর মরণের স্থান?

আনন্দ হাঁটছে...

—খুঁজেছিলে ব'লেই তো একবার তুমি জন্মদিন আর মৃত্যুদিন একই তারিখ ক'রে দিতে চেয়েছিলে, না? মৃত্যুভূমি আর জন্মভূমি তো একই হ'তে পারে।

—কিন্তু এ কংক্রিটের জঙ্গলে ফসলের ক্ষেত কোথায় পাবো? মৃত্যু অত সহজ নয়—

আনন্দ পথ বদলালো।

—এ কী! কোথায় যাচ্ছো?

—ওই দ্যাখো জটলা— ওখানে নিশ্চয়ই একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে— শুনতে পাবো, অথচ অলীক— কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

—অলীক তো অলীকই, কানে না-নিলেই হলো।

আনন্দ হাঁটছে...

ক্রসিঙে এসে দাঁড়ালো। আশ্চর্য— কোথাও কোনো জটলা নেই, অথচ এই একটু আগে সেটা ছিল। ডানদিকে বাঁক নিলো। চারদিকে কেমন নরম নীল আলো ছড়িয়ে আছে।

জুয়েল হাউসের সামনে দাঁড়ালো। একবার ঘুরে দোকানটাকে দেখলো। দেখবার জিনিস বটে। আলো আর কাচের অদ্ভুত সোনাভ মায়া। কেমন যেন অচেনা মনে হচ্ছে তার চারপাশটা। একটু আগে কে যেন সঙ্গে ছিল, আমি থামলে সেও থামছিল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এই তো আমি

—এ কোথায় এলাম আমরা?

—সবুজ নদীর দেশে—

আনন্দর চোখের সামনে ভাসছে নরম নীল সন্ধ্যার নদী, দিগন্তে টিপের মতো পূর্ণিমার চাঁদ— আমি এই নদীটির কিনারে শুয়ে থাকবো—

আনন্দ হাঁটছে নদীর দিকে...

দূর থেকে ভেসে আসছে জেলেনৌকার ঠক্ ঠক্— কেমন সুরেলা অচেনা আওয়াজ...

কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে আনন্দ...

নদী না ফসলের ক্ষেত? ওই তো সবুজ বাতাস বয়ে আসছে, নদীর বুক থেকেই কি উঠে আসছে অমন শরীর জুড়ানো হাওয়া? প্রবল হাওয়া! টাল সামলাতে পারছে না আনন্দ— আর নৌকাটাও তাকে আল্‌তো ছুঁয়ে গেল— নক্ষত্র-সমেত সমস্ত আকাশটা নেমে আসছে, যেন বালক মিলুর পতন রুখে দিতে ছুটে আসছেন নক্ষত্র-হয়ে-যাওয়া সত্যানন্দ-কুসুমকুমারী...

নিভে যাচ্ছে তারার আকাশ... একটা কালো ক্যান্‌ভাস আনন্দর চোখের সামনে, ক্যান্‌ভাস জুড়ে অন্ধকারের আবর্ত... একটা সুড়ঙ্গ টেনে নিচ্ছে তাকে...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের দিন বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাঁচ-ছ' পাতায় আনন্দ খবর হলো। দৈনিক বসুমতী-র স্টাফ রিপোর্টার জানাচ্ছেন: বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ও ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগস্থলে একটি চলন্ত ট্রামের ধাক্কায় অধ্যাপক জীবনানন্দ দাস গুরুতর রূপে আহত হন। তাঁকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

যুগান্তর লিখেছে: প্রখ্যাত কবি শ্রীজীবনানন্দ দাশ বৃহস্পতিবার রাত্রে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ও ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগস্থলে ট্রাম হইতে পতনের ফলে গুরুতর রূপে আহত হন। তাঁহাকে ঘটনাস্থল হইতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর কোলাহল সব ফুরিয়ে গেছে
সেই শেষঘুম এসেছে নক্ষত্রের ভিড়ে

তারপর, তেইশ অক্টোবর— আবারও খবর সে সেইসব কাগজে... হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড লিখলো:
Sri Jibanananda Das, eminent poet and literateur, died in Sambhunath Pandit Hospital at 11.35 on Friday night. He was about 55. Sri Das's body will be cremated in the Keoratala burning [sic] Ghat at about 9 this morning.

It may be recalled that Sri Das was seriously injured being knocked down by a tram car near Deshapriya Park on Oct. 14 last and was admitted to the hospital with fractures of bones and ribs.

He was survived by his wife, a daughter and a host of friends and admirers to mourn his loss.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতজ্ঞতাস্বীকারপত্র

যাঁদের সংগ্রহ আমাকে সমৃদ্ধ করেছে ও যাঁদের রচনা আলো ছড়িয়েছে:

জোনাকি ঘোষরায়	**জীবনানন্দ সমগ্র** (প্রতিক্ষণ); **প্রতিবেশী**— গৌরকিশোর ঘোষ
বরেন্দু মণ্ডল	**জীবনানন্দ দাশ বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত**— দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; **একদিন শতাব্দীর শেষে** (জীবনানন্দ স্মারক সংকলন)— পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসমিতি; **জীবনানন্দ স্মৃতি** (ময়ূখ); **নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ**— রাজনারায়ণ বসু; **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ**— শিবনাথ শাস্ত্রী; **হে প্রেম তোমারে ভেবে ভেবে**— জীবনানন্দ দাশ; **জীবনানন্দ**— অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
তাপস মণ্ডল	**আমি সেই পুরোহিত**— সুচেতা মিত্র; **আলোকের মহাজিজ্ঞাসায় কবি জীবনানন্দ**— করুণাসিন্ধু দাস; **জীবনানন্দ সংখ্যা**, যুবমানস (১৯৯৯)
সুমন মজুমদার	**কালিদাস রচনা সমগ্র; বোদলেয়ার ও র‍্যাবোঁর কবিতা**
শিবেন মজুমদার	**বঙ্কিম রচনাবলী** (উপন্যাস)
অরিজিৎ সিংহ	**জীবনানন্দ সংখ্যা** (বৈদগ্ধ)
অঞ্জন চক্রবর্তী	**জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা** (অনুষ্টুপ)
সুশীল সাহা	**জীবনানন্দ সংখ্যা** (উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা)
বিশ্বজিৎ ঘোষ	**জীবনানন্দ সংখ্যা** (কোরক); **রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ**— চিন্মোহন সেহানবীশ
নিতাই নসকর	**জীবনানন্দ সংখ্যা** (বিভাব)
দেবাশিস বিশ্বাস	**জীবনানন্দের ডায়েরি ও গদ্য আলোচনা** (বিষয়মুখ, জানুয়ারি ২০০০; জানুয়ারি-জুন ২০০১)
স্বপন চক্রবর্তী	**জীবনানন্দের ডায়েরি** (এবং কথা)
কৃষেঃন্দু পালিত	**বৈষ্ণব পদ সংকলন**— দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; **আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ**— অধ্যাপক সমরকুমার মল্লিক
প্রলয় চক্রবর্তী	**হস্তান্তর**— শংকর ঘোষ (পশ্চিমবঙ্গ, জীবনানন্দ দাশ স্মরণ সংখ্যা)
কল্যাণ চন্দ	**কখনো চম্পা কখনো অতসী, স্মৃতিকথন**— রণেশ দাশগুপ্ত
মানস ঘোষ	**চণ্ডীদাস** (চলচ্চিত্রের সিডি)
জলধি হালদার	**জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ** (ভারবি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগত সংগ্রহ

জীবনানন্দ দাশ— প্রভাতকুমার দাস; **দাঙ্গার ইতিহাস**— শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; **স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল**— হীরালাল দাশগুপ্ত; **শুনুন ধর্মাবতার**— নাথুরাম গড্‌সে; **আলেখ্য: জীবনানন্দ**— ভূমেন্দ্র গুহ; **জীবনানন্দ**— অরুণেশ ঘোষ; **নীল হাওয়ার সমুদ্রে**— প্রদীপ দাশশর্মা; **জীবনানন্দ স্মৃতি** — সম্পাদক: উজ্জ্বলকুমার দাস; **থেরীগাথা**— ভিক্ষু শীলভদ্র; **উপনিষদ**...

যাঁরা এই আখ্যানের পাণ্ডুলিপি অংশত কিংবা সম্পূর্ণভাবে পড়েছেন (বরেন্দু মণ্ডল, সৌমদীপ মণ্ডল, প্রভাতকুমার দাস, সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি) এবং স্বপ্ন দেখেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন,— তাঁদের প্রতি রইলো আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~